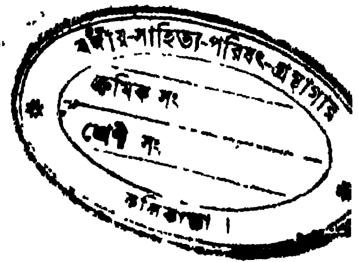
ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চতসপ্তিমিববাশিবান্ কঃ ।
স্তোত্রয়ন্বিকরতাং বিপশ্চিতা
মচ্চিরা কংসমাবুদ্ধিপঃ ॥





আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

—:*:—

পঞ্চদশ বর্ষ—১৩২৯



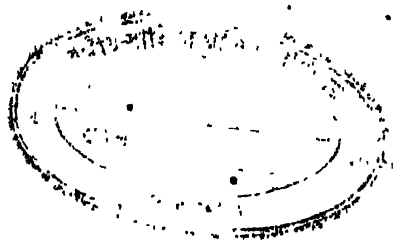
সম্পাদক—শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী

বার্ষিক মূল্য—২৲ প্রতি সংখ্যা—৶৹

যোড়হাট

সারস্বত মঠস্থ "যোগমায়া যন্ত্র" হইতে

ব্রহ্মচারী [illegible] দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত



সূচী

—※—

বর্ণমালানুসারে

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৫শ বর্ষ } বৈশাখ { ১ম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণম্

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।১৬।৯]

উষো যদগ্নিং সমিধে চকর্থ
বি যদাবশ্চক্ষসা সূর্য্যস্য।
যন্মানুষান্ যক্ষ্যমাণাঁ অজীগঃ
তদ্দেবেষু চকৃষে ভদ্রমপ্নঃ॥

ব্যঞ্জিভির্দিব আতাস্বদ্যৌৎ
অপ কৃষ্ণাং নির্ণিজং দেব্যাবঃ।
প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈ-
রোষা যাতি সুযুজা রথেন॥

আবহন্তী পোষ্যা বার্য্যাণি
চিত্রং কেতুং কৃণুতে চেকিতানা।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনাং
বিভাতীনাং প্রথমোষা ব্যশ্বৈৎ॥

মাতা দেবানামদিতেরনীকং
যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতী বিভাহি।
প্রশস্তিকৃদ্‌ ব্রহ্মণে নো ব্যুচ্ছা
নো জনে জনয় বিশ্ববারে॥

যজ্ঞভূমে জ্বালায়েছ ওগো উষা পুণ্য হোমানল,
অরুণের আঁখি মেলি' নীলিমারে করেছ উজল,—
যজ্ঞসেবী মানুষের দিব্য তেজে চিত্ত আলোকিয়া,
দেবতার কর্ম্মভার, হে কল্যাণী, এনেছ বহিয়া।

যুলন্ত জ্যোতিঃর দল দিকে দিকে পড়িছে ঝরিয়া,
দ্যুলোকের কালো বাস, ওগো দেবী, নিয়েছ হরিয়া—
অরুণের রাগে রাঙা তুরগেরে জুড়িয়াছ রথে,
এস আজ বিশ্ববাসী নিখিলের চেতনার পথে!

আকুল-হৃদয়ে-চাওয়া বয়ে আন রতনের ঝাঁপি;
তোমার পরাণ ছুঁয়ে বিশ্বে প্রাণ উঠিয়াছে কাঁপি।
শাশ্বত অতীত ফেলে তব রূপে তার রূপছায়া—
জ্যোতির্ম্ময়ী কায়া মাঝে আজি তব জাগে নব মায়া!

দেবগণ-মাতা তুমি—অদিতির নিত্য সহচরী;
জাগে ওই হোমশিখা—জাগ তুমি ভূমা রূপ ধরি।
বরষি আশিষ দেবী ব্রহ্মজ্যোতিঃ-পূর্ণ কর হিয়া,
জন-গণ-মন মাঝে দাও স্থান, বিশ্ব-বরণীয়া!

———*———

নব বর্ষ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরোকরোৎ অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণমস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎষু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ এবং বল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় আপ্যায়িত হউক। সমস্ত ব্রহ্মোপনিষদ্ আমার নিকট প্রকাশিত হউক। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকৃত না করি—ব্রহ্মও যেন আমাকে নিরাকৃত না করেন—সর্ব্বত্র অনিরাকরণই হউক—অনিরাকরণই হউক। আত্মাতে নিরত আমার মাঝে উপনিষদের যে ধর্ম্ম, তাহারাই প্রকাশিত হউক—আমার মধ্যে তাহারাই প্রকাশিত হউক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

পুরাতনকে পিছনে ফেলিয়া আজ নূতনের সম্মুখে আসিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। আজ আমাদের জীবনের সমস্ত তাৎপর্য্য এই নূতনের মাঝেই মধুময়, বীর্য্যময় হইয়া দেখা দিয়াছে—তিল তিল তপস্যার দ্বারা ইহাকেই আমাদের সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। একটী বৃহৎ ভাবের উদার আলোকস্রোতে আজ এই জীবনের দলগুলি মেলিয়া ধরিতে হইবে—বিশ্বের সকলের সঙ্গে গভীরতম অন্তরের যোগে যুক্ত হইতে গিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বতঃ সঞ্চারী এক মহা বর্ত্তমানের বেলাভূমিতে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি। কোন্ সত্য আজ অপ্রতিহত বীর্য্যশালী স্নিগ্ধতায় আমাদের মর্ম্ম বিদ্ধ করিল? তাহা ব্রহ্মের সত্য—যিনি ভূমা, যিনি বৃহৎ, সমগ্র বিশ্ব যাঁহার মাঝে ওত এবং প্রোত, লোক হইতে লোকান্তরের মাঝে যিনি বিধৃতিরূপে অমৃতের সেতু, তিনিই আমাদের অন্তরের আলোকে প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিলেন। তিনি উপনিষৎস্বরূপ—জীবন মরণ মন্থন করা পরমাশ্চর্য্য রহস্য তিনি—মরমীর হৃদয় হইতে দরদীর হৃদয়ে গোপন সঞ্চরণ তাঁহার চিরন্তন লীলা; তাই তো তিনি সকল প্রাণের বন্ধনী হইয়া সকলের বন্ধু হইয়াছেন। আজ সমস্ত দেহ মন প্রাণ লইয়া তাঁহাকে স্বীকার করাই আমাদের পরম শ্রেয়ঃ। আমরা জীবনের কোথাও যেন তাঁহাকে নিরাকৃত না করি; তাঁহাকে অস্বীকার করিবার শতসহস্র ছল আমাদের মাঝে উদ্যত রহিয়াছে। কেবল স্পর্দ্ধাভরে নয়—দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া যে আরাম-শয়নে ঢলিয়া পড়ি—সেই তো তাঁহার দুঃসহ অপমান। আমরা দুর্ব্বল কিসে?—আসক্তিতেই তো আমরা বীর্য্যহীন। চাহিবার শক্তি, চাহিবার আনন্দ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা যাহা অল্প, যাহা ক্ষুদ্র, তাহাকেই আমরা বেড়িয়া ধরিতেছি—ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনগুলি লইয়াই কেবল কোলাহল করিয়া মরিতেছি। ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করি না, কিন্তু তাহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিব কেন?—রসের সূত্রে তাহাদিগকে বরণমালায় গাঁথিয়া তুলিতে কি পারি না?—ইহাতেই তো আসক্তি রস হইয়া দেখা দিবে।

আমরা সকলেরই সার্থকতা স্বীকার

করিব। কিন্তু অতি ক্ষুদ্রকেও বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার অখণ্ড তাৎপর্য্যকে আমরা জীবনে পরিস্ফুট করিয়া দেখিব। জীবনের সমস্ত রূপই আমাদের বরণীয়—কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে হইবে অন্তর্বাহ্যচক্ষুঃ হইয়া। এই যে দেহ, বাক্য, প্রাণ, বল, ইন্দ্রিয়—ইহাদের তাৎপর্য্যও আমরা অস্বীকার করিব না—আমরা অন্তরে বাহিরে ইহাদিগকে ভূমানন্দের রসানুবদ্ধ বলিয়াই জানিব। ইহাদের সঙ্গে যদি আমাদের কেবল বাহিরের যোগই ঘটে, তাহা হইলে ইহারা মরণের পথেই আমাদিগকে আগাইয়া দিবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের মাঝে যে একটী স্বানুভূতি প্রাণনচেষ্টা কেবলি জ্যোতির্ম্মালার মত বাহিরের দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, অভিমানের বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার সঙ্গে যদি আমরা এই দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের যোগ ঘটাই, তাহা হইলে আর কোথাও ইহাদের মাঝে বাধা থাকিবে না—ইহাদের অতিস্থূল অপরূপ স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে। জীবনের ইহাই উপনিষৎ—ইহাই রহস্য। কেবলই বিরোধ দিয়া জীবনকে কণ্টকিত করিয়া সত্য পাইব না—এই যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিচিত্র রাগিণী আমাদের জীবনে রসের অনুরণনে ছলকিয়া উঠিতেছে, ইহার মাঝে যে সুরটী গভীরতম, অনায়াস চেষ্টায় সেইটাকেই স্পর্শ করিতে হইবে—কেবলি নিজকে ছড়াইয়া দিয়া; ফুল যেমন আলোর স্পর্শে তাহার দলগুলি মেলিয়া ধরে—তেমনি সন্তর্পণে, অনায়াসে, স্বচ্ছতম রসানুভূতিতে। তারপর দেখিবে, বিধান মানিয়া মানিয়া আর তোমাকে পথ চলিতে হইতেছে না, কাহারও প্রবেশ নিষেধ করিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইতে হইতেছে না—নিশ্বাসের মত সহজ চেষ্টায় এ জগৎ যেন তোমার মাঝে প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠিতেছে।

এমনি করিয়া দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়কে আপ্যায়িত করিয়া আমরা যদি ব্রহ্মকে কোথাও নিরাকৃত না করি, তবে তিনিও আমাদের কোথাও নিরাকৃত করিবেন না—জীবনের ইহাই দ্বিতীয় সূত্র। আমাদের মাঝে যেটুকু স্বাতন্ত্র্য তাঁহার নিরসনেই নিযুক্ত ছিল, আগে তাহাকেই দূর করিতে হইবে; তাহা হইলেই বাঁধভাঙ্গা নদীর স্রোতের মত তাঁহার আনন্দ কূল ছাপাইয়া আমাদের মাঝে উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে। আলো চাই, বল চাই, আনন্দ চাই, কিন্তু পাই না কেন?—এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ দিয়া কেবলই তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছি বলিয়া। সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিব এমন শক্তি আমাদের নাই, কিন্তু এই ক্ষুদ্র করতল দিয়া আপনার চক্ষুকে তো আচ্ছাদন করিতে পারি। আমাদের পক্ষে তাই এতটুকু স্বাতন্ত্র্যের বাধাও তাঁহার করুণা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে—আপন হাতে আমরা আপন চোখ ঢাকিয়াছি, তাই তাঁহাকে চাহিয়াও পাই না। এই আবরণ হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়—সকলের বন্ধন হইতে আমরা মুক্ত হইব, তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া নয়—তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া। কিন্তু সে আপ্যায়ন তো ক্ষুদ্র উপকরণ দ্বারা সম্ভব নয়—উপকরণ যে তাহাদের শক্তিকে শুধু পঙ্গু করিবে। তাই আত্মরতি দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে হইবে—প্রাণ হইতে প্রাণের সঞ্চারের মত কোন মহামানবের আনন্দের বিদ্যুৎসঞ্চারে আমাদের আনন্দও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে—দেহে মনে, প্রাণে আনন্দে উপচিয়া পড়িবে—যুগ-

যুগান্তরের সঞ্চিত উপনিষৎ রহস্য মুহূর্ত্তের স্পর্শে জাগিয়া উঠিবে। ওঁ শান্তিঃ।

"ভূমৈব সুখং—নাল্পে সুখমস্তি"—যাহা ভূমা, যাহা বৃহৎ, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। অতৃপ্তি তাই আমাদের হৃদয় জুড়িয়া হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু তৃপ্তি খুঁজিতেছি কিসে? —বাহিরের উপকরণে? হায় রে অন্ধ!—ন বিত্তেন অমৃতস্য আশাস্তি—এই বিত্তের সঞ্চয়ে সেই অমৃতকে কিনিয়া লইব—এতদূর স্পর্দ্ধা আমাদের? তাই তো বেদনার আঘাতে বিত্তের স্তূপীকৃত সঞ্চয় বারবার করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে—অশান্ত চিত্ত আবার অতৃপ্তির দাহে স্বস্তিহীন হইয়া ফিরিয়া মরে। তবে কোথায় তাহার মহৎ তৃপ্তি—কোথায় তাহার পরম লাভ?—সে যে ভূমার স্পর্শে। সে ভূমা তো বাহিরের উপকরণে নয়, সে যে অজর, অভয়, অমৃতের সেতু হইয়া আমাদের অন্তরের মাঝে গুহাহিত হইয়া রহিয়াছে। বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্তরের মাঝেই তাহাকে খুঁজিতে হইবে। বাহিরে যাহা রহিয়াছে, তাহা থাক্, তাহাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনও বিরোধ হইতেছে না; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অন্তরের মাঝে রসের উৎসটী না আবিষ্কার করিতে পারিতেছি, ততদিন পর্য্যন্ত বাহিরের দিকে তাকাইবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু আমরা বৃথা ক্ষোভে উচ্ছ্বসিত হইয়া কেবল বন্ধন করিয়াই চলিতে চাহি না। আমরা চাই অন্ধকারের মাঝে আলো ঢালিয়া অন্তরের রসানুভূতিতে নিত্য নূতন রূপ ফুটাইয়া তুলিতে। তাই কর্ম্মের প্রেরণা আমাদের মাঝে মরিয়া যায় না; কিন্তু এই প্রেরণাকেই যদি চরম করিয়া তুলি, তাহা হইলে কেবল মৃত্যুকেই আবাহন করিয়া আনা হইবে। কর্ম্মের মাঝে দেহ মনকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—কিন্তু আত্মার প্রদীপটা তুলিয়া ধরিয়া যদি তাহাদের পথে আলো না ঢালিতে পারি, তবে এই দেহ-মনের কর্ম্মপ্রমত্ততা কোথায় গিয়া থামিবে? এই জন্যই কর্ম্মের প্রতিও একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্য চাই—অন্তরের কামনা দিয়া তাহাকে বেড়িয়া রাখিলে তাহা ক্ষুদ্র হইয়া আমাদিগকে পীড়ন করিবে। মনে রাখিতে হইবে—কর্ম্মের বিস্তারে ভূমার সন্ধান মিলিবে না—ভূমাকে পাইব আত্মপ্রসারণে, কর্ম্মের ভাবনার প্রতি একেবারে নিরাসক্ত হইয়া।

এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিব, নিজেকে আমরা যতই বীর্য্যহীন শক্তিহীন বলিয়া ভাবি না কেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মাঝেই একটা গভীর তাৎপর্য্য প্রচ্ছন্ন আছে—যাহা নিরঙ্কুশ আনন্দদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। একটা মহৎ কর্ত্তব্য যে আমাদের প্রাণের স্পর্শের অপেক্ষায় রহিয়াছে, এ কথা যেদিন বুঝিতে পারিব, জীবন সেই দিন হইতে অর্থ-পূর্ণ হইবে। কিন্তু এই কর্ত্তব্য কাহার প্রতি?—কর্ত্তব্য আমার প্রতি। আপনার প্রতি উদাসীন হইয়া বৃথা আমরা বাহিরটাকে বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি; ইহাতে কি শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ ঘটিতেছে—বাহির কি বাস্তবিকই বড় হইয়াছে? আত্মপ্রত্যয়হীন নিষ্ফল চেষ্টার অপঘাতে কেবলই তাহার একদিক গড়িয়া তুলিতে আর একদিক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সমগ্র জগৎকে ধরিবার, সমস্ত প্রয়োজনের অতীত তাহার অখণ্ডিত তাৎপর্য্যটুকু হৃদয়ে গ্রহণ করিতে না পারিলে কর্ম্মের চেষ্টা কেবলই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অন্তরে বাহিরে বিপ্লব ঘটাইবে, সর্ব্বত্র যে নিগূঢ় শক্তি সকল বিক্ষোভের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রাণতপ্ত স্পর্শে

ফুলকে ফুটাইয়া ফলকে ফলাইয়া তুলিতেছে, তাহার পরিচয় কোথাও অনুভব করিব না। চাই চিত্তের প্রশান্তি; ক্ষুদ্র আধার পাইলেই অভিমান তাহার আশ্রয়ে ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে চাহে—আর তাহার কোলাহল ও আস্ফালনকে বিশ্বাস করিয়াই আমরা নিঃসঙ্কোচে আপনাকে তাহার মাঝে সঁপিয়া দিই। এ তো কর্ম্মচেষ্টার স্বরূপ নয়; অন্তর যদি নিরন্তর বিশ্রামের রসে অভিষিক্ত হইয়া না রহিল, তাহা হইলে সত্য কোথায়, শক্তি কোথায়? সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতেই জীবন সার্থক; কিন্তু বাসনার উৎপীড়নে তো সৌন্দর্য্য ফুটিবে না। স্তব্ধ হইয়া দেখিতে জানিলে দেখিব, এ জগতের সৌন্দর্য্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত; তার মাঝে কেবল তোমার আমার কামনাই আস্ফালনমুখর কর্ম্মচেষ্টায় নির্লজ্জ প্রেতের তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছে। নহিলে চেষ্টা জগতের সর্ব্বত্রই আছে—সে চেষ্টার মাঝে গতিও আছে, ছন্দও আছে; কিন্তু সে গতির সকল রাগিণীই মুহূর্ত্তের মাঝে আর্ত্ত নাদে বিদীর্ণ হইয়া পড়ে, তুমি আমি যখন কামনাক্লিন্ন মিথ্যা কর্ম্মচেষ্টাটুকু তাহার মাঝে জুড়িয়া দিই।

বীর্য্য লাভ কর;—সে বীর্য্য তীক্ষ্নতম বাধার সম্মুখে অকুণ্ঠিত—সেই কঠিন সম্পদে প্রাণের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখ; কিন্তু এই বীর্য্যের সঙ্গে অভিমানের যোগ ঘটাইও না। বীর্য্যের প্রকাশ আমাদের সর্ব্বত্র স্নিগ্ধরূপে পরিব্যাপ্ত হউক। সে কেবল যুদ্ধের উপকরণ নয়—কেবল আঘাত করিয়া আঘাত বাঁচাইয়া তাহাকে সর্ব্বদা ত্রস্ত হইয়া ফিরিলে চলিবে কেন? উদার প্রশান্তির মাঝে তাহাদের শক্তির ও প্রেমের সমন্বয় ঘটাইতে হইবে। অক্ষুব্ধ অন্তরের বীর্য্য শুধু বাধাকে লঙ্ঘন করা নয়—তাহার মাঝে পরিব্যাপ্ত হইতে পারিলে তবে আনন্দের শক্তি, প্রেমের শক্তি ফুটিয়া উঠিবে। প্রারম্ভে হয়ত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তখনও দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এই আত্মরক্ষার চেষ্টার মাঝেও কোনও খণ্ড স্বার্থ, ক্ষুদ্র প্রয়োজন উগ্র হইয়া না উঠে। বাহিরের দৃষ্টিতে আমাদের তপশ্চর্য্যা রুক্ষ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের কঠিন আঘাতে যদি অন্তরের তন্ত্রীতে সুরই উৎসারিত না হইল, তবে বুঝিব, আমরা ঠিক শ্রেয়ের পথ ধরিতে পারি নাই। আহত চিত্ত কেবলই অমৃত ক্ষরণ করিবে, আনন্দ-ব্যঞ্জনা ভাবরূপে অন্তরকে সর্ব্বদা সুকুমার করিয়া রাখিবে—তার পর যত ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত মাথার উপর উদ্যত হইয়া থাকুক—তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া—অন্তরাবৃত্তচক্ষু হইয়া—অন্তশ্চেতনাকে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত করিয়া আনন্দকে যদি আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি—তবেই আমরা বীর্য্যের যথার্থ পরিচয় পাইব। সে বীর্য্য অনুদ্বেলিত, শুদ্ধ অথচ সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল। অন্তহীন নীলিমায় আকাশ যেমন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে—স্তূপীকৃত বস্তুপিণ্ডকে কোথাও সঞ্চরণে বাধা দিতেছে না—অন্তরের বীর্য্যও তেমন শুদ্ধ, সাধারণ হইবে। আমাদের কৃত্রিম চেষ্টায় আকাশকে লঙ্ঘন করিতেছি ভাবিয়া যদি তাহার বীর্য্যে সন্দেহ প্রকাশ করি, তবে সে স্পর্দ্ধারও ক্ষমা পাইব বটে; কিন্তু এই উদার পরিব্যাপ্ত আকাশ যদি তাহার সমস্ত ঔদার্য্যকে সঙ্কুচিত করিয়া কঠিন পীড়নে বস্তুপিণ্ডকে নিষ্পেষিত করিয়া ধরিত, তবে শূন্যতার সেই প্রচণ্ড পীড়নেই সমস্ত জগৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তাই বলি, যাহা নির্ব্বাধ

সঞ্চরণের আধার—যে শক্তি কাহাকেও প্রতিরোধ করে না—স্বচ্ছন্দে যে আপনার বুকে সকলের ঠাঁই করিয়া দেয়—সেই শক্তিই শক্তির চরম প্রকাশ। আমাদের অন্তরের বীণাও এমনি নিরাসক্ত, অপ্রতিহত অথচ নিঃস্বাদার হওয়া চাই।

কর্ম্মের ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে কেন? আমাদের অশুদ্ধ চিত্তের ভাবনা তো কর্ম্মকে কেবল বন্ধনই করিয়া তুলিবে—বিশ্বপ্রাণে বিশ্বেশ্বরের লীলার সুর তো তাহাতে বাজিয়া উঠিবে না। তাই কর্ম্মের দিকে না তাকাইয়া আমাদিগকে বীর্য্যময় আনন্দের সঞ্চয়ে বিভোর হইতে হইবে। চাই সমস্ত সঙ্কল্পের নিরসন; এই সঙ্কল্প আর বিকল্পের বেড়াজালে নিজকে ঘিরিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই তো বন্ধন যাতনায় দিন দিন শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে!—সাধ করিয়া আমরা কর্ম খুঁজিয়া ফিরি, বিজ্ঞাতিবিজ্ঞের মত সঙ্কল্প ফাঁদিয়া বসি।—অভিমানে অন্ধ হইয়া থাকিলে মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিব কি করিয়া? —কি করিয়া তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতই কর্ম আমাদের কাছে অনায়াস ভারহীন হইয়া উঠিবে? অটুট সঙ্কল্পের অভিমানে অন্তঃশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে ভাবিয়া যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছি, তাহাতে বাস্তবিকই কি অন্তরের সমস্ত শক্তিই আমার জাগ্রৎ করিয়া তুলিতে পারিতেছি?—অন্ধ আমরা—অবিশ্বাসে সঙ্কুচিতচিত্ত হইয়া ভাবি, সঙ্কল্প দিয়া যদি শক্তিকে না বাঁধি, তবে কর্ম্ম সার্থক হইবে কিসে? কিন্তু সমস্ত আসক্তি হইতে দূরে থাকিয়া নিরভিমান আনন্দের মাঝে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি, তবে মহাশক্তির স্পন্দনে আনন্দের রসেই স্নিগ্ধ হইয়া কি কর্ম্মের সৃষ্টি হইতে পারে না? সে কর্ম্ম আমাদের অপরিসর চিত্তের বুভুক্ষা দ্বারা জর্জ্জরিত নয়—বিশ্বের প্রাণলীলায় তাহা উৎসারিত—বিশ্বযন্ত্রীর মহারাগিণী যে তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে ছন্দিত হইয়া উঠিবে!

জানি, দিগন্তের কোলে যে মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছে, তাহারই ভীতি জাগাইয়া আমাদের অভিমানক্ষুব্ধ কর্ম্মচেষ্টাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিতে উদ্যোক্তার অভাব হইবে না। কিন্তু আজ যদি ভয়ের শাসনই মাথা পাতিয়া লই—অতর্কিত মরণের আশঙ্কায় অপ্রবুদ্ধ জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরাই শ্রেয়ঃ মনে করি—তবে আমাদের মরণই ভাল। দুর্দ্দিনের বারিধারা বসুন্ধরা যেমন স্তব্ধ হইয়া সহ্য করেন, আমাদিগকেও তেমনি স্তব্ধ হইয়া সমস্ত বিক্ষোভ সহিয়া যাইতে হইবে। আসুক আঘাত, আসুক ক্ষতি—তাহার মাঝেও অন্তরের অমৃত শিখাটী প্রদীপ্ত করিয়া রাখিব—স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্যে, রসোচ্ছল প্রশান্তিতে। কি করিতে হইবে আর কি না করিতে হইবে, তাহার চিন্তাই আজ দিকে দিকে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে—অন্তর্দৃষ্টিবিহীন কর্ম্মচেষ্টা নিরর্থক আস্ফালনে কেবল ফেনাইয়া ফেনাইয়া চলিয়াছে—কোথায় ইহার মাঝে শান্তি—কোথায় সমাধি?—বিক্ষোভে দেহমনকে বিসর্জ্জন দিয়াও স্বস্তি কোথায়? প্রাণের চেষ্টা যে দিনের পর দিন অবসাদের খাদে নামিয়া আসিতেছে। কি করিয়া আমরা এই দেহমনপ্রাণকে পর্য্যন্ত অমৃতের পাত্র করিয়া তুলিব?—উচ্ছাসে নয়—সঙ্কল্পে নয়—অভিমানে নয়। বাক্যে, কর্ম্মে, চিন্তায়, আমরা যে ব্রহ্মকে নিরাকৃত করিয়া আসিতেছি—সেই কলুষ হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে; জীবনের সমস্ত চেষ্টা এই একমুখে উদ্যত করিয়া বলিতে হইবে—মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—অনিরাকরণমস্তু—অনিরাকরণমস্তু।' তবেই আমাদের মুক্তি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

———*———

অপায় ও উপায়

(১)

Shasta Springs

california. u. s.

সেদিন ডাকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তারি অনুবৃত্তিস্বরূপ রাম আজ আবার তাঁর মনে যা ফুটছে, তাই লিখছেন।

জানালা খুলে রাম বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন—বাইরে খুব বরফ পড়ছে। শুভ্র নিষ্কলঙ্ক তুষার-পাতে চারিদিকে যেন কল্পলোকের সৃষ্টি হয়েছে—আর বরফ পড়বার ভাঙ্গটাই বা কি মনোরম।—ফরাসী ইংরের মর্ম্ম ধরে বলতে গেলে সমস্তটা পাহাড় যেন বাস্তবিকই Shasta হয়ে দেখা দিয়েছে—এমান নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তার রূপ। অভিব্যক্তি-বাদ সম্বন্ধে একখানা আধুনিকতম পুস্তক এই মাত্র রামের সারা হল।

মানুষ চায় মৌলিক হতে, লোকের কাছ থেকে মান কাড়তে বা নাম জাহির করতে—তাই তারা সত্যের পথ হতে দূরে পড়ে। এই সমস্ত খেয়াল দূরে রেখে, নৈরাশ্যে মুসড়ে না পড়ে কিম্বা আত্মশ্লাঘায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে, আমরা যদি সত্যদৃষ্টি নিয়ে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কিসের অভাব, তারই মীমাংসা করতে যাই, তবে প্রথমে এই কুশ্রী ব্যাপারটাই আমাদের চোখে পড়ে যে, সমস্তটা দেশের মাঝে বাস্তবিক কোথাও একটা আত্মীয়তার বন্ধন নাই; একই পুণ্যভূমিতে বাস করবার দরুণ এ দেশের লোক কোনও প্রীতির সূত্রে বাঁধা পড়েনি; স্বদেশবাসীর প্রতি দরদের এ দেশে বড়ই অভাব। ধর্ম্মের অতন্ত্র সাম্প্রদায়িকতা এ দেশবাসীর মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করেছে—তাতে এদের মাঝে স্বাজাত্যবোধ একেবারে মুছে গিয়েছে।

আমেরিকাতেও ভারতবর্ষের মত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে—এবং ভারতবর্ষের চেয়ে তাদের সংখ্যা বেশী ছাড়া কম হবে না হয়ত; কিন্তু তবুও দু'চারজন তরলমস্তিষ্ক ধর্ম্মান্ধ লোক ছাড়া আর কেউ আপন সম্প্রদায় আঁকড়ে পড়ে থাকেনি। Catholicism, Methodism, Presbyterianism প্রভৃতি কিছুতেই মার্কিন জাতির ঐক্য ও স্বাজাত্যবোধ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। সত্য কথা বলতে গেলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ মনুষ্যত্বের স্ফুরণকে যতখানি বাধা দিয়েছে, আমেরিকাতে তার কিছুই দেয়নি। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা যুগের পর যুগ ধরে একই মাটীতে হিন্দুর সঙ্গে বসবাস করে আসছে, কিন্তু তবুও হিন্দুস্থানের দেশভাইদের চেয়ে দাক্ষিণ তুরোপের তুর্কীদের উপর তাদের টান বেশী। একটা ছেলে যদি খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে তার হিন্দু পিতার রক্তমাংস দিয়ে গড়া হলেও, পথের কুকুরের চেয়েও দূর হয়ে যায়। মথুরাবাসী একজন দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব দাক্ষিণাত্যের সব সাম্প্রদায়িক একজন বৈষ্ণবের দরুণ কি না করবে; অথচ মথুরারই এক জন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীকে অপদস্থ করবার জন্যও তার চেষ্টার কোন ত্রুটী হবে না—এ সমস্তের জন্য দায়ী কে?—দায়ী সমস্ত সাম্প্রদায়েরই অন্ধসংস্কার আর সঙ্কীর্ণ জ্ঞান।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে যদি বলা যায়—এ দেশে "ঘরের শত্রু বিভীষণ"

তবে তাতে অত্যুক্তি হবে না। স্বাজাত্যবোধের ধারণাটা পর্য্যন্ত এ দেশবাসীর কাছে অলীক কল্পনা। এর কারণ কি জান? যে অতীত মৃত, তারি মৃতদেহটার সঙ্গে এরা অন্ধভাবে আপনাকে এক করে নিয়েছে; আর ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে যে সমস্ত অদ্ভুত কুসংস্কারের প্রচার হচ্ছে, তারি পায়ে বিনা সর্ত্তে এরা মাথা বিকিয়েছে—আধ্যাত্মিক আত্মহত্যাকে শাস্ত্রানুগতা বা প্রমাণবশ্যতার মোলায়েম নাম দিয়ে চিক্কণ করতে চেষ্টা করছে।

দেশে যদি যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার প্রচার না হয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির আদর না হয়, তাহলে লোকের জীবনের আবহাওয়া যেমন বিশুদ্ধ হবে না তেমনি এই সব সংস্কারের পরগাছাও কোন দিন মরতে চাইবে না। আজকাল যে বিজ্ঞানচর্চা হচ্ছে, তার ফলে সমাজের দৈনিক স্বাস্থ্য প্রকৃতিস্থ হয়ে মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়েছে। যে ধর্ম্ম বা যে সম্প্রদায় বিজ্ঞানের এই প্রভাবটুকু হতে দূরে সরে থাকবে তার অন্ধ ভক্তদের উপর কোনরূপ সন্দেহ করবার তার কোন অধিকার নাই। রাম বলছেন, অতীত যুগে ধর্ম্মের যে সমস্ত আচার ও অনুশাসন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সেই যুগেরই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল মাত্র। কিন্তু বিধাতা বিরূপ; তাই এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর মানব প্রথমে যেমন শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিল, পরে আবার তেমনি অতিরিক্ত ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাই নিয়ে মেতে গিয়েছে; আর সুর দরুণ যে ধ্যান ও স্বাধীন চিন্তা বিজ্ঞানের জননী, তার কথাই লোকে ভুলে গেল—'ছেলে'কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে মানুষ মায়ের দফা সারা করে দিল। ক্রমে না বুঝে শুঝেই লোকে এই সব অনুশাসন মানতে লাগল;—ভাল করে মানুষ হতে না হতেই মানুষের সন্তান খৃষ্টপন্থী বা মহম্মদপন্থী হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে ধর্ম্মজগতে জড়ত্বের সৃষ্টি হল। যারা যে ধর্ম্ম ধরে চলত, তারা সে ধর্ম্মের এমনি গোঁড়া হয়ে পড়ল যে, কি করে কোন সত্যের উদ্ভব হয়েছে, তার কোন খোঁজ না রেখে কেবল প্রবক্তা আর পুঁথির দোহাই দিয়ে নির্ব্বিবাদে সমস্ত আচার আর অনুশাসন মাথায় তুলে নিল; যাঁরা তথাকথিত ধর্ম্মপ্রবক্তা, তাঁরা কতখানি মৌলিক গবেষণা, সাধনা ও একাগ্রতা নিয়ে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সকল আইন কানুন আবিষ্কার করেছেন—মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার ফলে কাম খৃষ্টের বাণী বা বৈদিক যজ্ঞের আসল তাৎপর্য্য মানুষ একেবারেই ভুলে গেল। তার জায়গায় শব্দগত কতগুলি নামের উপর তার প্রাণের সকল শ্রদ্ধাভক্তি ঢেলে দিল। যা ছিল প্রাণ, তার পূজা ছেড়ে দিয়ে মানুষ মৃতদেহটার পূজাই সার করল। এমনি করে খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ কিম্বা শঙ্করাচার্য্যের মত আরও মানুষকে লোকে প্রবক্তা বলে খাড়া করল অর্থাৎ তাঁরা যেন হঠাৎ ভাগ্যবলে সত্যলাভ করেছেন; আর তাঁদের রচিত যে সমস্ত গ্রন্থে তাঁরা সত্যের আভাসে ইঙ্গিতে মাত্র ব্যাখ্যা করেছেন, সেইগুলিকে মানুষ প্রকৃতির মহাগ্রন্থের চেয়েও উঁচুতে ঠাঁই দিয়ে প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত মহাপুরুষদের অবমাননা করতেও ছাড়ল না।

রাম একথা বলছেন না যে, জগৎব্যাপারে এই সমস্ত প্রতিপালনের কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। এরা যেন বীজের উপরকার খোসার মত। বীজটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কিছুদিন পর্য্যন্ত খোসার খুবই

দরকার রয়েছে বটে, কিন্তু বীজপুষ্টির একটা বিশেষ সময় পার হয়ে গেলে পর ঐ খোসাটাই শাসের পক্ষে যেন কারাগারের মত দম বন্ধ করে আনে; বীজ অঙ্কুরিত হবার সময় খোসাকে তার ছেড়ে আসতেই হয়—তখন খোসার চেয়ে অঙ্কুরের মূল্য বেশী। তাই বলি, মানুষ প্রকৃতিগ্রন্থের যে পরোক্ষ পাঠ নিয়ে খুসী, তা তাকে অচল করেই বসিয়ে রাখে; এ অভ্যাস তাকে ছাড়তে হবে, খোসার মায়া করতে গেলে চলবে না। প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে যে প্রবক্তার শক্তি তো তারই জন্মগত অধিকার, সে তো অতিপ্রাকৃত কিছুই নয়।

এমন সব লোক আছে, যারা নাকি কিছুতেই একটা ঘরের নকসা বুঝে উঠতে পারে না, যে পর্য্যন্ত একটা ঘর তাদের চোখের সামনে খাড়া করা হয়েছে। তেমনি এ জগতে এমন লোকেরও অভাব নাই, যারা বর্ত্তমান ও অতীতের মোহ ছেড়ে এক পা'ও এগিয়ে যাবার কল্পনা করতে পারে না। তবে আশা হয়, ভারতবর্ষে এমনধারা লোকের সংখ্যা দিন দিনই কমে আসছে। মানুষ যে কেবল এদিক ওদিক দোল খেয়ে বেড়ায়—এইটে তার বন্ধ করতে হবে। তার জন্যই বেদান্ত দরকার। বেদান্ত তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও মৈত্রীযুক্ত করবে। চাই চলিষ্ণু বেদান্তের ধর্ম্ম। এ জগতের কোথায় না এ ধর্ম্মের অভাব হচ্ছে? কিন্তু এর প্রয়োজন ভারতবর্ষেরই সব চেয়ে বেশী—তার অবস্থা এমনি শোচনীয়। অভাব তো কতই আছে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী অভাব—আলোর অভাব, ভালোবাসার অভাব।

(২)

"এত দলাদলি, এত মত আর পথের মারপ্যাঁচ রয়েছে জগতে; কিন্তু আসলে প্রয়োজন একটু ভালবাসার—তারি অভাবে এ জগতে দুঃখের আর শেষ হল না।"……

তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। রাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ছন্দে গেঁথে এই কথাগুলি বলছেন আর লিখে যাচ্ছেন—তাঁর দুচোখ বেয়ে ধারা পড়ছে।……

"একদিন আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—তারপর থেকে প্রায়ই আমি সে স্বপ্ন দেখি; জানি না সেটা সত্য কিনা—কারণ লোকে বলে আমার নাকি অসুস্থ শরীর। কিন্তু যখনই সন্ধ্যা পাটে নামে, তখনই কেন যেন আমার দুচোখ জলে ভরে আসে, আর আমার সামনে স্বপ্নের মাঝে জেগে ওঠে আমার পুণ্যবাণীর (ভারতবর্ষের) মুখখানি।

"সেদিন ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল—সন্ধ্যার বাতাস মন্দা হয়ে আসছিল—পশ্চিমের আকাশপার হতে সাগরজল তীরের গানে ঢলে পড়ছিল। আকাশ, মেঘ, সাগরের ঢেউ—সুন্দর যেন সবার গায়ে ঢলে গলে পড়ছিল; সূর্য্যের গভীর রক্ত রাগে সব যেন আগুনের শিখার মত হয়ে উঠছিল।

"আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি—ধীরে ধীরে আমার সমুখ থেকে সূর্য্যাস্তের মহিমা মিলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হারানো দিনের বেদনাভরা স্মৃতি যেন আমার মাঝে ভেসে উঠল—আমার শৈশব, যৌবন আবার যেন আমার কাছে ফিরে এল; আমি স্তব্ধ হয়ে সূর্য্যাস্তের দিকে তাকিয়ে রইলাম—ক্রমে যেন আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে এল।

"অতীত যেন আমার মনের উপর আছড়ে পড়ল—মৃত যারা, তারা যেন আমার কাছে

ঘেঁসে এসে দাঁড়াল—তাদের তপ্ত প্রাণের স্পর্শ আমি পেলাম—মৃত্যুর আবরণ তাদের খসে পড়েছে। বিয়ের বাঁশীর সুরের মত তাদের স্বর আমার কানে পৌঁছাল—আমার মত তারাও যেন তন্ময় হয়ে সেই অস্তমান সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

"তার পর জীবনের বিচিত্র রঙ রাঙা কত দিন পার হয়ে গেল; কত দেশ দেশান্তরে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি; কিন্তু এখনো বুঝি আমার শরীর ভাল নেই; কারণ এখনো সূর্য্যাস্তের সময় কেন জানি আমার দুচোখ ভরে জল আসে—আর স্বপ্নের মাঝে আমার পুষ্পরাণীর মুখখানা ভেসে উঠে।"

ওগো দেবতা, তুমি তো এখন অস্তে যাচ্ছ—ভারতের আকাশে গিয়ে তুমি জাগবে—সেই পুণ্যভূমিতে বামের এই বার্ত্তা কি তুমি বহন করে নিবে না? আমার অনুরাগমাখা অশ্রুবিন্দু যেন ভারতের শ্যামা ভূমিতে শিশিরবিন্দু হয়ে ফুটে ওঠে। শৈব যেমন শিবের আরাধনা করে, বৈষ্ণব যেমন বিষ্ণুর আরাধনা করে, বৌদ্ধ যেমন বুদ্ধের অর্চ্চনা করে, খৃষ্টান যেমন খ্রীষ্টের পূজা করে, মুসলমান যেমন মোহাম্মদের পূজা করে, আমিও তেমনি আমার সমস্ত হৃদয়ের লাজ তপ্ত অরুণিমা দিয়ে আমার প্রাণের দেবতা ভারতবর্ষের পূজা করি। তার যে কোনও সন্তান—হোক না সে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী, শিখ, সন্ন্যাসী বা প্যারিয়া—তারই মাঝে আমি আমার ভারতবর্ষকেই দেখি—তারই পূজা করি। ওমা রূপে রূপে তুমি ছড়িয়ে পড়েছ—তোমার সব রূপেরই আমি পূজা করি। ওমা তুই যে আমার গঙ্গাজী, আমার কালী, আমার ইষ্টদেব, আমার শালগ্রাম! যে দেবতা ভারতবর্ষের মাটীতে এসে লুটিয়ে পড়েছিলেন, পূজার কথায় তিনি বলেছিলেন, "অব্যক্তে যাদের মন বাঁধা পড়েছে, তাদের গতি দুঃখকর; কারণ দেহীর পক্ষে অব্যক্তের পথ ধরা বড় কঠিন।" আচ্ছা, তাই হোক ঠাকুর—আমার কৃষ্ণজীর কথারই জয় হোক—আমি তোমার ব্যক্ত শ্রীমূর্ত্তিরই পূজা করব, যার কথায় লোকে বলে—"তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি হচ্ছে একটা বুড়া ষাঁড়, একটা খট্টাঙ্গ, একটা ভাঙ্গা ত্রিশূল, ছাই, সাপ আর মড়ার খুলি।" সে কে?—সে কি মহিম্নস্তোত্রের মহাদেব?

না গো না—আমার ইষ্টদেব হচ্ছে ওই যে নারায়ণের জীবন্ত বিগ্রহ—অন্নহীন, বিত্তহীন, দুর্ভাগা হিন্দুস্থানী, হিন্দু। এই আমার ধর্ম্ম। ভারতবাসীর পক্ষেও এই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম—খাঁটী বেদান্ত—এই হচ্ছে ভগবৎ প্রেম। কেবল উপরভাসা রকমে ছুঁ দিয়ে গেলেই চলবে না—কেবল চোখ বুজে ঘাড় নেড়ে গেলেই হবে না। আমি ভারতের প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে পর্য্যন্ত পূর্ণ সহযোগ চাই—জাতীয়তার এই জীবন্ত প্রেরণাকে তাদের দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিশু বাল্যকাল পার না হয়ে যৌবনে পৌঁছাতে পারে না। মানুষ কিছুতেই ভগবানের সঙ্গে এক হতে পারবে না—যদি সমস্ত জাতির সত্তা তার দেহের প্রতি তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে না উঠে। ভারতের প্রতি সন্তান সমষ্টি ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করুক—বুঝুক তারা যে, প্রত্যেক ব্যষ্টির মাঝেও সমষ্টি ভারত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ভারতের প্রতি নগর নদী, বৃক্ষ, প্রস্তর—তার প্রত্যেকটী জীবই দেবতার প্রাণবন্ত বিগ্রহ। সমগ্র দেশকে

দেবীরূপে চিনবার জানবার সময় কি আমাদের আসেনি—প্রত্যেক খণ্ডের প্রকাশে কি অখণ্ডরূপিণী জননীকে পূজা করবার দিব্য প্রেরণা আমরা পাই নি? দুর্গা প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে হিন্দু তাকে জীবন্ত করে তোলে। কিন্তু এই যে আমার অতিবাস্তব দুর্গা প্রতিমা আমার ভারতমাতা—তাঁর মা তাঁর লুপ্ত গৌরব, তাঁর প্রাণের আগুণ জ্বালিয়ে তোলা সন্তানের কর্ত্তব্য নয়? এসো ভাই, আগে হৃদয়ে হৃদয়ে আমাদের যোগ হোক্—সঙ্ঘর আর কর্ম্মের স্রোত আপনা হতেই হবে। জগতের ক্ষত্র মুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"পুরুষ শ্রদ্ধাময়—যার যে শ্রদ্ধা সে তাই হয়।"

ভাই শাস্ত্রাচারী নিষ্ঠাবান হিন্দু, শাস্ত্রের বিধান তোমাকে আজ সত্য করে তুলতে হবে। আজ তোমার আপদ্ধর্ম্মের বিধান মেনে জাতিভেদের কঠিন নিগড় শিথিল করতে হবে ভাই—তোমাদের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সকল তীক্ষ্ণ বিরোধ আজ স্বাজাত্য-বোধের কাছে বলি দিতে হবে। আজ দেখছ না—যে ভারত অতীতে কত জাতিকে আশ্রয় দিয়েছে, বিদেশীকে কোল দিয়েছে, কত জাতির কত দেশের অন্ন জুটিয়েছে—আজ তার নিজের সন্তানের দুটো গ্রাস অন্নও জুটছে না! প্রত্যেককে নিজের স্থান অধিকার করবার জন্য পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা দাও। মাথা যত পার উঁচু করে রেখো—কিন্তু পা দুটো যেন সকলের সঙ্গে একই ভূমিতে থাকে—কারও কারও উপর পা দিয়ে যেন মাথা উঁচু করো না—সে দুর্ব্বল বলেও না, নিজে সেধে বললেও না!

তরুণ যুবক, তুমি সংস্কারক হতে চলেছ? ভারতের অধ্যাত্মচিন্তাকে তার প্রাচীন আচারকে নিরর্থক তুমি আঘাত করো না। নূতন আর একটা বিরোধের সৃষ্টি করে এ জাতি তো কখনও এক হতে পারবে না। আজ যে ব্যবহারিক জগতে ভারতবর্ষের এমন দুরবস্থা হয়েছে, তার জন্য তার ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা তো দায়ী নয় কাঁটার বেড়া ছিল না বলেই এমন সাজানো বাগান পয়মাল হয়ে গেল। কাঁটার বেড়াও দিতে হয়—কাঁটার উপর রাগ করে সংস্কার আর উন্নতির দোহাই দিয়ে ফুল ফলের গাছগুলিকে উজাড় করে দিও না। কাঁটার বেড়াই যে রক্ষা করে—এদেশে যে তার দরকার রয়েছে আমি শূদ্র শক্তির জয়গান করলাম বলে মনে করো না যে সত্ত্ব ও রজের উপরে আমি তমে ঠাঁই করছি। আমি বলি, তমের উপর আমরা মনের ঝাল খুবই মিটিয়েছি—আর তেমন করে তাকে বাধা দেবার উগ্র চেষ্টা করে করেই ভীষণ তমঃই আজ আমাদের মাঝে মাথা তুলেছে। আমাদের এখন এই তমঃকেও কাজে লাগাতে হবে—তার দিক দিয়েই তার ধর্ম্ম রাখতে হবে। বাগান থেকে যদি আবর্জনা সাব ঝেঁটিয়ে ফেলে দাও, তাকে যদি কাজে না লাগাও, তবে বাগানের উন্নতি হবে কি করে?

তমঃ যেন কয়লা—তাকে না পেলে আগুনও (রজঃ) হবে না, আলোও (সত্ত্ব) হবে না। প্রাণের প্রেরণায় যে দেশ আপনাকে অভিব্যক্ত করতে পারে, সে দেশে তমঃশক্তির প্রচুর উপাদানের অনুপাতে রাজসিক আগুন আর সাত্ত্বিক আলোকেরও শক্তি জেগে ওঠে। আজকালকার কবোটীবিদ্যার সিদ্ধান্তের সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের আশ্চর্য্য মিল আছে। দেখা গিয়েছে, নৈতিক ও মানসিক শক্তিগুলি যতই অনুকূল, যতই প্রবল হোক না কেন, তমঃ বা জৈব উপাদানের প্রচুর সঞ্চয় মানুষের মাঝে না থাকলে বীর্য্যশালী মহত্ত্ব ও সুদৃঢ় চরিত্রবলের উদ্ভব অস-

স্তব। এই জন্যই হিন্দুর কাছে যিনি মহাদেব, তিনি তমোগুণের অধীশ্বর।

ভারতবর্ষের সঙ্কটের সময় যদি আমরা জন্ম গ্রহণ করে থাকি, সে তো ভালই হয়েছে—এতে আমরা আরো বেশী করেই সেবার সুযোগ পাব—আমাদের কাজে বৈশিষ্ট্য, কবিত্ব, গতি-চঞ্চলতা আরও বেশী করে ফুটে উঠবে। কথায় আছে, যারা ঘুমায় ভাল, তারা জাগেও ভাল। ভারতবর্ষ বহুদিন ধরে অঘোরে ঘুমিয়েছে, তাই তো আশা তার জাগরণও গৌরবের হবে। ভারতবাসীর প্রাণে শুধু এই ভাবটা আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে—চাই শ্রদ্ধা—সমালোচনা নয়, চাই ভ্রাতৃভাব, চাই সংশোধনমুখী প্রেরণা, আর চাই কর্ম্মে সহযোগিতা—শ্রমিকের আভিজাত্য।”

হায় হায়—শুধু দলাদলি করে, পরস্পরের সমালোচনা করে নিদারুণ শক্তির অপচয় এ দেশে হচ্ছে। তার চেয়ে এসো ভাই, খুঁজে দেখি, আমাদের মাঝে মিল আছে কোথায়, আর সেই মিলনের সূত্রগুলিকেই বড় করে দেখি। এমন কত লোক আছে, আর্য্য-সমাজ যাদের হৃদয় স্পর্শ করে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম করে না; কারু হয়ত কেবল ব্রাহ্ম সমাজই ভাল লাগে, কেউ বা বৈষ্ণবধর্ম্মকেই বড় করে দেখে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার ধর্ম্মে আমি যে আনন্দ যে শান্তি পাই, অপরে যদি তা না পায়, তবে তা নিয়ে তার সঙ্গে ঝকড়া করবার কি আছে? তারা আসুক্ আমার কাছে—কি থাকুক্—কি চলে যাক্। আমি তো সকলই ভাসিয়ে দিয়েছি—সকলকেই ভেসে যেতে দিয়েছি! তুমি কিম্বা আমি জগতের সমস্ত সহানুভূতি একেশ্বর ভোগ করতে চাই কেন? আমার অধিকার আছে শুধু সেবা করবার—আমি সবারি সেবক—যারা ভালবাসে, তাদেরও আমি সেবক—যারা ঘৃণা করে (যদি তেমন কেউ থাকে), তাদেরও আমি সেবক। যে ছেলেটা সব চেয়ে দুর্ব্বল, মা তাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন। তোমার সঙ্গে যাদের মত মিলল না, তারা কি সবাই ভুল পথে চলছে? যদি তা না হয়, তবে তাদের দিয়েও তো দেশের প্রয়োজন আছে। কারু যদি কেবল ডান পা খানাই থাকে, আর তাই নিয়ে যদি তাকে চলাফেরা করতে হয়, তবে তার কি দুর্দ্দশা ভেবে দেখ দেখি। সেই শিক্ষাই সত্য, যে শিক্ষা ভাগবত দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখায়।

সুরদাসের গানে আছে—প্রভুজী, আমার অবগুণের কথা তুমি মনে রেখো না—

“প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পরশকো মন দ্বিধা নাহি হোয়,
দুহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী এক নহর,
বহত মিল নীর ভরো।
যব মিলিকে তব এক বরণ হোয়,
গঙ্গা নাম পরো॥

সমগ্র জাতির যে ধর্ম্ম, তার উপর তোমার মনগড়া বা দেশগড়া ধর্ম্মের ঠাঁই কখনো হবে না। এ দুয়ের মাঝে তাল ঠিক রাখতে পারলে তবে আনন্দ মিলবে। জাতির হিতার্থে তুমি যাই কর না কেন, তাতেই দেব শক্তির আপ্যায়ন হবে—বিশ্বশক্তির আরাধনা হবে। ভারতবর্ষই আমাদের দেবতা, তার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞই আজ আমাদের করতে হবে গীতার কথায় বলতে গেলে এই হচ্ছে আমা-

দেব যুগ সঙ্ঘ। গীতায় আছে—"যাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন, তাঁরা সমস্ত পাপ হতে মুক্ত; আর যে পাপাচারীরা নিজের জন্যই পাক করে, তারা পাপই ভোজন করে।"

যদি ভগবানকে পেতে চাও, তবে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন কর—তোমার সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে ভারতমাতার মহাপ্রাণের সঙ্গে তোমার ক্ষুদ্র প্রাণকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে নাও। যদি আনন্দ চাও, সত্য চাও, তবে ব্রাহ্মণের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র জাতির হিত চিন্তায় তোমার মনপ্রাণ নিয়োগ করতে হবে। যদি আনন্দ চাও, তবে ক্ষাত্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র জাতীর জন্য যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি আনন্দ চাও, তবে বৈশ্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র জাতির ন্যাসরূপে তোমাকে ধন সঞ্চয় করতে হবে। কিন্তু রাম বলছেন, সবচেয়ে বড় কথা এই যদি ইহকালে পরকালে আনন্দ চাও—যদি রামকে উপলব্ধি করতে চাও, তোমার অন্তরের সূক্ষ্ম ধর্ম্মকে যদি বাস্তব রূপ দিতে চাও,তবে এই সন্ন্যাসভাবে অনুপ্রাণিত হও—যে সেবাভার একদিন পুণ্যশীল শূদ্রদের জন্য নিরূপিত ছিল, সেই সেবায় দেহ বিসর্জ্জন করে—হাতে পায়ে খেটে ব্রাহ্ম, ক্ষাত্র ও বৈশ্য বীর্য্য সার্থক কর। পারিয়ার কাজের সঙ্গে আজ সন্ন্যাসীর ভাবের যোগ করতে হবে। উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। যে ভারত একমাত্র ব্রাহ্মণভূমি বিদেশও আজ তার কাছে এই সেবার আদর্শই প্রচার করছে।

জাপানী যুবক যখন মায়ের সেবার [গার্হস্থ্যধর্ম্ম] ওজর দিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হতে অসম্মত হয়, তখন তার মা আত্মহত্যা করে দেশের ধর্ম্মের সম্মুখ হতে ঘরের ধর্মের বাধা সরিয়ে দেন। আদর্শ গুরু গোবিন্দ সিং যে দেশের ধর্ম্মের কাছে ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও সামাজিক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, তাঁর সে অপূর্ব্ব ত্যাগের সঙ্গে কোন বীরত্ব কাহিনীর তুলনা চলতে পারে? মানুষ শক্তি চায়। কিন্তু দেশাত্মার সঙ্গে যদি তোমার আত্মার যোগ হয়, তাহলে শক্তি যে তোমার দাসী হবে। ইসলাম প্রবক্তার ভাষায় তুমও তখন বলতে পারবে—"দক্ষিণে সূর্য্য আর বামে চন্দ্রও দাঁড়িয়ে যদি আমাকে ফিরে যেতে বলে, তবুও আমি সে হুকুম মানব না।"*

* স্বামী রামতীর্থ

স্বামী রামতীর্থ

স্বামী রামতীর্থের বাণীর সঙ্গে "আর্য্য-দর্পণের পাঠকদের বিশেষ পরিচয় আছে, কারণ তাঁর বক্তৃতার অনুবাদ প্রতিমাসেই আর্য্যদর্পণে প্রকাশিত হয়ে থাকে। স্বামী রামতীর্থ সম্বন্ধে অনেকেই নানা রকম প্রশ্ন করে থাকেন। ইতিপূর্বে আর্য্যদর্পণে এক-বার তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বেরিয়েছিল (১৩২৩, শ্রাবণ)। যাঁদের সে প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ হয়নি, তাঁদের সুবিধার জন্য, শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ সাহেব ও স্বামিজির ভক্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণের লিখিত স্বামিজীর বক্তৃতাগ্রন্থের ভূমিকা হতে কিছু সঙ্কলন করে দিলাম।

স্বামী রামতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমের নাম গোসাই তীর্থরাম। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দীপালির দিন মহাত্মা গোসাই তুলসী দাসের বংশে পঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা জেলায় মুরালীওয়ালা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। জন্মের কয়দিন পরেই তীর্থরাম মাতৃহীন হন। ছেলেবেলায় বড় ভাই গোসাই গুরুদাস ও এক বৃদ্ধা খুড়ীমার যত্নে তিনি মানুষ হন। শিশুকে দেখে জ্যোতিষীরা বলেছিলেন যে কালে এ একজন অসাধারণ মহাপুরুষ হবে। ছোট থাকতেই তীর্থরাম অতি আগ্রহে মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণকাহিনী শুনতেন, আর নানারকম অত্যাশ্চয্য প্রশ্ন করে আবার নিজে নিজেই তার মীমাংসা করে সকলকে অবাক করে দিতেন।

লেখাপড়ার দিকে তীর্থরামের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ছেলেবেলা হতেই তাঁর চরিত্রের এই একটা বিশেষত্ব ছিল, যে কাজেই তিনি হাত দিতেন, তাই তাঁর কাছে তপস্যা হয়ে উঠত। তাঁর পারিবারিক অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল, কিন্তু এর মাঝেই তিনি যতখানি ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা নিয়ে ধীর পদে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন, তা প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষেই আদর্শ। শীতের কষ্ট, অনাহারের কষ্ট স্বীকার করেও কতদিন তিনি দুপুর রাতে পড়বার জন্য বাতির তেল সংগ্রহ করেছেন। তাঁর পড়বার সময় ছিল উদয়াস্ত; শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণার সকল পীড়নই তাঁর প্রচণ্ড জ্ঞানপিপাসার কাছে হার মেনেছিল। গুজরাণওয়ালায় তাঁর ছাত্রজীবনের সাক্ষী যাঁরা আছেন, তাঁরা এখনও বলে থাকেন, কত দিন তীর্থরামকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে, কিন্তু তবুও তাঁর মুখের আনন্দজ্যোতিঃ একটুকুও ম্লান হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তীর্থরাম বরাবর উচ্চস্থান অধিকার করে এসেছেন। বি, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে গণিতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তীর্থরাম লাহোরের ফর্ম্মান খৃষ্টান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বেল সাহেব যখন তীর্থরামকে সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যেতে বললেন, তখন মাথা হেঁট করে জলভরা চোখে তীর্থরাম বলে উঠলেন, "এত কষ্ট করে আমি যে সম্পদ অর্জ্জন করেছি, তা সরকারী চাকরীর কাছে বিকিয়ে দিতে পারব না— আমি তা সকলকে বিলিয়ে দিব।" বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার যে তাঁর কতখানি সত্য, তা আমরা সবাই জানি।

ছাত্রজীবনে তিনি সম্পূর্ণ একক ছিলেন— জনকোলাহলের মাঝেও নিজের শুভ্র স্বচ্ছ জীবনের বেষ্টনী দিয়ে তিনি এমন একটী অবকাশ রচনা করেছিলেন যার মাঝে তাঁর অহরহ আত্মানুশীলনের সাধনা চলত। জীবনের লক্ষ্য যেন সর্ব্বদা তাঁর চোখের সামনে ভাসত, আর তারি আদর্শে তিনি তিল তিল করে তিনি শৈশব হতে নিজকে গড়ে তুলেছিলেন। গণিতের অধ্যাপক হয়ে গণিত অধ্যয়ন সম্বন্ধে তিনি যে একখানা পুস্তিকা রচনা করেন, তা পড়লেই আমরা বুঝতে পারি, তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কি ছিল। তাতে তিনি লিখেছেন, "আহার সম্বন্ধে ছাত্রদের অত্যন্ত সংযমী হতে হবে। গুরুপাক খাদ্য আহার করলে মেধাবী ছাত্রের বুদ্ধিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কাজে মন বসাতে হলে মনটী আগে বিশুদ্ধ করা চাই। যার চিত্তশুদ্ধি হয়নি, সে ছাত্র হবার যোগ্য নয়।

অধ্যাপক জীবনে তীর্থরাম শুধু বিজ্ঞানালোচনা করেই তৃপ্ত হতে পারেননি। সত্যকে

জানা এবং সত্যকে প্রকাশ করা, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "একটা তত্ত্ব অনুসন্ধান করবার জন্য আমি আগে আপ্রাণ চেষ্টা করি; তার পর তাকে যখন হাতের মুঠোয় পাই, তখন অটল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীর কাছে আমার সত্যের অভিজ্ঞতা আমি প্রচার করি।" জীবনে তিনি যাই লাভ করেছেন, তাই দিয়ে তিনি নিজেকে অগ্নি পরীক্ষা করে, তবে তাকে গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপনার অন্তরালেও আত্মজ্ঞান লাভের পিপাসা যে তাঁকে কত খানি ব্যাকুল করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাঁর সমস্তটা জীবন যেন তিনি বিশ্বের কাছে দায় বাঁধা বলে মনে করতেন। এই তীব্র দায়িত্ববোধ ঘরের সুখে তাঁকে কিছুতেই স্বস্তি দেয়নি। তিনি যেন জানতেন, একদিন এই ক্ষুদ্র কারাগার ভেঙ্গে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এসে তাঁকে দাঁড়াতে হবে।

তাঁর সাধনজীবনের ইতিহাস চিরদিনই আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকবে। কি করে যে তিনি জীবনের পাত্র পূর্ণ করলেন, তা আমরা জানি না, কিন্তু সাধনার প্রথম অবস্থায় যে বুকফাটা বেদনার নিঝর তার অন্তর হতে উৎসারিত হয়েছে, তার একটু আধটু পরিচয় আমরা পেয়েছি। নিদ্রাহীন কত রজনীতে যে তাঁর গোপন অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হয়েছে—তার সাক্ষী ছিলেন কেবলী তাঁর সাধ্বী স্ত্রী। কিসের জন্য যে তার এ বেদনা, তা আমরা জানি না - কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁর এই অশ্রুসিক্ত হৃদয়ভূমিতেই একদিন প্রেমের ফুল ফুটেছিল। নদীর তীরে, গহন বনে নিদ্রাহীন চোখে কত রাত কেটে গিয়েছে—নিস্তব্ধ প্রকৃতি ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গী ছিল না। আত্মহারার মত একা একা তিনি, নিজেরই রচিত বিরহগীত গেয়ে বেড়াতেন--ভাবের আবেগে কখনো কখনো চেতনা লুপ্ত হত - বন্ধুবান্ধবেরা এসে সন্ধান পেয়ে অবসন্ন দেহে সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থরাম বনে যান—তার এক বছর পরেই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে স্বামী রামতীর্থ নাম গ্রহণ করেন। এর পরেই তাঁর সাধনজীবনের আরম্ভ। এ সময়ের কথা তিনি বড় কোথাও প্রকাশ করেননি। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, রাবী নদীর তীরে কিছুদিন ধরে তিনি যোগসাধনা করেছিলেন। হৃষীকেশের কাছে ব্রহ্মপুরীর তপোবনে স্বামী রামতীর্থ অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। যে অদ্বৈত বেদান্তের উপর তাঁর বাণীর প্রতিষ্ঠা, তার তত্ত্ব তিনি এখানেই উপলব্ধি করেছিলেন —তিনি জেনেছিলেন, এই বিশ্বের বিরাট দেহ তাঁরই দেহ—বিশ্বপ্রাণ তাঁরই প্রাণ। এই অনুভূতিটি তিনি সমস্ত জীবন ধরে নানা ছন্দে, নানা সুরে জগতের কাছে স্পষ্ট করে ধরতে চেয়েছেন। নিজেকে যেমন তিনি কিছুর কাছেই খাটো করতে পারেন নি, তেমনি কাউকেও তিনি কোনও দিন খাটো নজরে দেখেন নি। বাইরের আলোর সাহায্যে তিনি দেখতেন না, তিনি দেখতেন তাঁর অন্তরের দিব্যজ্যোতিঃ দিয়ে; তাই জগতের সর্ব্বত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুর সত্তা তিনি অনুভব করেন নি। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যোগ আশ্চর্য্য ছিল। রামতীর্থ যেন মুক্তপ্রাণ বনের পাখী ছিলেন। কি ভারতবর্ষে কি আমেরিকায় তার অধিকাংশ সময়ই ঘরের বাইরে বনে বনেই কাটত। গভীর রাত্রে হিমালয়ের নিস্তব্ধ অরণ্যের মাঝে কিসের তন্ময়তায় যেন

তিনি একা একা বেড়িয়েছেন। আমেরিকাতে কালিফোর্ণীয়ার Shasta Springsএর কাছেই পাহাড়ের কোলে একটি তাবুতে তিনি থাকতেন। কিন্তু এক খাওয়ার সময় ছাড়া তিনি বড় একটা ঘরে আসতেন না। যেখানে নদী পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলেছে, সেইখানে প্রকৃতির কোলে ভাব-বিহ্বল অবস্থায় তার দিন কাটত। যে সমস্ত যাত্রী Shasta দেখতে আসত, তারা কৌতূহলবশতঃ এই সদানন্দ পুরুষটাকে দেখতে এসে, যে সত্য যে আনন্দ তার কাছ থেকে নিয়ে যেত, তা তাদের চিরজীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকত।

স্বামী রামতীর্থের জীবন যেন আনন্দ আর মাধুর্য্যের অফুরন্ত উৎস ছিল। তার উদার জগতে যেন সর্ব্বদাই "মধুবাতা ঋতায়তে—মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।" তাঁর মনভুলানো হাসি একবার যে দেখেছে জীবনে সে তা ভুলতে পারেনি। আমেরিকার সেণ্ট লুই প্রদর্শনীর ধর্ম্মসভার অধিবেশনের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার কাগজওয়ালারা বলেছিল যে সমস্ত সভার মাঝে স্বামীজীই ছিলেন যেন একটা আলোর টুক্‌রা। কেউ যদি প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাকে কোনও প্রশ্ন করত, তাহলে মিনিটের পর মিনিট ধরে তিনি এমন মিষ্টি করে হাস্‌তে থাকতেন যে, তার সে আনন্দের বিজলীচমকে আপনা হতেই সংশয়ীর মনের আঁধার দূর হয়ে যেত। যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকেই তিনি অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে নিজের মাঝে টেনে এনেছেন। তাঁর এই অত্যাশ্চর্য্য মনোহরণের ক্ষমতার দরুণ লোকে তাঁকে বল্‌ত—"রাম বাদশা।"—বাস্তবিকই আনন্দের রাজতক্তে তিনি বাদশাই ছিলেন বটে। তিনি নিজেই একবার লিখেছিলেন, "আমি বাদশা রাম—তোমাদের হৃদয়েই আমার সিংহাসন। আমি যখন বেদবাণী প্রচার করেছিলাম, কুরুক্ষেত্রে, জেরুজিলামে, মক্কাতে যখন আমার বাণী ঘোষিত হয়েছিল, তখন আমাকে তোমরা ভুল বুঝেছিলে; আজ আবার আমি আমার কথা তোমাদের শোনাচ্ছি—আমার কণ্ঠ তোমাদের কণ্ঠ হোক্—তত্ত্বমসি। যা দেখছ সবই তুমি—কেউ তোমায় প্রতিহত কর্‌তে পারে না—রাজশক্তি, দেবশক্তি, ভূতশক্তি তোমার শাসনকে প্রতিরোধ কর্‌তে পারে না—সত্যের শাসন এমনি অলঙ্ঘ্য। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ—আমার মস্তক তোমাদেরি মস্তক। ইচ্ছা হয়, এ মস্তক ছেদন কর—দেখবে এর স্থানে সহস্র মস্তক উন্নত হয়ে উঠেছে।"—মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ যা, রাম তাকেই তাঁর অন্তরের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন—অতি সন্তর্পণে, বিন্দুমাত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি না করে। তার মধুময় স্পর্শে অদ্বৈত বেদান্তের মহোচ্চ সত্য যেন প্রভাতের সোনার আলোর মত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ হয়ে উঠেছে।

তাঁর ভালবাসায় কুণ্ঠিতা ছিল না। তাঁর দৃষ্টিতে কোন বস্তুই ক্ষুদ্র ছিল না। চেতন অচেতন সকল জিনিষকেই তিনি যে কি অপরূপ সত্যদৃষ্টিতে দেখতেন, তা যে তাঁর সঙ্গ না করেছে, তাকে বোঝান কঠিন। মানুষ যে তাঁর দুর্লভ প্রেমের অধিকারী হয়েছে, সে তো দূরের কথা—প্রেমের আনন্দে পুঁথিপুস্তক ছুরী পেন্সিল পর্য্যন্ত তাঁর কাছে জীবন্ত হয়ে উঠত—প্রেমিকের মত তিনি তাদের সোহাগ বেঁটে দিতেন। যাকে তিনি সামনে পেতেন তার মাঝেই যেন নিজকে বিলিয়ে দিতেন—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁর দেহজ্ঞান লোপ হয়ে যেত।

"কতবার বক্তৃতার সময় ভাবের আবেগে রুদ্ধ-কণ্ঠ হয়ে তিনি শুধু ওঁ—ওঁ বলতে থাকতেন আর তাঁর চক্ষু বেয়ে ধারা ছুটত। তাঁর আমেরিকান বন্ধুরা বলতেন যে রাম দেহের গণ্ডীতে কোনও সময়েই বদ্ধ থাকতেন না। সে দেশের কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেছিলেন যে, রাম যেমন করে দেহের কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চভূমিতে বিচরণ করেছেন, তাতে দেহধারণ করে থাকা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হবে। দেহের কথা তাঁর মনেই আসত না—জীবনকে তিনি বলতেন যেন "দেহের পিঞ্জরে পোরা আকাশের পাখীর পাখা ঝাপটানোর মত।"

যে তাঁকে দেখেছে, সেই তাঁকে আপন হতে আপন বলে জেনেছে। আমেরিকা-যাত্রী জাহাজে মার্কিণেরা মনে করত, তিনি বুঝি আমেরিকাবাসী; জাপানীরা তাঁকে জাপানবাসীর মতই ভালবেসেছে। জাপান ছেড়ে আমেরিকা যাওয়ার পর তাঁর জাপানী বন্ধুরা বলতেন যে, রাম চলে গেলেও যেন তাঁদের ঘরে ঘরে রামের বিদ্যুতভরা হাসি ঝিলিক্ দিয়ে উঠত। জাপানী শিল্পী দেখতেন, তাঁর গৈরিক বসন যেন একটা দীপ্ত আগুনের শিখা—আর তাঁর কথাগুলি যেন আগুনের ফুলকির মত। আমেরিকাবাসী যে তাঁকে কি চক্ষে দেখেছিল, তা তাদের দেওয়া বিদায় অভিনন্দন দেখলেই আমরা বুঝতে পারব। যুক্তরাজ্যের সমস্তগুলি রাজ্যে তিনি ঘুরেছিলেন আর যতদিন সেখানে ছিলেন, প্রতিদিন একটী করে বক্তৃতা দিয়েছেন। মিশরের মুসলমানেরা তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। সেখানে পার্শী ভাষায় তিনি তাদের মসজিদে এক বক্তৃতা দেন, পরদিন কাগজওয়ালারা লিখল—হিন্দু সাধু রামের সাক্ষাৎ পাওয়া যে কেউর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকাকুস্থ বলেছিলেন, ভারতের যত দার্শনিককে তিনি দেখেছেন, তার মধ্যে স্বামী রামের মত একটীও তাঁর চোখে পড়েনি।

তাঁর ভালবাসা এমনি করে সকলের হৃদয় জয় করেছিল। তাঁর উদার প্রেমের মাঝে কোনও সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মাত্র ছিল না। আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে আসার পর এক ভক্ত তাঁকে নূতন কোন একটী প্রতিষ্ঠান গড়তে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু রাম তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "সে হতেই পারে না—ভারতবর্ষে যত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সবই তো আমারই প্রতিষ্ঠান; তাদের ভিতর দিয়েই আমি কাজ করব।" এই বলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে দুই বাহু প্রসারিত করে ভারতবর্ষকে যেন বুকে জড়িয়ে ধরে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—"খৃষ্টান, হিন্দু, পার্শী, আর্য্যসমাজী, শিখ, মুসলমান—যেই হোক না কেন—আমার প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেবতা ভারতভূমির অন্নজলে যাদের রক্তমাংস গঠিত হয়েছে—তারা যে সবাই আমার ভাই—শুধু ভাই না কেন, তারা যে আমিই। বল তাদের—আমি তাদেরই—আমি সকলকে বুকে তুলে নিচ্ছি; কাকে আমি ছেড়ে যাব?—আমি যে প্রেম; প্রেম যে আলোর মত সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, সকলকেই উজ্জ্বলে তোলে। ওরে, প্রেমের বন্যা, প্রেমের আলো ছাড়া যে আর কিছুই আমি নই—আমি যে সকলকেই সমান ভালবাসি।"

রাম তাঁর সমস্ত জীবন যেন পরের দায়ে সঁপে দিয়েছিলেন, তার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ছিল না। হিন্দুস্থানকে যে তিনি কি ভাল বাসতেন, তার দুঃখ দূর করবার জন্য যে তাঁর

কি প্রবল ও ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। শুধু হিন্দুস্থান বলে নয়, জগতের সমস্ত জাতির প্রতিই তাঁর এই উপদেশ ছিল, "এক রোগ আর তার এক মাত্র প্রতিকার—প্রাণের আইন মেনে চললেই সমস্ত জাতি সুস্থ হবে, মুক্ত হবে। এই আইনের বলে ব্যক্তিগত জীবনও দেবজীবনের চেয়ে মহৎ করে তোলা যায়। ব্রহ্মে অবস্থান কর—সব ঠিক চলবে; অপরকেও ব্রহ্মে অবস্থিতি করতে সাহায্য কর কোথাও কোন গোল হবে না। এই সত্যে যদি বিশ্বাস কর—তবে বাঁচবে; আর যদি এর বিদ্রোহী হও, তবে তবি দণ্ড পাবে।"

সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়ে রাম আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। দু'বৎসরেরও কম সময় সেখানে থেকে সে দেশকে তিনি যা দিয়েছিলেন, আর যা পেয়েছিলেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর একজন আমেরিকান বন্ধু লিখেছিলেন, "রামের কথা বলতে গেলে ভাষায় হার মানে। তার কথাগুলি ছিল যেন শিশুর কলকণ্ঠ, পাখীর কাকলি, নির্ঝরের সঙ্গীত। সাগরে পর্বতে, তরুলতায় শষ্পদলে—সর্বত্রই যেন তাঁর জীবন অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে তার একাত্মবোধ গভীর হতেও গভীরতর ছিল। এমন সরল এমন কোমল,—এমন উদার, নিষ্কলঙ্ক, নিরভিমান, আবেগপূর্ণ, সত্যপিপাসা জীবন যাকে সব দিয়েছে, তাকেই চিরঋণী করে রেখেছে। প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে তার উপর অজস্র প্রশ্ন বর্ষণ করা হত কিন্তু আশ্চর্য্য স্নিগ্ধতায় ও মধুর ভঙ্গীতে স্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত কথায় তিনি তার মীমাংসা করতেন। তাঁর সৌজন্য অসাধারণ ছিল। তাঁর সঙ্গে যে কারু বিরোধ হতে পারে, এ কল্পনা কষ্টকর ছিল। যুক্তিতর্ক যেখানে স্পর্শ করেনি, তিনি প্রাণভরা ভালবাসা ঢেলে সেখানে হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর উপদেশের কাছে যার মাথা নত হয়নি, সেও তাঁর শুভ্র প্রেমের মহিমার কাছে লুটিয়ে পড়ত। তাঁর আনন্দ যেন চারিদিকে উপচে পড়ত। একবার তিনি লিখেছিলেন, 'আনন্দ যে চায়, অনন্ত প্রকৃতিই তো তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে; তার জন্য তারার মালায় সাজানো আকাশ আছে, স্রোতস্বিনীর ঝিকিমিকি আছে, বাতাসের প্রাণজুড়ানো স্পর্শ আছে, জ্যোৎস্নার মধুমাখা হাসি আছে। এ সমস্ত ছেড়ে দিয়ে অবস্থা বিশেষের উপর সুখ নির্ভর করে, এ কথা যে বলে, সুখ তার কাছ থেকে আলেয়ার মত দূরে সরে সরে যায়। সমস্ত জগতের স্বাস্থ্য আজ দূষিত হয়েছে এই জন্য যে, মানুষ প্রকৃতির মহিমা, তার আনন্দ, তার ঔদার্য্য হতে নিজকে আড়াল করেছে।'

"আর একবার খুব কঠিন পীড়ার সময় তিনি লিখেছিলেন, 'আজকাল চিত্তের একাগ্রতা ও অধ্যাত্মভাবের প্রেরণা এমনি প্রবল হয়েছে যে, সব যেন সেই একরসে ডুবে যাচ্ছে। এই তো শরীর ক্ষণে ক্ষণে তার খেয়ালের অন্ত নাই,—আমি এই আলেয়ার কাছে নিজকে বাঁধা দিব? জন্মণ-বিসূচী। চিত্তের একাগ্রতা ও প্রশান্তি আশ্চর্য্য রকম বেড়ে যায়। দেহের পীড়া তো অতিথির মত; কৃপণের ন্যায় যে এর যথাযোগ্য সৎকার করে না, তার মত হতভাগা আর কে আছে?' তিনি সর্বদা বলতেন, 'চন্দ্রে সূর্য্যে গ্রহ নক্ষত্রে যে মহাশক্তি, সেই শক্তিই তুমি—সব সময়ই এই ভাবনা করবে। দেহের ক্ষুদ্র আসক্তি আর বন্ধনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অনন্ত মহিমায় ভাস্বর জীবনের কথাই কেবল মনন

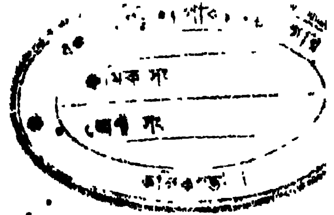
কর—অস্বস্তি থাকবে না, মৃত্যু থাকবে না, দুঃখ থাকবে না।’—এই শিক্ষা তিনি সকলকেই দিতেন।” তারপর আমেরিকা হতে ফিরবার সময় খবরের কাগজে তাঁর যে সমস্ত প্রশংসা বেড়িয়েছিল, পুঁটুলীশুদ্ধ সেগুলো সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে রাম দেশে ফিরে এলেন।

রামের পাণ্ডিত্যও ছিল তাঁর হৃদয়ের মত অগাধ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন, বিজ্ঞান, পারস্য, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অলি গলিতেও তাঁর গতিবিধি ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চারখানি বেদ অধ্যয়ন করেন—প্রত্যেকটী বেদ মন্ত্রের তিনি তন্ন তন্ন করে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও সমন্বয় করে তিনি একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি হিমালয়ের নির্জ্জন বনভূমিতে বাস করতেন—বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছিল—তিনি যেন ক্রমেই অন্তরের মাঝে ডুবে যাচ্ছিলেন। এই সময় শ্রীযুত পরাণকে তিনি বলেন, ‘আমি দেহে থাকতে হয়ত আমার কাজে কোন ফল দেখতে পাবে না, কিন্তু আমি চলে যাবার পরেই এ কাজ ভাল চলবে। যে সমস্ত ভাব আমার জীবনকে অভিষিক্ত করেছে, পরিচালনা করেছে, কাল পূর্ণ হলে সমগ্র সমাজে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে; সমস্ত ইচ্ছা উদ্দেশ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্রহ্মসত্তায় নিজকে ডুবিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার কর্ম্ম সার্থক হবে।”

স্বামী রামতীর্থের রচনা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ বলেছেন, স্বামিজীর দার্শনিক মতবাদের মাঝে যে অফুরন্ত কাব্যের ভাণ্ডার নিহিত রয়েছে, সেইটুকুই বিশেষ করে সবার উপভোগ্য। এই কবিত্বের প্রভাবেই তাঁর বাণী কোনও দিন ম্লান হবে না—বিশ্ববাণীর ভাণ্ডারে তা চির সম্পদ হয়ে থাকবে। প্রকৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, তাঁর তীব্র সত্যপিপাসা, অনন্যসুলভ ত্যাগ, আর তাঁর সর্ব্বদুঃখাভিভাবী অনাবিল হাস্যোজ্জ্বল আনন্দধারা—এতেই তাঁর সমস্ত দার্শনিকতাকে কবিতার মত মনোরম করে তুলেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরস্পর সান্নিধ্যের ফলে উভয়ের মিলন দিন দিন অনিবার্য হয়ে আসছে। যদি শুধু পথ আর মত নিয়ে বিচার করি, তাহলে উভয়ের মাঝে যে সমস্ত অনৈক্য আছে, সেগুলই আমাদের চোখে পড়বে। কিন্তু এই উভয় জীবনের মাঝে কাব্যের আলো যেখানে উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে, সেখানেই মিলনের রাগিণী বেজে উঠেছে। এই মহামিলন যজ্ঞের স্বামী রামতীর্থও একজন হোতা। স্বামী রামতীর্থ ও স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তে যে আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য্যের যোগ করেছেন, তাতে প্রাচী ও প্রতীচীর পরস্পরের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ ঘটবার বিশেষ সুযোগ হয়েছে।

রামের কথা আমরা যতই আলোচনা করি, ততই এই প্রশ্নই আমাদের মাঝে জাগে, রাম কি বাস্তবিকই আমাদের মাঝ থেকে চলে গিয়েছেন? তাঁর দেহত্যাগের (১৯০৬) কিছু পূর্ব্বে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন, তাতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে—“হে মরণ, ইচ্ছা যদি হয় তবে এ দেহ তুমি স্বচ্ছন্দে হরণ কর আমি তাতে ভ্রূক্ষেপও করিব না। আমার আবার দেহের অভাব কি? চাঁদের আলোর রূপালী সূতো দিয়ে আমি

কান্না বুনব—তার মাঝেই আমি প্রাণ পাব। আমি ঝরণার সঙ্গীতে জেগে উঠে অমরবীনায় ঝঙ্কার তুলব—সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আমি নেচে বেড়াব। বসন্তের মদির সমীরণ আমি—আমি কালবৈশাখীর প্রমত্ত ঝঞ্ঝাবাত—আমার রূপ এই জগতেরই বিবর্ত্তনের রূপ। আমি ঐ গিরিশৃঙ্গ হতে নেমে এসেছি—মৃতকে প্রাণ দিয়েছি সুপ্তকে জাগিয়েছি, সৌন্দর্য্যকে প্রকট করেছি, বিরহীর অশ্রুজল মুছে দিয়েছি। বুলবুলকে আমি ভালবেসেছি—গোলাপকে আমি সোহাগ দিয়েছি সবার পরাণ ছুঁয়ে সবার পরাণ নিয়ে এই আমি চল্লাম। আমি এইখানে আমি ওইখানে আমাকে ধরতে পারবে কে? কোনও সঙ্গই তো আমি কাছে রাখেনি ধনি!"—ওঁ শান্তিঃ।



—✻—

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন, সনাতন, মমতাভিমানের জ্বালায় সংসার ছারখার হইয়া গেল—কি করিয়া এর দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা কি জান? শ্রীকৃষ্ণ প্রপন্নার্ত্তিহর—সব সঁপিয়া যে তার চরণে লুটাইয়া পড়ে, তিনি তাহাকেই কৃপা করেন—সংসার দহন হইতে আর তাহার কোনও ভয় থাকে না। তাঁর শ্রীমুখের বাণী এই:—

সকৃদেব প্রপন্নো য স্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥

"ভগবান আমি তোমার হইলাম" একবার এই কথা বলিয়াও যে শরণাগত হইয়া আমার নিকট মনের কথা জানায়, আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় দিয়া থাকি—ইহাই আমার ব্রত।

শরণাগতি ভিন্ন কৃপা হয় না; অথচ কৃপা করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উন্মুখ—ভক্তকে অভয় দেওয়াই তাঁর ব্রত। তাঁর দিক হইতে তো আমাদের সঙ্গে মিলনের কোনও বাধা নাই বাধা যে আমাদের দিক দিয়াই। বলিতে পার তিনি ইচ্ছা করিলেই তো সে বাধা ঘুচাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহা দেন না কেন?—তাঁহার ইচ্ছা তো আমাদের ইচ্ছার মত জবর দস্তি নয় যে পলকের মধ্যে একটা অকাণ্ড ঘটাইয়া বসিবে। আমাদের অভিমান দিয়া তাঁর আকর্ষণকে যে তিনি বারবার ব্যাহত করিতেছেন, এও তাঁহারই ইচ্ছা। তিনি তো শুধু বরণাহরীই নন, তাঁর মত ব্যাথাতুর এ জগতে কে? তাঁর আনন্দ তাঁর স্বাতন্ত্র্য কণা কণা আমাদিগকে বাটিয়া দি। তাহারই বিষের জ্বালা তিনি বুকে পুরিয়া লইয়াছেন—নিরভিমান প্রেমিকের মত আকুল আগ্রহে পথ চাহিয়া বসিয়াছেন, করে কে তাঁর বাঁশীর ডাকে সকল অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তাহার পায়েই নিজকে সঁপিয়া দিতে ছুটিয়া আসিবে। প্রেমের বেদনা যদি কখনও তোমার প্রাণে জাগিয়া থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, কেন তিনি সব পারিয়াও শরণাগতির অপেক্ষায় অমন করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া বসিয়া থাকেন! আমরা যে সব ভুলিয়া নিজের অভিমানটাই সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি—এর সমস্তটুকু ভোগ নিঃশেষ না

হইলে তাঁর কৃপা বুঝিতে পারিব কি করিয়া? তা বুঝি আর না বুঝি, তাঁর আকর্ষণ তিল তিল করিয়া তাঁর দিকেই আমাদিগকে টানিয়া লইতেছে—একদিন মোহের ঘোর কাটিবেই।

তাঁহাকে ছাড়িয়া কাহারও সাধ্য নাই যে এক পদ অগ্রসর হয়। যদি কামনা নিয়াও মজিয়া থাক, তবু তাঁহাকেই চাহিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (২, ৩, ১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

—যিনি উদারমতি তাঁহার কামনা থাকুক আর না থাকুক, কিম্বা মোক্ষকামনাই থাকুক, তিনি তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষকে ভজনা করিয়া থাকেন।

কামনার মাঝেও প্রভেদ আছে। চিত্ত যাহাদের অন্ধকারে আবৃত, অবোধের মত তাহারাও কামনা করে; আবার বুদ্ধি যাহাদের বিশারদ হইয়াছে, তাহাদেরও হয়ত কামনা থাকে। সমস্ত বিষয়াসক্তি দূর হইলেও মোক্ষকামনা মানুষের মাঝে থাকিতে পারে। কিন্তু কথা এই, জীব যে কামনাই করুক না কেন, ভগবান ছাড়া তাহার আর গতি নাই। অন্ধ কামনায় যে মত্ত, সে হয়ত নিজের শক্তির অভিমানেই স্ফীত হইয়া চলে; কিন্তু এ অভিমান কয়দিন? যে কামনার তাড়নায় ভগবানকে ছাড়িয়া সে দূরে দাঁড়াইয়াছে, সেই কামনাই কত অপথে বিপথে ঘুরাইয়া অবশেষে তাহাকে এমনি বীর্য্যহীন, শক্তিহীন করিয়া তুলিবে যে তখন আর ভগবান ছাড়া তাহার গত্যন্তর থাকিবে না। অজ্ঞানীর কামনার শেষেও তাই দেখি ভগবান। আর যিনি জানেন, জগতের একমাত্র নিয়ন্তা ভগবান, অথচ কর্ম্মবশে যাঁহার কামনার সম্যক্ নিবৃত্তি হয় নাই, তিনি ভগবানের কাছে না চাহিয়া কাহার কাছে চাহিবেন? আবার বিষয়ের আকর্ষণ যাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, অথচ সংস্কার বশতঃ সংসারের বন্ধন যিনি ছেদন করিতে পারিতেছেন না, তিনিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মোক্ষ কামনা লইয়া ভগবানকেই আশ্রয় করেন। তারপর সমস্ত কামনার মূল—এমন কি মোক্ষকামনা পর্য্যন্ত যাঁহার বিগলিত হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র ভগবানের অনির্ব্বচনীয় লীলামাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়া বন্ধন মোক্ষেও যিনি সমজ্ঞান হইয়াছেন, তাঁহার তো কথাই নাই; ভগবান ভিন্ন তাঁহার কিছু বা আছে আর কিই বা থাকিতে পারে? তাই বলি, কামনা থাকুক আর নাই থাকুক, ভগবানকে ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য আমাদের নাই।

তারপর তাঁর সর্ব্বজয়ী আকর্ষণের কথা। কামনা লইয়াই বা তুমি কতদিন পড়িয়া থাকিবে? সেই অনাদি যুগ হইতে যে তোমার কামনার ঘরে আগুন লাগিয়া রহিয়াছে, তাহা কি দেখিতে পাও নাই? তাই না তোমায় সংসারসুখ এমনি করিয়া ধূম আবিল হইয়া উঠিয়াছে কিছুতেই আর তুমি শান্তি পাইতেছ না। একটু একটু করিয়া তাহার প্রেমের প্রতাপে তোমার অভিমান নির্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, তারপর যেদিন বুঝিবে কামনার সিদ্ধি খুঁজিতে গেলেও তাঁহার কাছেই আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, সেই দিনই তাহার আকর্ষণের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। কামনা লইয়াও যদি কেহ ভগবানকে ভজনা করে, তবে না চাহিতেও সে ভগবানকেই পায়; শ্রীকৃষ্ণ তাহার আকিঞ্চনে হাসিয়া বলেন, "আমাকে ভজনা করিয়াও এ তুচ্ছ বিষয় সুখই চাহিতেছে—অমৃত ছাড়িয়া বিষ মাগিতেছে; এ এত বড়

মুর্খ? আমি তো বুঝি; আমি কেন ইহাকে বিষয় দিয়া ভুলাইব?—আমি ইহাকে আমারই শ্রীচরণামৃতের অধিকারী করিব।"

এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (৫, ১৯, ২৮)—

সত্যং দিশত্যর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং॥

—ভগবানের কাছে মানুষ যা চায়, তা তিনি দেন বটে; কিন্তু পরমার্থ দিয়া তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করেন না—এই জন্য তাঁহার কাছে আবার তাহাকে যাচক হইতে হয়। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তাহারা কামনা না করিলেও সমস্ত কামনার পরিপূরক নিজেরই চরণপল্লবের আশ্রয় তিনি তাহাদিগকে দিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণই রসস্বরূপ। বিষয়ের মাঝে যে রস পাইয়া জীব মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারই রসের আভাস মাত্র। এমন হইতে পারে, বিষয়রসের আকাঙ্ক্ষায় জীব শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছে, কিন্তু চিত্তের তীব্র সন্তাপ বশতঃ বিষয়-বাসনা দগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণানুরাগরূপ পরম রসের উদয় হইয়াছে। সমস্ত রসই তো তিনি, যাহা কিছু পার্থক্য তাহা কেবল সংস্কারজনিত প্রকারভেদ মাত্র। কর্ম্মক্ষয় যেখানে আসন্ন, সেখানে এই সংস্কার সহজেই ক্ষয় হইয়া যায়—কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষার উদয় করাইয়াই ভোগের পর্য্যাপ্তি ঘটে এবং সেই প্রশান্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্ব স্বরূপে আবির্ভূত হন। ধ্রুবেরও বিষয়ার্থিতা এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণানুরাগে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি, বরং ন যাচে॥

—শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার অভিলাষে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু দেব ও ঋষিগণের নিকটেও যিনি গোপন সেই তোমাকে আমি পাইলাম। কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, হে প্রভো, আমি কৃতার্থ হইলাম, আর বর চাই না।

কি করিয়া যে এই কৃপা হয়, কাচ খুঁজিতে খুঁজিতে কি করিয়া যে এমন দিব্য রত্ন মিলিয়া যায়, তাহার রহস্য রসিকেরা ভেদ করিতে চাহেন না। আর এই রহস্য জানিয়াই বা কি লাভ? যদি পূর্ব্বের সুকৃতিবশে চিত্ত তাঁহার অভিমুখী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অযাচিত করুণার কথা স্মরণ করিয়া, কৃপাসিদ্ধ মহাজনগণের অপরিসীম সৌভাগ্য দর্শন করিয়া আপনিই চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে, তাঁহার অহেতুক কৃপার অধিকার যেন করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রসিকেরা এই জন্য যুক্তিতর্কের বিচার চাহেন না—মনটী প্রাণটী শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ভাসাইয়া দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, যেদিন জোয়ার আসিবে, সেদিন আপনা হইতেই কূলের বন্ধন টুটিয়া যাইবে। এমনি ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥

—আমার সাধন ভজন ছিল না বলিয়াই যে তোমার দর্শন পাইব না, এই কথায় যা

কি করিয়া বলি ? আমার মত অধমেরও তো তোমার দর্শন পাওয়া অসম্ভব নয়। কালরূপ নদীর প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কেহ কখনও তীরে উত্তীর্ণ হয় বই কি ?

লীলাময়ের লীলায় স্থান কাল পাত্রের বিচার নাই। আমরা আর কার্য্য-কারণের পরম্পরা ধরিয়া তাঁহার লীলার কি ইতি করিব ? কাজেই সব ছাড়িয়া কেবল তাহার মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন আর করিবার কি আছে ? তবে এখানেও একটা কথা বুঝিবার আছে। সুকৃতিবশে অহেতুক কৃপা আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু সে কি সকলের ভাগ্যেই ঘটে ? বুকপোরা অভিমান লইয়া সংসারের হাটে যখন দম্ভ করিয়া ফিরি, তখনও কি একথা বলা চলে যে এই অভিমান থাকিতে থাকিতেই কৃপার অনুভূতি লাভ করিব ? আর এ অভিমানই কি সকলের মুছিয়া যায় ? ভগবানের উপর যখন নির্ভর করিয়াছি, তখন তাঁহার দেওয়া ভরসা ছাড়িয়া দিয়া দুর্জ্জয় স্পর্দ্ধায় নিজের ভার নিজের কাঁধেই তুলিয়া লইয়াছি। সে ঠাকুরের ঠাকুরালী এমন নয় যে আমার নিজের গড়া নাটে তিনি বাধা দিবেন। যত-দিন আপন অভিমানে আপনি তৃপ্ত থাকিয়া বলিব, বেশ আছি, ততদিন তিনিও আমার কথায় সায় দিয়ে বলিবেন, তাই ত, বেশ আছ বৈ কি ? কিন্তু অভিমানের পুঁজি যখন ফুরাইয়া আসিবে, সেই দিন যখন আর্ত্তি করিয়া বলিয়া উঠিব, তাই ত গো—এতদিন এ কি করিলাম ?—লীলাময়ও তখন বলিয়া উঠিবেন, হাঁ, তাইত এতদিন এ কি করিলে ? কাজেই অভিমান নিয়া যাহারা মাতিয়া রহিয়াছে—তাহারা যদি কৃপার ভরসায় হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকে, তবে কি কৃপা হইবে ! আপনাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই কপটীর কাছে তো ফাঁকী দেওয়া চলিবে না। এ জায়গায় আর যুক্তি তর্ক চলে না—ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাব দেখিয়াই ফল দিবেন। তবে নিতান্ত অধম অধিকারীরও যদি তাঁহার অহেতুক কৃপার কথা স্মরণ করে, তবে চিত্তে প্রচুর বল ও শান্তি পায় বই কি ?—এইটুকুই জন্মান্তরের সুকৃতি।

কর্ম্মের সঞ্চয় শেষ হইলে ভগবানের করুণা যাহা আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে—সাধুসঙ্গ তাহার অন্যতম। সাধুসঙ্গের মহিমা কে না জানে ? এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (১০, ৫১, ৩৫)—

> ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
> জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
> সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
> পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

—রাজা মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে অচ্যুত, সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন সংসারবন্ধন ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হয়, তখন জীবের সাধুসঙ্গ ঘটিয়া থাকে ; সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সদ্গতি হয় এবং পরাবরের অধীশ্বর তোমাতে রতি জন্মে।

ভক্ত আর ভগবান্ এক—ভক্তের সঙ্গে মিলন ভগবানের সহিত মিলনের তুল্য বটে। কিন্তু ভগবানের করুণার আর অবধি পাই না—যখন দেখি, সদ্গুরুরূপে তিনি কোন ভাগ্যবানের হাত ধরিয়া তাহাকে স্বীয় আনন্দ-ধামে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (১১, ২৯, ৬)—

> নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
> ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে প্রভো, আপনার কৃত উপকারের কথা স্মরণ করিয়া ব্রহ্মবিদেরা পর্যান্ত কোনও প্রত্যুপকার কল্পনা করিতে পারেন না, কারণ বাহিরে আপনি গুরুরূপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে দেহীদের সমস্ত অশুভ বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে নিজের গতি অর্পণ করিয়া থাকেন।

সাধুসঙ্গের ফলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে যদি শ্রদ্ধা জন্মে, তবে তাহা হইতেই ভক্তির সঞ্চার হইয়া সংসাররূপ পাশ ছিন্ন হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমামৃতরূপ মহাফলে অধিকার জন্মিবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিতেছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

—লোকোত্তর সৌভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও আমার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, এবং বিষয়ের প্রতি তিনি অতিশয় বিরক্ত অথবা অতিশয় আসক্ত না হন, তাহা হইলে সেই ভক্তিযোগেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। বিষয়ের উপর ভক্তের কোন সহজ আকর্ষণ নাই। তিনি জানেন সকলই শ্রীভগবানের। সুতরাং কাহাকেও অবজ্ঞায় ফেলিয়া দিতে পারেন না; ভাবের অঞ্জন চোখে মাখিয়া সকলেই তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি অত্যাসক্তি বা অভিনিবেশ উভয়েরই পরপারে।

আমার মালী

("বাঙ্গলা কলেজ মেগেজিন" হইতে অনূদিত, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়)

বেশ লোকটী ছিল, আমার মালী। গেল বৈশাখ মাসে একদিন সকাল বেলা সে বললে "আজ্ঞে, আমি আর এখানে থাক্‌তে পারছি না, বয়স তিন কুড়ি পাঁচ হল। এখন ছুটির সময় হয়েছে।"

আমি তখন পড়ছিলুম, তার অৰ্দ্ধেক কথাও শুনতে পাইনি। মাথা না তুলেই বললুম, "কেন?"

বেচারা আমার ভাব দেখে আর একটা কথা না কয়ে তার বাগানে চলে' গেল।

বাগানটি তারই ছিল। তার যা খুসী সে গাছ সে লাগাত। আমার পড়্‌বার ঘরের সাম্‌নে বাগান। জান্‌লা দিয়ে সবটা দেখা যেত। কিন্তু বাগান দেখ্‌বার আমার সময় হত না।

তার বয়স দেখ্‌লে, সে খুব খাটত। যখন সে আমার কাছে চাকরি করতে আসে, তখন কেউ তাকে রাখতে চায়নি, সে বুড়ো; বুড়া কি কাজ করবে! আমি তার মুখের ভাব দেখে রেখেছিলুম। তাকে ভাল মনে হয়েছিল। পরেও দেখেছি, আমার ভুল হয়নি।

আমি তার নাম জানতুম্ না। বাড়ীর কেউ জানত না। আমরা তাকে "বুড়া" ব'লে ডাকতুম।

সে দিন সে গেল, বোধ হয় দুঃখ পেয়ে।—

আর একদিন সুযোগ বুঝে, আবার

সেই কথা তুলতে এবার আমি বললুম, "লোকে কি শুধু শুধু চাকরি ছাড়তে চায়? তুমি কেন যেতে যাও? যা পাব তাই কব, তা হলেই হবে।"

"আজ্ঞে, আমার প্রভুর সেবা যে এখনও বাকি আছে। যে কটা দিন আছে, তাঁর সেবা করতে চাই।"

উত্তরটা আমার ভারি নূতন ঠেকল। আমি তাকে ভালরকমই জানতুম, কিন্তু কখনও ভাবি নাই, সে এত দূর করবে। আমি তাকে ছাড়তে চাই না। বললুম, "আচ্ছা বুঢা, এখানে থেকেই তোমার প্রভুর সেবা চলে না কি?"

"তা কেমন করে চলবে? এক মনে কেমন করে হবে?"

তবু সে জাতিতে বাউরী। অপর চাকরে তাকে ছুঁতো না। সে যদি কোনো জিনিসের এক ধার ধরত, তারা অন্য ধার ধরত না। আমার বোধ হয়, ওড়িয়া ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সবটা তার কণ্ঠস্থ ছিল। সে সময় সময় ভাগবতের পদ আওড়াত। আমার আশ্চর্য্য বোধ হত। সে লেখাপড়া শেখে নাই, অথচ এত জানত!

"কিন্তু বুঢা, আমি ত জানি, সূর্য্য উঠবার আগে আর রাত্রে শোবার আগে তুমি ভগবানের নাম অনেকক্ষণ কর। কাজ করবার সময়েও মাঝে মাঝে নাম কর। আর কি চাও?"

আমার কথা শুনে সে যেন বিষণ্ণ হল। হয়ত ভাবলে আমি তাকে বিশ্বাস করি না। তাকে প্রসন্ন করতে বললুম, "আচ্ছা দেখা যাবে।"

বেচারা আমার অনুমতি না নিয়েই অনায়াসে চাকরি ছাড়তে পারত। কিন্তু সে তেমন লোক নয়।

"দেখ, তোমার ছেলেকে দিয়ে যাও না?"

"এখনও সে কুড়িতে পড়েনি। যে বছর তার জন্ম হল, সে বছর আমাদের গাঁয়ের মহান্তীরা আমার জমির পাশের দশ বিঘা জমি নিয়েছিল।"

"আমি ত তার কাজ দেখেছি। তোমার অসুখের সময় সেই ত মালী হয়েছিল।"

কিন্তু বুঢা অবুঝ। সে জানে না, পূর্ব্ব জন্মে তার ছেলে কি কর্ম্ম করেছিল, এ জন্মে কি ফল ভোগ করবে।

"আচ্ছা, তুমি কি জানো পূর্ব্বজন্মে কি করেছিলে?"

"না জানলে উনিশ বছর থেকে মালী হলুম কি করে?"

আমার তর্কের সময় ছিল না। থাকলেও তাকে বোঝাতে পারতুম না।

কিছুদিন গেল। একদিন বাগানের মাঝ দিয়ে বাড়ী ফিরছিলুম। সে আমায় একটা পাথর দেখালে। কি বলবে, বুঝতে পারলুম না, শুধু বললে, "আজ্ঞে, আমায় ছুটি দেন।"

আমি অবাক হয়ে গেলুম। এই কথার জন্য পাথর দেখানো কেন, বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মনে হল পাথরটা সেখানে ছিল না। কোনও দেবী পাথরটাতে এসে তাকে চাকরী ছাড়তে বলেছেন নাকি? তাকে কথাটা বলতে সাহস হল না, কি জানি তার মনে কি হয়। আমি শুধু বললুম, "পাথরটা ত এখানে ছিল না?"

"না, আমি সকালবেলা বয়ে এনেছি। বড় ভারী লাগল!"

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কেউ পাথরটা আনতে বলে থাকবে, এটার কষ্ট হয়ে থাকবে, তাই আমি বললুম, "কে আনতে

বলেছিল? যদি ভারীই লাগল, আর কাউকে ধরতে বললে না কেন?"

"আমি ভেবেছি না সরিয়ে করি কি? এই পাথর! এর জন্য লোক ডাকব?"

আমার আবার মনে হল হয়ত কোন দেবী রাত্রে স্বপ্ন দিয়ে পাথরটা সরাতে বলেছিলেন। নইলে এত তাড়াতাড়ি কেন? সেও তো আমাদের মত কত কি মানে।

"যদি কেউ বলে নাই, তবে সরাতে গেলে কেন?"

সে আশ্চর্য্য হয়ে রইল। কারণ পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা ঐ পথ দিয়ে আমার বাড়ি দিদি এসেছিলেন। তিনি অন্ধকারে দেখতে পাননি, পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলেন। মালী দেখেছিল।

"মহাপ্রভু রক্ষা করেছেন। নইলে হানি হত।"

"যদি না হত, তোমায় কেউ দোষ দিত না।"

"আমায় না দিয়ে আর কাকে দিত? আপনার সময় নাই, বাড়ীতে কি হয় না হয়, অপরে দেখে না। আমি যদি না দেখি, আমি আছি কেন? আমার পশুজন্ম না হয়ে মানুষজন্ম হল কেন?"

তার এত শেষের যুক্তি আমার বেশ জানা ছিল। ইহার খণ্ডন ছিল না।

"বুড়া, তুমি ভাল করেছ, পাথরটা সরিয়েছ। কিন্তু যেতে চাও কেন?"

আমার কথায় সে অবাক হয়ে গেল। বোধ হয় মনে মনে আমার বুদ্ধির নিন্দাও করেছিল। কিন্তু শুধু বললে, "পাথরটা ভারী লেগেছিল।"

"হ্যাঁ, পাথরটা বড়। এত তাড়াতাড়ি না করে কাকেও ডাকলে হত।"

বলেই মনে হল, কেউ তার সঙ্গে পাথরটা ধরত না। তারা জাতিতে উঁচু; তারা মনে করত ভগবান তাদেরই, বাউরীর নয়। বোধ হয় মালী তাদের এই আবদারের টের পেয়ে দুঃখ পেত।

কিন্তু আমি আবার ভুল করলুম।

"কি? কুড়ি বছর আগে এক জোড়া ভারী যাঁতা চার ক্রোশ বয়ে এনেছি, এখন কিনা ছোট একটা পাথর ভারী লাগল!"

বুড়া কাঁদতে লাগল। তার শুখনা গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল। আমার দুঃখ হল, ভোলাবার তরে বললুম, "তা সত্যি। কিন্তু সে তো কুড়ি বছর আগের কথা। তখন তোমার বল ছিল।"

"সেই কথাই তো আপনাকে জানাচ্ছি।"

কিন্তু কি লজ্জা! আমি তার মনের ভাব মোটেই ধরতে পারিনি। তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম, যদি কিছু বলে। কিন্তু সে তেমন লোক নয়, এক কথা দুবার বলবার নয়।

"তারপর?"

"আর কি চাই? বুড়ো হয়েছি, আর জানতে বাকী কি?"

এখনও তার চোখ ছলছল করছিল।

"যদি এই কথা, তাহলে পাথর টাথর আর তুলতে যেও না।"

হায়! সে কথাই নয়। সে যে বুড়ো হয়েছে, মহাপ্রভু প্রথমে আমার বন্ধুর পায়ে হোঁচট লাগিয়ে, পরে বুড়াকে দিয়ে পাথরটা সরিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

আমি তার যুক্তির মর্ম বুঝলুম। কিন্তু তাকে ছাড়তে চাই না। তেমন বীর, তেমন বিশ্বাসী, তেমন টানের লোক সহজে মিলে না। তারই কথায় বলি, সে মানুষ

হয়ে জন্মেছিল। পশু কেবল খাওয়া শোওয়া জানে। এই কথা সে কতবার অন্য চাকর দের বলত। শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা,—যখন তারা দুপুর বেলা স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে সারা বিকালটা কাটাত, তখন সে বুড়ার ঘুম থাকত না। তারা যেখানে-সেখানে পাতা টাতা ফেলত, বুড়া সে সব খুঁটিয়ে তুলে বেড়াত। আমি তার মাইনে বাড়িয়ে দিতে চাইলুম, তার কুটুম্ব পোষ্যের কথা তুল্লুম। কিন্তু সে অবুঝ। খাবার পরবার ভাবনা মহাপ্রভুর, তার ভাবনা কি আছে?

ভাল লোকটী এতও জানত। সে অপর চাকরদের শেখাত। তারা তাকে "বুড়া পো" (বুড়া ছেলে) বলে ডাকত। কত বাহিরের লোক তার পরামর্শ চাইত; তাকে তারা "মহান্তী" (মহাজন) বলে ডাকত।

আগে যে মালী ছিল, সে ফুল গাছের যত্ন করত না। বুড়া চাকই তুলসী, মল্লিকা লাগিয়ে দিল। দূরে নয়,—আমার পড়বার ঘরের জানলার ঠিক সামনে, যেন আমি ভগবানের দয়ার ভোগ প্রত্যক্ষ করি। কি দয়া! আমরা না চাইলেও তিনি সুগন্ধি সর্জনা করছেন আমাদের উপভোগের নিমিত্তে। মানুষ নির্ব্বোধ; বিনামূল্যে পায় তবু নিতে চায় না।

বুড়ার কিন্তু একটা দোষ ছিল। কোনও গাছ কাজের মনে করলে সেটা কিছুতেই সরাত না। কত বার তার সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। আমি ধরতাম যেখানকার গাছ সেখানেই সাজে। সে ধরত সেখানকার না হলে সেখানে জন্মিবে কেন? অত কথা কি, প্রভুর ইচ্ছা না হলে ঘাসও জন্মে না।

একদিন দেখি বুড়া বাগান নিড়াচ্ছে, কতকগুলা ঘাস উপ্‌ড়িয়েছে। আমি সুযোগ বুঝে ধরলুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেলুম— "সে কাজের ঘাস নয়।"

এই উত্তরে আমি খুশী হলুম, মনে করলুম এবার বুঝিয়ে দেব আমার কথাই ঠিক। কিন্তু বুড়াকে পারবে কে? বিনা প্রয়োজনে ভগবান কিছুই গড়েননি; কিন্তু যখন সে প্রয়োজন আমাদের জানাননি, তখন তুলে ফেলাতে দোষ নাই।

ভাল ফুল, ভাল শাক পালা জন্মাবার তরে বাগান করা হয় নাই। বাড়ীটা পরিষ্কার থাকবে বলে বাগান করা হয়েছিল। বুড়া যা খুসী তাই করিতে পেত। কখন সে সারি সারি পেঁড়শ লাগাত, কখনও শিমের বন করত, কখনও বা মেঠো ফসল 'মাণ্ডিয়া' চাষ করত।

একবার বুড়াকে একটু অনুযোগও করে ছিলুম "বুড়া তুমি এত এত লাগিয়েছ কেন? দুই চারিটা করে লাগালেই ত হ'ত। তা ছাড়া এটা কি মাঠ যে মাণ্ডিয়া বুনবে?"

"এতে কার কি ক্ষতি হচ্ছে? ইন্দ্র জল দেন—পৃথিবী ফল দেন।"

পরে শুনলুম পাড়ার কেওট ও অন্যান্য দুঃখী জন বাগানের ফসলের ভাগ পায়। ইন্দ্র আর পৃথিবীর এত দান একলা ভোগ করলে পাপ হয়। ইহার পর আমি আর তাকে কিছু বলতুম না।

তার মতন বন্ধু বৎসল আমি আর দেখি নাই। বাহির বাড়ীর একচালায় সে থেত শুত; কিন্তু এমন দিন প্রায় দেখিনি, যে দিন সন্ধ্যার পর একজন দুজন কেহ না-কেহ বুড়ার বন্ধু (কুটুম্ব) না এসেছে। মনে হ'ত বুড়ার কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। সে তার জন্য রাঁধ্‌ত বাড়্‌ত, কত কথা কইত, কত হাস্‌ত

জানি না তার অল্প মাইনে থেকে কি ক'রে এত খরচ জোগাত। একবার আমার এক ছোট 'পূজারী' পাচক বলেছিল, বুড়া বাগানের সব জিনিষ বেচে চাল ডাল মাছ কেনে। সে দেখেছিল, বুড়ার বন্ধু-ভোজনে ভাল ভার ব্যঞ্জন হ'ত। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ধরিনি। বাড়ীটা পরিষ্কার রেখেছিল।

সময়ে সময় পাঁচ ছ' জন বন্ধু গ্রাম থেকে এসে তার কাছে খেত। পূজার সময় ঠাকুর দেখতে দশ বারজনও আসত। সত্য কথা বলতে কি, বুড়ার এই বন্ধুবাৎসল্য আমার ভাল লাগ্‌ত না একদিন বন্ধুরা চলে গেলে আমি বুড়াকে ধরলুম—

"দেখ, বাড়ীতে হোটেল খোলা ঠিক নয়।" কিন্তু যে উত্তর পেলুম, তাতে আর কথা বলতে হল না। "এটা হোটেল কি? খাওয়ানর জন্যে সে পয়সা নেয় কি? না, তা নয়। ভগবান তাকে মানুষ জন্ম দিয়েছেন, সে চাকরী করে বটে, কিন্তু সারা-জীবন মানুষ ছাড়া আর কি হবে! পশুর দয়া মায়া নাই। মানুষ ত পশু হ'তে পারে না। লোকগুলি সহরের অপর বাড়ীতে যায় না কেন? আমাদের ভাগ্য যে তারা এ বাড়ীতে আসে।"

বুড়ার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

একদিন দেখি সকালে বুড়া ও পূজারী বকাবকি করছে। এত জোরে যে আমার পড়া বন্ধ করতে হ'ল। বুড়া জানালার কাছে এসে পূজারীর নামে নালিশ করলে। পূজারী বুড়াকে চোর বলেছে।

"কেন—কি হয়েছে?"

"কাল রাত্রে জনকতক বন্ধু এসে পড়ল, রান্নার কিছুই ছিল না। তাই বাগানের কাঁচকলা দিয়ে রান্না করি। এ কি করে চুরী হল?"

আমি কষ্টে হাসি চেপে রেখে বললুম, "নিশ্চয়ই না। কলাগাছ তুমিই রুয়েছ, ফল নিশ্চয়ই তোমার।"

"না না, তা ঠিক নয়।"

কি বলব, বুঝতে পারলুম না, ভয়ে ভয়ে বললুম—"তা যদি ঠিক নয়, তা হলে পূজারীর কথাই ঠিক।"

"কিন্তু আমি কি নিজে কলা খেয়েছি? পূজারীর কথা ঠিক হবে কি করে? লোকে কি খাবে তার বাড়ীতে যায়? তারা এখানে আসে কেন?"

"বোধ হয় তারা যা চায়, তা এখানে পায় তাইতে আসে।"

"ঠিক, পূজারী বামুন হলেও ধর্ম্ম জানে না।"

বুড়া যে কেবল তার ধর্ম্ম রাখত, তা নয়, আমারও ধর্ম্ম রাখত। লোকে এসে ধর্ম্ম পালবার সুযোগ দিত, আমরা দয়া করিনি, দয়া তারা করত।

বোধ হয় বুড়া ঠিকই বলেছিল। কারণ যখনই বাগান দিয়ে যাই, তখনই তাকে মনে পড়ে। জানি না বাড়ীতে গিয়ে ধর্ম্ম সে কেমন রাখছে। যেমনই রাখুক, তেমন মানুষের মত মানুষ আর পাব কি?

—প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৮

যৌবনের ডাক

বসন্তের স্পর্শে ধরিত্রীর যৌবন-শ্রী যেমন করিয়া জাগিয়া উঠে, মানুষের জীবনেও ভূমার স্পর্শে তেমনি যৌবন জাগে। জীবনের পরিপূর্ণতা যৌবনে—এ কেবল দেহের শিরায় উপশিরায় উত্তপ্ত শোণিতস্রোতের পুলক চঞ্চলতা নয়। মানুষের মর্ম্ম যিনি বুঝেন, তিনি জানেন, বয়সের মাপকাঠি দিয়া যৌবনের পরিমাপ করিতে যে যায়, সে তার যথার্থ তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পায় না। দেহের যৌবন যতদিন না আসে, ততদিন অর্দ্ধস্ফুট চিত্তবৃত্তিগুলি লইয়া আমরা তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকি—কিন্তু দেহের স্ফূর্ত্তি যাহাকে উদ্বোধন করিয়া আনিয়াছে, সেই মনের যৌবনকে যে জীবনে অক্ষয় করিয়া রাখিতে না পারিল—তার মত দুর্ভাগা আর কে? চিরযৌবন মানুষের জন্মগত অধিকার—সেই তার যথার্থ আনন্দরূপ। যুগযুগান্তর কত বিবর্ত্তন সহিয়া গিয়াছে যেমন আমাদের এই শ্যামা মেদিনীর যৌবন শ্রী কোনও দিন ম্লান হইল না, মানুষের মধ্যেও এমনি করিয়া যেদিন যৌবন জাগিবে, সেই দিনই সে নিজকে চিনিতে পারিবে। কোন রহস্যময় শক্তির বশে প্রকৃতির এই চিরযৌবনের লীলা, সেইটুকু আবিষ্কার করিয়া তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া জীবন বীণায় আমাদের তার বাঁধিতে হইবে। অনিরুদ্ধ, অনাবিল আনন্দই জীবনের লক্ষ্য—তাই যৌবনের নিশানা—অন্তর্গূঢ় প্রাণশক্তির পরিচয়।

এই আনন্দ আমরা লাভ করিব কি করিয়া?—নিজকে সঙ্কুচিত, নিপীড়িত, সহস্র জালে বিজড়িত করিয়া নয়। যৌবন যে সঙ্কোচ মানে না, সে তো আমরা বুঝি, কিন্তু তবুও সংস্কার হইতে তো তাহাকে মুক্ত করিতে পারি না—জন্মজন্মান্তরের, যুগযুগান্তরের আবর্জ্জনা যে পাষাণের বাঁধের মত তাহার দিক্‌প্লাবী আনন্দস্রোতকে একটা সঙ্কীর্ণ খাতের মাঝে সঙ্কুচিত করিয়া আনে! এই সঙ্কোচ আমাদের সর্ব্বাগ্রে দূর করিতে হইবে—চিত্তে চিন্তায় স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে হইবে। প্রাণকে অবরুদ্ধ করিয়া স্বভাবকে আমরা এতদূর বিকৃত করিয়া তুলিয়াছি যে, বিদ্রোহ না করিয়া, বিপ্লব না ঘটাইয়া স্বাধীনতার সজীবতা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ইহাতে চিত্তের চেষ্টা কেবলই বহির্ম্মুখে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণশক্তির অপচয়ই ঘটাইতেছে। এই অপচয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে চিত্তের চারিদিকে আমাদিগের যেমন বৃহৎ পরিসর রচনা করা চাই, তেমনি অতর্কিত বিপদ হইতে যিনি ইহার চেষ্টাকে রক্ষা করিতে পারিবেন, এমন সাক্ষী পুরুষও চাই। এমনি সর্ব্বসাক্ষী, উদারদৃষ্টি সমাজ-পতির অভাবেই তো আজ আমাদের জাতির যৌবন হয় নিষ্প্রভ, নয় উচ্ছৃঙ্খল। সমাজ ধর্ম্মকে মানিয়াই এ দেশ আপনার বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে; সেই সমাজের স্তরে স্তরে যেখানে অসত্য, সঙ্কোচ ও নিরানন্দের আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, সেখানে তরুণের জীবন কি করিয়া ফুটিবে?

কেবল আপনার ভাবনা নয়—অনেকের ভাবনা ভাবিতে পারিলেই তবে আনন্দ। যৌবনের প্রথম উন্মেষে মানুষ যে কেবল আপনার ভাবনা লইয়াই বিব্রত থাকে, এ কথা যে বিশ্বাস করে, সে মানুষকে বুঝিতে পারে নাই। আপনাকে ছড়াইয়া দেওয়া—সবার

বুকে বিলাইয়া দেওয়া—এ কেবল তরুণ জীবনেই সম্ভব। নিজের মাঝে আনন্দের সঞ্চয় যখন অফুরন্ত, তখন নিজকে না ছড়াইয়া দিয়া কি স্বস্তি মিলে? যৌবনের অস্বস্তিতেও এই আত্মপ্রসারণের আকাঙ্ক্ষা; ইহার মর্ম্মকথাটী বুঝিয়া ঠিক পথে ইহাকে চালাইতে পারিলে যৌবনও যেমন তৃপ্ত হইবে, বিশ্বের আনন্দভাণ্ডারের সঞ্চয়ও তেমনি বাড়িয়া যাইবে। যে ত্যাগ আর তপস্যার শক্তিতে জগৎ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা যৌবনের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধনা কিছুই নয়। যৌবনের সম্পদ আছে বলিয়াই সে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে—সুখ তাহার পক্ষে অনায়াস বলিয়াই দুঃখ সহিতে সে ভয় পায় না। যৌবনের এ গুণ যে আছে, সে কি আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি না? যাঁহারা যৌবনের সীমা পার হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও কি অতীত জীবনের স্মৃতিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিয়া এই সত্যেরই সাক্ষাৎ পান না? প্রকৃতি মানুষকে জন্ম দিয়াছে, তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য; কিন্তু মানুষের মাঝে স্বাতন্ত্র্যের বীজ রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই ফুটাইয়া তুলিবার ভার অনেকটা তাহার নিজের ঘাড়েই আসিয়া পড়ে। এই কথাটী স্মরণ করিয়া এবং প্রকৃতির লীলার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের যৌবন উচ্ছ্বাসকে যদি আমরা নিয়মিত করিতে পারিতাম—তবে বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইতেন।

উদার দৃষ্টি আজ চাই-ই। আজ জগতের এমন সঙ্কটকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, একের দুঃখে অপরের চুপ করিয়া থাকিলে আর চলিবে না। মানুষমাত্রেই যে মানুষের পরম আত্মীয়—এই ...ও এবং আদিম সত্যটী আমাদিগকে আজ অনুভব করিতে হইবে। জাতিতে জাতিতে বিরোধের সংঘর্ষ কর্কশ হউক না কেন, প্রত্যেক জাতির প্রাণকেন্দ্রে যে সার্ব্বজাতিক মিলনের জন্য বিপুল বেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহামানবের মিলনক্ষেত্র আজ হয়ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কিন্তু এই স্বপ্ন যে একদিন সফল হইবেই সমগ্র মানবজাতির পরিণতি যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে, তাহা তো আজ আমরা চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অতীতে যদি কোনও জাতি কোনও বিশিষ্ট জীবনধারার অনুবর্ত্তন করিয়া মহাসত্য লাভ করিয়া থাকে, তবে আজ তাহার সার্ব্বভৌম সার্থকতা সুস্পষ্ট হইবার দিন আসিয়াছে। বিরোধের বিষদাঁত ভাঙিয়া গিয়াছে; তাহার আস্ফালনকে অবজ্ঞায় ফিরাইয়া দিতে পারে, এমন শান্তবীর্য্য মনুষ্যত্ব মাঝে আজ জাগিয়াছে। পার্থসারথির ধর্ম্মবাক্যের কল্পনা, খ্রীষ্টের মিথ্যা হইবার নয়।

এই তো সত্যের বিরাট্ মূর্ত্তি আমাদের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে; ইহার পায়ে অর্ঘ্য বহন করিয়া লইবার জন্য কি আজ দেশে দেশে যৌবনের ডাক পড়িবে না? কালাকালের বিচার নাই, পাত্রাপাত্রের বাছাই নাই —চিত্ত যার উন্মুক্ত, সঙ্কল্প যার অটুট বীর্য্য যার উদ্দীপ্ত, তাহাকেই আজ জাগিতে হইবে —একটী প্রাণের প্রদীপে সহস্র প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। এখনো অন্ধকারের ঘোর কাটে নাই—এখনো চারিদিকে নিশাচর পাশব শক্তির উন্মত্ত চেষ্টা দেখিতে পাইবে কখনো বা অত্যাচারীর কখনো বা অত্যাচারিতের বক্ষ বিলোড়ন

করিয়া তাহা গর্জ্জিয়া উঠিবে; কিন্তু তবুও বিশ্বাস করিতে হইবে, উষার পূর্ব্বরাগের আর বিলম্ব নাই—আলোর দূত এই আসিল বলিয়া; শুধু নিষ্ঠাপূত বীর্য্যে জগতের সকলের দুঃখ বুক পাতিয়া তুলিয়া লও অক্রোধের দ্বারা ক্রোধের জয় হইবে—প্রেমে বিরোধের শান্তি হইবে।

যুগার্জ্জিত মিথ্যা সংস্কারের বশে শুধু আপনার সুখ-শান্তির কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিও না—যে যৌবন তোমার মাঝে তপস্যায় সার্থক হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে আজ জাগাইয়া তোল। কর্ম্মের শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে আয়োজনের অভাব হইবে না। ভাব যদি চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে তাহাই পথের সন্ধান বলিয়া দিবে। ভাবের অভাবেই আজ আমাদের নিপুণ কর্ম্ম শক্তি পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। নহিলে মানুষ হইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বিশ্বরাজ যে স্বহস্তে তাহার কপালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছেন তার কাছে আবার বাধা কি, বিপত্তি কি? যদি ভাবের আগুনে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তিকে সে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে, তবে আয়োজনের আর উপকরণের অভাবে তাহার শক্তি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? আর কিছু পার আর না পার, অন্ততঃ অন্তরকে প্রসারিত করিতে শিখ, একের ভাবনায় দশের ভাবনা আনিয়া জুড়িয়া দাও—ক্রমে সমস্ত বিশ্বের প্রাণ তোমার মাঝে জাগিয়া উঠিবে—তখন দেখিতে পাইবে, যৌবনের আবেগ কোন পথ ধরিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চায়—কি তার আশা, কি তার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষের দিব্যদৃষ্টিতেই তাহা একদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই সত্যকে আজ আমাদের জীবন দিয়া সার্থক করিতে হইবে। নিজেকে সমস্ত ছোঁয়াচ হইতে আগলাইয়া রাখিবার চেষ্টার মাঝে যে সত্য ছিল, তাহার সার্থকতা এতদিনে ঘটিয়াছে—ভারতবর্ষের তপোলব্ধ সত্যে বিশ্বের যে প্রয়োজন ছিল, আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখন এই অমৃত বাঁটিয়া দিবার ভার যদি ভারতবর্ষ মাথা তুলিয়া না নেয়, তবে কিসের জন্য এত সঙ্কটে বিধাতা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন! তাহার অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ আজ তপস্বী ভারতের কাছে মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে—ইহাকেই সফল করিবার জন্য জীবন যৌবন তাহাকে সঁপিয়া দিতে হইবে।

নববর্ষের অরুণ প্রভাতে দিকে দিকে যে আনন্দের হাস ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আনন্দে তরুণের করুণ হৃদয়গুলি অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বের কর্ম্মভারকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যত বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন—অসীম ধৈর্য্যে অমিত বীর্য্যে তাহা লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে। এই জন্য চাই চরিত্রের অটুট বল, আর অজড় প্রাণের পরিপূর্ণ সঞ্চয়—যে প্রাণ কিছুরই কাছে নত হইবে না—মানুষের কাছে না—সমাজের কাছে না রাষ্ট্রের কাছে না। কর্ম্মের সঙ্গে থাকিবে জ্ঞান—জ্ঞানের আলোকেই কর্ম্ম পথের আঁধার দূর হইয়া যাইবে এই জ্ঞানের দীপশিখাটী উজ্জ্বল রাখিয়া ছুটিতে হইবে বিশ্বের পানে—দীপ্ত বহ্নিশিখার মত—একের প্রাণের আগুনের সহস্রের প্রাণে আগুন জ্বালাইয়া তুলিতে।

নবজীবনের বোধনদিনে এই আহ্বান আসিয়া যৌবনের কাণে বাজিয়া উঠিল। মূঢ় মমতায়, বীর্য্যহীন প্রেমমত্ততায় সে কি ইহাকে ফিরাইয়া দিবে?

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য দর্পণ



(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৫শ বর্ষ } **জ্যৈষ্ঠ** { ২য় সংখ্যা

দেবজ্যোতিঃ

[ঋগ্বেদসংহিতা ১।১১৫।১]

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আ প্রা দ্যাবা পৃথিবীঅন্তরীক্ষং
সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং
মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি
বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্॥

তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং
মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সংজভার।
যদেতদ্ অযুক্ত হরিতঃ সধস্থাৎ
রাত্রির্বাসস্তনুতে সিমস্মৈ॥

তন্মিত্রাবরুণস্যাভিচক্ষে
সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ
কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি॥

একি হেরি অপরূপ!—ফোটে ওই পুষ্পিত-কিরণ
মিত্র অগ্নি বরুণের দীপ্তি-ভরা উদার নয়ন!
দ্যাবা পৃথ্বী অন্তরীক্ষ পূর্ণ করি—বিশ্ব বিথারিয়া
আত্মরূপী সবিতার দিব্যজ্যোতিঃ উঠে হিল্লোলিয়া!

আসে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়ী পুণ্যরুচি উষারে চাহিয়া—
প্রিয়ারে খুঁজিয়া যেন প্রণয়ীর উচ্ছ্বসিত হিয়া।
মর্ত্ত্য যেথা যুগ-বাহু তোলে আঁখি দেবতার পানে
সবিতার আশীর্ব্বাদ নামে সেথা নিত্য সুকল্যাণে!

এই তাঁর দেবলীলা—সবিতার এই তো মহিমা—
সংহরিয়া দীপ্তি তাঁর কর্ম্মমাঝে রচিলেন সীমা;—
মুক্ত হ'ল রথ হতে অশ্ব তাঁর বিচিত্র বরণ—
ঢাকে বিশ্ব রাত্রি ওই বিস্তারিয়া মায়া-আবরণ!

অন্তরীক্ষ মাঝে যেথা সবিতার ফোটে চিত্র কায়া,
মিত্র আর বরুণের আঁখিকোলে নাচে নব মায়া।—
দিব্য দ্যুতি অশ্ব তাঁর বিশ্ব হতে সংহরিল কালো—
ব্যাপ্ত করি চরাচর উদ্ভাসিত অন্তহীন আলো!



ঈশা বাস্যম্

প্রদীপের সমস্ত রশ্মি যেমন দীপকলিকায় সংহত, আমাদের জীবনও তেমনি একটা ভাবের গ্রন্থিতে বাঁধা। প্রকৃতির বন্ধন যে মুহূর্ত্ত হইতে শিথিল হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনের এই কেন্দ্রবিন্দুটী সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা জানিয়াও জানিতেছি না, পূর্ব্বতন সংস্কারের শাসন মানিয়া এলোমেলোভাবে নিজকে ছড়াইয়া দেওয়াই সহজ মনে করিতেছি। কিন্তু এ পথে চলিয়া আমাদের শান্তি নাই, কেননা জীবনের মর্ম্মগত সত্তাটী যেখানে অহরহঃ বাহিরে প্রকাশ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাহার চেষ্টাকে মূঢ়তায় লঙ্ঘন করিয়া গেলে তাহার শাস্তি পাইতেই হইবে। এই জন্যই দেখি, বৈচিত্র্যের মাঝেও এককে খুঁজিয়াই আমরা তৃপ্তি পাই। আকর্ষণের মাঝেও বিকর্ষণ আছে বলিয়া গ্রহমণ্ডল যেমন কেবলই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়, মন্ত্রের টানে কাছে যাইতে চাহিয়াও যাইতে পায় না, অথচ ছাড়িয়া যাইতেও নাড়ীতে বাধে, আমরাও তেমনি আপনার অজ্ঞাতে একটা কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া ফিরিতেছি—কবে যে প্রলয়ের মত আকর্ষণ আসিয়া সমস্ত দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় তপস্যা করিতেছি।

কিন্তু অজানার অন্তরালে যাহা হইতেছে, তাহাকে জাগ্রৎ জীবনের অনুভূতির সঙ্গে ব্যাপ্ত করিয়া জানাতেই তপস্যার সার্থকতা। জ্ঞানকেও এমনি করিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। যে কর্ম্মশক্তি উচ্ছৃঙ্খল অনিরূপিত চেষ্টার মাঝে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ফিরিতেছে অথবা ক্ষুদ্রপ্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তির ইন্ধনরূপে বিরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, একটা ভাবের বন্ধন দিয়া যদি তাহার অনিয়মকে আমরা নিয়ন্ত্রিত না করি, তাহা হইলে জীবনের ভার কেবলই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। আবার এই নিয়ন্ত্রণের মাঝেও বাস্তব জগতের কোনও বিশিষ্ট লক্ষ্য থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। যে কর্ম্মের ফল কেবল সংসারটাকেই বড় করিয়া দেখিবে, তাহা যত সুশৃঙ্খলতাতেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, জীবনের সমস্ত নিগূঢ় শক্তির পরিচয় তাহাতে মিলিবে না। নিয়মের সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির যখন যোগ হইবে, সংসারনিরপেক্ষ হইয়া অধ্যাত্ম দৃষ্টির সহায়তায় প্রতি কর্ম্মের মূল প্রয়োজক নিমিত্তগুলিকে যখন আমরা আয়ত্ত করিতে শিখিব, কর্ম্ম তখনই অনায়াস ও বিশুদ্ধ হইয়া দেখা দিবে। প্রতিদিন মূঢ়ভাবে আমরা যাহা করি, তাহা বিশেষ করিয়া আমাদেরই সৃষ্টি বলিয়া আমরা জানি; তাই তাহার ভালমন্দের সমস্ত দায়িত্ব আমাদিগকেই বহন করিতে হয়। অথচ এত করিয়াও আপনার ফলাভিসন্ধির অনুযায়ী কর্ম্মকে আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি না। ইহাতেই দেখি, যাহা হইবার, অদৃষ্ট শক্তির নিয়ন্ত্রণে তাহা অপ্রতিহতভাবে হইবেই, অথচ আমাদের মিথ্যা কর্তৃত্বের অতিরিক্ত ভাবটুকু তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া আমরা আনন্দকেই শুধু খর্ব্ব করিতেছি, কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে তো পারিতেছি না। বিচারে যদি এইটুকু বুঝিতে পারি, তবেই আত্মকর্তৃত্বের সঙ্কীর্ণ পন্থা ছাড়িয়া দিয়া ফলভাবহীন কর্ম্মের সাধনায় আনন্দের নির্ব্বাধ ঔদার্য্য জীবনে অনুভব করিবার জন্য

একটা ব্যগ্রতা জাগে।

কিন্তু শুধু ব্যগ্রতা দিয়াই সব সময়ে যাহা চাই, তাহা আমরা পাই না। অলক্ষিতে যে সংস্কারের বোঝা সঞ্চয় করিয়াছি, চলিবার সময় তাহা পিছন পানে টানিয়া রাখিবার চেষ্টাই করিবে। সত্যসাধনায় এইজন্য সংগ্রাম অনিবার্য্য। এই সংগ্রাম অভাবে করিলে চলিবে না, জাগিয়া থাকিয়া যদি শত্রুকে আঘাত করিতে পারি, তবেই তাহার আঘাত সহিবার বীর্য্যও পাইব; কিন্তু অন্ধচেষ্টার সংগ্রামে অতর্কিতে যে আঘাত আসিয়া পড়ে, তাহা বীর্য্যকে সুদৃঢ় করে না, কিন্তু তাহাকে ক্ষতি বলিয়া জানিয়াই মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইতে থাকে। নির্বীর্য্যতার এই দুঃসহ ক্ষতিকে পরাজয় করিবার জন্য অত্যন্ত সচেতন হইয়াই আমাদিগকে সংসারের ভার বহন করিতে হইবে। নিভৃতক্ষণের বিচারে যে সত্যকে পরমার্থ বলিয়া জানিয়াছি, অহরহ মনন দ্বারা তাহার দীপ্তিকে চিত্তে অম্লান করিয়া রাখিতে হইবে—কর্ম্মের নব নব আবর্ত্তে সেই সত্যকে নূতন নূতন বিরোধের মাঝে জয়ী করিয়া তাহার তাৎপর্য্যকে আরও ব্যাপক করিয়া বুঝিতে হইবে। সত্যের ধারণা যতই গভীর, যতই ব্যাপক হইতে থাকিবে, ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লাভক্ষতির পীড়ন হইতেও আমরা ততই বাঁচিয়া যাইব।

এই সত্যের একটী রূপ—প্রত্যেক বস্তুকেই তাহার যথার্থ স্থানে রাখিয়া দেখিতে শিখা। আমাদের সংসারদৃষ্টি মিথ্যা, কেননা তাহা অবিচারে দেখা। এই দেখার মাঝে কি করিয়া যে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া দেখা যায়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে—তাহা আমাদের খেয়ালে আসে না; কিন্তু অসামঞ্জস্যের পীড়া তবুও তো ভোগ করিতে হয়। এই অস্বস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া পরখ করিয়া তবে আমাদের পথ চলিতে হইবে। পূর্ব্ব সংস্কারের সমস্ত গলদ দূরে ফেলিয়া নূতন দৃষ্টি লইয়া দেখিতে হইবে, আমাদের নিত্যকার জীবনে কোন বস্তুটার যথার্থ গুরুত্ব কতটুকু। জীবনকে প্রয়োজনের সামিলে আনিয়াছি বলিয়াই নানাদিক দিয়া তাহাকে আমরা খাট করিয়াছি এবং তাহারই ক্ষুদ্রতার অনুপাতে পরমার্থদৃষ্টিতে যাহা ক্ষুদ্র হইত, তাহাকেই বৃহৎ করিয়া তুলিতেছি। এই প্রয়োজনের তাগিদটা আগে জীবন হইতে দূর করিতে হইবে। জীবন হইবে অনায়াস, লঘুগতি—আনন্দের রসে রাঙিয়া সুখদুঃখকে সহজে তাহা লঙ্ঘন করিয়া চলিবে। কিন্তু এই সহজতাটুকু পাইতে হইলে কর্তৃত্বের বন্ধন আগে শিথিল করিতে হয়। আপাত প্রয়োজনে কর্ত্তা আমির অংশটা যত বড় হইয়াই দেখা দিক্ না কেন, আনন্দের পথের পাথেয় হিসাবে উহার কোন মূল্যই নাই। যদি কর্ম্মচক্রের মেরু হইতে আমাকে সরাইয়া লইতে পারি, তবে দুইটী সত্য প্রত্যক্ষ করিব। প্রথমতঃ দেখিব, আমার কর্তৃত্বে কর্ম্মের নিমিত্তে যে সংকীর্ণতা ছিল, তাহা দূর হইয়া গিয়াছে—ক্ষুদ্র ইচ্ছার বুদ্বুদ মহা ইচ্ছার সমুদ্রে মিলাইয়া গিয়াছে—কর্ম্মের নিমিত্ত সর্ব্বতোব্যাপী উদার হইয়া দেখা দিয়াছে। আবার দেখিব, কর্ম্মের যে উপাদানগুলিকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলাম, তাহারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইয়া চঞ্চল ছায়ানৃত্যের মত চক্ষের সম্মুখে নাচিয়া বেড়াইতেছে—প্রয়োজনের গরজে অচল অটল হইয়া জগতের বুক তাহারা চাপিয়া বসে নাই! কর্ম্মচক্রের এই তো সত্যরূপ।

কর্ম্মের কেন্দ্র হইতে আমার আমিত্বকে যদি সরাইয়া লই অথচ নিত্য মননশীল আমিকে যদি সমস্ত কর্ম্মের আবর্ত্তের মাঝেই জাগাইয়া রাখি, তাহা হইলেই কর্ম্মের উপনিষদ জীবনে সত্য হইয়া উঠিবে। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টির সঙ্কীর্ণ পরিধি যাহাকে বেড়িয়া ধরে, তাহাকেই ধ্রুব বলিয়া কল্পনা করে; তাই প্রতিদিনের জীবনের হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া দেখি স্বাতন্ত্র্যের ছাপ প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা কর্ম্মের উপর এমন স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্ত্তমান-ভূত ভবিষ্যতের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া অনাদি কালের নীর স্রোতে যে আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি, তাহা আর মনে পড়ে না। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা অংশ এমনি নিষ্ঠুর ভাবে বিশ্লিষ্ট যে, তাহার একের সঙ্গে অপরের যোগ ঘটাইয়া সমগ্রের তাৎপর্য্যটুকু গ্রহণ করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু আসলে জীবন তো এমনি নিথর কঠিন নয়; "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—যা কিছু জগতীতে আছে, তার সবই যে জঙ্গম—স্থাবর শুধু আমাদের এই অভিমানটাই। ইহাকে সঙ্গে জুড়িয়া দিই বলিয়াই জঙ্গম জগৎকে আমরা স্থাবর করিয়া তুলি; আপনার অনায়াস লঘুগতিতে সমস্ত বৈচিত্র্যের মাঝে আনন্দ ছড়াইয়া যাহা চলিয়া যাইত, তাহাকে পঙ্গু করিয়া কাঁধের বোঝা করিয়া রাখি; ইহাতে আমরাও যেমন স্থবির হইয়া স্থাণুর মত হইয়া পড়ি, আমাদের সৃষ্ট জগৎও তেমনি অচল হইয়া নিরানন্দ হইয়া উঠে।

তাই কর্ম্মের প্রথম পর্ব্বেই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, "যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—অভিমান দিয়া কাহাকেও বেড়িয়া রাখা যায় না—যা কিছু আছে জগতে, তার সকলই চলিষ্ণু। এই যে অনন্ত, অবিরাম প্রবাহ, ইহার মাঝে আমার স্থান কোথায়?—সে কি সমগ্রের অণুপরমাণুগুলিকেই আপনার সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি দিয়া আঁকড়িয়া রহিবে? এই বাসনার কৃচ্ছ্র বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সমগ্রের মাঝে যে অখণ্ড রসের অনুভূতি তাহাকেই জাগ্রৎ করিয়া তুলিবে না? খণ্ডকে আমরা খণ্ড বলিয়াই স্বীকার করিব, কিন্তু তাহার মাঝে যে উদ্দাম প্রাণাবেগ, তাহাকেও প্রত্যক্ষ করিতে শিখিব; আমরা জানি, প্রতিদিনের যে মুহূর্ত্তগুলি সুখ দুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লইয়া চঞ্চল চরণে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও যদি আমার বলিয়া মমতায় আঁকড়িয়া ধরি, তবে প্রাণকে রুদ্ধ করিয়া মরণকেই ঘরে ডাকিয়া আনিব। তাই আমরা বলি জগৎ জগৎই থাকুক—বহিয়া যাওয়ার যে স্বাধীনতা তাহার রহিয়াছে, তাহাকে অব্যাহত রাখিয়াই তাহার সুখে-দুঃখে, বিচিত্র আনন্দ-প্রবাহে আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িব!

কিন্তু তবুও এই চলার তাৎপর্য্য যেটুকু, তাহাকে ভুলিলে চলিবে না। অভিমানের যখন প্রত্যাহার করিলাম, তখন জগতের এই চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি কোন সূত্রে গাঁথিয়া লইব?—"ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্ব্বং"—যিনি ঈশ, তাঁহাকে দিয়া এই যাহা কিছু সমস্তই আচ্ছাদন করিতে হইবে। এই যে জগতের গতিচঞ্চলতা ইহা তাঁহারই ঈশিত্ব দ্বারা বিধৃত, তিনি ইহার সর্ব্বময় প্রভু। জগতের জঙ্গমতা যেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তাঁহার ঈশিত্বকেও তেমনি স্বীকার করিতে হইবে—শুধু স্বীকার নয়, কর্ম্মের প্রতি পর্ব্বে পর্ব্বে তাহার মনন করিতে হইবে। একটা কিছু অবলম্বন চাই; কিন্তু অভিমানকে অবলম্বন করা চলে

না—কেননা লীলার আনন্দ তাহাতে ব্যাহত হইয়া পড়ে। তাই শুধু একাংশকে নয়, সমস্তকে আচ্ছাদন করা যায় যে বিরাট সত্তা দিয়া, তাঁহাকেই কর্ম্মশৃঙ্খলার প্রতি গ্রন্থিতে অনুভব করিতে হইবে। "ইদং সর্ব্বং" একদিকে, আর ঈশ একদিকে; সর্ব্বের তাৎপর্য্য তাঁহার ঈশিত্বে। দ্বন্দ্ব প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের মাঝে চলিতেছে - মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃতি তাল ঠুকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে;—এই সমস্ত দ্বন্দ্বের মাঝে "ঈশা বাস্যম্" এই উপনিষদটীকে জপমালার মত বহন করিতে হইবে, ইহারই মননে অভিমানের কলুষ দূর করিতে হইবে। জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসে স্মরণ করিতে হইবে—"আমি নই—তিনি;" অভিমানের রায়ে যাহা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহারও সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঈশা দ্বারা ভূমা দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিতে হইবে; সেখানেও অভিমানের ক্ষুদ্র বিচার নাই, আছে শুধু তাঁহারই মহত্ব; তাঁহারই ঈশিত্ব, তাঁহারই সংযোগে ক্ষুদ্রও মহৎ হইয়া দেখা দেয়। তিনি ঈশ—তিনি ঋতস্বরূপ; সত্যে তিনি যেমন অটল, প্রাণনে তেমনি তিনি চিরচঞ্চল। চিরচঞ্চলের মাঝেও সত্যের অটল প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাই কর্ম্মসূত্রের তিনিই নিয়ন্তা - তিনিই ঈশ। কেবল জগতের ঘাত প্রতিঘাতেই যে এই ঈশকে স্বীকার করিব, তাহা নহে—আমাদের অন্তরেও তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—সেই প্রতিষ্ঠাই হইবে সত্য দৃষ্টি। জগৎ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্তরের দিকে চাহিলেও দেখি, সেখানে যে সঙ্কল্প-বিকল্প, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ব্যাকুল তাড়না চলিয়াছে—সেখানেও তো তাঁহারই প্রভুত্ব। অন্তরেও তিনি নিয়ন্তা বলিয়া অভিমান সেখানে মর্ম্মাহত, দীনতা লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্রতা পরাজিত, কর্ম্মচেষ্টা প্রশান্ত। একটীর পর একটী করিয়া কত তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে কে—আমার অভিমান? সে যদি নিয়ন্তা হইত, তবে আবার তাহাকে দুঃখ পাইতে হয় কেন? তাই মিথ্যা কর্তৃত্বের আসন হইতে তাহাকে চ্যুত করিয়া বহির্জগতের যিনি একমাত্র ঈশিতা, তাঁহাকেই অন্তর্জগতের সিংহাসনেও অভিষিক্ত করিয়া লইতে হইবে—অন্তরের বিক্ষোভের দিকে চাহিয়াও বলিতে হইবে—"ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্ব্বম্।" এই উপনিষদকে কেন্দ্র করিয়াই অন্তরে বাহিরে কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি—এখানে কর্ম্ম করিয়াই আমাদিগকে তাঁহার লীলারসিক হইতে হইবে। তাই যে আবর্ত্তের মাঝে জীবন উল্লসিত হইয়া উঠিবে, তাহার আনন্দবাঞ্জনা টানিয়া তুলিতে হইবে—যিনি অধিষ্ঠাতা, তাঁহারই মহিমাকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া। সমস্ত গতিশক্তি নিরুদ্ধ করিয়া কেবল স্থাণুত্বের সাধনা আজ নয়, আজ এই উদার ধরিত্রীর কোলে সমস্ত প্রাণটুকু লুটাইয়া দিয়া আমাদিগকে সত্যের সন্ধান করিতে হইবে—এইখানেই চলিতে হইবে, বলিতে হইবে, প্রাণে প্রাণে বিদ্যুতের স্পর্শ ঢালিয়া দিতে হইবে;—কিন্তু তাহারও তো একটা পথ চাই। কেবল অন্ধের মত দিশাহারা হইয়া ছুটিলে হইবে না—এই ক্ষুদ্র জীবনের পরিধির মাঝে বিশ্বরাজকে নামাইয়া আনিতে হইবে—তাঁহারই মহিমায় নিজকে লুপ্ত করিয়া দিয়া, তাঁহারই আলোতে তাঁহারই প্রেরণায়, আমরা তাঁহার পথেই ছুটিব। আমাদের কর্ম্ম কোথায় কোন লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছে, তাহার স্মৃতি যে পর্য্যন্ত মুছিয়া না যাইবে,

যে পর্য্যন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় রচা সকল সীমার বাঁধন টুটিয়া না যাইবে—সে পর্য্যন্ত কোথায় শান্তি, কোথায় আনন্দ? বাহিরের চোখ দুটাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট পথেই যদি আমরা চলি, তবে দূর দূরান্তরের গহন রহস্যের মাঝে আলো ফেলিয়া আনন্দকে চিনিয়া লইবার অন্তর্দৃষ্টি হইতে যে বঞ্চিত হইব।

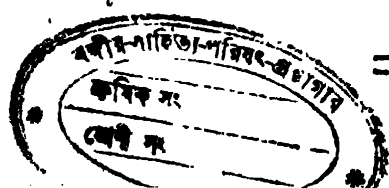
জীবনের যে দায়, তাহা মিটাইতেই হইবে, পাশ কাটিয়া তাহাকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? কিন্তু কি করিয়া এ দায় মিটিবে?—অভিমানের পঙ্কিল ভোগ দ্বারা নয়—অন্তরের সুনির্ম্মল ত্যাগ দ্বারা। আনন্দ যে দিকে দিকে ছড়ান রহিয়াছে—নিজকে বিক্ত করিয়া তবে না আমরা তাহাকে হৃদয় পূরিয়া গ্রহণ করিতে পারিব। তাই আনন্দের জগতে যে স্বচ্ছন্দবিহার করিতে চায়, তাহার উপর এই আদেশ—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—সেই ত্যাগ দ্বারাই ভোগ করিবে। আগে ত্যাগের প্রতিষ্ঠা, তবেই জীবনে ভোগ নিরূপিত হইবে। জীবনে ত্যাগের স্বরূপ কি?—সে তো সর্ব্বশূন্যতা নয়। বাসনার ত্যাগ, অভিমানের ত্যাগই তো যথার্থ ত্যাগ। জগতে বিচরণ করিতে হইলেই উপকরণের সংস্পর্শ ঘটিবে; কিন্তু সেই উপকরণের উপর অভিমানসঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়ার্থ-তাৎপর্য্যের যে আরোপ করে, তাহারই জীবন পঙ্কিল ভোগে কলুষিত হইয়া উঠে জগৎ শৃঙ্খলার মাঝে ঐশিক সত্তাকে সে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই দুর্দ্দৈব হইতে আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্মের পথে চলিতে চলিতে যাহা কিছুর সংস্পর্শ পাইব, তাহাকেই জানিব—"তেন ত্যক্তং"—ইহা তাঁহার প্রসাদ। এই প্রসাদের সর্ব্বত্র তিনি আনন্দগূঢ় হইয়া আবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ অবস্থা হইতে ইহা ত্যক্ত বা চ্যুত হইয়াছে একটা আনন্দস্ফুলিঙ্গের মত—পরিচ্ছিন্ন জগতে তাঁহারই আনন্দলীলাকে উৎসারিত করিবার জন্য। তাঁহার ত্যক্ত এমনি কণা কণা আনন্দে এ জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে—আপনার ক্ষুদ্রত্বকে ত্যাগ করিয়া তবে আমরা তাহা ভোগ করিবার অধিকার পাইব। আমার ত্যাগ দ্বারা তাঁহার ত্যাগকে গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই জীবনে মাধুর্য্য উছলিয়া উঠিবে।

মননের দ্বারা শিখিয়াছি—যিনি ঈশ, তাঁহারই মহিমা দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। অন্তরের ইহাই ভাবব্যূঢ় অবস্থা, ইহার উপরেই এখন কর্ম্মের বংফলাইতে হইবে। যে ভাবে আমরা নিজকে জগতের উপর ছড়াইয়া দিই, তাহা আমাদের জানার ভঙ্গী—তাহাই মনন লব্ধ জ্ঞান—"ঈশাবাস্যম্"; আবার যে ভাবে জগৎকে আমাদের মাঝে ফিরিয়া পাই, তাহাই তাহার আনন্দ রূপ—কর্ম্মের তাহাই সঞ্চারক শক্তি—তাহার মন্ত্রকথা "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" ওতপ্রোত হইয়া এই দুইটী তত্ত্ব জীবনের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে—মানস জগতে আর জাগ্রৎ জগতে অবিরাম মননের দ্বারা এবং অবিরাম কর্ম্মের দ্বারা এই দুইটী তত্ত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। নির্ব্বিকার প্রশান্তিতে আমরা জানিব—তিনিই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; আবার কর্ম্মজগতের নিত্য-চলিষ্ণু প্রাণস্পন্দনের মাঝে পাইব—তাঁহার ত্যাগের দ্বারা এবং আমার ত্যাগের দ্বারাই আনন্দের প্রতিষ্ঠা।

কোথায় এই সত্য সাধনার আরম্ভ?—আসক্তি যেখানে লোলরসনা হইয়া জগৎকে গ্রাস করিতে চায়, সেখানেই প্রথম সত্যের

শাসন দিয়া কঠিন আঘাত করিতে হইবে। "মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্"—গৃধ্রের মত কাহারও ধনের উপর ঝাঁপাইয়া পাড়ও না। সত্য সাধনার প্রথম পাঠ বলিয়া এই উপনিষদ্ কেবল ব্যক্তির জীবনে নয়, জাতির জীবনেও প্রযোজ্য বটে। সাম্রাজ্যলিপ্সা আজ সমস্ত জগতে যে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তীব্র দাহ হইতে বুঝি কেহই রক্ষা পাইবে না। এই তো গৃধ্রনীতি—যাহা মৃত, যাহা পূতি, তাহাকে লইয়াই এই কাড়াকাড়ি, এই উন্মত্ত আস্ফালন;—এত উঁচুতে উঠিয়াও সেই ভাগাড়ের দিকে দৃষ্টি। অমৃতের অধিকার মানুষ এমনি করিয়া পদদলিত করিয়া করিয়া যায় বটে।

এই বৈশ্য-বুদ্ধি ধীরে ধীরে আমাদের মাঝেও ছড়াইয়া পড়িতেছে—আধ্যাত্মিকতার ছদ্ম আবরণের নীচে বুঝি কুৎসিত ভোগের গলিত শবদেহ উঁকি মারিতেছে। আমাদের শক্তি নাই, তাই নির্লজ্জের মত চাহিতে পারি না, কিন্তু বুভুক্ষুর লালসা-বিলোল দৃষ্টি লুকাইবে কোথায়? মৃত সমাজে যে স্পন্দন দেখা দিয়াছে, সে কি প্রাণদেবতার জাগরণ না অপদেবতার? কিন্তু তবু নিরাশ হইলে চলিবে না—অমৃতের সাধনা করিতেই হইবে, কেননা তাহাই আমাদের জন্মগত অধিকার। তবে আজ অন্তরকে চিনিয়া লইবার জন্য তীব্র সত্য দৃষ্টি চাই;—যাহা দুর্লক্ষণ, স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইলে চলিবে না; তেমনি যেটুকু ভাল, তাহাকেও সংশয়ের চোখে দেখিলে চলিবে না। এখনও বহু পথ বাকী। শূদ্রসুলভ তামসিকতাকে আঘাত করিতে না করিতেই বৈশ্যবৃত্তি আমাদের মাঝে মাথা কাড়িয়া উঠিতেছে—সমাজের মৃতদেহের উপর গৃধ্রের দল ঝাঁপাইয়া পাড়তেছে। ইহাকেও যদি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, তবুও সংগ্রাম শেষ হইবে না—তারপর ক্ষত্রিয়ের জিগীষাবৃত্তির সঙ্গে লড়িতে হইবে; নব নব সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছা, কর্ম্মশক্তির উদ্দাম চঞ্চলতা, ফলাভিসন্ধি—এই সমস্ত রাজসিক বিক্ষোভ হইতেও বাঁচিতে হইবে। ইহাকেও অতিক্রম করিলে তবে ব্রাহ্মণ্য সম্পদ; অমৃতের অধিকার—প্রশান্তিতে, পরিব্যাপ্তিতে। এক একটা স্তর উঠিয়া প্রশান্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলে তবে আমাদের বিবর্ত্তনের সমাপ্ত হইবে—গুণত্রয়ের শক্তি নিরুদ্ধ হইবে না, বহুজনহিতায় তাহা আয়ত্ত হইবে। এই সাধনার পথে তিনটি উপনিষদ আমাদের অবলম্বন। প্রথমতঃ "মা গৃধঃ"—তারপর "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—চরমে "ঈশা বাস্যম্" চাই সংযম, ত্যাগ ও পরিব্যাপ্তি। যে মোহে দুই চক্ষু ধাঁধিয়া রহিয়াছে, যাহার উগ্র তাড়নায় সমস্ত জগৎটা মুখে পূরিয়াও আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে চাহে না—সংযমের বজ্রাগ্নিতে আগে তাহারই প্রলয় ঘটাইতে হইবে। তারপরে, সংযত চিত্তের সহজ ত্যাগের মহিমাতে কর্ম্মের মাঝে আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিবে। এই আনন্দের সঞ্চয়ে নিজকে রিক্ত করিতে করিতে জীবন অনায়াসে বহিয়া চলিবে—অন্তরের সকল আঁধার ঘুচিয়া আমিত্বের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া যাইবে—অন্তরে বাহিরে শুধু জাগিবেন তিনিই। এ জগৎ তাঁহারই জগৎ—এ কর্ম্মও তাঁহারই।



কালীয় দমন

যে নিজকে জেনেছে, তার আর জগতে চাইবার রইল কি? সাত রাজার ধনেও এমন কিছু নাই, সমস্ত বিশ্বেও এমন কিছু নাই—যাতে তার মন বাঁধা পড়তে পারে। জগতের সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারের দিকেও সে ফিরে তাকায় না—বিশ্ববুদ্ধির দৌলতেও তার মন ভোলে না। আহা কি আনন্দ! এই তো আনন্দের চরম, আনন্দের পরিপূর্ণতা! ভাষায় কি এ ভাব ফোটে? এ বস্তু বাক্যকে ছাড়িয়ে উঠেছে, এর আর বর্ণনা করা চলে না। এই যে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শান্তি—তুমি যে তাই গো—সেই তো তোমার স্বরূপ—তোমার আত্মা যে এই!

এই তত্ত্ব যদি জানতে পার, তবে সকল অভাব অনাটনের বাইরে দাঁড়াবে তুমি। এই বস্তুটা আয়ত্ত করতে পারলে সমস্ত জগতই তোমার।

হায়রে, মানুষ কি ভুলই করছে। যা পরম আনন্দ, চরম শান্তি, তাকে ছেড়ে সংসার-মায়ার পিছনে, ছায়ার পিছনে, আলেয়ার পিছনে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে। এই অখণ্ড আনন্দ তো তোমারই—তুমিই তো তাই! একে তুমি খুঁজছ না কেন? জন্মাবধি যা তোমার হক্, তার দখল ছাড়বে কেন? কিন্তু বাইবেলের এসাউ এর (Esau) মত, মানুষ একটুকু অন্নব্যঞ্জনের খাতিরে তার হকের ধন ছেড়ে দেয়।

নরাধম জুডাস (Judas Isacariot) ত্রিশটা রূপার চাক্তির লোভে খৃষ্টদেবকে বেচে দিয়েছিল। তোমার আত্মরূপী যে খৃষ্টদেব—এই দুনিয়ার যিনি শাহান্-শাহ, জগতের মিথ্যা সুখের ছলনায় ভুলে তাঁকে যেন বেচে দিও না—একটু যেন ঘটে বুদ্ধি থাকে ভাই—একটু বুদ্ধি যেন থাকে।

তোমার মাঝেই তো খাঁটী সুখ—অম-ধার অমৃতের অপার পারাবার যে তোমারই অন্তরে। নিজের মাঝে তাকে খোঁজ—তাকে উপলব্ধি কর—লাভ কর—সে যে এই এখানে—তোমার আত্মারূপে। সে তো শরীর নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়; সে কামনা নয়, কাম্য নয়; তুমি যে এগুলির বহু উর্দ্ধে। এগুলি কেবল নাম আর রূপ। তুমিই যে ফেনার হাসি—তারার ঝিকিমিকি। জগতে এমন কি আছে, যার লোভ তোমাকে বাঁধতে পারে?

একবার প্রণব গান কর দেখি—আর জপের সঙ্গে সঙ্গে তাকে আঁকড়ে ধরবার জন্য তোমার সমস্ত মন প্রাণ, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শক্তি একেবারে নিঃশেষে ঢেলে দাও দেখি! প্রণবের অর্থ কি জান?—প্রণবের অর্থ—আমিই তাই—আমি আর সে এক—ওঁ—তাই আমি—ওঁ—ওঁ। যদি পার, জপ করবার সময় যত দৈন্য, যত লোভ—সব মনের সামনে জাগিয়ে তোল—তারপর দু'পায়ে তাদের মাড়িয়ে থেঁৎলে ফেল—তাদের ছাড়িয়ে ওঠ তুমি—তোমারই জয় হোক্।

হিন্দুদের পুরাণে একটা বড় সুন্দর গল্প আছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—তাঁর পিতামাতা ভাই-বন্ধু সবাই বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের সামনেই তিনি যমুনার খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়েছেন—সবাই মনে করল, কৃষ্ণকে আর পাওয়া যাবে না, তিনি বুঝি

চিরদিনের মত গেলেন। কিন্তু তিনি এক ডুবে একেবারে নদীর তলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন; সেখানে ছিল একটা হাজার ফণাওয়ালা সাপ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাঁশীতে তান ধরলেন—বাঁশীতে প্রণব ঝঙ্কার উঠল—আর সঙ্গে সঙ্গে সাপের ফণায় ভীষণ পদাঘাত করতে লাগলেন। এক একটা করে ফণা জাগে আর নির্দ্দয়ভাবে তিনি তাকে পীড়ন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যতটা ফণা ভাঙ্গেন, আবার ততটা ফণা গজিয়ে ওঠে—কাজেই তাঁকে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও সাপের ফণার উপর তাঁর উদ্দণ্ড নৃত্য চলছেই। বাঁশীতে অবিরাম প্রণবের ঝঙ্কার উঠছে আর এদিকে তালে তালে সাপের ফণায় তাণ্ডব নৃত্য চলছে! ক্রমে হৃদগুর মাঝেই সাপের প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাঁশীর তানের গুণেই হোক্ বা পদাঘাতের পীড়নেই হোক্—সাপ আর মাথা তুলল না। তার রক্তে যমুনার জল লাল হয়ে গেল; নাগস্ত্রীরা এসে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগল—তাঁর সঙ্গসুধা পান করবার জন্য তারা ব্যাকুল হল। শ্রীকৃষ্ণ নদীগর্ভ হতে উঠে আসলেন—বিস্মিত বন্ধুবান্ধবেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন—তাঁদের বড় আদরের, বড় স্নেহের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবার তাঁদের মাঝে ফিরে এসেছেন—এ আনন্দ তাঁরা রাখবেন কোথায়? এই গল্পটীর দুটী অর্থ আছে। যারা আত্মার মহিমা জানতে চায়, নিজের স্বরূপ বুঝতে চায়—তাদের পক্ষে এ কাহিনীটী অধ্যাত্মজগতের একটী বাস্তব নিদর্শন।

ওই নদী বা হ্রদ হচ্ছে যেন মন, আর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ। যে শ্রীকৃষ্ণ হতে চায়, অর্থাৎ হারানো মাণিক আবার যে ফিরে পেতে চায়, তাকে তার মনের গভীর সায়রে ডুবে যেতে হবে—আপনার মাঝে তাকে তলিয়ে যেতে হবে। এমনি করে নিজের স্বভাবের অন্তস্তলে পৌঁছে, যে কামনা বাসনার বা সংসার-চিন্তার দুরন্ত বিষধর নাগ সেখানে বাসা বেঁধেছে, তার সঙ্গে তার লড়তে হবে—তার স্পর্দ্ধা তাকে চূর্ণ করতে হবে। বাঁশীর সুরে তাকে মুগ্ধ করে, পদাঘাতে তার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করে তাকে তার বিনাশ করতে হবে। মনের সায়র যে তার নিষ্কণ্টক করতে হবে, তাকে শোধন করবার উপায়ই হচ্ছে এই। শ্রীকৃষ্ণ যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথেই চলতে হবে - বাঁশীর সুরে প্রণবের ঝঙ্কার তুলতে হবে—তার মাঝে অমরার তান বেজে উঠবে, আনন্দের সুর ঝরে পড়বে।

কিন্তু এই বাঁশীটী কি? সে তোমারই প্রতীক। ভাবতেন কত না বাঁশীর গুণে মুগ্ধ। একটা বাঁশীর দিকে চেয়ে দেখ, তার মাঝে এমন কি দেখতে পাচ্ছ, যার দরুণ তার এত মান, এত গৌরব? এর কোন গুণে শ্রীকৃষ্ণ এর এত গরব বাড়িয়েছিলেন? যে শ্রীকৃষ্ণ জগতে পূজিত, বড় বড় রাজারা পর্য্যন্ত যাঁর অনুরাগে বাঁধা, ভারতের অপ্সরানিন্দিত গোপবধূরা যার পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল- সবার শ্রেষ্ঠ, সবার শ্রেষ্ঠ, প্রেম দিয়ে-গড়া-তনু সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাজবাজড়ার দিকে একটীবারও না তাকিয়ে এই বাঁশীকে তিনি অধরস্পর্শে ধন্য করলেন কেন? কি গুণে এর এত মান? বাঁশীর কথা এই—"আমার একটী গুণ আছে—সেই গুণেই আমি বড়। আমি নিজকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত করেছি।"

বাঁশীটা আগাগোড়াই ফাঁকা। সে যেন বলছে—"আমি নিজকে রিক্ত করেছি—

অনাত্ম-বস্তু হতে মুক্ত হয়েছি।" এই বাঁশীতে ফুঁ দেওয়া অর্থ চিত্তকে শুদ্ধ করা, ভগবানের দিকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া —যিনি প্রিয় হতেও প্রিয়তম, তাঁর পায়ে যা কিছু সব ঢেলে দেওয়া। অন্তরের অন্তর হতে তোমার ত্যাগ ফুটে উঠুক—দেহের ওপর তোমার দাবী ছেড়ে দাও—যত স্বার্থ, যত মমতার বাঁধন, যত "তোমার আমার" বলে ভাবনা—সবকে ছাড়িয়ে ওঠ দেখি বাঁশীতে অধরের স্পর্শ কি জান? —সে হচ্ছে ভগবানকে তেমনি অনুরাগে জড়িয়ে ধরা—যেমন অনুরাগ সংসারের কোন প্রেমিকই তার প্রণয়িনীর জন্য অনুভব করেনি, সে হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এমন তীব্র পিপাসা, যা বিরহদগ্ধ সংসারীর প্রাণেই হয়ত জাগে, সে হচ্ছে সত্যের পিপাসা—যা চরম তত্ত্ব, তাকে জানবার জন্যই দুঃসহ আকুলতা—এই হচ্ছে বাঁশীতে ঝঙ্কার তোলা। চিত্ত যখন এমনি প্রশান্ত, এমনি বিশুদ্ধ, তখন একমনে কেবলি প্রণব জপ কর—প্রণব গান কর—তবেই তোমার বাঁশীতে সুরের লহর উঠবে। তোমার সমস্তটা জীবনই বাঁশীর মত হয়ে যাক্—তোমার সমস্তটা দেহ বাঁশীর সুরে বেজে উঠুক। স্বার্থপরতা হতে রিক্ত করে তাকে ভগবৎ-ভাব দিয়ে পূর্ণ কর।

এক তানে প্রণব জপ কর আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মন-সায়রে জাল ফেলতে থাক—খুঁজে বের কর কোথায় সেই হাজার ফণার কালসাপ। এই নাগের ফণাগুলিই হচ্ছে অভাব, সাংসারিকতা আর স্বার্থবুদ্ধি। তাদের দুপায়ে দলে যাও—প্রণব জপ করতে করতে তাদের নির্মম ভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে একেবারে চিহ্ন লোপ করে দাও।

তোমার চরিত্র এমন হোক, সঙ্কল্প এমন দৃঢ় হোক, প্রতিজ্ঞা এমন অটল হোক যে তোমার মনের সায়র মথন করে যখন তুমি বাইরে আসবে, তখন তার জলে আর বিষ থাকবে না—যে তার জল পান করবে, তাকে বিষের জ্বালায় জ্বলতে হবে না। মন সায়রের জলটা এমনি নির্মল করে তোমায় বেরিয়ে আসতে হবে। লোকের সঙ্গে তোমার মত নাই বা মিলল, তোমায় তারা হাজার রকম বিপদেই না হয় ফেলল, তোমায় দুঃখো গালমন্দই না হয় দিল, কিন্তু তবুও লোকের অনুরাগ বিরাগ, গালাগালি আর তোষামোদ —কিছুর দিকেই তুমি ভ্রূক্ষেপ করো না—তোমার অন্তর হতে যেন কেবল চিরশুদ্ধ, দিব্যভাবের প্রবাহ বয়ে যায়। ঝরণার জল যেমন সদাই বিশুদ্ধ থাকে বলে লোকের মাঝে তা কখনো বিষ ছড়ায় না, তেমনি তোমার হৃদয় হতেও জগতের পানে যে অমৃত-ধারা বয়ে চলবে, তার গুণ কুটিলতার সংস্পর্শও তোমার পক্ষে অসহন হবে। আগে হৃদয়কে শুদ্ধ কর, অবিরত প্রণব জপ কর, তোমার যত দুর্বলতা আছে, সব খুঁজে টেনে বের করে সমূলে ধ্বংস কর। চরিত্র এমনি বিশুদ্ধ, সুন্দর কর, যাতে কোথাও তোমার পরাভব না ঘটে। বাসনার কালীয় নাগ যখন মরবে, তখন দেখবে, বাসনার বস্তু এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে—কালীয়দমন করলে পর নাগকন্যারা যেমন করে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল।

একখানা কাগজে কতকগুলি ঘর কেটে, তোমার মাঝে যে সমস্ত গলদ রয়েছে তার একটা তালিকা কর। তালিকাটা হয়ে গেলে পর, সপ্তাহের যে কোনও একটা দিন ধরে অনুসন্ধান করে দেখ, তোমার সে দিন কি দুর্বলতা ভোগ করতে হয়েছে। হয়ত সেদিন

তোমাকে শোক বা লোভ আচ্ছন্ন করে ধরেছিল; ঐ তারিখে লোভের ঘরে একটা ঢেঁরা দাও—এমনি করে রোজকার হিসাব চলুক। নিজে নিজে যদি এ রকম ডায়েরী রাখতে পার, তাহলে কি তোমার দোষ, কি তোমার দুর্ব্বলতা, তা অনায়াসেই তোমার চোখে পড়বে।

কেবল খাতাতেই যে ঢেঁরা থাকবে, এমন কথা রাম বলছেন না।

আজকে হয়ত তুমি একটা কুপ্রবৃত্তির অধীন হয়েছ; এ জায়গায় নিজকে ঠকাতে যেওনা—ঠিক ঠিক নিজকে যাচাই করে আজকার দিনটা চিহ্নিত করে রাখ। পরদিন প্রাতে কিম্বা সুযোগমত যে কোন সময় দরজা বন্ধ করে একা বস, তারপর তোমার হিসাবের খাতাটি সামনে নিয়ে স্থির দেখ, লোভ, না দুঃখ, না কিসের কাছে তুমি হারলে, তার পর নিজকে শাসন কর।

এদেশে অপরের কাছ থেকে আমরা অনেক বক্তৃতাই শুনতে পাই, কিন্তু দেশের যত বড় বড় বক্তারা এসে যত বক্তৃতাই দিন না কেন, এমন কি স্বয়ং খৃষ্ট বা ভগবান এসে তোমার কাছে বক্তৃতা দিলেও কিছু ফল হবে না—যদি নিজের কাছে নিজে বক্তৃতা দিতে না পার। নিজকে যে বক্তৃতা শোনাতে পারে, সেই নিজকে বাঁচাতে পারে। তুমি জানছ যে, তুমি শত্রুর অধীন হয়েছ। বেশ, এইবার এই মনোবৃত্তিটাকে বিশ্লেষণ করে তার নিদান বের করবার চেষ্টা কর দেখি। কেনই বা তুমি এর ধাক্কায় এত মুসড়ে পড়লে? আগে কারণটা বের কর, তার পরে তার প্রতীকার খুঁজো। তখন ভগবদ্গীতা কি বাইবেল কি এমার্সনের (Emerson) গ্রন্থাবলী ইত্যাদি যে সমস্ত বইয়ে তোমাকে শোক মোহের উপর টেনে তুলতে পারে, তারই কোনও একখানা পড়তে পার; তা ছাড়া নিজের ভাবনা-চিন্তার সাহায্যে মন থেকে দুশ্চিন্তাগুলি যাতে একদম তাড়িয়ে দিতে পার, তারই প্রাণপণ চেষ্টা করবে। যদি তখন এমন মনে হয় যে তোমার প্রবৃত্তির উপর তুমি জয়ী হয়েছ, আর তোমার নিজকে হারাবার ভয় নাই, তোমার সামনে যাই আসুক না কেন, তাকেই তুমি দুপায়ে মাড়িয়ে যেতে পারবে, তোমাকে হটাবার সাধ্য কারু নাই—তখন আগের ওই ঢেঁরার দাগটা মুছে ফেলো। তখন তুমি মুক্ত হলে যে। যা হয়ে গিয়েছে তার জন্য দুঃখ করছ কেন? যা হবার, তা তো একেবারেই চুকে-বুকে গেছে।

একটা একটা করে তোমার দোষ ত্রুটীগুলি ধরে, তার কারণ ও প্রতীকার নির্ণয় করে, তার নিদান বের করে, তারপর নিজকে শায়েস্তা করতে বসে যাও। কিন্তু সবাই এখানে জুটে তার নিদান বের করবার পূর্ব্বে, তোমার নিজকে নিজে পাঠ দিতে হবে। এ কাজটা তোমাদের প্রত্যেককে করতে হবে।

ভোগ তুমি ভুগছ, তাকেই তাড়াবার জন্য ধ্যানে বসে যাও, আর একমনে প্রণব জপ করতে থাক। ওষ্ঠ যখন জপে নিযুক্ত, কণ্ঠ যখন প্রণবগুঞ্জনে ঝঙ্কৃত, সমস্ত সংকল্প যখন অটল প্রতিষ্ঠ—ভগবানের করুণার ধারা তখনই তোমার উপর নেমে আসবে—তখন ভিতর থেকে তুমি জোর পাবে। কুচিন্তাগুলি হচ্ছে তোমার মন-কালীদহের কালীয়নাগের ফণা—একটা একটা করে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দাও। সমস্ত ভুলচুকের এক কারণ, এক মূল—সে হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যাই নানা পাপের আকারে দেখা দেয়—বিশেষতঃ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে অবিদ্যা, তাই

পাপের মূল।

মানুষ আত্মাকে দেহের সঙ্গে এক ক'রে নিয়ে তার চারিদিকে নানা উপকরণ জড়ো করে, বাইরে থেকে সুখের উপায় করবে ব'লে মনে করে; কিন্তু দেহের সঙ্গে নিজকে যারা এক করে নিয়েছে, তাদের শোক হ'তে দুঃখ হ'তে বাঁচাবে কে?

দেহকে ছাড়িয়ে ওঠ। উপলব্ধি কর যে তুমি আত্মস্বরূপ—অন্তহীন, শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ! কাম বা ক্রোধ তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে?

আত্মজ্ঞানের অভাব তো আছেই—তা ছাড়া প্রকৃতির আইন কানুন সম্বন্ধেও মানুষের অজ্ঞানতা কম নয়। তাইত মানুষ দুর্ব্বল হ'য়ে রোগ ভোগ করে। এই ধর প্রকৃতির একটা অলঙ্ঘ্য আইন আছে—তাকে এড়িয়ে যেতে পারে এমন সাধ্য কারু নাই। আইনটা হচ্ছে এই—

যে কিছু অন্যায় কর, অনিষ্ট কর—মনের মাঝেই অন্যায়ের ভাব পোষণ কর কিম্বা কাজেই কর—যেখানে কেউ তোমার খোঁজ করবে না, সন্দেহ করবে না, এমন নিভৃতে নিরালায় একটা কুকর্ম্ম কর না কেন; অভেদ্য দুর্গের মাঝে সঙ্গোপনে বসে পাপের বীজ বপন কর না কেন; প্রকৃতির আইন এমনি কঠিন, অনাম্য, অলজ্ঘ্য, অপ্রতিহার্য্য যে আজ দমকা হাওয়ার আবাদ করলে কাল ঘূর্ণি হাওয়ার ফসল ঘরে তুলতে হবে—দুঃখের হাত থেকে কিছুতেই তুমি রেহাই পাবে না। পাপের ফল মৃত্যু অবধারিত।

মানুষ মনে করে এটা একটা নীতির কথা—কাজেই গণিতের নিয়মের মত এর অবিসংবাদী নিশ্চয়তা কিছু নাই—অঙ্কশাস্ত্রের আইনটা যত জোরে খাটে, এ আর তেমন জোরে খাটবে না। কিন্তু একথা যারা ভাবে, তাদের মহা ভ্রম বলতে হবে। নির্জ্জন গিরিকন্দরে গিয়ে পাপাচরণ কর, দেখে অবাক্ হবে, তোমার পায়ের তলার তৃণগুলি পর্য্যন্ত কণ্টকিত হয়ে উঠেছে—শেষ আদালতে তারাও তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালে দেখবে গাছ পালা, ঘরের দেওয়ালগুলোর পর্য্যন্ত যেন মুখ ফুটে গিয়েছে। প্রকৃতিকে ফাঁকী দেওয়া কি সহজ হে?—এ সত্য—এ আইন; শুধু হৃদয়ে পাপের অনুষ্ঠান যদি করি, তবেই দেখব বহির্জগতের যত বিপত্তি আর দুর্দ্দৈব এসে চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে;—তখন আর মুস্কিলের আসান পাওয়া ভার। এই হ'লো আসল কথা; কিন্তু গোড়ার খবর যারা রাখে না, দুঃখ দৈন্যের কারণটা তারা খোঁজে বাইরের জগতে। পারিপার্শ্বিকের উপর তারা মহা খাপ্পা হয়ে ওঠে- ভাইবন্ধু আত্মীয়স্বজনের উপর নালিশ রুজু করে বসে। এই যে প্রকৃতির আইন, ঘরে ঘরে এর প্রচার হওয়া আবশ্যক। ভগবানের চোখে ধূলা দিতে গেলে নিজের চোখই কাণা হবে।

আইন এই যে, তোমাকে শুদ্ধ শান্ত হতে হবে। অশুদ্ধ ভাব পোষণ করলেই তার সাজা পেতে হবে। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক নিয়ম একটী একটী করে বিশ্লেষণ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রের মত সুনিশ্চিতরূপে তাদের প্রমাণ করা যায়। একবার এগুলোর তাৎপর্য্য বুঝতে পারলে মানুষ আর কিছুতেই কামনা-বাসনার দিকে ঝুঁকবে না। বাসনাকে জয় করতে পারলে মনকে যতক্ষণ ইচ্ছা একমুখী ক'রে রাখা চলে। চাই আগে বিশুদ্ধ চরিত্র, তারপর অন্য কথা।

কে যেন জিজ্ঞাসা করলে, চিত্তজয় করতে হলে কি উপবাস প্রয়োজন?

উপবাস সম্বন্ধে রাম বলছেন, অনাহার বা অত্যাহার কোনটাই ভাল না—দুটাই চরম, দুটাকেই বর্জ্জন করতে হবে। উপবাসের ইচ্ছা কখন কখন আপনা হতে আসে—না খেয়ে থাকতে আপনিই কেন যেন তখন মন যায়। হৃদয়ের এই সমস্ত সহজ ইঙ্গিতগুলি মেনে চলতে হয়। কিন্তু কখনও হয়ত তোমার অন্তর বলবে আহার গ্রহণ করতে; তখন তারই স্বাভাবিক প্রেরণার অনুসরণ করা উচিত।

উপবাসও হবে একটা উপায় মাত্র—সেই যেন সর্ব্বে সর্ব্বা হয়ে না দাঁড়ায়। জোর করে উপবাস করানো হয় বলেও মানুষ অনেক সময় উপবাস করে থাকে—এরা উপবাসের গোলামী করে মাত্র। এমন গোলামী রাম পছন্দ করেন না। ভারতবর্ষে উপবাসের একটা রীতি আছে। কতকগুলি বিশেষ দিন আছে, তাতে কি রকম খাবার কতটুকু খেতে হবে, তার ব্যবস্থা আছে। এই দিনগুলি হচ্ছে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা। পূর্ণিমার দিন ও-দেশের লোকেরা খুব অল্প করে খায়, যাতে পেট ভারী না হয়। সে দিন হলো ধ্যানধারণার দিন, লোকে সেদিন তাই নিয়ে থাকে। তোমরা পরীক্ষা করে এটার সত্যমিথ্যা দেখতে পার। সেদিন এমন খাবার খাওয়া উচিত, যা মনের স্থৈর্য্য নষ্ট না করে। পূর্ণিমা আর অমাবস্যার মাঝে এমন একটা বিশেষ গুণ আছে, যাতে বাস্তবিকই সেদিন চিত্তসমাধান সহজ হয়।

আসল উপবাস হচ্ছে মন থেকে সকল রকম বাসনা, কামনা আর ফলাকাঙ্ক্ষাকে দূর করে দেওয়া—তাদের পুষ্ট না করে নষ্ট করা।*

*স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০২)

পথের সঙ্কেত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভাবের কথাই বলিতেছিলাম। জীবনের কেন্দ্রটা কি, অন্তরের কোন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া সংসারের পথে চলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। লেখাপড়ার চরম ফলটা কি হইবে, তাহার সম্বন্ধে সকলেরই একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা আছে—এইটুকুই সংসারের ভাব। কিন্তু এ জন্মের সংসারের চেয়েও বড় সংসার রহিয়াছে, তাহার কথাটাও তো ভাবা চাই। একেবারে তাহার কথা কিছু না ভাবিয়া কেহই পারে না, কেননা নিজকে ভুলাইলে কি হইবে, অন্তরের পিপাসা যে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে গাথা। কিন্তু কথা এই যে, সংসারের ভাবনার বেলায় চিন্তার ধারার মাঝে বেশ পৌর্ব্বাপর্য্যের একটা শৃঙ্খলা থাকে, আর এই অন্তরের ভাবনার বেলায় তাহা থাকে না কেন? নিজের অন্তরের কথা একটু তলাইয়া ভাবিতে শিখিলে কি সংসারের মধু তিক্ত হইয়া উঠিত? বরং ঠেলায় পড়িয়া যখন ভাবনা আসিয়া জোটে, তখন সংসারের রসও বিরস হইয়া উঠে। একটু আগে হইতে তাল সামলাইয়া চলিলে বোধ হয় এমন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচ"র ধুয়া ধরিতে হইত না।

আসল কথা, ছোট হইতেই সংসার গুছাইবার শিক্ষা সবাই পায়—কেননা সেটা

প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ তাগিদ কিন্তু অন্তরকে গুছাইবার জন্য তো আর কেহও কোনও তাগাদা দিতেছে না; সেখানে যদি বাহিরের কতকগুলি লোক-ধর্ম্ম আর সমাজ ধর্ম্ম মানিয়া (নিদানপক্ষে মানিবার ভাণ করিয়া) গেলেই রেহাই পাওয়া যায়, তবে ভিতরটা নিয়া নাড়াচাড়া করিবার প্রবৃত্তি তোমার হইবেই বা কেন? কিন্তু যিনি বাহির দিয়াছেন, তিনিই ভিতর দিয়াছেন; একটার দায় মিটাইয়া আর একটাকে ফাঁকি দিলে তিনি সহিবেন কি? তিনি যে তাহা সহ্য করেন না, পদে পদে আঘাত পাইয়া মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া তাহা প্রমাণ করিতেছ, কিন্তু তবুও এমনি অন্ধ তোমাদের শিক্ষা যে, প্রকাশ্যে সে কথাটা স্বীকার করিয়া জীবনটাকে আর একটু সমঝিয়া লইবার জন্য কোনও ব্যবস্থা কেহ করিতেছে কি? অন্যে পরে কা কথা—বাপ-মা ছেলে মেয়ের প্রতি এই কর্ত্তব্যটুকু পালন করিতেছেন? যে শিক্ষার কেরামতির ব্যাখ্যানের আর অন্ত নাই, তাহাকে দিয়াই কি এ বিষয়ে কিছু সুবিধা হইতেছে? সুবিধা আর হইবে কি! বাহির ছাড়া যে একটা ভিতরের শিক্ষা আছে, আর তাহার কসরতটা যে ভগবান কেবল গৃহহীন সন্ন্যাসীর জন্যই শিকায় তুলিয়া রাখেন নাই, এ কথা কাহারও খেয়ালে জাগে না—বাপ-মায়েরও না, ছেলে-পিলের নিজেরও না। হায়রে অন্ধ!

যাক, এখন কাজের কথা লইয়াই আলোচনা করি। জীবনে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন একজন সঙ্গী পুরুষের। এই সঙ্গীটা তোমার নিত্যকালের সঙ্গী অভাবে পড়িয়া বা দুর্ব্বিপাকে ঠেকিয়া ইহারই আশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইবার একটু ঠাঁই পাইবে, এই হইল প্রথম কথা। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চিত্তের এমন একটা মেরুদণ্ড থাকিবে, যাহাকে ধরিয়া নিজকে খাড়া করিয়া রাখিতে পার, সুখ-দুঃখের সকল উৎপাতই আনন্দে সহিয়া যাইতে পার—এই হইল তাহার চেয়েও বড় কথা। কি করিয়া এই সাক্ষীকে নিজের মাঝে জাগাইবে, তাহা বুঝিতে চাহিলে আগে ভাবিয়া দেখ, সাধারণ মানুষ ভিতরে কতটুকু পাইলে খুসি থাকে, আর যেটুকু লইয়া সে খুসী, তাহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে কি না। দেখিবে, ফাঁকা মন লইয়া কেহ সংসার করে না—ভাল হোক, মন্দ হোক, একটা কিছু দিয়া সকল সময়েই মনটা ভরাট করিয়া রাখা চাই। চিত্ত ভরিয়া রাখিবার এমন সব উপাদান কোথা হইতে যে আসিয়া জোটে, তাহার খোঁজ বড় কেহ রাখে না; অথচ প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন জিনিষ আসিয়া চিত্তের মাঝে স্তূপাকার হইতেছে। ইহাদিগের সকলগুলিকেই ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতে পারিলে কাজ সহজ হইত মানি, কিন্তু বিদায় করা তো মুখের কথা নয়। তাই সেগুলিকে তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া আগে যেগুলি নূতন আমদানী, তাহাদের লইয়াই বোঝাপড়া আরম্ভ কর। লক্ষ্য রাখ, কখন একটা নূতন আবেগ আসিয়া চিত্তের মাঝে দখল লইবার জন্য গোলযোগ বাধাইয়া দেয়। সে ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার পরের কথা, কিন্তু যাহা ছিল, তাহার উপর নূতনটা আসিয়া কখন কি ভাবে ঠাঁই জুড়িয়া বসিল, সেইটাই আগে পরখ করিতে হইবে। যদি তাহা তোমাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলে যে সদ্যঃ সদ্যঃ পরখ করিবার সুযোগ তুমি পাইলে না, তবুও আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতেই স্মৃতির সাহায্যে তাহাকে বিশ্লেষণ করিতে ভুলিও না।

এই পরখ করার মাঝে কলা-কৌশল কিছুই নাই। একটা নূতন জানোয়ারের আকার প্রকার চাল-চলন তোমার মাঝে যতটুকু কৌতূহল জাগাইয়া তুলিবে, নিজকে পরখ করিবার জন্য ততটুকু কৌতূহলই যথেষ্ট। কিন্তু সাবধান, নিজের স্বপক্ষে যেন তখন ওকালতী করিতে যাইও না। তোমার কাজ কেবল কার্য্য-কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটা অভিনব ভাবের পরিণতি লক্ষ্য করা। এর মাঝে ভালমন্দ সুকুর বিচার তো কিছুই আসিতেছে না। ওকালতী করা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিজের ভাবের প্রতি মানুষের মমতা বড় বেশী। বিশেষতঃ অপরিণত যুবক মনের সে মমতা যেন আর বেড়িয়া পাওয়া যায় না। নিজের কথা পরের কাছে বলিবার বেলাতেই যে ফাঁকী চলে তা নয়, নিজের মনকেও মানুষ চোখ ঠারিতে কসুর করে না। তাই বলি, মমতা দিয়া পরখ করিও না। নিছক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া, শুধু কৌতুক-পূর্ণ একটা কৌতূহল লইয়া পরখ সুরু করিও—ভালমন্দের কোনও কথাই ইহার মাঝে আনিও না। প্রকৃতির আইন আগে জানা চাই। বিচার তার পরের কথা।

এমনি করিয়া দুই চারিটা ভাব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে, ক্রমে চিত্তের মাঝে ডুবিয়া থাকার একটা সহজ অভ্যাস জন্মিয়া যাইবে। তখন এমন হইবে যে শুধু বড় বড় বিপ্লব আর বিক্ষোভই নয়, অতি ছোট খুঁটিনাটিটুকু পর্য্যন্ত তোমার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে না—তোমার চিত্তের কোথায় কি হইয়াছে না হইতেছে, তাহার সকল খবরই তোমার কাছে পৌঁছিবে। ইহাতে এমন কিছু হইবে না যে, ইহার দরুণ যাহা ভাল তাহার দিকে তোমার প্রবৃত্তি হইবে, কিম্বা যাহা মন্দ, তাহার উপর তোমার নিবৃত্তি জন্মিবে।' হয়ত আপন আদর্শ অনুযায়ী ভাল মন্দ গড়িয়া তোলা তোমার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইবে না—কিন্তু তবুও একটা খুব বড় কাজ হইবে এই যে, তোমার উচ্ছৃঙ্খল চিত্তের মুখে এইবার লাগাম পড়িবে। না বুঝিয়া না জানিয়া কেবল কতকগুলি রাবিশ আনিয়া চিত্তে জমা করা, আর তাহারই ছটফটানিতে ঝড়ের মুখে এঁটো পাতের মত উড়িয়া উড়িয়া বেড়ান, অন্ততঃ ইহার হাত হইতে তখন রক্ষা পাইবে।

'এক জায়গায় মানুষ বড় ভুল করিয়া বসে—তত্ত্ব না বুঝিয়াই সে সংযমের অসাধ্য সাধন করিবে বলিয়া পণ করে। যদি চিত্তে এমন নির্ভরের ভাব থাকিত যে, যিনি আমাকে চালাইবেন, তাঁহার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখিয়া কেবল তাঁহার আদেশ আর উপদেশের জোরে নিজকে ঠেকাইয়া রাখিব, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। কিন্তু নির্ভরের এমন দৃঢ়তা কয়জনার আছে? অথচ গতানুগতিকের পথে চলিয়া কতকগুলি শোনা কথার ভরসায় মানুষ নিজকে শাসন করিবার একটা মিথ্যা অভিনয় করিয়া যায় মাত্র—কথার জোরে দুই চারিবার হয়ত তাল সামলাইয়া অবশেষে প্রকৃতির কাছেই আত্মসমর্পণ করে। তারপর পূর্ব্ব সংস্কারের প্ররোচনায় কেবলই এই বন্ধন-দশা হইতে নিজকে মুক্ত করিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিয়া মরে—কিন্তু পথ পায় না; চিত্তে অনুশোচনার দাহ আরম্ভ হয়, তবুও পতঙ্গের মত আগুনে পুড়িয়া মরিবার লোভ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি থাকেনা। এই তো অবিচারের ফল। এই জন্যই বলিতেছিলাম,

তত্ত্ব না বুঝিয়া সংযমে সিদ্ধি দুরাশা মাত্র। 'এমন ভাবিতে নাই—এমন করিতে নাই' বলিয়া কেবল জোরসে হাঁকিলেই হয় না—বরং তাহাতে মানুষ লুকাইয়া ভাবিতে, লুকাইয়া করিতে শিখে। আদর্শ-প্রতিষ্ঠার আগে তত্ত্ব বোঝা প্রয়োজন। আবার, সে বোঝার ভারও প্রত্যেকের নিজকেই নিতে হইবে—নিজের উপর খবরদারী নিজেকে করিতে হইবে।

এই খবরদারী করার একটা মহৎ গুণ এই যে, প্রবৃত্তির বশে মানুষ যেখানে পরের উপদেশও লঙ্ঘন করিয়া যাইত, সেখানেও নিজের চোখে দেখাকে সে সহজে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। এর মূল কারণটা এই যে, আসক্তির মাঝে যে মোহ রহিয়াছে, তাহাই তোমার চিত্তে রসাভাস জাগাইয়া তোলে; কিন্তু এই মুহ্যমান অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিলে আর রসাভাস হইতে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় না—বরং তাহাতে [illegible] অভাবে রসাভাস তখন খণ্ডিত হইয়া যায়। ধর, আহারে তোমার প্রবল লোভ রহিয়াছে। যদি তোমার চিত্ত তোমার নিজের আহারের উপর সজাগ দৃষ্টি না রাখে, তাহা হইলে আমি তোমাকে শত উপদেশ দিয়াও লোভ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারিব না। হয়ত আমার কথায় কিম্বা চক্ষু-লজ্জার খাতিরে দুই চারিবার তুমি সংযমের অভিনয় করিয়া যাইবে, কিন্তু ভিতরের আগুন তো তাহাতে নিভিবে না। খাবার জিনিস সামনে পড়িলেই যে তাহাতে তোমার স্বাভাবিক তন্ময়তা জন্মিয়া যায়—কেমন করিয়া খাইতেছ, তাহার দিকে কোন হুঁস না রাখিয়া কেবলই যে গোগ্রাসে উদরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোল—এই তন্ময়তার রসাভাস হইতে কি আমার দুইটা কথা তোমায় ঠেকাইয়া রাখিবে? কিন্তু তুমিই যদি নিজে একবার তোমার খাওয়ার তদারক করিতে—কোনও কিছু ভালমন্দের বিচার না করিয়া, চুপটী করিয়া নিজের মনের এক কোণে বসিয়া নিজের খাওয়ারই রঙ্গ দেখিতে—তাহা হইলে আর অন্নব্যঞ্জনে কিছুতেই তেমন করিয়া রুচি জন্মিত না—তোমার কাছেই তোমাকে লজ্জা পাইয়া হাত গুটাইয়া লইতে হইত। মানুষ যে অপরকে অনায়াসে সংযমের উপদেশ দেয় অথচ নিজে সংযমী হইতে পারে না, ইহার কারণই এই যে, অপরের ব্যবহারটা সে নিরপেক্ষভাবে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার নিজের দিকে তাকাইবার শিক্ষা তো তাহার নাই; নিজের বেলায় রস-লোলুপতা তাহার মাঝে যে তন্ময়তা আনিয়া দিয়াছে, তাহার ঊর্দ্ধে সাক্ষীর জন্য তো সে আসন রচনা করে নাই।

[illegible] সাক্ষী [illegible] সজাগ [illegible]। [illegible] মাঝে [illegible] উঠিয়া পড়, [illegible] রাখিতে পারিবে, তখনই চৈতন্যের সাক্ষীকে পাইবে। এই নিত্য অনুসন্ধানের শেষ হয় না বটে, কিন্তু চিত্তসংযমের পক্ষে খুব বড় একটা অবলম্বন তুমি এখানে পাও। তারপর এই ভিতরের শক্তিকে বাহিরের ব্যাপারে প্রতিফলিত করিতে শিখিতে হইবে। ঘাত-প্রতিঘাত লইয়াই সংসার। কেবল তোমার মনের মাঝেই যে কত অজানা-অচেনা ভাবের বুদ্বুদ উঠিতেছে, তা নয়; বাহিরের জগতেও এমনি কত তরঙ্গের খেলা। সেগুলি আবার তোমার বুকেই আছড়াইয়া পড়ে। নিজের প্রতি যে অন্ধ, সে-ও এই সমস্ত তরঙ্গবিক্ষোভে মাতালের মত টলিয়া পড়িতেছে; নিজের দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়াই তাহার টলুনী আরও

বেনী। নিজের চঞ্চল স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিচয় যদি পাইয়া থাক, আর তাহাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণেকের তবেও যদি একটা স্থির কেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া থাক, তবে তাহারই ভরসায় এইবার বাহিরের সঙ্গে লড়াই সুরু কর—অন্তরের স্থির আসনে বসিয়া দেখ, সুখ দুঃখের তরঙ্গ কেমন করিয়া তোমাকে নাচাইয়া ফিরে।

প্রথমতঃ দুঃখের কথাই বলি, কেননা ইহারই আঘাত মানুষকে অতি উগ্রভাবে সচেতন করিয়া দেয়। বেদনা পাইলাম, আর অমনি তাহাকে প্রত্যাহত করিবার জন্য সমস্ত স্নায়ুজালে সাড়া পড়িয়া গেল—এটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। যদি তোমার গালে মশায় কামড়ায়, তবে তোমার অজ্ঞাতসারেই হাতখানা গিয়া সশব্দে গালে পড়িবে—আত্মপর বিবেচনা বা পরিণাম ফল বিচার সে করিবে না, ইহাই সনাতন রীতি। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, এই রীতি মানিয়াই মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার চলিতেছে, সংসারে দেনা-পাওনার হিসাব জমিয়া উঠিতেছে। কথার বদলে কথা, আঘাতের বদলে আঘাত, মন-কষাকষির উপর আরও মন-কষাকষি—এই লইয়াই তো নিত্যকার কারবার। কিন্তু কেনই যে কথার উত্তরে কথা আসিয়া জোটে, আঘাত পাইলেই কেন ফিরিয়া আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়, এ কথা কি কেউ তলাইয়া দেখিতেছে?—একেই তো বলে স্রোতের টানে গা ভাসাইয়া দেওয়া। এ কথা যদি বুঝিয়া থাক, তবে এইবার অন্তরকে সাক্ষী করিয়া উজান বাহিয়া চল—আঘাত পাইয়াই আঘাত করিও না, একটু স্থির হইয়া সহিয়া দেখ, ব্যথার বিষটা কোন শিরা বাহিয়া মগজে চড়িয়া বসল। প্রথমতঃ এতে খুবই কষ্ট হইবে; যদি রাগের কারণ থাকে, তবে মনে হইবে, আত্মসম্মান খোয়াইয়া বুঝি নিজের ন্যায্য দাবী ছাড়িয়া দিতেছি; যদি ক্ষতির বা শোকের কারণ থাকে, তবে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বুকটা কেবল মোচড়াইয়া মোচড়াইয়া উঠিবে। তা উঠুক, যদি মরদ হও, তবে তোমাকে ওইখানেই থামিতে হইবে—হাল ছাড়িলে চলিবে না। ক্রমে দেখিবে, অন্তরে শক্তি জাগিয়াছে; নিষ্ফল উত্তেজনায় কত অকাণ্ড যে করিয়া বসিতে, তাহার হিসাব দেখিয়া, তখন নিজেই চমকাইয়া উঠিবে। কিন্তু কেবল সহিবার শক্তিটুকুই তো লাভ নয়, এরও উপরি-পাওনা আছে—সেটুকু আনন্দ।

আঘাত সহিবার বীর্য্যের সঙ্গে যদি আনন্দ জাগিয়া উঠে, তবে আর ভাবনা কি? চিত্তের সঙ্কোচ হইতে যে তাহা হইলে চির-জন্মের মত বাঁচা গেল। যতক্ষণই নিজকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, ততক্ষণ এতটুকু কথার বিষও হয়ত বুকের মাঝে চিরটা জীবন কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আনন্দ আসিয়া যদি এই ব্যথার উপর তার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দেয়, তবে দেখিবে, কত বড় বড় আঘাত নির্মম অবহেলায় ঠেলিয়া যাইতেছ—দুঃখের মাঝে তো এমন কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, যাহাকে চিরকাল স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখা চলে। অন্তর তোমার তখন নিরাসক্ত—প্রসাদের মত তখন বলিতে পারিবে, "আমি কি গো দুঃখের ডরাই?"

আবার এর মাঝে শুধু নিরাসক্ত আনন্দই তো নয়, লীলার আনন্দই যে এখানে ভরপূর। এক দুঃখ হইতে আর এক দুঃখে আসিয়া ঠেকিতেছ, যেন আনন্দের এ-কূলে ও-কূলে খেয়া পারাপার চলিতেছে। এই তো

এক বিপদের মাঝে পড়িয়াছিলে, দয়াল ইহার মাঝেও তো তোমায় চরণ ছাড়া করি-লেন না। তারপর মন-ভরা কৌতুক নিয়া বসিয়া থাক, দেখ, চক্রী আবার কোন গহন চক্রে ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া ছুটিয়া পালায়। মনে ভাবিয়াছ, সে বুঝি বিপদ হইতে তোমাকে বারবারই তরাইবে?—না গো না, তোমাকে যে সে বাঁচাইল বলিয়া মনে কর, সে তোমার ছোট নজরের কথা। যদি তার দেওয়া দুঃখের বোঝা বহিতে পার, তবে দেখিবে, সে রঙ্গ করিয়া দুঃখ বাড়ায় বই কমায় না—আর অতি দুঃখের সময় তোমারই গলা ধরিয়া সে কাঁদিতে বসে—বাঁচাইবার নামটীও করে না।

এই তো লীলার রহস্য; কিন্তু দুঃখের মাঝে যে মমতার রহস্য রহিয়াছে, তা বুঝি জান না। যে ছোট, কিম্বা যে ছোটর সঙ্গে সমান, আঘাত করিলে তাহারই বাজে। আঘাতের দুঃখ যখন এড়াইতে পারিবে, তখন জানিবে, তুমি আর ছোট নও, তুমি বড় হইয়া গিয়াছ। আঘাতে আর তখন তোমার হৃদয় হইতে বিষের জ্বালা ঝরিয়া পড়িবে না—মমতায় দুই চক্ষু তোমার ছল ছল হইয়া উঠিবে। যে অবোধ, সেই তো আঘাত করে—যাহার বোধ আছে, সেই তো আঘাত সহিতে জানে। শুধু অভিমানভরে সহিয়া থাকা নয়, যদি বাস্তবিকই প্রশান্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আঘাত সহিতে পার, তবে দেখিবে, সমস্ত জগতের উপর মায়ের মত সকরুণ স্নেহে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে—ব্যথা পাইয়া বিশ্বের ব্যথার বালাই মুছাইয়া দিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে! তখন তুমি কি আর এ জগতের?—এই ঈর্ষ্যা-কোলাহলে মুখরিত, অকরুণ অক্ষমায় কুণ্ঠিত জগতের ধূলি কি আর তোমার গায় লাগিবে? তখন এই জগতের মাঝে থাকিয়াও দেখিবে, ওপার হইতে কে যেন আসিয়া তোমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে, তার অঙ্গদ্যুতিতে তোমার অন্তর বাহির স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে! কি প্রয়োজন তোমার এ জগতে?—কিছুই না; শুধু ভালবাসার দায় মিটাইবার জন্যই বিশ্বের ব্যথা বুকে তুলিয়া লইয়াছ—আঘাতে আঘাতে করুণা মমতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। চরম আঘাতে, চরম ক্ষতিতে নিজেকে যদি রেণু রেণু করিয়া বিলাইয়া দিতে পার—তবেই বুঝি আনন্দের পূর্ণতা—মর্ত্তাবাসের সার্থকতা।

এইটুকু সকলকেই পাইতে হইবে, নহিলে শুধু ঝগড়া-বিবাদ করিয়া দুঃখের হাত হইতে তো বাঁচিতে পারিবে না। দুঃখের স্বরূপ চিনিয়া লইয়া দুঃখকে গ্রহণ করিতে শিখ, দেখিবে, দুঃখের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দুঃখ জীবনে অমৃত হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই সাধনার সূচনা ব্যবহারিক জগৎ হইতে। ছোট খাট একটা দিনকেও উপেক্ষা করিও না। দুঃখের শিক্ষার ছোট বড় নাই; আঘাত ক্ষুদ্র হইলেও তাহা তোমার স্বরূপকে বিকৃত করে নাই কি? তাই ছোট বড় সকল আঘাতের মাঝেই নিজের অবসুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া বারবার চেষ্টা কর—প্রত্যেকটী অভিঘাত তোমার বুক পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাক্, পাঁজর কাটিয়া বুকের মাঝে যেন তাহারা বাসা না বাঁধে! ব্যবহারে সংযম রক্ষা করিতে শিখ—একটা সামান্য মুখের কথাতেও পরকে পীড়া দিও না—পরের পীড়াও মুখ ভার করিয়া বুকে পুরিয়া লইও না। হাসিমুখে সব সহিয়া যাও। কচি বয়স হইতে এই হাসির শিক্ষা প্রয়োজন; আঘাত করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকে তখন হইতে দমাইতে না শিখিলে পর-জীবনে দুঃখভোগ অনিবার্য্য—হাসিতে চাহিলেও তখন হাসি আসিবে না। (ক্রমশঃ)

মুদ্গলের অতিথিসেবা

[মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৫৯।২৬০]

কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক মুনি ছিলেন। উঞ্ছবৃত্তি করিয়া তাঁহার সংসার চলিত। কৃষকেরা ক্ষেত হইতে ফসল তুলিয়া নিলে যে দুই একটী শস্যকণা পড়িয়া থাকিত, স্ত্রী-পুত্র সহিত একপক্ষ কাল উপবাসী থাকিয়া পাইবার মত তাহাই তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ করিতেন। পনের দিনে এইরূপে এক দ্রোণ মাত্র ধান সংগ্রহ হইত। এই এক দ্রোণ ধানই ছিল মুনির সম্বল।

কিন্তু মুদ্গল ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, কাহারও ধনে তাঁহার ঈর্ষা হইত না। এই এক দ্রোণ ধানের জোরেই তাঁহার বাড়ী হইতে কোন দিন অতিথি ফিরিয়া যাইত না, কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম বাদ পড়িত না—প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে যথারীতি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত।

মুদ্গলের যজ্ঞে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত থাকিয়া নিজের ভাগটুকু লইয়া যাইতেন। দেবতাদিগকে তুষ্ট করিয়া ও উপস্থিত সমস্ত অতিথির সৎকার করিয়া এক দ্রোণ ধানের অন্নের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতে মুদ্গল ও তাঁহার পরিবারের একদিনের আহার হইত।

নিজে পক্ষকাল উপবাসী থাকিয়াও সকলকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মুদ্গলের আনন্দের আর সীমা ছিল না। তাঁহার ত্যাগের পুণ্যে ঐ এক দ্রোণ ধানের অন্নই যেন অফুরন্ত ছিল। পর্ব্বদিনে অন্ন ফুরাইয়া গেলেও অতিথি আসিলে পাত্র আপনা হইতে পূর্ণ হইয়া উঠিত—অনাহারে সেদিন কাহাকেও তাঁহার বাড়ী হইতে ফিরিতে হইত না।

দৈবাৎ একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি মুদ্গলের কথা শুনিতে পাইলেন। অকাণ্ড বাধাইতে দুর্ব্বাসার মত আর একটীও নাই—খাঁটী সোনা যাচাই করিয়া দেখা তাঁহার কাজ। যেই শুনিলেন, মুদ্গল এক দ্রোণ ধানেই দেবতাদের তৃপ্তি, সকলকে খুসী করিয়া দেন, অমনি আর কথা নাই একেবারে সোজাসুজি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। মুদ্গল দেখিলেন, এ যেন এক আস্ত পাগল, হাবভাব চালচলনের কোনও একটা তাল বেতাল নাই, পরণে এক টুকরা ন্যাকড়াও নাই, মাথায় একগাছি চুল নাই, মুখে গালি ছাড়া একটা ভাল কথা নাই।

দুর্ব্বাসা আসিয়াই মুদ্গলকে বলিলেন, "আমি তোমার বাড়ীতে খাইতে আসিলাম, ঘরে ভাত থাকে তো দাও।"

মুদ্গল বিনীতভাবে কুশল প্রশ্ন করিয়া তাড়াতাড়ি অতিথিকে বসিতে আসন দিলেন, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া পরিপাটীরূপে অন্ন সাজাইয়া সম্মুখে ধরিলেন। অতিথি পাগল বলিয়া তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা হইল না, বরং তাঁহাকে ক্ষুধিত জানিয়া বিশেষ করিয়া তাঁহার সেবা যত্ন করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বাসার বেজায় ক্ষুধা, মুনির অন্নও বড় সুরসাল, দেখিতে দেখিতে অতিথির পাত্র শূন্য হইয়া গেল। মুদ্গল তাড়াতাড়ি যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সমস্তই আনিয়া তাঁহার পাতে ঢালিয়া দিলেন।

মুদ্গলের পাত্র শূন্য হইয়াছে জানিয়া, দুর্ব্বাসা আর সবটা খাইলেন না; কিছু খাইয়া

লেন, কিছু চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন; তার পর বাকী উচ্ছিষ্ট অন্ন সারা গায়ে মাখিয়া পাগলের মত বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে—যেমনটী আসিয়াছিলেন, তেমনটী চলিয়া গেলেন।

মুদ্গল ও তাঁহার পরিবারের সেদিন আর খাওয়া হইল না।

তারপর, ইহার পরের পর্ব্বেও দুর্ব্বাসা ঠিক সময়টীতে আসিয়া আগেকার মতই কিছু খাইয়া, কিছু ফেলাইয়া ছড়াইয়া মুনির খাওয়াটী পণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন।

দুই পক্ষ ধরিয়া মুদ্গল উপবাসী, কিন্তু দুর্ব্বাসার ব্যবহারে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া আবার তিনি ধান খুঁটিতে বাহির হইলেন। ক্ষুধায় তাঁহার মনে একটুও বিকার উপস্থিত হইল না, কিম্বা দুর্ব্বাসার অপমানে তাঁহার উপর ক্রোধও হইল না, বা খাবার জোটাইবার জন্য তিনি ব্যস্তও হইয়া উঠিলেন না। যেমন মুদ্গল, তেমনি তাঁহার পরিবার—কাহারও মনে একটুকু বিকার নাই—এক মাস ধরিয়া যে তাঁহারা উপবাসী, তাহাদের মুখ দেখিয়া এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না।

দুর্ব্বাসাও যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন একবার নয়, দুইবার নয়, উপরি-উপরি ছয় বার পর্ব্বের সময় আসিয়া ঐ একই কাণ্ড ঘটাইলেন। কিন্তু তবুও তিনি মুদ্গলের মনে কোনও বিকার দেখিতে পাইলেন না - শুদ্ধসত্ত্ব মুনির মনটীও যেন স্ফটিকের মত শুদ্ধ, নির্ম্মল—এত কঠোর নির্য্যাতনেও তাহাতে একটু দাগ লাগিল না।

ছয় ছয়বার পরীক্ষা করিয়া দুর্ব্বাসা সন্তুষ্ট হইলেন। শেষবার মুদ্গলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার মত দাতা আমি এ সংসারে দেখি নাই—কোনবারই দিতে তোমাকে বিন্দুমাত্র কাতর দেখিলাম না। ক্ষুধা বড় বিষম বালাই ক্ষুধায় মানুষের ধৈর্য্য লোপ হয়, ধর্ম্মলোপ হয়, সংজ্ঞালোপ হয়। মানুষের জিহ্বা রসের বশ, রসের দিকেই সে মানুষকে টানিয়া নামায়। আহারের মধ্যেই জীবের প্রাণ; তাহাতে আবার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গুলিকে কখন কোন পথে লইয়া যায়, তাহার স্থিরতা নাই। তাই আমি বলি, মনকে আর ইন্দ্রিয়কে যে একমুখী করিতে পারিয়াছে, সেই তো খাঁটী তপস্বী।

"আমি জানি, বড় কষ্টে মানুষ যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা সে প্রাণ ধরিয়া বিলাইয়া দিতে পারে না—মনে তার একটু না একটু খুঁত থাকিয়াই যায়। কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। ইন্দ্রিয়জয়, ধৈর্য্য, দান, প্রশান্তি, দয়া, ধর্ম্ম, সত্য—তোমাতে তো সবই রহিয়াছে! তোমার সঙ্গ পাইয়া আমি কেবল সন্তুষ্ট নয়, ধন্য হইয়া গিয়াছি। স্বর্গ তো তোমার হাতের মুঠায়—দেবতারাও যে তোমার ত্যাগে ধৈর্য্যে মুগ্ধ। তুমি সশরীরে স্বর্গে যাইবে।"

বলিতে না বলিতেই হাঁস-সারস টানা দিব্য রথ লইয়া স্বর্গ হইতে দেবদূত নামিয়া আসিলেন। দেবদূত বলিলেন "মুদ্গল, কর্ম্মে আপনার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। কর্ম্মফলে আপনি স্বর্গলোক জয় করিয়াছেন—এই রথে চড়িয়া স্বর্গে চলুন।"

মুদ্গল উত্তর করিলেন, "বেশ কথা। কিন্তু স্বর্গবাসের কি গুণ, কি দোষ, তাহা বলুন তো। সাধুদের সঙ্গে সাত পা একত্রে চলিলেই তাঁহারা মানুষের বন্ধু হন; সুতরাং আপনি আমার বন্ধু। তাই বন্ধুভাবে আপনাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। কোনও সঙ্কোচ

না রাখিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলুন দেখি। আপনার কথা শুনিয়া তারপর স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া স্থির করিব।"

দেবদূত বলিলেন, "মুদ্গল, ভাবিয়াছিলাম, আপনি আর্য্যবুদ্ধি ; কিন্তু এখন আপনার কথা শুনিয়া তাহাতে সন্দেহ হইতেছে। যে স্বর্গ-সুখের তুলনা নাই, লোকে যাহার জন্য পাগল, সেই স্বর্গ যাচিয়া আপনার দুয়ারে উপস্থিত, আর আপনি এখন বিচার করিতে বসিলেন। এটা বুদ্ধির কাজ হইল না। যাক্, আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহাই বলি।

"স্বর্গ পুণ্যকর্ম্মাদিগের বিহারভূমি। সেখানকার ভোগ অফুরন্ত। সেখানে কাহারও ক্ষুধা পায় না, পিপাসা লাগে না, শীত গ্রীষ্ম থাকে না, শরীরের গ্লানি থাকে না—কুৎসিৎ কি অকল্যাণ কোনও বস্তুই সেখানে নাই। স্বর্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি ঘটে। শোক, দুঃখ, জরা, শ্রম—কিছুই সেখানে নাই। সেখানে কর্ম্মের ফলে দেহ উৎপন্ন হয়, পিতা মাতা হইতে তাহা জন্মায় না। স্বর্গে সকলের দেহই আলো দিয়া গড়া। এই দেহে ময়লা লাগে না, দুর্গন্ধ হয় না, অপবিত্র কিছু জন্মে না। স্বর্গবাসীদের গলার মালা কখনো শুকায় না, আভরণ ম্লান হয় না, দিব্য রথে চড়িয়া যেখানে-সেখানে তাঁহারা বিচরণ করিতে পারেন। ঈর্ষ্যা, শোক, ক্লান্তি, মোহ, মাৎসর্য্য—কিছুতেই স্বর্গবাসীদিগকে পীড়িত করে না।

"আবার এই স্বর্গের উপরেও এক লোক আছে—ঋভুরা সেখানকার অধিপতি। এই ঋভুরা দেবতাদিগেরও দেবতা, দেবতারাও তাঁহাদিগের আরাধনা করেন। সে লোকে আলোকের প্রয়োজন হয় না, সেখানে সকলই জ্যোতির্ম্ময়। যে যাহা চায়, সেখানে সে তাহাই পায়। ঋভুদিগের আশ্চর্য্য মহিমা—অন্য দেবতার মত তাঁহারা আহুতি গ্রহণও করেন না, অমৃতও খান না। তাঁহাদিগের দিব্য শরীর, অথচ কোনও মূর্ত্ত বিগ্রহ নাই। তাঁহারা সুখও চান না ; যেমন তাঁহাদের জরা মৃত্যু নাই, তেমনি হর্ষ প্রীতিও নাই—কল্পান্তেও তাঁহাদের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। ঋভুদিগের সুখ নাই, দুঃখ নাই—সুতরাং আসক্তিও নাই, বিরক্তিও নাই। মুদ্গল, আপনার কি ইচ্ছা হয় না, দানের পুণ্যে এই দেবদুর্লভ লোকে গিয়া বাস করেন ?

"তবে স্বর্গবাসের যে দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাও বলি। ইহ-জগতে যে যে-কাজ করে, স্বর্গে গিয়া সে তাহারই ফল ভোগ করে। সুতরাং নূতন করিয়া কোনও কর্ম্ম না থাকায়, কর্ম্মের ফলভোগ একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। ফল ভোগ হইয়া গেলে আবার পতন অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয়, স্বর্গবাসের এই একটী মাত্র দোষ। স্বর্গবাসীদের মন সুখে এমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, সে সুখ ছাড়িয়া আসিতে তাদের অসন্তোষ আর খেদের সীমা থাকে না। এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া আবার নিম্নলোকে নামিয়া আসিতে কাহার সাধ হয় ? কাজেই স্বর্গবাসী যখন দেখেন, গলার মালা শুকাইয়া আসিয়াছে, তখনই পতনের আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। স্বর্গসুখের এই যা একটু ত্রুটি।

"কিন্তু স্বর্গ হইতে পতন হইলেও সে ব্যক্তি মানুষের মাঝেই জন্মগ্রহণ করে—সেখানেও তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। তবে এমন অবস্থাতেও যদি তাহার জ্ঞান না জন্মে, তবে কর্ম্মফলে যে তাহার অধোগতি হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি ? যাক্, স্বর্গের সকল কথাই তো শুনিলেন, এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে চলুন।"

মুদ্গল বলিলেন, "তবুও তো স্বর্গের মাঝে খুঁত রহিয়াছে। আচ্ছা, এই দোষটুকুও নাই, এমন কোনও লোকের কথা আপনি জানেন না?" দেবদূত উত্তর করিলেন, "হাঁ জানি, ব্রহ্মলোকেরও ঊর্দ্ধে বিষ্ণুর পরম পদ; তাহা নিত্য শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ। বিষয়াসক্ত যাহারা, তাহারা তো তাহার সন্ধান পায় না। যিনি আসক্তিহীন, জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার অহঙ্কার নাই, শীতোষ্ণ সুখদুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব যাঁহাকে টল্‌ইতে পারে না, এমন ধ্যানপরায়ণ যোগ-যুক্ত পুরুষই সে পদের অধিকারী।"

দেবদূতের কথা শুনিয়া মুদ্গল বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া মনে মনে কি যেন বিচার করিলেন। তারপর দেবদূতকে বলিলেন, "ভাবিয়া দেখিলাম, অমন দোষের ভরা স্বর্গ-সুখ দিয়া আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। স্বর্গ হইতেও যখন পতন হয়, তাহার পরেও যখন নিদারুণ দুঃখ আর পরিতাপের অন্ত হয় না, তখন আর আমি স্বর্গ চাই না। যেখানে গেলে মানুষের শোক থাকে না, ব্যথা থাকে না, চাঞ্চল্য থাকে না, আমি সেই লোকের তপস্যাতেই প্রাণপাত করিব। সুতরাং আপনি যাইতে পারেন—নমস্কার!"

দেবদূতকে বিদায় দিয়া মুদ্গল প্রশান্ত চিত্তে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার নিন্দা স্তুতিতে, লোষ্ট্র কাঞ্চনে সমজ্ঞান জন্মিল; তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিলেন এবং ধ্যানের ফলে ক্রমে অসামান্য বল ও অনুত্তম বুদ্ধি লাভ করিয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইলেন।



শিক্ষা ও স্বাবলম্বন

বচন আছে, "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ।" কিন্তু এ তপস্যার পরিমাণ যদি পাঠ্য-অপাঠ্য পুঁথির বহর আর ডিস্‌পেপসিয়া-জীর্ণ স্বাস্থ্য দিয়ে নির্ণয় করা হয়, তাহলে শাস্ত্রবচনের মর্য্যাদা থাকে না। যা সহজ হয়েও কর্ম্ম-বিপাকে দুর্লভ হয়ে উঠেছে, তাকে পাওয়ার জন্য নিজকে তাপ দেওয়াই হচ্ছে তপস্যা। তপস্যায় ছোটকে ছাড়তে হবে—বড়কে পাওয়ার জন্য। বড় একটা সত্যের আদর্শ যদি পরোক্ষে অপরোক্ষে মনকে সামনের দিকে আকর্ষণ করবার সুযোগ না পায়, তবে তপস্যা কখনও যথার্থ হয়ে উঠতে পারে না। যে ছাত্র, সে জীবন আরম্ভ করেছে মাত্র; সমস্ত সমাজের মমতাভরা দৃষ্টি তার উপর—কেননা একদিন সে যোগ্য হয়ে এই সমাজের জটিলতার অন্ততঃ একটা গ্রন্থি-মোচন করবারও ভার নিবে, এ আশা সমাজ তার কাছে করে। কাজেই কেবল পুঁথি গিলাটাই তার পক্ষে চরম কর্ত্তব্য নয়—তাকে সব দিক দিয়ে মানুষ হতে হবে—তিল তিল সাধনায় এমন একটা সত্যের অধিকার তাকে অর্জ্জন করতে হবে, যা সমগ্র সমাজেরই একান্তভাবে মর্ম্মগত। জীবনের বাইরের রূপটা যেমন হয়েই ফুটে উঠুক না কেন, ভিতরের দিক দিয়ে সবল সহজ মনুষ্যত্বের গৌরবে সমগ্র সমাজের অন্তর-পুরুষের সঙ্গে যদি তার যোগ না থাকে, তবে তার শিক্ষা ব্যর্থ বলতে হবে। সমাজ যে তার শিক্ষার সময়টা সকল রকম আনুকূল্য

দিয়ে নিরঙ্কুশ করবার চেষ্টা করেছে, সে চেষ্টা তাহলে বৃথা হয়েছে।

এই জন্য প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকেই সমাজ তপস্যার দাবী করতে পারে। শিক্ষার যে ঋণ জীবনের প্রারম্ভে সমাজের কাছে প্রত্যেকের জমা হয়ে উঠেছে, সত্যের তপস্যায় তাকে পরিশোধ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। হয়ত সমাজ আজ তার দাবীর কথা ভুলে গিয়েছে; কিন্তু তা বলে ভগবানের হিসাবে তো দেনার অঙ্ক একটীও মুছে যায় নি—তাঁর ন্যায় বিচারে ঋণের ক্ষতি যে উভয়কেই সইতে হবে।

সরল মনুষ্যত্ব অর্জ্জন—এই হল তপস্যার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ধরেই শিক্ষার আদর্শকে আমাদের মনের মাঝে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। তপঃসাধনারও নানা দিক রয়েছে, তার মাঝে একটা স্বাবলম্বন। শিক্ষার সঙ্গে স্বাবলম্বনের কি সম্বন্ধ, তাই নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব।

স্বাবলম্বনের মাঝে যে রিক্ততা, যে পৌরুষ, যে সবলতা রয়েছে, তাকেই আমরা বিশেষ ভাবে লাভ করতে চাই। আমাদের দেশের ছাত্রজীবন যে বাহুল্যের আবর্জ্জনায় কতখানি ভারাক্রান্ত, অথচ সে যে কতখানি অশক্ত নিরুপায়, তা তো কারু অজানা নেই। হাত পাতলেই মিলে, এই নীতির উপর যদি জীবন গড়ে উঠে, তাহলে তাতে অশক্তি ছাড়া আর কি জন্মাবে? অবশ্য ছাত্রজীবনের চারদিকে যথেষ্ট পরিমাণে অবকাশ রচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এত অবকাশটুকু তো আবার বীর্য্য দিয়ে পরিপূর্ণ করা চাই, আত্মশক্তির উদ্বোধনে তাকে নিযুক্ত করা চাই। তা করতে হলেই সামাজিক জীবনের যে সমস্ত বৈচিত্র্য রয়েছে, তার সঙ্গে ছাত্রজীবনেরও ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন। সমাজ কথাটা আমরা এখানে ব্যাপক ভাবেই প্রয়োগ করছি —কৃত্রিমতার মাপে কাঁটাছাঁটা বিশিষ্ট কোনও সমাজ আমাদের লক্ষ্য নয়। বৃহৎ মানবসমাজের যে সমস্ত কর্ত্তব্য, যে সমস্ত দায়িত্ব, তাদের সঙ্গেই যদি ছাত্রের পরিচয় না ঘটল, তবে শুধু কতগুলি কেতাবের বুলি মুখস্থ করে তার কি কোন কার্য্যকরী শিক্ষা হবে? বর্ত্তমানের চলিত শিক্ষাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃত অনুশীলন হয় মাত্র। আর সেই অনুশীলনটুকুর সুবিধার জন্য,ছাত্রজীবনের চারদিক আমরা এমনি করে আটঘাট বেঁধে দিয়েছি যে, এই অনায়াসযাপ্য সঙ্কীর্ণ জীবনের পরপারেও যে জীবনসংগ্রামের একটা ক্ষেত্র রয়েছে, মানুষের কর্ত্তব্যের একটা বৃহত্তর ভূমি রয়েছে, শিক্ষার্থী তার কোনও সন্ধানই পায় না। নিতান্তপক্ষে এই বৃহত্তর কর্ম্মজগতের সে দর্শকমাত্র, এর সুখ দুঃখের প্রতি তার ঔদাসীন্য ছাড়া কোনও শ্রদ্ধা বা মমতার ভাব নাই। অথচ এমনি করে অনভ্যস্ত জীবনের উপর যখন শিক্ষান্তে সংসারের দায়িত্ব চেপে বসে, তখন তার যে কি দুর্দ্দশা ঘটে, তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কর্ম্মজীবনের প্রতি শুধু ঔদাসীন্যই নয়—ছাত্রজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য আধুনিক সামাজিকের অনুমোদিত যে সমস্ত ব্যয়বহুল ব্যবস্থার পত্তন আমাদের দেশে হয়েছে, তাও জীবনকে অন্তঃসারহীন করবার পক্ষে কম সাহায্য করে না। শিক্ষার মাঝে যদি তপঃকৃচ্ছ্রতার আদর্শ প্রচার থাকত, তাহলে সেটা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক হত। ঐশ্বর্য্যের কোলে যার জন্ম, সে যদি শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নেয়, তাতে তার ক্ষতি বা অগৌরবের কোনও কারণ ঘটে না,

কেননা দুঃখের ভূমিতে সাম্যই আত্মবিকাশের অনুকূল। কিন্তু শিক্ষা জীবনের আদর্শ যদি সমাজের গুটীকতক স্বচ্ছল ব্যক্তির জীবনের আদর্শে গড়ে তোলা হয়, আর সৌষ্ঠব ও সুব্যবস্থার দোহাই দিয়ে গরীব-দুঃখীর ছেলেকেও যদি সেই উচ্চ মঞ্চে টেনে তোলা হয়—তাহলে এই আপাতমনোরম সুখের সাম্য পরজীবনে যে বৈষম্যটুকু ঘটাবে তার জন্য দায়ী হবে কে? নাগরিক সভ্যতার বনিয়াদের উপর শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করতে গিয়ে এই ভুলটী ঘটছে। দেশের কর্মশক্তি, প্রাণশক্তি যেখানে যথার্থ পরিপুষ্ট হচ্ছে, সেখান হতে ছাত্রের জীবন নির্ব্বাসিত। সেখানকার যে দুঃখ-দ্বন্দ্ব, যে কর্ম্ম-প্রবাহ, যে আশা-আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন, তার ছোঁয়াচ হতে বাঁচিয়ে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ইন্দ্রজালে তাকে মুগ্ধ করলেই কি শিক্ষা সার্থক হবে? যে ঐশ্বর্য্যের অভিনয়ের সঙ্গে অধিকাংশ ছাত্রেরই হয়ত পরজীবনে কোনও সম্বন্ধ থাকবে না, তার পাঠটা এখন হতেই অভ্যাস করানো কি বড় সুখের হবে? আর সম্বন্ধ থাকলেও কি বাহুল্যকেই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে স্বীকার করতে হবে?

শিক্ষার সমস্তটাতেই যে এমনি করে বিলাস-ব্যসন দিয়ে শিক্ষার্থীর মনুষ্যোচিত সবল অধিকারগুলিকে খর্ব্ব করা হয়, এর চেয়ে দুর্দ্দৈব আর কি হতে পারে? উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে হলেই যে নাগরিক সভ্যতার আশ্রয় নিতে হবে, এই অন্ধ সংস্কার থেকেই এমনতর বিপত্তি ঘটছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মাঝেও মানবজাতির সমগ্র বিবর্ত্তনের ধারার পুনরাভিনয় হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিকের এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে যে যুগে মানুষ নগর-সভ্যতার পত্তন করতে শিখেনি, সেই যুগের প্রাকৃতিক আবহাওয়াটা প্রাথমিক শিক্ষা-জীবনে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখা নিশ্চয় শিক্ষার্থীর শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টির পক্ষে অনুকূল হবে। শুধু প্রকৃতিকে ফিরিয়ে আনা নয়, তার সঙ্গে জীবনের সেই সরল আদর্শও ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সে আদর্শ আমাদের দেশ থেকে এখনও তো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি, এখনও তো তাকে আমরা বহু শতাব্দীর অতীত জীর্ণ স্মৃতির কোঠায় ফেলে দিইনি। সভ্যতার উন্নতির (!) সঙ্গে জীবন ক্রমই জটিল হয়ে উঠছে, তা দেখতে পাচ্ছি; কাজেই আগেকার মত বনের কোলে ছোট একটী পাতার কুটীরের কল্পনা কতদূর কাজে-করী হবে, তাতে সন্দেহ করবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিন্তু বাইরের খোলসটাই না হয় বদলিয়েছে, তা বলে মানুষের অন্তরের যে প্রয়োজন ছিল, তার কি কোনও অদলবদল হয়েছে? জটিল নাগরিক সভ্যতা গড়ে তুলেছি বলেই যে চিরদিন তার বোঝা বয়ে বেড়াতেই হবে, এমন কোনও বাধা-বাধকতা আছে কি? সভ্যতার গুণ অনেক, কিন্তু তাই বলে তার দোষগুলির সংস্কার চেষ্টার কি কোনও প্রয়োজন নাই?

সমাজ-জীবনের কৃত্রিম অভাবগুলিকে খাটো করে তথাকথিত-সভ্যতার বাহুল্যকে ছাঁটা যায় কি না, সে প্রশ্ন না হয় এখন থাক। কিন্তু উপস্থিত মানুষের জীবনের অন্ততঃ একটা অংশকেও কি করে সভ্যতার নাগপাশ হতে মুক্ত করা যায়, তাই আমাদের ভাবতে হবে শিক্ষাকে ভিতর বাইর সব দিক দিয়ে আবার প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে নেওয়া চলে কি না, তাই দেখতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শের একটা বিষময় ফল এই দেখতে পাচ্ছি, এতে

শিক্ষার্থীর মন একটা আড়ষ্ট সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনের মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে থাক্‌ছে, জীবনের মাঝে কোন প্রচেষ্টার গতি সে অনুভব করছে না, নগরের বাইরে দেশের যে সত্য সবল রূপ, তার করুণা তার হৃদয়কে স্পর্শ করছে না,—কতকগুলি কৃত্রিম অভাব, কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে, তারই পরিপূরণে জীবনটাকে নিয়োজিত করাই সে পুরুষার্থ ভাব্‌ছে। সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, এতে সবরকমে তার পরনির্ভরতাই বাড়্‌ছে, নিজের মাঝে পুঁথি মুখস্থ করার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ছাড়া আর কি শক্তি যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার পরিচয় সে পাচ্ছে না। এই জন্যই দেখা যায়, বহু আড়ম্বরে, বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষার পাঠ সাঙ্গ করে ছেলে যখন ঘরে ফিরে এল, তখন কৌলিক প্রথা অনুযায়ী চাকরীর চেষ্টা ছাড়া তার উদ্ধারের আর কোন উপায় রইল না। আজকাল Vocational trainingএর কথা উঠেছে বটে, কিন্তু তার মাঝেও যদি, কতখানি কম চেষ্টায় বিলাতী বিদ্যার আধুনিকতম কল-কৌশলগুলি হাতড়াতে পাবর, এই চেষ্টাটাই প্রবল হয়, তাতে তো তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল দুই-ই যাবে।

সহরে থেকে জান্‌ছি পয়সা দিলেই সব মিলে; কাজেই যা যখন দরকার, পয়সা দিয়েই তা কিনে আন্‌ছি—একটা জিনিষ উৎপন্ন করবার কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব নাই, দরকার মত পয়সা দিলেই হল। এই অর্থ-বিনিময় নীতির উপর সমস্তটা জীবন দাঁড় করানো ছাড়া যে আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না, তা তো মনে হয় না। এখনো আমাদের দেশের এমন অবস্থা হয়নি যে সূক্ষ্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-কৌশলের উদ্ভাবনে আমরা সকলেই এত ব্যস্ত থাকি যে নিজের প্রয়োজনটুকু পয়সা দিয়ে মিটানো ছাড়া নিজ হাতে করে নিবার ফুরসৎ আর হয় না। অপরের পক্ষে কেমন ব্যবস্থা সম্ভব, তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু অন্ততঃ যারা বিদ্যার্থী তাদের তো অবকাশের নিতান্ত অভাব নাই, তাদের কেন করে খাওয়ার খেটে-খাওয়ার বিদ্যাটা আমরা শিখাই না? অবশ্য বিলাতী ধরণে দশটার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে পুঁথিপত্তর সামনে জড়ো করে লেকচার দিয়ে ও-বিদ্যা কতখানি শেখানো যায়, তা জানি না। কিন্তু জীবনের আদর্শ সরল করে, শিক্ষার মন্দিরে পল্লীর স্নিগ্ধতাটুকু সঞ্চারিত করে, ঠিক গ্রামের মাটীতে পা দিয়ে যে অনায়াসে এ বিদ্যা আমরা লাভ করতে পারি, তা বিশ্বাস করি। কিন্তু মূলে ঐ একটা কথা—সহরের লোভ ছাড়তে হবে, জুতা জামার কদর ভুলতে হবে, দেশ-মায়ের ধূলায় বিছানো আঁচলখানিতে আসন নিতে হবে। এই সরলতাটুকু চার-দিকে বজায় রেখে কি উচ্চ শিক্ষার আমদানী করা যায় না? একটু আলো-হাওয়া, দু-চারটা গাছপালা, সকালে সন্ধ্যায় একটু পাখীর গান, দু' চারটী হাতে-পায়ে-খেটে-খাওয়া সহজ মানুষের সরল মুখ—উচ্চাঙ্গের বৈদেশিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কি এমন আসরে নামলে জাত যাবে? তা ছাড়া যারা তার আলোচনা করবে, পৃথিবীর ধুলার সঙ্গে তাদের সংস্পর্শ কি দোষের হবে? আমাদের দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তো এত কৌলীন্য ছিল না। উপনিষদ্-জ্ঞানের রাজা রাজর্ষি জনকও তো লাঙ্গলের খুঁটীতে হাত দেওয়াটা বর্ব্বরতা মনে করেন নি। কেবল আমরাই আমাদের যজ্ঞ-ভূমি পরকে দিয়ে চষাব?

স্বাবলম্বনের মুখ্য অর্থটা আমরা সরল জীবন যাপনের দিক দিয়েই দেখ্‌ছি। এর

ইকনমিক ফল কি হবে, ইকনমিষ্ট তার লাভ লোকসান খতিয়ে দেখুন; আমরা কেবল এইটুকু দেখছি, এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফল কি দাঁড়াবে। বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের যেটুকু লাভ হচ্ছে, এর দরুণ তার মাঝে তো কোন কমতি পড়বে না—বরং সময়ের নষ্ট উচ্ছৃঙ্খল অপব্যয় এতে সঙ্কুচিত হবে। নিজে করবার, নিজে খাটবার সুযোগ যদি থাকিত, তাহলে আত্মগৌরব বজায় রেখে অনেক গরীবের ছেলেরও যেমন শিক্ষার সুব্যবস্থা হত, দুঃখের তপস্যায় ধনীর সন্তানের মনুষ্যত্ব বোধও তেমনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠত। এই সঙ্গে প্রাচীন যুগের একটা কথা মনে পড়ে। আধুনিক সভ্যতার বিকারে যে socialism মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তার একটা ব্যবস্থা প্রাচীন সমাজপতিরা গোড়া হতেই করে রেখেছিলেন। তবে তার প্রণালীটা ছিল psychological; শিক্ষার সময়েই ধনী আর গরীবকে তাঁরা একই জোয়ালে যুড়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে উভয়ের মনে যে democratic মনোবৃত্তি জাগত, তাতে কারো ন্যায্য অধিকারের উপর অন্যায় জবরদস্তি না করেও, সমস্তটা সমাজে প্রচ্ছন্ন socialismএর একটা একটানা স্রোত বয়ে যেত। আজকালকার যুগেও যদি সরল জীবনের আদর্শে আমরা এমনিতর একটা স্বাবলম্বী শিক্ষার্থীর সমাজ গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সভ্য সমাজের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য স্বীকার করেও কি ভিতরে ভিতরে সমাজকে democratic করে তোলা যায় না?

কিন্তু democracyর কথা এখন থাক। স্বাবলম্বনের শিক্ষায় আমরা যে জিনিষটী চাই, সে হচ্ছে আমাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন। অবশ্য democracyর কথা এর মাঝে আসবেই, কেননা প্রত্যেক মানুষের আত্মার মর্য্যাদা স্বীকার করে, তার উপর বিনা প্রয়োজনে কর্তৃত্ব করবার লোভ যদি সম্বরণ করতে না শিখি, কৃত্রিমতার বেড়াজাল হতে মুক্ত করে জীবনকে যদি স্বচ্ছন্দ ও স্বল্প-সন্তুষ্ট না করতে পারি, তবে স্বাবলম্বনের কোনও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যই থাকে না। তবে একথা সর্ব্বাগ্রে জানতে হবে, নিজের উপর যথার্থ শ্রদ্ধা জন্মালেই পরকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি জন্মে। কাজেই আগে আমাদের মাঝে "স্ব" কোথায়, তাই বুঝে নিয়ে তাকে অবলম্বন করে জীবনকে গড়ে তুলতে পারলেই আমরা যথার্থ স্বাবলম্বী হব। তপস্যা নিজকে খুঁজবার জন্য। স্বভাবতঃই আমরা বহির্ম্মুখ হয়ে জন্মেছি—এর উল্টা দিকে মোড় ফিরে না দাঁড়ালে "স্ব"-এর সাক্ষাৎ পাব কোথায়? কিন্তু ভিতরের দিকে না তাকিয়ে যদি বাইরের আবরণগুলিকেই আরও পুরু করে তুলি, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে কি আমরা আরো দূরে সরে পড়ব না? এইজন্যই তো বলি জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে বাইরের জঞ্জালগুলোকে সকলের আগে বিদায় করা—ঠিক প্রকৃতির আইন বুঝে, যতটুকু নইলে নয়, ততটুকুতেই তৃপ্ত থাকা। স্বাবলম্বীর পক্ষে সরল জীবনের আদর্শ এই জন্য সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। বাইরের খাঁকতি যদি না কমে, তাহলে ভিতরের খোঁজ কোন দিন মিলবে না।

কিন্তু জীবনকে সরল করতে হলে সর্ব্বদা লড়াইর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে—কারণ আমরা সংস্কার ছাড়তে চাইলেও সংস্কার তো সহজে আমাদের ছাড়তে চাইবে না। এইজন্য অনেক গুণ অর্জ্জন করা প্রয়োজন হবে—তাই হল স্বাবলম্বনের সাধনা। প্রথম চাই তিতিক্ষা; শরীরের তিতিক্ষাও যেমন

চাই, মনের তিতিক্ষাও তেমনি চাই। কিন্তু তিতিক্ষা তখনই সহজ হবে, যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা থাকবে। মনের মাঝে যদি পর্য্যাপ্তি-বোধ না জন্মে, তাহলে জীবনকে সরল করবার জন্য অল্প আয়োজন নিয়ে কাজ সুরু করলেও মনের লোলতা তাকে নানা অছিলায় বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করবেই। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করতে গিয়ে চেষ্টাকেও যদি খর্ব্ব করি, তাহলে আবার একটা ভুল করা হবে। আত্মার শক্তি তো এতে উদ্বুদ্ধ হবে না। তা হলে চেষ্টাকে জাগ্রৎ রেখে যে শক্তি সঞ্চয় করব, নিজ প্রয়োজনে তার স্বল্পমাত্র অংশ রেখে উদ্বৃত্তটুকু নিয়ে কি করব? এইখানেই স্বাবলম্বী, সমাজ গড়ে তুলবে। তার "স্ব"-এর তাৎপর্য্য তো কেবল অহং-এর মাঝেই সঙ্কুচিত নয়;—তাই আত্মার মাঝে যে মহত্ত্ব, যে প্রেম রয়েছে, তাকে আশ্রয় করেই নিজকে তার উৎসর্গ করতে শিখতে হবে। এই উৎসর্গের দীক্ষা যারা নিয়েছেন, তাঁরা জানেন—নিজের চেষ্টায় কোনও কিছু লাভ করবার ভাগ্য যাদের হয়নি, তাদের দান করবার অধিকার কিছুতেই জন্মায়নি। পরের ধনকে গ্রাস করবার বেলাতেই তাদের মমতার পরিচয় মিলে, নিজের ধনকে বিলিয়ে দিয়ে পরকে মমতার টানে তারা টানতে পারে না।

স্বাবলম্বনের শিক্ষার এই চরম লক্ষ্য। সকল হতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে, রিক্ত করে, আঘাত সয়ে বেদনা বয়ে, আমাদের চলতে হবে—কিসের জন্য?—নিজকে উদ্বুদ্ধ করে পরের প্রয়োজনে বিলিয়ে দিবার জন্য। নিজকে নিঃসঙ্গ করা নিজের একান্ত-ভোগের সুবিধার জন্য নয়,—নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করে আত্মার ব্যাপ্তি উপলব্ধি করবার জন্য। এর মাঝে কোনও আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের কথা নাই—এ ধর্ম্ম যাজন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। গৃহী তার নিত্যকার গৃহকর্ম্ম সমাপন করেও,—কার্য্যতঃ সব সময় না হোক্—অন্ততঃ চিন্তাতেও আপনাকে সকলের সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে অনুভব করতে পারে, যদি তার যৌবনের শিক্ষায় তার মাঝে অহং-তৃপ্তির বাইরেও কোনও উদার ভাব জেগে থাকে। সব দিক দিয়ে নিজের শক্তিকে অনুভব করবার সুযোগ যার হয়নি, পরের জন্য যথার্থ ভাবে সে ভাবতে শিখবে কি করে?—সে তো সঙ্কটের সঙ্গে হাতে পায়ে যুঝে জীবনের বাস্তব আস্বাদ কোনও দিন পায়নি; সে কি করে বুঝবে—অবস্থার পীড়ন যাকে বইতে হচ্ছে, তার কি ব্যথা? আমাদের শিক্ষার মাঝে জীবনের এই যথার্থ আস্বাদ পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নাই বলেই পরের জন্য দুঃখ দরদটা কেবল কান্নাতেই ফুটে উঠে—হৃদয় দিয়ে ব্যথা বুঝতে পারি না বলে তার প্রতিকারের মাঝেও অদূরদর্শিতা, আত্মপ্রবঞ্চনার অভাব থাকে না।

তাই বলি, শিক্ষার ব্যবস্থাটা আমাদের গোড়া হতে পরিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়, জীবনগঠনের কাজেও শিক্ষানীতিকে প্রয়োগ করতে হবে। কেবল সামাজিক স্তরের কোঠায় কোঠায় ভাগ করে জীবনকে পঙ্গু করা নয়, মানুষের সকল প্রচেষ্টা, সকল সংগ্রাম, সকল বিপত্তির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা চাই। মানবজীবনের বৈচিত্র্য বুঝবার রসবোধ তখনই জন্মাতে পারে, যখন বোদ্ধার নিজের জীবন থেকে সমস্ত সংস্কারের আবর্জ্জনা খসে পড়ে তার অনাড়ম্বর নির্ম্মল আদিম মানুষের রূপটিই

ফুটে উঠেছে। আবার এই বোঝার সঙ্গে সঙ্গে অসত্যকে পরাজয় করবার জন্য, দুর্ব্বলতাকে উদ্ধার করবার জন্য, অক্ষমতাকে ক্ষমা করবার জন্যও শক্তি থাকা চাই। তপস্যা ভিন্ন এ শক্তি আসবে না। সে তপস্যা সমাজের প্রত্যেক সন্তানেরই কর্ত্তব্য। তপস্বী সমাজ-সন্তানের আত্মোৎসর্গে সমাজ দৃঢ় হবে, তার অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে। যাতে এমনি সত্যোন্মুখী উদার দৃষ্টিসম্পন্ন সন্তান গড়ে উঠে, তার জন্য কি সমাজের কোন দায়িত্বই নাই?

শিক্ষার্থীকে আত্মশক্তি উদ্বোধনের শিক্ষাই দাও। সে যেন মুহূর্ত্তের জন্যও মনে না করে যে, কর্ম্ম-বিমুখ হয়ে অপরের উপার্জ্জনে নিজকে বাঁচিয়ে রাখার মাঝে কোনও গৌরবই নাই। শুধু কোনও রকমে টিকে থাকাতেই তার জীবনের সার্থকতা নয়, সব দিক দিয়ে নিজকে ব্যক্ত করে তুলতে পারলেই তবে সে সমাজের ঋণ শোধ করতে পারবে। দেহ, মন, আত্মা—এই তিন নিয়ে মানুষ, মানুষ! আত্মশক্তিকে কেন্দ্র করে দেহের কর্ম্মশক্তি আর মনের মনীষা উভয়কেই জাগ্রৎ করতে হবে ও পরস্পরের কল্যাণে তাকে ব্যাপৃত করতে হবে। এই হচ্ছে শিক্ষাদানের পথ ও লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে এই পথ ধরাতে পারলেই ভগবান আমাদের মাঝে জেগে উঠবেন—তাঁর বাণীর সঙ্গে আমাদের সার্থক পরিচয় ঘটবে।

বেদান্ত-সার

(৭)

নৈয়ায়িক বলিতেছেন, প্রতিবন্ধকাভাব কার্য্যোৎপত্তির একটা সাধারণ নিমিত্ত। এ মানিতে হইলে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাই উত্তরপক্ষে বেদান্তী বলিতেছেন, প্রতিবন্ধকাভাবকে যদি কারণ বল, তবে তাহা কি রকম কারণ? কার্য্যের যে সমস্ত কারণ দৃষ্ট, তাহাদের দলেই ইহাকে ফেলিবে, না যেগুলি অদৃষ্ট কারণ, তাহাদের দলেই ধরিবে? যদি দৃষ্ট কারণের মাঝে ধর, তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই—মনে কর, কেহ আগুন জ্বালিতে চাহিতেছে। এখানে আগুনের দাহ হইল কার্য্য; এই কার্য্য ঘটাইতে হইলে কাষ্ঠ প্রভৃতি সহবৃত্তি দৃষ্ট কারণগুলি তাহাকে মনে মনে আঁচিয়া জুটাইয়া লইতে হইবে। প্রতিবন্ধকাভাবও যদি দৃষ্ট কারণের মাঝে ধরা যায়, তাহা হইলে কাঠ খড় জোটানোর মত, সহবৃত্তি প্রতিবন্ধকাভাবকেও বাছিয়া বাছিয়া জুটাইয়া লইতে হইবে—তবেই আগুন জ্বালাইবার প্রবৃত্তি সম্ভব হইবে। কিন্তু এমন ভাবে অভাবজ্ঞান লইয়া প্রবৃত্ত হইতে তো কাহাকে দেখা যায় না। সাধারণতঃ, কর্ত্তা ভাবরূপ নিমিত্তগুলিই জোটায়, অভাবকে নিয়া টানাটানি করে না। তা ছাড়া প্রতিবন্ধকাভাবের জ্ঞান যদি বাস্তবিকই নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে এমনও হইতে পারে যে, কোনও ব্যাপারে প্রতিবন্ধকের সহবৃত্তিই থাকা সত্ত্বেও তাহার অভাবসম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান আছে বলিয়া কার্য্যের অনুৎপত্তি হইবে না; কিন্তু তাই কি সম্ভব? যদি বল, এখানে প্রতিযোগী প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও যে তাহার অভাব জ্ঞান হইল, এ তো ভ্রম। আচ্ছা বেশ, এ যদি ভ্রমই হইয়া থাকে, তাহা

হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পক্ষে তোমার প্রতিবন্ধকের যোগ্যতা নাই মানিতে হইবে। প্রতিবন্ধকেরই যদি যোগ্যতা না থাকে, তবে তাহার অভাবের যোগ্যতা আবার আসিবে কোথা হইতে? কাজেই প্রতিবন্ধকাভাব যে দৃষ্ট কারণ, এ কথা বলা চলে না।

তারপর ইহাকে অদৃষ্ট কারণের মাঝেও ধরা চলে না। অদৃষ্ট কারণগুলি কি?—ঈশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা, জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট (সুখ-দুঃখের ইহারা অসাধারণ কারণ), দেশ-কাল, কিম্বা সূর্য্যাদি গ্রহসঞ্চারের ক্রিয়া—এগুলি আমাদের অপ্রত্যক্ষ, তাই অদৃষ্ট। কিন্তু ইহারা তো সকলেই ভাবাত্মক; কাজেই প্রতিবন্ধকের অভাবকে তো ইহাদের কোঠায় ঠেলিয়া দেওয়া চলে না। তবে যদি বল, এই সমস্ত ছাড়াও এমন একটা সর্ব্বসাধারণ অদৃষ্ট কারণ রহিয়াছে, যাহা নির্ব্বিশেষে সকল কার্য্যেরই নিমিত্ত, প্রতিবন্ধকাভাব তাহারই অন্তর্গত, তবে এমন অদৃষ্ট কল্পনা তো একটা খামখেয়ালী ব্যাপার হইয়া যায়। আমার গোঁ আমি বজায় রাখিবই, তাই একটা আজগুবি কল্পনা করিয়া বসিলাম; বিচারে তো তা চলে না।

তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। এমনও তো ব্যাপার দেখা যায় যে, প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও কোনও উত্তেজক কারণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হইল। কাজেই এমন ব্যাপারে প্রতিবন্ধকাভাবকে আর কি করিয়া কারণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি? যদি বল, উত্তেজকাভাববিশিষ্ট প্রতিবন্ধকাভাবকে কারণ বলিব, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এটাও শুধু একটা সংজ্ঞাকে টানিয়া লম্বা করা নয় কি? উত্তেজকাভাববিশিষ্ট বলিয়া কি প্রতিবন্ধকের সাধারণ জ্ঞান জন্মায়? তাহা হইলে তাহার অভাবের জ্ঞানটাই বা কোথা হইতে জন্মাইবে যে তাহাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব? আর যদিও বা এই সমস্তই সম্ভব হয়, তবু যে জায়গায় উত্তেজক কারণ রহিয়াছে, সে জায়গায় প্রতিবন্ধকাভাবরূপ কারণতার গতি কি হইবে?

ইহা ছাড়া আরও একটু সূক্ষ্ম আপত্তি আছে। প্রতিবন্ধকাভাব কথাটায় কার্য্যোৎপত্তিরূপ ব্যাপারের প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে, নিমিত্তের কোনও সুস্পষ্ট, বাস্তব ও ব্যাপারবিশিষ্ট সংজ্ঞা ইহাতে পাওয়া যায় না। যদি নিমিত্ত মানিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহার বিরোধী সত্তাকে মানিয়া কার্য্যের অনুৎপত্তি হইবে—একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কি উৎপত্তি কি অনুৎপত্তি উভয় স্থলেই নিমিত্ত বা তাহার বিরোধীকে আমরা বিশিষ্ট বাস্তব পদার্থরূপেই পাইতেছি। নিমিত্তের বেলায় এই বাস্তব সত্তাই হইল প্রধান; ইহাকে ধরিয়াই ক্রিয়ার সূচনা, কেননা ক্রিয়া বস্তুরই আশ্রিত। এইটুকু যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে নিমিত্ত থাকা সত্ত্বেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে অনুৎপত্তির বাস্তব নিমিত্তের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, বিরোধী নিমিত্তের সংসর্গ বশতঃই কার্য্যের প্রতিবন্ধক জন্মিয়াছে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অস্পষ্ট সংজ্ঞা, সুতরাং তাহা পরের কথা; আর বিরোধীর সংসর্গ বাস্তব সংজ্ঞা, তাহাই হইল আগের কথা। তবেই দেখিতেছি, প্রতিবন্ধকাভাবকে যদি মানিতে

হয়, তাহা হইলে তাহার আগেও বিরোধীর সংসর্গাভাবকে মানিতে হইবে—নিমিত্তের বাস্তবতা সর্ব্বদা সুস্পষ্ট রাখিতে হইবে বলিয়া।

এইখানেই একটা কথা উঠে। প্রতিবন্ধকাভাবকে যদি কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহা যে কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাও মানিতে হইবে, কেননা কারণ মাত্রেই কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপার মাত্রেই তো কারণ নয়; এইজন্য কারণের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বকে একটু যাচাই করিয়া লইতে হয়। তাই বলা হয়, যে বস্তুর নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অন্যথা-সিদ্ধ নহে অর্থাৎ কার্য্যের সঙ্গে জুড়িয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে যাহার নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না, তাহাই কারণ। নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব যদি অন্যথা-সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কারণত্ব প্রতিষ্ঠা করা চলিবে না। অন্যথা-সিদ্ধি নানা রকমে হইতে পারে। তার মধ্যে একটা লক্ষণ এই, যাহা নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্যের সঙ্গে অন্বয় ব্যতিরেক সম্বন্ধে যুক্ত থাকে না, কিন্তু কারণকে ধরিয়াই যাহার অন্বয় ব্যতিরেক সম্বন্ধ ধরা চলে, তাহা অন্যথা-সিদ্ধ। উদাহরণ দেওয়া হয়—দণ্ডরূপ। দণ্ড ঘটের কারণ, ইহা স্বীকৃত। কাজেই কার্য্যের সঙ্গে তাহার অন্বয়-ব্যতিরেক আছে, অর্থাৎ দণ্ড থাকিলে ঘট হয়, (অন্বয়), কিন্তু দণ্ড না থাকিলে ঘট হয় না (ব্যতিরেক)। আবার দণ্ডের রূপ নিশ্চয়ই থাকিবে। যদি বলি দণ্ডরূপ থাকিলে ঘট হইবে, না থাকিলে ঘট হইবে না, তবে সেটা হাসির কথা হইলেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, কেননা অন্বয় ব্যতিরেক সম্বন্ধ এখানেও আছে বই কি? কিন্তু তাই বলিয়া দণ্ডরূপ কি ঘটের কারণ হইবে? না—কেননা দণ্ডকে মানিয়া তবে দণ্ডরূপ মানিতে হয়। সুতরাং ঘটের সঙ্গে নিরপেক্ষ ভাবে তাহার অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধ হয় কি করিয়া? কাজেই নিরপেক্ষ ভাবে যাহা অন্বয়-ব্যতিরেক-শালী নহে, তাহার নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অন্যথা-সিদ্ধ।

এই বিচার প্রতিবন্ধকাভাব ও সংসর্গাভাবের বেলাতেও খাটে। উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা দেখাইয়াছি, তাহাতে বলা চলে যে প্রতিবন্ধকাভাবের অন্বয়-ব্যতিরেক অন্যনিরপেক্ষ নহে—তাহা বিরোধি-সংসর্গাভাবেরই বিষয়ীভূত। কাজেই যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অন্যথা-সিদ্ধ, তাহা কারণ হইবে কি করিয়া? যদি বল, সাক্ষাৎভাবে কারণ না হউক, বিরোধিসংসর্গাভাবকে মানিয়াই তাহাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা হউক, তাহাতেও আপত্তি হইবে। বিরোধী আমরা কাহাকে বলি? উৎপত্তি-হেতু কিম্বা স্থিতি-হেতু থাকা সত্ত্বেও উৎপত্তি কিম্বা স্থিতির বিঘটক যাহা, তাহাই বিরোধী। এইটাই সুনির্দ্দিষ্ট; তাহার অভাব হইল একটা অনিরূপিত সংজ্ঞা। যদি বিরোধিসংসর্গের অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অভাবই হয় মুখ্য আর তাহার প্রতিযোগী বিরোধী সত্তা হয় গৌণ। অর্থাৎ অভাব মানিলে তবে প্রতিযোগী বিরোধীকে মানা চলে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিরোধীকে মানিলেই তবে অভাবকে মানা চলে, কেননা সুনিরূপিত ভাব হইতেই অনিরূপিত অভাবের কল্পনা সম্ভব। কাজেই অভাবকে কারণ-সমুদায়ে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তবে বিরোধীকে পাইব, আবার বিরোধীকে পাইলে তবে তাহার অভাবকে পাইব—এই অন্যোন্যাশ্রয়

হইতে কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে? অতএব বাধ্য হইয়া নিরোধি-সংসর্গাভাবকে কার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধকাভাবের কারণ হইবার দাবীও চলিয়া যায়। এই বিচার এই পর্য্যন্তই থাক্—বার্ত্তিকের কথায় সায় দিয়া আমরাও বলি—"অলমতিকল্পনেন।"

নৈয়ায়িকের প্রাগভাবকেও কার্য্যোৎপত্তির কারণ বলা যায় না। প্রাগভাব কি, না প্রাক্‌কালীন অভাব। যদি তাহাকে কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিয়ত প্রাক্‌কালবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে অভাবের বিশেষণ যে কাল, তাহার আত্মাশ্রয়তা দোষ ঘটে। আবার কেবল মাত্র প্রাগভাবত্বটুকু ধরিয়া তাহাকে কারণ বলা চলে না, কেননা তাহাতে কারণের সম্পূর্ণ লক্ষণ খাটে না।

তারপর—কারণের ধর্ম্ম কারণত্ব; এ ধর্ম্ম ভাবাত্মক না অভাবাত্মক? যদি ভাবাত্মক হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও অভাবনিষ্ঠ হইতে পারে না, অর্থাৎ অভাবের কারণত্ব কখনও ভাবাত্মক ধর্ম্ম হইতে পারে না, কেননা পরস্পরবিরোধী ভাব এবং অভাবের মাঝে আধার ও আধেয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব। যদি কারণত্ব অভাবাত্মক ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলেও তাহা অভাবনিষ্ঠ হইতে পারে না, কেননা অভাব নির্ব্বিশেষ, নিরাত্মক; উভয় স্থলেই যেখানে অভাব, সেখানে আশ্রয়-আশ্রয়িভাব কি করিয়া সম্ভব?

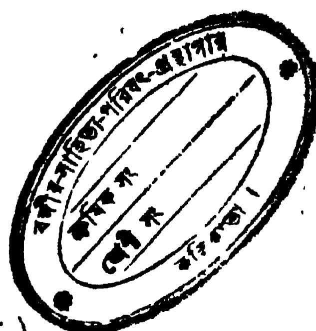
কাজেই কোনও অবস্থাতেই অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। এতদূর আসিয়া উত্তরপক্ষী নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, যদি কোথাও কোন কারণে অভাবেরও কারণত্ব থাকে, তথাপি প্রত্যবায়ের হেতু যে অকরণ, এ কথা স্বীকার করা যায় না। কেননা প্রত্যবায় শব্দে পাপরূপ অদৃষ্ট কিম্বা তজ্জন্য আগামী কোনও দুঃখকে বুঝাইয়া থাকে, শ্রুতি বলিতেছেন, এই সমস্ত দুঃখ নিষিদ্ধকর্ম্ম করিলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে—অকরণ হইতে নহে—যথা, "পাপকারী পাপো ভবতি" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫); "অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্‌" (ছান্দোগ্য ৫।১০।৭)।

অতএব, নিত্য কর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায়ের সাধক, ইহার অর্থ নিত্যকর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায়ের জ্ঞাপক—ইহাই বুঝিতে হইবে।

নিত্যকর্ম্ম লইয়া এই দীর্ঘ বিচারের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য হইল এই—"যাহা না করিলে প্রত্যবায় হইবে, তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম বলে" এমন লক্ষণ করা চলে না, কেননা তাহা হইলে জ্ঞান হইবার পর যখন কর্ম্মের বন্ধন থাকে না, তখনও এই লক্ষণের জোরে অকরণের প্রত্যবায় আশঙ্কা হইতে জ্ঞানী রেহাই পান না। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম যে জ্ঞানীকেও করিতে হইবে এই বন্ধন হইতেও যে তিনি মুক্তি পাইবেন না—এ কথা অশ্রদ্ধেয়। এই জন্যই বেদান্তী "অকরণ হেতু প্রত্যবায় হয়" এই কথাতেই আপত্তি দিয়া বলিতেছেন—এমন ব্যাখ্যা কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না, কারণ 'অকরণ' হইল অভাবাত্মক আর প্রত্যবায় হইল ভাবাত্মক। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইবে কি করিয়া? নিজের এই মতটী দৃঢ় করিবার জন্য, অন্যান্য দার্শনিকেরা যেখানে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তির কোনও নিশানা দিয়াছেন, বৈদান্তিক সেখানেই তর্ক করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সমস্ত বিচার সূক্ষ্ম ও জটিল বলিয়া সকলের রুচিকর না হইতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্মবিচারের কথাটা মোটেই বুঝিতে চেষ্টা করিব না পণ করিয়া বসিয়া থাকা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। বাঙ্গালী ব্যায়াম চর্চ্চার অভ্যাস বহুদিন ছাড়িয়া দিয়াছে—শুধু দেহের বেলাতে নয়—ভাব ও চিন্তার বেলাতেও তাই। একবার শুনিয়াই যাহা জলবৎ তরলং বলিয়া মনে না হইল, তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কচ্‌কচি আখ্যা দিয়া সে তৃপ্তি অনুভব করে। ইহাতে দর্শনচর্চ্চা দেশে দিন দিন মন্দা হইয়া আসিতেছে বাসব কথা আর চুট্‌কীর আদরই বাড়িতেছে। মানসিক শক্তি বিকাশের পক্ষে ইহাকে অনুকূল বলা চলে কি?

ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } আষাঢ় { ৩য় সংখ্যা

অগ্নি-প্রশস্তিঃ

[ঋগ্বেদসংহিতা ১।১৬।১১]

স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি
আবিরগ্নিরভবন্মাতরিশ্বনে।
অস্য ক্রত্বা সমিধানস্য মজ্মনা
প্র দ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ॥

অস্য ত্বেষা অজরা অস্য ভানবঃ
সুসংদৃশঃ সুপ্রতীকস্য সুদ্যুতঃ।
ভাত্বক্ষসো অত্যক্তুর্ন সিন্ধবো
অগ্নে রেজন্তে অসসন্তো অজরাঃ॥

কুবিন্নো, অগ্নিরুচথস্য বীরসৎ
বসুষ্কুবিদ্বসুভিঃ কামমাবরৎ।
চোদঃ কুবিৎ তুতুজ্যাৎ সাতয়ে ধিয়ঃ
শুচিপ্রতীকং তময়া ধিয়া গৃণে॥

ঘৃতপ্রতীকং ব ঋতস্য ধূর্ষদম্
অগ্নিং মিত্রং ন সমিধানঋঞ্জতে।
ইন্ধানো অক্রো বিদথেষু দীদ্যৎ
শুক্রবর্ণা মুদু নো যংসতে ধিয়ম্ ॥

পরব্যোমধামে অগ্নি লভি' জন্ম লঙ্ঘিয়া দ্যুলোক—
মাতরিশ্বা আঁখি 'পরে ফেলেছিল প্রথম আলোক !—
বীর্য্য দিয়া মন্থি' তারে, দীপ্ত তারে করি ক্রতুবলে,—
হেরি তার শুভ্র জ্যোতিঃ ব্যাপ্ত রহে আকাশে ভূতলে !

স্নিগ্ধ জ্যোতিঃমাখা তার মুখখানি লাগিয়াছে ভালো—
ক্ষয়হীন অঙ্গভাতি দিশে দিশে ছড়ায়েছে আলো ;—
লঙ্ঘি' তমঃ শিখা তার সিন্ধু সম চলেছে বহিয়া,
সুপ্তিহীন, জরাহীন, অকম্পিত রয়েছে চাহিয়া !

গেঁথেছি তোমার গাথা—অগ্নি তাহা শোন বারবার —
ঋদ্ধি দিয়া ঋদ্ধিমান, মনোরথ পুরাও সবার ;—
যজ্ঞেশ্বর, চিত্ত মোর যজ্ঞপানে সদা যেন ধায়—
স্মরি' শুচি তনু তব রচি' নতি চাহিলাম পায় !

রূপে তার ফোটে আলো—ঋত মাঝে নিয়েছে আসন,
দীপ্ত সে যে, বন্ধু মোর—এস তারে করি সুশোভন ;
সমিদ্ধিত যজ্ঞভূমে জ্যোতিঃ তার উঠিল দীপিয়া,
শুভ্রবর্ণে উদ্ভাসিয়া চিত্ত মোর রহিল ব্যাপিয়া।

——*——

নেদং যদিদম্ উপাসতে

বন্ধন আর মুক্তি—মানুষ এই দুইয়ের মাঝে। একদিকে জীবধর্ম দিয়া প্রকৃতি তাহাকে অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিতেছে, আবার অন্য দিকে আত্মার ধর্ম তাহাকে সেই বন্ধন কাটাইয়া আসিবার জন্য তিলে তিলে আকর্ষণ করিতেছে। এই জন্যই দেখি, তাহার জীবনে আলো ছায়ার লুকোচুরি—একবার তাহার মাঝে দেখি পশুত্ব, আবার দেখি ঋষিত্ব। প্রকৃতির পরবশতার মোহ অতিক্রম করিয়া নিজেকে যখন সে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিবার প্রেরণা পায়, তখনই তাহার মাঝে জিজ্ঞাসা জাগে। এই জিজ্ঞাসাই মানব জীবনের [illegible] বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। তবে এই বিদ্রোহ একদিনেই জাগে না—ইহার জন্যও শিক্ষা দীক্ষা আয়োজনের প্রয়োজন। এই শিক্ষা দিবে কে?—এখন দেখিতেছি, জিজ্ঞাসা জাগাইবার জন্য নিবৃত্তির সাধনা সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাই প্রাণে যথার্থ জিজ্ঞাসা না জাগিলেও সামাজিক সংস্কারে একটা কৃত্রিম জিজ্ঞাসা সকলের মনেই জাগে। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা সামাজিক শিক্ষার অঙ্গীভূত হইবার পূর্বে কে প্রথমে মানব-প্রাণে তাহা উন্মেষিত করিয়াছিল? প্রবৃত্তির আবর্ত হইতে দূরে সরিয়া নিবৃত্তির স্বরূপ বুঝিতে কে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল?—এ প্রশ্নের আর কোনও উত্তর পাই না—কেবল প্রাণে প্রাণে বুঝি—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি—দুইটী পক্ষ, এই দুই পক্ষে ভর করিয়া অনন্তের পথে মানুষ উড়িয়া চলিয়াছে। দেহের ভার যেদিন খসিয়া পড়িবে, সেদিন প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তিও চলিয়া যাইবে কি না, গতির সঙ্গে স্থিতিও নিরুদ্ধ হইবে কি না—তাহা কে বলিতে পারে?

কিন্তু তবুও মানুষের প্রকৃতি ওই এক-দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। যাহা পাইয়াছে, যাহা হইয়াছে, তাহা লইয়া পশু কোনও প্রশ্ন করে না—কিন্তু মানুষ করে। তাহার প্রশ্ন করাই মানে—তাহার এই বর্তমানের পাওয়া আর হওয়াটাকে অন্তরের আরও একটী অপরিজ্ঞাত গূঢ়তম আদর্শের সঙ্গে যাচাই করিয়া লওয়া। বর্তমান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তাহার অর্থ যখন সে বুঝিতে পারে, তখন বর্তমানের বন্ধনটা তাহার আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। জানার দ্বারা বন্ধন মোচন—এই জগতের এক আশ্চর্য্য রহস্য। আমাদের অবিশ্রান্ত সত্যের অপিহিতমুখ অপাবৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে চেষ্টা সফল না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই আবরণ স্বরূপ সেই "হিরণ্ময় পাত্র"খানা একটা নিরেট বুকের বোঝা হইয়া মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে পঙ্গু করিবে—তাহার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাকে সরাইবার উপায় নাই; কিন্তু সেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যটী জ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল, অমনি তাহার সকল ভার লঘু হইয়া গেল—প্রাকৃত প্রয়োজনে সে থাকিয়াও আর দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষকে পরাভূত করিতে পারিল না। এই যে পরমাশ্চর্য্য রহস্য—ইহারই প্রথম রূপ জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসা জাগিল—কেন ইষিতং মনঃ পততি?—কেন যুক্তঃ প্রাণঃ প্রৈতি?—কেন ইষিতাং বাচং বদন্তি? কো দেবশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ যুনক্তি?—অর্থাৎ এই যাহা কিছু হইতেছে, তাহা মানিয়া লইয়াও অন্তরাত্মা তৃপ্ত হইতেছে না—বুকের মাঝে কোথায় যেন

একটা কোঠা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সে তৃপ্তি আনিয়া দিবে কে? সে শূন্য পূরণ করিবে কে? চেতনা যতক্ষণ অস্পষ্ট, ততক্ষণ প্রাণ, মন, বাক্য, চক্ষু, শ্রোত্র, সমস্তই একাকার—বিচার-বিমূঢ় ঐক্যে অজ্ঞাতসারে তখন সমস্ত মানিয়া চলিয়াছি। প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হইল বিচারের বিশ্লেষণে; জানিলাম জীবনে বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু সে জানাতেও তো পিপাসা মিটিল না। তাই আবার এই বৈচিত্র্যকে ঐক্যে ফিরাইয়া নিবার জন্য আকুল জিজ্ঞাসা। কিন্তু এবারকার ঐক্য মূঢ় অবচেতনার মাঝে নয়—জাগ্রত চৈতন্যের সুস্পষ্ট আলোকে। যে ঐক্যে বৈচিত্র্য একাকার হইয়া ছিল, আনন্দের অনুভূতি সংবৃত হইয়াছিল—সে ঐক্য আর নয়। এখন বৈচিত্র্যকে অব্যাহত রাখিয়াই তাহার মূল ঐক্যের সূত্রটী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাই তো জিজ্ঞাসা, কে মনকে চালায়, কে প্রাণকে জুড়িয়া দেয়? এ যে বিচিত্র, তাহা এখন অনুভব করিতেছি; কিন্তু ইহার মূল কে?

বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া আবার যে ঐক্য খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়, তাহাকে বাধ্য হইয়া উল্টা পথ ধরিতে হয়। বৈচিত্র্যকে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই তুমি সার্থক করিয়া তুলিয়াছ—ইন্দ্রিয় ও মন তাহাদের শক্তির বৈশিষ্ট্য দিয়া জগতের বৈচিত্র্যের সন্ধানই বলিয়া দিয়াছে। যদি উহাদেরই পথ ধরিয়া চল, ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে আরও সূক্ষ্ম, আরও শক্তিশালী করিয়া তোল, তবে কেবলই নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলিবে—খণ্ড খণ্ড জানার আর কূল-কিনারা পাইবে না—অমীমাংসার অশান্তিতে প্রাণ হাঁপর হইয়া উঠিবে—তখন উপায়? তুমি তো জান, কেবল বস্তুর উপর বস্তু স্তূপাকার করিয়া অন্তর তৃপ্ত হইবে না—সে চায় বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ। আবার সে সম্বন্ধ যদি নিয়মের সম্বন্ধই হয়, তবুও প্রাণে তৃপ্তি আসিবে না; হয়ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দম্ভে বুদ্ধি তাহাতে ক্ষণেকের জন্য তৃপ্ত হইবে—কিন্তু তবুও নিয়মের বৈচিত্র্য আবার যখন দেখা দিবে, তখন নিয়মের মাঝেও যে তাহাকে নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—বিজ্ঞানকে মহাবিজ্ঞানে পারণত করিতে হইবে।

কিন্তু তবুও কি সম্যক্ তৃপ্তি ইহাতে মিলিবে? বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ তো কেবল নিয়মেরই সম্বন্ধ নয়। বোদ্ধার অন্তরের সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করিতে হইলে তাহার মাঝে রসের সম্বন্ধ-সূত্রটী যে খুঁজিয়া লইতে হইবে। বৈচিত্র্য এক হইয়াছে শুধু নিয়মে নয়—রসে। নিয়মের ঐক্য বুদ্ধির মাপে তৈয়ারী। তাহাকে খুঁজিতে গেলে বাহির মুখে চলিতে হয়। এ পথ তো ঐক্যসাধক জিজ্ঞাসুর পথ নয়। সে চায় সমগ্র একরসকে—যাহার মাঝে সমস্ত বৈচিত্র্য রসে নিবিড় হইয়া রহিয়াছে, তাহার পথ অন্তরের পথ দিয়া। জিজ্ঞাসুকে সেই পথে চলিতে হইবে। তৃপ্তি [illegible]কে নয়, তৃপ্তি অনুভূতিতে।

এই অনুভূতির সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। যে ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে কথার বাঁধুনী দিয়া বাঁধা চলে, তাহা হইতে মোড় ফিরিয়া, যেখানে "ন চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্‌গচ্ছতি, ন মনঃ"—তাহারই দিকে লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। যদি তাহার বিশিষ্ট সংজ্ঞা চাও—পাইবে না; কেননা যাঁহারা তাহার কথা বলিতে চাহেন, তাঁহারাও হার মানিয়া বলেন, "ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ—অন্য-

দেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"—আমরা তো জানি না, বুঝি না কি করিয়া এই বস্তুটীর বিষয়ে উপদেশ দেওয়া চলে—কেননা সে যে জানা সকল জিনিসের চেয়ে আলাদা, আবার অজানা জিনিসেরও উপরে।" তবে তাহার স্বরূপ কি?—কি সূত্র ধরিয়া তাহাকে খুঁজিব? যাহা জানিতেছ, বুঝিতেছ, তাহাকে ধরিয়াই সন্ধান আরম্ভ কর; এই যে চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, মন—ইহাদের ক্রিয়া তো প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষকে ধরিয়া আরও গভীরে ডুবিয়া যাও—ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলি একত্র জোটাইয়া তাহাদের রঙ্গভূমি হইতে যবনিকার অন্তরালে গিয়া দাঁড়াও—সেখান হইতে দেখ, কি করিয়া চক্ষুঃ দেখিতেছে, কি করিয়া কর্ণ শুনিতেছে, প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, মন ছুটাছুটী করিতেছে। বিষয়ের সঙ্গে ইহাদের যে সংযোগ, সেই সংযোগই তোমাকে মূঢ়ের মত অভিভূত করিয়া রাখে; কাজেই আগে বিষয়নিরপেক্ষ দৃষ্টি অর্জন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় যে বিষয়ে গিয়া পড়িল, তাহার রসে না মাতিয়া তাহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ "অতিমুচ্য"—একেবারে "প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ"—এই জগতের কাছে মৃতস্বরূপ হইয়া, তবে অমৃতকে লাভ করিতে হইবে। এই বিষয়ব্যাবৃত্তি—এই অন্তর্দৃষ্টিই সেই বিদিত ও অবিদিতের পরপারের বস্তুর অনুভূতি আনিয়া দিবে।

যদি তাহার স্বরূপ জানিতে চাও, তবে ভাষায় তাহা ফুটিবে না, শুধু দিক্‌দর্শন হইবে মাত্র। শুধু বলা চলে, যাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সে তাহার পরপারেই কেবল নয়, সে অন্তরের অন্তরেও বটে—চক্ষুরও সে চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, প্রাণেরও প্রাণ, মনেরও মন সে। প্রমাণ চাও—পাইবে না। এ তর্কের বিষয় নয়, ভাষার গোচর নয়, মনেরও সামিল নয়—এ শুধু শোনা কথা। একজন বলে, আর একজন তাহা শোনে; কি ভাষায় যে তাহাদের কথা হয়, তাহা জানি না, কেননা লোকের কথায় তো তার কথা বলা চলে না। তুমি আমি এ হেঁয়ালী কি করিয়া বুঝিব? যে তাহাকে জানিয়াছে, তাহার দেওয়ার আগ্রহ, আর যাহার জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, তাহার নেওয়ার আগ্রহ—এ দুয়ের মাঝে শ্রদ্ধাকে মধ্যস্থ করিয়া যে কি করিয়া পরস্পর আদান প্রদান হয়, তাহা ইন্দ্রিয় চালিত বুদ্ধির কাছে কেমনে ধরা পড়িবে? আগুনের স্পর্শে আগুন জ্বলিয়া উঠে, প্রদীপ হইতে প্রদীপে আলো সঞ্চারিত হয় কি করিয়া? শুধু স্তব্ধ হৃদয়ের ঐকান্তিক অনুভূতি—বাহিরের কোনও সংস্পর্শ নাই, কোনও কোলাহল নাই—তার মাঝে অমৃতের অভিষেক "তপ্ত সৈকতে বারিবিন্দু জনু!" সে বর্ষণে কি করিয়া পিপাসু ভূমি সরস হইল, কে বলিবে?

কোথায় সে, কি সে—তাহা বলা চলে না; কিন্তু তবুও তুমি আমি যাহা লইয়া পড়িয়া রহিয়াছি, সে যে তাহা নয়—এ কথা জোর করিয়া বলা যায়; প্রমাণ জিজ্ঞাসুর তৃপ্তি আর অতৃপ্তি। অতৃপ্ত হৃদয় আপনা হইতেই বলিয়া দিবে "নেদং যদিদম্ উপাসতে"—এই যে জগৎ জুড়িয়া লোকে যাহার পূজা করিতেছে, সে তা নয়। বাক্য যেখানে লইয়া যায়, মন যেখানে লইয়া যায়, চক্ষু শ্রোত্র যাহার পরিচয় দেয়, প্রাণ যে হিল্লোল জাগাইয়া তোলে, সে তো তাহা নয়; এ গুলিকে বিশ্বাস করিও না, ইহাদের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লও—শুধু অপরের উপাসনায় তাহাকে পাইবে না—তোমার পর-

বশতায় সে নাই, সে আছে তোমার স্বাতন্ত্র্যে। প্রাণ, মন আর ইন্দ্রিয়,—তুমি ইহাদেরই অধীন; ইহাদের একটিরও রহস্য তুমি ভেদ করিতে পার নাই—কে যে কোথা দিয়া তোমাকে কোথায় লইয়া যায়, চিরজন্ম সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও তাহা ধরিতে পারিলে না। এই পরবশতার পথে কোথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইবে—কোথায় এমন বস্তু পাইবে, যাহার আলোকে সকল রহস্য তোমার কাছে স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে? তাই, যে পথে চলিয়াছ, সে পথ হইতে ফিরিতে হইবে—মূঢ়তায় যাহার উপাসনা করিতেছ, তাহার উপাসনা ছাড়িতে হইবে। বাহির হইতে নিজকে অন্তরাবৃত্ত করিয়া, আবার সেই অন্তর হইতে বাহিরের উপর আলো ফেলিতে হইবে—জীবনের ধারাটাই একেবারে সম্পূর্ণ উলটিয়া যাইবে। এই সাধনারই প্রথম মন্ত্র—"নেদং যদিদমুপাসতে।"

তারপর জানার রহস্য। এরও তো কোন শেষ নাই। অনুভূতির সাচ্চা হইতে বুদ্ধির মেকী কি করিয়া চিনিয়া লইবে? ইন্দ্রিয়ের পথে নিত্য যাহা দেখিতেছ, যাহা অনুভব করিতেছ, যদি কোনও দিন তাহা হইতে বিশেষ কিছু অনুভব কর, তবেই হয়ত জানার শেষে পৌছিয়াছ ভাবিয়া নাচিয়া উঠিবে। সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে এমন অনেক বাধা—এমন অনেক নকল তৃপ্তি! কি করিয়া ইহাদের হাত এড়াইবে?

জানার মাঝে যদি কোনও অবলম্বন থাকে, তাহা হইলেই আর সে জানা চরম হইতে পারে না। অথচ আমার আমিত্ব সেই অবলম্বনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া এমনি একাকার হইয়া যায় যে, তাহাকে জানা হইতে পৃথক করিয়া লওয়া কঠিন। এই যেমন একটা দেহের বোঝা, কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের বোঝা লইয়া অতএব সংসার ক্ষেত্রে আমাদের জানার ব্যাপার চলিতেছে। কিন্তু জানার সময় দেহেন্দ্রিয়ে ভর দিয়া যে জানিতেছি, তাহা কি টের পাই? যদি কোনও কারণে গভীর আঘাতে অর্দ্ধসুপ্ত চেতনা একটু বিশেষ ভাবে সচকিত হইয়া উঠে, তখন দেহ আর ইন্দ্রিয় হইতে একটা পৃথক সত্তা হয়ত অনুভব করি। তখন বোঝা যায়, এই জঞ্জাল ছাড়াইয়া আসিয়া যদি জ্ঞানের দীপটী জ্বলিয়া উঠে তবে সে কি গভীর তৃপ্তি। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? বাহিরের স্থূল খোলসটা ছাড়িয়া আসিলেও যে ভিতরে আরও কত সূক্ষ্ম আবরণের সঙ্গে একাত্মবোধ রহিয়াছে, তাহার খোঁজ খবর কি একদিনেই মিলে? তবে বারবার ঐকান্তিক সাধনার বলে বাহিরটাকে ভুলিয়া যদি ভিতরটাতেই বাসা বাঁধা যায়, যদি চেতনাকে সজ্ঞানে দেহ আর ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ইচ্ছামত বাহিরে বিচ্ছুরিত করিবার ক্ষমতা জন্মে, তবে ক্রমে ক্রমে এই যে ভিতরের দেওয়ালগুলি, এগুলিও ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। ভিতরেও বাধা আছে—এ জানিলে আবার নূতন রকমের অতৃপ্তি জন্মিবে, বাধার লড়াই আবার জাগিয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া একটার পর একটা বাধা জিনিয়া আসিলে যে দিন অন্তরের সমস্ত আশ্রয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, আর ভিতর বাহির আলোয় আলোয় একাকার হইয়া যাইবে—সেই দিন জানা সার্থক হইবে। তবে সে সময়ের খবরটা আর এ জগতে পৌছিবে না, কেননা সে খবর ধরিয়া রাখার মত অন্তঃকরণ তখন নাই, তাহাকে ফুটাইবার মত ভাষাও সেখানে নাই। ব্রহ্মশক্তির প্রেরণায় সমুদ্রের

জলে যে বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিয়াছিল, সে যদি এই সময়ে ছিঁড়িয়া গিয়া সাগরের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তবে আর খবর মিলিবে কি করিয়া? কিন্তু যে শক্তির আকর্ষণে একটী একটী করিয়া আবরণ ভাঙ্গিয়া সাধক একাকারের পথে চলিয়াছিল, সেই শক্তিই যদি আবার ভিতর হইতে আলো দিয়া বাহিরের আবরণগুলির নূতন পত্তন করিতে থাকে, আবার যদি—অজ্ঞানে নয়, পূর্ণ জ্ঞানে—ভিতর হইতে বাহিরের দিকে একটা অভিনব সৃষ্টি ব্যাপার চলিতে থাকে, তাহা হইলে ওই ওপারের আলোর একটু স্নিগ্ধ স্পর্শ এবারকার নূতন সৃষ্টির মাঝে ফুটিয়া উঠিবে বই কি? ওপার হইতে যদি কেহ ফিরিয়া আসে, সে একটা স্বচ্ছ আবরণ লইয়াই আসে—যেন একটা স্ফটিকের দানার ভিতর দিয়া গোটা সূর্য্যের আলোটা ঠিকরাইয়া পড়ে। তার মাঝে যে আলো, যে আনন্দ, তা কেবল ফুটিয়া উঠে—রসে। এই জিনিসটা শুধু অনুভব করা চলে, মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। সে অনুভূতির তুলনা নাই। সে যে দেহ-মন-বুদ্ধির অস্পষ্ট স্মৃতিকে গুঞ্জন করিয়া কেবলই অকূল আলোকে ভাসিয়া চলে। তাই জিজ্ঞাসা করিলে রসিক বলে, জানিতে গিয়া যে তাহাকে জানিতে পারে নাই—আমার জানা দিয়া যে তাহাকে বেড়িয়া রাখিতে পারি নাই—সেইখানেই তো জানার সার্থকতা। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, তবু নয়ন না তিরপিত ভেল"—এই না রূপ।

অহরহ জানার সাধনা করিতেই হইবে—নহিলে আর পথ নাই। "ইহ চেৎ অবেদীৎ—অথ সত্যম্ অস্তি; ন চেৎ ইহ অবেদীৎ—মহতী বিনষ্টিঃ।"—যদি এইখানেই ইহাকে জানিলে, তবে বুঝ, সত্য আছে—জানিলে তোমার সকলই সেই জানার আলোকে সত্য হইয়া উঠিবে; আর যদি এখানে না জানিলে, তবে একেবারে মহতী বিনষ্টি—মহাবিনাশ। এ দুয়ের মাঝে আর কোনও ফাঁক নাই। আবার জানাটাও সার্থক হওয়া চাই—"প্রতিবোধবিদিতম্"—"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য"—প্রত্যেকটা বোধে জানিতে হইবে, প্রত্যেক ভূতে ভূতে জানিতে হইবে—জানার যাচাই অহরহ চলিবে। এই দৃষ্টি লইয়াই কর্ম্ম। চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ যেখানে, সেইখান হইতেই তো কর্ম্মের প্রবৃত্তি। এই চক্ষু, শ্রোত্র, মন, প্রাণকে ডিঙ্গাইয়া দৃষ্টিটা সেই কেন্দ্রে রাখিতে হইবে। যতটুকু অংশ ইন্দ্রিয় মন প্রাণকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ততটুকুকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিলে চলিবে না। যতটুকুতে কর্ম্ম চলিতেছে, তাহারও পারের কথা রহিয়াছে। "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে, তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত—ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি—ব্রহ্মই একবার দেবতাদিগের জন্য জয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা গৌরব বোধ করিলেন; তাহারা মনে করিলেন, এ বিজয় আমাদেরই—আমাদেরই এই মহিমা।"—এই হইল কর্ম্মজগতের প্রহসন। বাঁশীতে সুরের লহরী উঠিয়াছে; কে যে তাহাতে প্রাণ ঢালিয়া অমন সুর জাগাইয়া তুলিল, বাঁশী তাহা জানে না। সে সুর বাহির করিয়া দেয়, কাজেই সে ভাবে, সুর দিয়া তার শূন্য রন্ধ্রগুলাই বুঝি ভরাট।

অন্তরের অন্তর যে, তাহাকে কেমন করিয়া পাইব?—"প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ"—এই লোক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া। ইহ-

জগতের মৃত্যুতেই অমৃত। এই মরণের সাধনাই করিতে হইবে। "তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি— সত্যম আয়তনম্"— তার তপস্যা, দম, কর্ম্ম আর বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠা—সত্য তাহার আশ্রয়! এই তো পন্থা। প্রথমেই চাই তপস্যা; দেহ, ইন্দ্রিয়, মনকে তাপ দিতে হইবে, আঘাত করিতে হইবে—কেবল সুখের পসরা সাজাইতে ব্যস্ত হইলে চলিবে না। তারপর অন্তরাবৃত্ত বহিঃ-শক্তিকে অন্তরে সংহত করিতে হইবে, ইহাই দ্বিতীয় সাধনা। শক্তি যখন এক কেন্দ্রে সংহত হইয়া সংহত সূর্য্যরশ্মির মত জ্বলিয়া উঠিবে, তখন সেই জ্বলন্ত প্রাণের আগুণ লইয়া কর্ম্মের পথ আলো করিয়া তুলিতে হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিদ্যার অধিকার; শুদ্ধচিত্তে শ্রুতি শুধু তখন কর্ণমূলা নয়—হৃন্মূলা হইয়া অপরোক্ষানুভূতিতে জাগিয়া উঠিবে। সত্যই এ সাধনার আশ্রয়। এই সত্যই অহরহঃ মনন কর --

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—যাহা বাক্যদ্বারা অপ্রকাশিত, বাক্য যাহাদ্বারা প্রকাশিত, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; বাক্যদ্বারা লোকে যাহার উপাসনা করে, সে তাহা নয়।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—মনদ্বারা যাহার নিশ্চয় হয় না, মন যাহা দ্বারা মনন করে, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; মন দ্বারা লোকে যাহার উপাসনা করে, সে তাহা নয়।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—চক্ষুদ্বারা যাহাকে দেখে না, যাহাদ্বারা চক্ষুসমূহকে দর্শন করে, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; চক্ষুদ্বারা লোকে যাহার উপাসনা করে, সে তাহা নয়।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—শ্রোত্রদ্বারা যাহাকে শোনে না, এই শ্রোত্র যাহাদ্বারা শ্রুত হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; শ্রোত্রদ্বারা লোকে যাহার উপাসনা করে, সে তাহা নয়।

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—প্রাণ দ্বারা যাহাকে প্রাণন করিতে পারে না, যাহা দ্বারা প্রাণের প্রাণন হয়, তাহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; প্রাণদ্বারা লোকে যাহার উপাসনা করে, সে তাহা নয়।



প্রণব

স্বর্গরাজ্য যে তোমার মাঝেই—কি করে তুমি তা জানবে? কি করে যে জানা যায়, সে সম্বন্ধে একটা ভারী সুন্দর গল্প আছে। একবার নাকি একটা দৈত্য বেদ চুরী করে সমুদ্রের তলে লুকিয়ে রেখেছিল।

বেদ কথাটার দুটী অর্থ—আসলে তার মানে জ্ঞান—সেই তো স্বর্গরাজ্য। আর তার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে—হিন্দুর সব চেয়ে প্রামাণ্য শাস্ত্র।

যে দৈত্য বেদ চুরী করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল, তার নাম শঙ্খাসুর। বেদ উদ্ধার করবার জন্য—জ্ঞানের হারামাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য, ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে সেই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করলেন, বেদও উদ্ধার করলেন।

ছেলেরা গল্পটা পড়ে তার সাদাসিধে অর্থটাই বোঝে। সাধারণ লোকেও তেমনি সহজভাবেই এটাকে গ্রহণ করে, কিন্তু আসলে গল্পটার মাঝে একটা গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে। একটা ব্যাপক সত্য বোঝাবার জন্য গল্পটার সৃষ্টি হয়েছিল।

শঙ্খের মাঝে কীটরূপে যে অসুর লুকিয়ে আছে, তার কাছ থেকে বেদ উদ্ধার করবার জন্য ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হলেন। মাছের রূপ ধরে তিনি সমুদ্রের তলে গিয়ে দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করলেন। তার কি প্রয়োজন ছিল? মাছ হল সামুদ্রিক প্রাণী—শঙ্খকীটও তাই। সর্ব্বময় ভগবান মৎস্যরূপে শঙ্খকীটের সঙ্গে লড়াই করলেন।

শঙ্খ থেকে কীটটা দূর হয়ে গেল, শঙ্খটা ভেসে সমুদ্রের তীরে ঠেকল—লোকে তা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিল। তারপর শঙ্খে ফুঁ দিতেই চারদিক কাঁপিয়ে তার ভিতর থেকে প্রণব-ধ্বনি হতে লাগল। এই হচ্ছে বেদ। এমনি করেই শঙ্খরূপ বেদকে ভগবান সমুদ্রের তল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

এ কাহিনী যিনি রচনা করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ওঁকারের মাহাত্ম্য সকলকে দেখানো। তিনি দেখাতে চান যে জগতের সমস্ত জ্ঞানের চরমে এই ওঁকার। এই হচ্ছে সমস্ত বেদের সার—একটা শঙ্খের মাঝেই স্বর্গরাজ্যটা পোরা রয়েছে—এর চেয়ে সংক্ষেপে আর তার তত্ত্ব বলা যায় না। এই হল গল্পটার তাৎপর্য্য।

সমস্ত পুণ্য কর্ম্মে, সব বড় বড় কাজে হিন্দুরা শঙ্খ বাজায়—জন্মে মৃত্যুতে, বিগ্রহে পূজায়, সব সময় তারা ওঁকার স্মরণ করে। প্রাণ যার প্রণবে বাঁধা, তারই মাঝে যে চলছে ফিরছে বেঁচে আছে—সেই তো ধন্য। অন্তরের সম্পদ লাভ করতে হলে, স্বর্গরাজ্যের দুয়ার খুলতে হলে, এই হচ্ছে চাবী।

বুদ্ধিতে যদি কিছু না ধরে, তাহলে ইউরোপ আর আমেরিকার লোকেরা কিছুই মানতে চায় না। সাধারণ বুদ্ধির তর্ক দিয়ে হয়ত এই প্রণবের মাহাত্ম্য আমরা বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে এই প্রণবের মাঝে এমন আশ্চর্য্য এক শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যাতে ঠিক ঠিক এই মন্ত্র জপ করতে পারলে মানুষের মাঝে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়—মানুষের অন্তরের যা রহস্য, তা এ মন্ত্রে ফুটে ওঠে, জগতের সকলের সেরা সম্পদ আমাদের হাতের মুঠায় আসে। প্রণবের কাহিনী

মনে হচ্ছে, এ হচ্ছে নাম আর রূপের পার্থক্য। অঙ্গারের অণুগুলির আকৃতি ও সংস্থান দুটাতে দু'রকম—কাজেই এদের প্রভেদ কেবল রূপে।

তাই হিন্দু দর্শন বলছে, জগতে যত বিভিন্নতা দেখছ, সব হচ্ছে নাম-রূপের খেলা। যদি একবার তলিয়ে যেতে পার—এ নাম-রূপের ভিত্তি যে তত্ত্ব, তার অনুসন্ধান যদি করতে পার—তাহলে দেখবে, সবার পিছনে রয়েছেন সেই এক, অবিকারী, অনন্ত, অখণ্ড তত্ত্ব—সে তত্ত্বের কোনও আশ্রয় নাই, তিনি স্ব-তন্ত্র। কাজেই স্বরবর্ণের সঙ্গে এঁর তুলনা চলতে পারে। আর নাম-রূপকে বলা যেতে পারে যেন ব্যঞ্জনবর্ণ। কাজেই সোঽহং থেকে 'স' আর 'হ'কে, নাম আর রূপ বলে বাদ দিলে থাকে শুধু অ-উ-ম্—ওঁ। এই ওঁকারই হচ্ছে চরম তত্ত্ব, যা তোমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গাঁথা। জগতের প্রাণের সঙ্গে এ গাঁথা—সমস্ত বিভেদের অন্তরালে যে শক্তি রয়েছে, এ তারই স্বরূপ—তত্ত্বের এই হল স্বভাবদত্ত সংজ্ঞা।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ও অন্যান্য দার্শনিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ যেন একটা মুদ্রারই এ পিঠ আর ও-পিঠ। একটাকে ছেড়ে আর একটা থাকতে পারে না। এই যেন টেবিলটা রয়েছে—এর কথা না চিন্তা করে তুমি কি এটা প্রত্যক্ষ করতে পার? এমনি করে যে-কোন বস্তু, না ভেবে কি দেখা যায়? প্রত্যক্ষ করার মাঝে চিন্তা একেবারে অনুস্যূত হয়ে চলেছে।

আবার দেখ, চিন্তা ও ভাষা এক—ভাষা ছাড়া চিন্তা করা চলে না। শিশুর ভাষা নাই, কাজেই কোনও চিন্তাও নাই। যে পর্য্যন্ত ভাষা না জুটবে, সে পর্য্যন্ত শিশুর চিন্তা করাও চলবে না। মা ছেলের কানে নাম দিয়ে দেন—আর নামের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থও হৃদয়ে ঢেলে দেন। সোয়ারের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্পর্ক, অর্থের সঙ্গে মায়ের কথারও সেই সম্বন্ধ। কথার ঘোড়ার উপর অর্থের সোয়ার চেপে বসে শিশুর মনোরাজ্যে হাঁকিয়ে চলে।

ভাষা ছাড়া আমরা চিন্তা করতে পারি না—কেননা ভাষা আর চিন্তা এক। তা ছাড়া এ-ও দেখেছি, চিন্তা আর জগৎ এক। কাজেই ভাষা আর চিন্তা যদি এক হয়, আবার চিন্তা আর জগৎ যদি এক হয়, তাহলে ভাষা আর চিন্তা পরস্পরের আত্মীয় নিশ্চয়ই। চিন্তা ছাড়া এ জগতের কোনও জিনিষ দেখবার যো নাই। একটা জিনিষ দেখবে অথচ তার চিন্তা মনে ঢুকবে না—চেষ্টা করলে দেখতে পাবে, এ অসম্ভব। এই দেওয়ালটা দেখার মাঝেই হচ্ছে দেওয়ালটা নিয়ে চিন্তা করা।

এ জগতের যা কিছু সমস্তই তদনুযায়ী ভাবেরই উল্টা পিঠ মাত্র। চিন্তা ছাড়া প্রত্যক্ষ হতে পারে না। ভাষার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ যেন একটা পাতারই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বাইবেলে যে আছে, "সৃষ্টির আদিতে বাক্ ছিল।—বাক্ ঈশ্বরের সহচরী—বাকই ঈশ্বর"—এ কথার মূল তাৎপর্য্য এই।

যদি তাই হয়, তাহলে সমস্তটা জগৎ বোঝাবার জন্য আমরা একটা শব্দ পেতে পারি না? এমন একটা শব্দ চাই, যার মাঝে থাকবে এই বিশ্বকে ধারণ করবার শক্তি ও বীর্য্য—তাকে শাসন করবার তেজ।

সব ভাষাতেই, কতকগুলি শব্দ আসে কণ্ঠ

প্রণব

স্বর্গরাজ্য যে তোমার মাঝেই—কি করে তুমি তা জানবে? কি করে যে জানা যায়, সে সম্বন্ধে একটা ভারী সুন্দর গল্প আছে। একবার নাকি একটা দৈত্য বেদ চুরী করে সমুদ্রের তলে লুকিয়ে রেখেছিল।

বেদ কথাটার দুটো অর্থ—আসলে তার মানে জ্ঞান—সেই তো স্বর্গরাজ্য। আর তার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে—হিন্দুর সব চেয়ে প্রামাণ্য শাস্ত্র।

যে দৈত্য বেদ চুরী করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল, তার নাম শঙ্খাসুর। বেদ উদ্ধার করবার জন্য—জ্ঞানের হারামাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য, ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে সেই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করলেন, বেদও উদ্ধার করলেন।

ছেলেরা গল্পটা পড়ে তার সাদাসিধে অর্থটাই বোঝে। সাধারণ লোকেও তেমনি সহজভাবেই এটাকে গ্রহণ করে; কিন্তু আসলে গল্পটার মাঝে একটা গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে। একটা ব্যাপক সত্য বোঝাবার জন্য গল্পটার সৃষ্টি হয়েছিল।

শঙ্খের মাঝে কীটরূপে যে অসুর লুকিয়ে আছে, তার কাছ থেকে বেদ উদ্ধার করবার জন্য ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হলেন। মাছের রূপ ধরে তিনি সমুদ্রের তলে গিয়ে দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করলেন। তার কি প্রয়োজন ছিল? মাছ হল সামুদ্রিক প্রাণী—শঙ্খকীটও তাই। সর্ব্বময় ভগবান মৎস্যরূপে শঙ্খকীটের সঙ্গে লড়াই করলেন।

শঙ্খ থেকে কীটটা দূর হয়ে গেল, শঙ্খটা এসে সমুদ্রের তীরে ঠেকল—লোকে তা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিল। তারপর শঙ্খে ফুঁ দিতেই চারদিক কাঁপিয়ে তার ভিতর থেকে প্রণব-ধ্বনি হতে লাগল। এই হচ্ছে বেদ। এমনি করেই শঙ্খরূপ বেদকে ভগবান সমুদ্রের তল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

এ কাহিনী যিনি রচনা করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ওঁকারের মাহাত্ম্য সকলকে দেখানো। তিনি দেখাতে চান যে জগতের সমস্ত জ্ঞানের চরমে এই ওঁকার। এই হচ্ছে সমস্ত বেদের সার—একটা শব্দের মাঝেই স্বর্গরাজ্যটা পোরা রয়েছে—এর চেয়ে সংক্ষেপে আর তার তত্ত্ব বলা যায় না। এই হল গল্পটার তাৎপর্য্য।

সমস্ত পুণ্য কর্ম্মে, সব বড় বড় কাজে হিন্দুরা শঙ্খ বাজায়—জন্মে মৃত্যুতে, বিগ্রহে পূজায়, সব সময় তারা ওঁকার স্মরণ করে। প্রাণ যার প্রণবে বাঁধা, তারই মাঝে যে চলছে ফিরছে বেঁচে আছে—সেই তো ধন্য। অন্তরের সম্পদ লাভ করতে হলে, স্বর্গরাজ্যের দুয়ার খুলতে হলে, এই হচ্ছে চাবী।

বুদ্ধিতে যদি কিছু না ধরে, তাহলে ইউরোপ আর আমেরিকার লোকেরা কিছুই মানতে চায় না। সাধারণ বুদ্ধির তর্ক দিয়ে হয়ত এই প্রণবের মাহাত্ম্য আমরা বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে এই প্রণবের মাঝে এমন আশ্চর্য্য এক শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যাতে ঠিক ঠিক এই মন্ত্র জপ করতে পারলে মানুষের মাঝে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়—মানুষের অন্তরের যা রহস্য, তা এ মন্ত্রে ফুটে ওঠে, জগতের সকলের সেরা সম্পদ আমাদের হাতের মুঠায় আসে। প্রণবের কাহিনী

মনে হচ্ছে, এ হচ্ছে নাম আর রূপের পার্থক্য। অঙ্গারের অণুগুলির আকৃতি ও সংস্থান ছুটাতে ছু'রকম—কাজেই এদের প্রভেদ কেবল রূপে।

তাই হিন্দু দর্শন বলছে, জগতে যত বিভিন্নতা দেখছ, সব হচ্ছে নাম-রূপের খেলা। যদি একবার তলিয়ে যেতে পার—সব নাম-রূপের ভিত্তি যে তত্ত্ব, তার অনুসন্ধান যদি করতে পার—তাহলে দেখবে, সবার পিছনে রয়েছেন সেই এক, অবিকারী, অনন্ত, অখণ্ড তত্ত্ব—সে তত্ত্বের কোনও আশ্রয় নাই, তিনি স্ব-তন্ত্র। কাজেই স্বরবর্ণের সঙ্গে এঁর তুলনা চলতে পারে। আর নাম-রূপকে বলা যেতে পারে যেন ব্যঞ্জনবর্ণ। কাজেই সোঽহং থেকে 'স' আর 'হ'কে, নাম আর রূপ বলে বাদ দিলে থাকে শুধু অ-উ-ম্ -ওঁ। এই ওঁকারই হচ্ছে চরম তত্ত্ব, যা তোমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গাঁথা। জগতের প্রাণের সঙ্গে এ গাঁথা—সমস্ত বিভেদের অন্তরালে যে শক্তি রয়েছে, এ তারই স্বরূপ—তত্ত্বের এই হল স্বভাবদত্ত সংজ্ঞা।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ও অন্যান্য দার্শনিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ যেন একটা মুদ্রারই এ পিঠ আর ও-পিঠ। একটাকে ছেড়ে আর একটা থাকতে পারে না। এই যেন টেবিলটা রয়েছে—এর কথা না চিন্তা করে তুমি কি এটা প্রত্যক্ষ করতে পার? এমনি করে যে-কোন বস্তু, না ভেবে কি দেখা যায়? প্রত্যক্ষ করার মাঝে চিন্তা একেবারে অনুস্যূত হয়ে চলেছে।

আবার দেখ, চিন্তা ও ভাষা এক—ভাষা ছাড়া চিন্তা করা চলে না। শিশুর ভাষা নাই, কাজেই কোনও চিন্তাও নাই। যে পর্য্যন্ত ভাষা না জুটবে, সে পর্য্যন্ত শিশুর চিন্তা কথাও চলবে না। মা ছেলের কানে নাম দিয়ে দেন—আর নামের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থও হৃদয়ে ঢেলে দেন। সোয়ারের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্পর্ক, অর্থের সঙ্গে মায়ের কথারও সেই সম্বন্ধ। কথার ঘোড়ার উপর অর্থের সোয়ার চেপে বসে শিশুর মনোরাজ্যে হাঁকিয়ে চলে।

ভাষা ছাড়া আমরা চিন্তা করতে পারি না—কেননা ভাষা আর চিন্তা এক। তা ছাড়া এ-ও দেখেছি, চিন্তা আর জগৎ এক। কাজেই ভাষা আর চিন্তা যদি এক হয়, আবার চিন্তা আর জগৎ যদি এক হয়, তাহলে ভাষা আর চিন্তা পরস্পরের আত্মীয় নিশ্চয়ই। চিন্তা ছাড়া এ জগতের কোনও জিনিস দেখবার যো নাই। একটা জিনিষ দেখবে অথচ তার চিন্তা মনে ঢুকবে না—চেষ্টা করলে দেখতে পাবে, এ অসম্ভব। এই দেওয়ালটা দেখার মাঝেই হচ্ছে দেওয়ালটা নিয়ে চিন্তা করা।

এ জগতের যা কিছু সমস্তই তদনুযায়ী ভাবেরই উল্টা পিঠ মাত্র। চিন্তা ছাড়া প্রত্যক্ষ হতে পারে না। ভাষার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ যেন একটা পাতারই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বাইবেলে যে আছে, "সৃষ্টির আদিতে বাক্ ছিল।—বাক্ ঈশ্বরের সহচরী—বাকই ঈশ্বর"—এ কথার মূল তাৎপর্য্য এই।

যদি তাই হয়, তাহলে সমস্তটা জগৎ বোঝাবার জন্য আমরা একটা শব্দ পেতে পারি না? এমন একটা শব্দ চাই, যার মাঝে থাকবে এই বিশ্বকে ধারণ করবার শক্তি ও বীর্য্য—তাকে শাসন করবার তেজ।

সব ভাষাতেই, কতকগুলি শব্দ আসে কণ্ঠ

থেকে, কতকগুলি ওষ্ঠ থেকে আর কতকগুলি মূর্দ্ধা থেকে। কণ্ঠের নীচ থেকে উঠেছে এমন কোনও শব্দ কোন ভাষাতেই নাই; অর্থাৎ কণ্ঠ হচ্ছে যেন বাগ্‌যন্ত্রের এক সীমানা। —তেমনি ওষ্ঠ হচ্ছে তার আর এক সীমানা, ওষ্ঠেরও বাইরে থেকে কোনও শব্দ আসতে পারে না।

প্রণবে আছে অ, উ, ম। অ কণ্ঠ্য শব্দ অর্থাৎ বাগযন্ত্রের একদিকের সীমা থেকে তার উৎপত্তি। উ তেমনি শব্দমালার মধ্যে থেকে ওঠে। মূর্দ্ধার কাছাকাছি বাগযন্ত্রের মধ্যদেশ থেকে তার উৎপত্তি। আবার ম হচ্ছে ওষ্ঠ্য বর্ণ—বাগ্‌যন্ত্রের শেষ প্রান্তের অনুনাসিক বর্ণ।

কাজেই অ হল বর্ণমালার আদি, উ হল তার মধ্য, আর ম হল অন্ত। এই তিনটীতেই সমস্ত বাগ্‌যন্ত্র ব্যাপ্ত রয়েছে। কাজেই ওম্ হচ্ছে একমাত্র স্বাভাবিক সহজ শব্দ। সমস্ত ভাষার প্রতীক ওম্—কাজেই সমস্ত জগতেরও সে প্রতীক।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে। অকারের মত আরও তো কণ্ঠ্য বর্ণ আছে—তেমনি উ আর ম'য়ের সগোত্র বর্ণেরও তো অভাব নাই। কাজেই খুসীমত যে কোনও একটী কণ্ঠ্যবর্ণ বেছে নিয়ে ঋকারের মত যে কোনও বর্ণের সঙ্গে, কিম্বা মকারের সগোত্র অন্য কোনও বর্ণের সঙ্গে যদি তাকে জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সমস্ত ভাষার একটী নূতন প্রতীক সৃষ্টি করা চলে না কি?

কিন্তু অকার হচ্ছে কণ্ঠ্যবর্ণের শ্রেষ্ঠ। তেমনি উকারের উচ্চারণস্থান থেকে আর যত বর্ণ বেরিয়ে আসে, সবার মাঝে উকারই শ্রেষ্ঠ—সে যেন সকলের রাজা। বোবাও এই বর্ণটী উচ্চারণ করতে পারে, কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না—সে যেন আপনা থেকেই ওঠে—কাজেই এই জাতীয় বর্ণের মাঝে উকারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ম হচ্ছে ওষ্ঠ্য বর্ণের রাজা। তা ছাড়া তার আর একটু বিশেষত্ব আছে—অনুনাসিক বর্ণ বলে সমস্ত নাসাপথকে সে ব্যাপ্ত করে থাকে—অর্থাৎ শ্বাস বা প্রাণের উপর তার আধিপত্য। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটা নাম খুঁজি, তাহলে ওঁকারকে ছেড়ে যাওয়ার আমাদের যো নাই। ওঁকার সমস্ত ভাষার প্রতীক, সমস্ত ভাবের প্রতীক কাজেই সমস্ত বিশ্বেরও প্রতীক।

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র, এমন কি হিন্দুর সমস্ত দর্শন এই ওঁকারের ব্যাখ্যাতেই পর্য্যবসিত। প্রণব সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। জগতে এমন শক্তি নাই, এমন এমন আশ্রন নাই, এমন বস্তু নাই, ওঁকারের মাঝে যাকে পূরে দেওয়া না যায়। ক্রমে দেখতে পাবে—সমগ্র সত্তা, সমগ্র জগৎ, সমস্ত বৈচিত্র্য, এই অ—উ ম বা ওঁকারের মাঝে নিহিত রয়েছে।

শব্দকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—তার কতকগুলির উচ্চারণ সুস্পষ্ট, কতকগুলি অস্পষ্ট। আমরা তাদের বলি, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। এই সংস্কৃত নাম দুটীর গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। বর্ণাত্মক অর্থ—যে শব্দকে বর্ণ দিয়ে চিত্র করা যায়। ধ্বন্যাত্মক অর্থ যে শব্দের চিত্র নাই। সাধারণ ভাষা বর্ণাত্মক আর ভাবের ভাষা ধ্বন্যাত্মক—তাকে অক্ষর দিয়ে কিম্বা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা চলে না।

একজন হাসল। তুমি কি কালীর লেখায় সেই হাসিটী ফুটিয়ে তুলতে পার? কাগজের উপর কালীর আঁচড় কেটে তা ব্যক্ত

না জানি ঋষির কি সর্ব্বনেশে ঘুমই পাইয়াছিল। সেই যে রাজাকে পা টিপিতে বলিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর এ দিকে একদিন দুই দিন করিয়া ক্রমে একুশ দিন পার হইয়া গেল, চ্যবন এক কাতে শুইয়া কেবলই ঘুমাইতেছেন—জাগিবার নামটীও নাই।

একুশ দিন পরে চ্যবনের ঘুম ভাঙ্গিল; ঘুম হইতে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিছু আদেশ করিয়া যান নাই—কি জানি কোথায় কি ত্রুটী হয়—তাই রাজা রাণী তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন।

এই একুশ দিন ধরিয়া তাঁহাদের খাওয়া নাই, ঘুম নাই চ্যবনের শয্যার পাশে এক ভাবে বসিয়া কাটাইয়াছেন, অনাহারে, অনিদ্রায়, পরিশ্রমে শরীর এমন হইয়া পড়িয়াছে যে আর পা চলে না—কিন্তু তবুও তাঁহাদের মনে একটু বিরক্তি নাই—হাসিটী যেন মুখে লাগিয়াই রহিয়াছে।

রাজা রাণী পিছনে পিছনে আসিতেছেন দেখিয়া, চ্যবন হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। রাজা হতবুদ্ধির মত রাণীকে লইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর আবার সেই শ্রান্তদেহেই দুইজনে ঋষিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও চ্যবনকে না পাইয়া, শ্রান্তদেহে রাজা রাণী পুরীতে প্রবেশ করিলেন। মনে মনে একটু লজ্জাও হইল, দুঃখও হইল। চ্যবনের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা ঘরে ফিরিলেন—কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তারপর শুষ্ক মনে, চ্যবন যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে ঢুকিয়া দেখেন, ঋষি দিব্য আরামে শয্যার উপর শুইয়া আছেন।

ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের ধড়ে তবুও প্রাণ আসিল। আর কথাটী না বলিয়া তাঁহারা তখনই আবার ঋষির পা টিপিতে বসিয়া গেলেন। এবার ঋষি আর এক পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন। আগেকার মতই একপাশে শুইয়া ক্রমে একুশ দিন কাটিয়া গেল—ঋষির ঘুম ভাঙ্গিল না। রাজা-রাণী সেই একই ভাবে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ক্লান্তিতে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তবুও তাঁহাদের মনে একটু বিকার নাই।

একুশ দিন পরে ঘুম হইতে উঠিয়া চ্যবন বলিলেন, "তোমরা দুজনে আমার সমস্ত শরীরে তৈল মাখাইয়া দাও—আমি এখন স্নান করিতে যাইব।"

রাজারাণী তাড়াতাড়ি তৈল আনিয়া ঋষির সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তবুও তাঁহারা চ্যবনের খামখেয়ালীতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইলেন না বা কোনও কথার প্রতিবাদ করিলেন না।

বহুক্ষণ ধরিয়া তৈল মাখার পর চ্যবন যখন দেখিলেন, রাজারাণী নির্ব্বিকার, তখন হঠাৎ "হইয়াছে, আর দরকার নাই" বলিয়া স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। রাজা-রাণীও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

সেখানে রাজার যোগ্য নানারকম স্নানের উপকরণ সাজানো ছিল। চ্যবন গিয়া সেগুলিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া স্নান না করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। কুশিক সমস্ত দেখিয়াও কিছু বলিলেন না।

রাজারাণী স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া

থেকে, কতকগুলি ওষ্ঠ থেকে আর কতকগুলি মূর্দ্ধা থেকে। কণ্ঠের নীচ থেকে উঠেছে এমন কোনও শব্দ কোন ভাষাতেই নাই; অর্থাৎ কণ্ঠ হচ্ছে যেন বাগ্‌যন্ত্রর এক সীমানা। —তেমনি ওষ্ঠ হচ্ছে তার আর এক সীমানা, ওষ্ঠেরও বাইরে থেকে কোনও শব্দ আস্‌তে পারে না।

প্রণবে আছে অ, উ, ম। অ কণ্ঠ্য শব্দ অর্থাৎ বাগযন্ত্রের একদিকের সীমা থেকে তার উৎপত্তি। উ তেমনি শব্দমালার মধ্যে থেকে ওঠে। মূর্দ্ধার কাছাকাছি বাগযন্ত্রের মধ্যদেশ থেকে তার উৎপত্তি। আবার ম হচ্ছে ওষ্ঠ্য বর্ণ—বাগ্‌যন্ত্রের শেষ প্রান্তের অনুনাসিক বর্ণ।

কাজেই অ হল বর্ণমালার আদি, উ হল তার মধ্য, আর ম হল অন্ত। এই তিনটীতেই সমস্ত বাগ্‌যন্ত্র ব্যাপ্ত রয়েছে। কাজেই ওম্ হচ্ছে একমাত্র স্বাভাবিক সহজ শব্দ। সমস্ত ভাষার প্রতীক ওম্—কাজেই সমস্ত জগতেরও সে প্রতীক।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে। অকারের মত আরও তো কণ্ঠ্য বর্ণ আছে—তেমনি উ আর ম'য়ের সগোত্র বর্ণেরও তো অভাব নাই। কাজেই খুসীমত যে কোনও একটী কণ্ঠ্যবর্ণ বেছে নিয়ে অকারের মত যে কোনও বর্ণের সঙ্গে, কিম্বা মকারের সগোত্র অন্য কোনও বর্ণের সঙ্গে যদি তাকে জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সমস্ত ভাষার একটী নূতন প্রতীক সৃষ্টি করা চলে না কি?

কিন্তু অকার হচ্ছে কণ্ঠ্যবর্ণের শ্রেষ্ঠ। তেমনি উকারের উচ্চারণস্থান থেকে আর যত বর্ণ বেরিয়ে আসে, সবার মাঝে উকারই শ্রেষ্ঠ—সে যেন সকলের রাজা। বোবাও এই বর্ণটী উচ্চারণ করতে পারে, কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না—সে যেন আপনা থেকেই ওঠে—কাজেই এই জাতীয় বর্ণের মাঝে উকারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ম হচ্ছে ওষ্ঠ্য বর্ণের রাজা। তা ছাড়া তার আর একটু বিশেষত্ব আছে—অনুনাসিক বর্ণ বলে সমস্ত নাসাপথকে সে ব্যাপ্ত ক'রে থাকে—অর্থাৎ খাস বা প্রাণের উপর তার আধিপত্য। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটা নাম খুঁজি, তাহলে ওঁকারকে ছেড়ে যাওয়ার আমাদের যো নাই। ওঁকার সমস্ত ভাষার প্রতীক, সমস্ত ভাবের প্রতীক কাজেই সমস্ত বিশ্বেরও প্রতীক।

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র, এমন কি হিন্দুর সমস্ত দর্শন এই ওঁকারের ব্যাখ্যাতেই পর্য্যবসিত। প্রণব সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। জগতে এমন শক্তি নাই, এমন এমন আইন নাই, এমন বস্তু নাই, ওঁকারের মাঝে যাকে পূরে দেওয়া না যায়। ক্রমে দেখতে পাবে—সমগ্র সত্তা, সমগ্র জগৎ, সমস্ত বৈচিত্র্য, এই অ—উ ম বা ওঁকারের মাঝে নিহিত রয়েছে।

শব্দকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—তার কতকগুলির উচ্চারণ সুস্পষ্ট, কতকগুলি অস্পষ্ট। আমরা তাঁদের বলি, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। এই সংস্কৃত নাম দুটীর গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। বর্ণাত্মক অর্থ—যে শব্দকে বর্ণ দিয়ে চিত্র করা যায়। ধ্বন্যাত্মক অর্থ যে শব্দের চিত্র নাই। সাধারণ ভাষা বর্ণাত্মক আর ভাবের ভাষা ধ্বন্যাত্মক—তাকে অক্ষর দিয়ে কিম্বা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা চলে না।

একজন হাস্‌ল। তুমি কি কালীর লেখায় সেই হাসিটী ফুটিয়ে তুলতে পার? কাগজের উপর কালীর আঁচড় কেটে তা ব্যক্ত

না জানি ঋষির কি সর্ব্বনেশে ঘুমই পাইয়াছিল। সেই যে রাজাকে পা টিপিতে বলিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর এ দিকে একদিন দুই দিন করিয়া ক্রমে একুশ দিন পার হইয়া গেল, চ্যবন এক কাতে শুইয়া কেবলই ঘুমাইতেছেন—জাগিবার নামটীও নাই।

একুশ দিন পরে চ্যবনের ঘুম ভাঙ্গিল; ঘুম হইতে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিছু আদেশ করিয়া যান নাই—কি জানি কোথায় কি ত্রুটী হয়—তাই রাজা-রাণী তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন।

এই একুশ দিন ধরিয়া তাঁহাদের খাওয়া নাই, ঘুম নাই চ্যবনের শয্যার পাশে এক-ভাবে বসিয়া কাটাইয়াছেন; অনাহারে, অনিদ্রায়, পরিশ্রমে শরীর এমন হইয়া পড়িয়াছে যে আর পা চলে না কিন্তু তবুও তাঁহাদের মনে একটু বিরক্ত নাই—হাসিটী যেন মুখে লাগিয়াই রহিয়াছে।

রাজা রাণী পিছনে পিছনে আসিতেছেন দেখিয়া, চ্যবন হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। রাজা হতবুদ্ধির মত রাণীকে লইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর আবার সেই শ্রান্তদেহেই দুইজনে ঋষিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও চ্যবনকে না পাইয়া, শ্রান্তদেহে রাজা রাণী পুরীতে প্রবেশ করিলেন। মনে মনে একটু লজ্জাও হইল, দুঃখও হইল। চ্যবনের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা ঘরে ফিরিলেন কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তারপর শূন্য মনে, চ্যবন যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে ঢুকিয়া দেখেন, ঋষি দিব্য আরামে শয্যার উপর শুইয়া আছেন।

ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের ধড়ে তবুও প্রাণ আসিল। আর কথাটী না বলিয়া তাঁহারা তখনই আবার ঋষির পা টিপিতে বসিয়া গেলেন। এবার ঋষি আর এক পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন। আগেকার মতই একপাশে শুইয়া ক্রমে একুশ দিন কাটিয়া গেল—ঋষির ঘুম ভাঙ্গিল না। রাজা-রাণী সেই একই ভাবে বসিয়া পদসেবা করিতে-ছেন। ক্লান্তিতে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তবুও তাঁহাদের মনে একটু বিকার নাই।

একুশ দিন পরে ঘুম হইতে উঠিয়া চ্যবন বলিলেন, "তোমরা দুজনে আমার সমস্ত শরীরে তৈল মাখাইয়া দাও—আমি এখন স্নান করিতে যাইব।"

রাজারাণী তাড়াতাড়ি তৈল আনিয়া ঋষির সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তবুও তাঁহারা চ্যবনের খামখেয়ালীতে বিন্দু-মাত্র বিরক্ত হইলেন না বা কোনও কথায় প্রতিবাদ করিলেন না।

বহুক্ষণ ধরিয়া তৈল মাখার পর চ্যবন যখন দেখিলেন, রাজারাণী নির্ব্বিকার, তখন হঠাৎ "হইয়াছে, আর দরকার নাই" বলিয়া স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। রাজা-রাণীও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

সেখানে রাজার যোগ্য নানারকম স্নানের উপকরণ সাজানো ছিল। চ্যবন গিয়া সেগুলিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া স্নান না করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। কুশিক সমস্ত দেখিয়াও কিছু বলিলেন না।

রাজারাণী স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া

দেখিতে পাইলেন, চ্যবন স্নান করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "অন্ন প্রস্তুত, এখানে নিয়া আসিব কি?" চ্যবন বলিলেন, "আচ্ছা, আন।"

রাজা আর রাণী দুজনেই কত রকমের খাবার আনিয়া থরে থরে ঋষির সম্মুখে সাজাইয়া রাখিলেন। কি জানি, চ্যবনের আবার কি রকম খাদ্যে রুচি হয়, তাই বনবাসীদের ফলমূল আহার হইতে রাজার চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় পর্য্যন্ত সমস্ত রকম খাবারই কুশিক সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। এখন হাসিমুখে রাণীকে লইয়া স্বয়ং সেগুলি বহিয়া আনিলেন।

চ্যবন কিন্তু কিছুই খাইলেন না। ঘরের বিছানা, আসন, কাপড় চোপড়, আসবাবপত্র, যাহা কিছু ছিল, সমস্তই টানিয়া আনিয়া দুড়্ দাড়্ করিয়া খাবারের উপর ফেলিতে লাগিলেন। তারপর সমস্তগুলি স্তূপ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া আবার অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। রাজা-রাণী চাহিয়া চাহিয়া সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মনে বা মুখে একটুও ভাবান্তর হইল না।

সমস্ত দিন রাত্রি কাটিয়া গেল—রাজা আর রাণী চুপটী করিয়া একভাবে বসিয়া আছেন। পরদিন ঋষি আবার দেখা দিলেন। আরও কয়দিন ধরিয়া তাঁহাদের উপর যথেচ্ছাচার চলিল; কিন্তু খাওয়া, পরা, স্নান, শোওয়া—কোন কিছুতেই ঋষি রাজার একটুও ত্রুটী ধরিতে পারিলেন না।

একদিন চ্যবন বলিলেন, "আমি রথে চড়িয়া বেড়াইতে যাইব, শীঘ্র রথ লইয়া আইস।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রথ আনিব—যুদ্ধরথ না ক্রীড়ারথ?" ঋষি বলিলেন, "খুব ভাল দেখিয়া একটা যুদ্ধরথ আনিও—দেখিও, আয়োজনের যেন কোনও ত্রুটী না হয়।"

হুকুমমত রথ আসিল। চ্যবন বলিলেন, "কিন্তু রথে ঘোড়া যুড়িলে তো চলিবে না। তুমি আর তোমার রাণী রথ টানিবে। চাবুকটা দাও তো আমার হাতে।"

রাজা একটীও কথা না বলিয়া লোহার সূঁচ পরানো চাবুকটা ঋষির হাতে দিয়া রাণীকে রথের বাঁদিকে জুড়িয়া দিলেন, নিজে ডানদিকে বসিলেন। তারপর চ্যবন রথে চড়িলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, রথ কোথায় লইয়া যাইব, বলুন। যেখানে বলিবেন, আপনার রথ সেখানেই যাইবে।"

চ্যবন বলিলেন, "রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রত্যেক বড় বড় রাস্তায় রথ যাইবে। ধীরে ধীরে রথ টানিও, যাতে আমার কোনও রকম পরিশ্রম বা আরামের ব্যাঘাত না হয়। তা ছাড়া রাস্তা হইতে লোকজন সরাইয়া দিতে পারিবে না—আমার রথ হাঁকানো সকলকেই দেখিতে হইবে। আর দেখ, যত ধন রত্ন আনিয়া আমার রথ বোঝাই করিয়া দিতে বল—আমি রাস্তার লোককে সে সকল বিলাইয়া দিতে দিতে যাইব।"

রাজার হুকুমে তখনই নানা ধন রত্নে রথ বোঝাই করা হইল। হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর লইয়া মহাসমারোহে ঋষি রথে চড়িয়া বাহির হইলেন। অমাত্যেরা সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আজ পঞ্চাশ দিন ধরিয়া রাজা আর রাণীর আহার নাই, নিদ্রা নাই। শরীর শুকাইয়া ছায়ার মত হইয়া গিয়াছে—চলিয়া যাইতে টলিয়া পড়েন—এত বড় ভারী রথ টানিয়া নেওয়া কি তাঁহাদের সাধ্যে কুলায়? রথ তাড়াতাড়ি চলিতেছে না দেখিয়া ঋষি সেই

ছুঁচমুখো চাবুক দিয়া রাজা-রাণীর পিঠে গালে নিষ্ঠুরভাবে খোঁচা মারিতেছেন—রক্তে তাঁহাদের শরীর ফুলন্ত পলাশ গাছের মত রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহাদের সহিষ্ণুতা—এত নির্য্যাতনেও মুখে বিন্দুমাত্র বিকারের চিহ্ন নাই।

রাজারাণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রজারা হাহা-কার করিয়া উঠিল, কিন্তু শাপের ভয়ে কেহ কোনও প্রতিবাদ করিতেও সাহস পাইল না। ঋষি স্বচ্ছন্দমনে রথ হাঁকাইয়া চলিয়াছেন, আর কুবেরের মত মুঠায় মুঠায় রত্ন লইয়া রাস্তার দুধারে ছড়াইয়া যাইতেছেন।

এমনি করিয়া নগর ছাড়িয়া রথ বাহিরে আসিয়া পড়িল। কুশিক আর তাঁহার রাণী এযাবৎ একটীও কথা বলেন নাই—ঋষি যাহা বলিয়াছেন, অম্লানবদনে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহাদের ধৈর্য্য ও বিনয় দেখিয়া এবার চ্যবনের মন প্রসন্ন হইল। তিনি রথ হইতে নামিয়া রাজা ও রাণীর বাঁধন খুলিয়া দিলেন।

তারপর স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে ঋষি কুশিককে বলিলেন, "বৎস, তোমাদের সেবায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বর নাও"—এই বলিয়া সস্নেহে তাঁহাদের গায় হাত বুলাইয়া দিলেন। ঋষির অমৃতময় স্পর্শে রাজা ও রাণীর শরীরের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত ক্ষতচিহ্ন মুছিয়া গেল।

ঋষি বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে কখনও বৃথা বাক্য উচ্চারণ করি নাই, সুতরাং আমি যাহা বলিব, তাহা নিশ্চয়ই হইবে। আমরা গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি কিছুদিন ব্রতাবলম্বী হইয়া এখানে থাকিব। তুমি রাণীকে লইয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া যাও—আজকার দিন বিশ্রাম করিয়া কাল আবার দুজনে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিও। বাছা, কিছু মনে করি-না। তুমি মনে মনে যাহা আকাঙ্ক্ষা করি-তেছ, তাহা সফল হইবে।"

রাজা কুশিক উত্তর করিলেন, "আপনার আচরণে আমরা বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হই নাই। আপনার পরাক্রম আমরা জানি, আর জানি আপনার প্রসাদে আমাদের কল্যাণই হইবে। আপনার স্পর্শে আমাদের যেন নূতন যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে।"

এই বলিয়া চ্যবনকে অভিবাদন করিয়া রাজা ও রাণী অমাত্য ও অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। পঞ্চাশ দিন পরে আজ তাঁহাদের ভাগ্যে আহার ঘটিল—খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁহারা বিশ্রাম করিতে গেলেন। কাল আবার ঋষির ওখানে নিমন্ত্রণ—আবার কি নূতন পরীক্ষা ভাগ্যে আছে, কে জানে?

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়াই রাজা আর রাণী গঙ্গাতীরে পূর্ব্বদিন চ্যবনকে যেখানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেইখানে গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এই কি সেই গঙ্গাতীর, কাল যেখানে কেবল কুশের বন আর উইয়ের ঢিবি দেখিয়া গিয়া-ছিলেন? এ যে অমরাবতীর নন্দন কানন, —যেন কোন যাদুমন্ত্রে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে!

রাজা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, "এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না সত্য? না আমার চিত্ত বিকার ঘটিয়াছে? এ কি সশরীরে উত্তরকুরুতেই উপস্থিত হইলাম, না স্বর্গেই আসিলাম?"—এমন সময় দেখিতে পাইলেন, মণিময় স্তম্ভযুক্ত সমুজ্জ্বল দিব্য শয্যায়

মহর্ষি চ্যবন শুইয়া আছেন। দেখিয়াই রাজা ও রাণী তাড়াতাড়ি তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিলেন।

কাছে আসিতে না আসিতেই দেখেন, কোথাও কিছু নাই—নন্দন কাননও নাই, চ্যবনও নাই, সোণার বিমানও নাই। হত-বুদ্ধি হইয়া তাঁহারা নানা কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখেন, অদূরে কুশাসনে বসিয়া মহর্ষি চ্যবন জপ করিতেছেন।

কুশিক তখন বুঝিলেন, ঋষির যোগবলেই গঙ্গাতীরে নন্দন কাননের আবির্ভাব হইয়াছিল। তপস্যার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে রাজা রাণীকে বলিতে লাগিলেন, "দেখিলে, তপস্যার কি আশ্চর্য্য শক্তি! মানুষ কল্পনাতেও যাহা আনিতে পারে না, তপস্যাতে তাহাও সম্ভব। ত্রিলোকের রাজ্য ইহার কাছে কোন ছার! তপস্যার বলে নূতন লোক সৃষ্টি করাও তো অসম্ভব নয়। আমার মত রাজা হওয়া সহজ, কিন্তু জগতে ব্রাহ্মণ্য লাভ করা বহু ভাগ্যের কথা।"

রাজা রাণীকে দেখিতে পাইয়া চ্যবন তাঁহাদিগকে কাছে ডাকিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রণাম করিলে বসিতে বলিয়া চ্যবন মধুর স্বরে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মহারাজ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের উপর তোমাদের আধিপত্য জন্মিয়াছে, তাই আমার কঠিন পরীক্ষায় তোমরা পার পাইলে। তোমাদের মাঝে বিন্দুমাত্রও কলুষ নাই, আমার সেবাতেও কিছুমাত্র ত্রুটী ঘটে নাই। আমি তোমাদের ব্যবহারে বড়ই প্রীত হইয়াছি—এখন তবে বিদায় দাও, আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাই।—আর তোমাদের যাহা ইচ্ছা বর লও।"

কুশিক উত্তর করিলেন, "জ্বলন্ত আগুণের মাঝে পড়িয়া বাঁচিয়া আসিয়াছি—আপনি যে আমাকে সবংশে ভস্ম করেন নাই, এই আমার বহু ভাগ্য—আমি আর বর চাহি না। তবে আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার একটা সংশয় দূর করুন।"

চ্যবন বলিলেন, "বেশ, বল তোমার কি সংশয়?"

কুশিক বলিলেন, "কি উদ্দেশ্যে আপনি আমার গৃহে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তো বুঝিলাম না। তা ছাড়া আপনার এমন সব অদ্ভুত ব্যবহারেরই বা অর্থ কি?"

চ্যবন বলিলেন, "কথাটা যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন খুলিয়া বলাই ভাল। পিতামহ ব্রহ্মার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তোমার পৌত্র নাকি তেজবীর্য্যে ব্রাহ্মণতুল্য হইবে। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে তো ব্রাহ্মণে-ক্ষত্রিয়ে কুলসঙ্কর উপস্থিত হইবে—সেটা কি ভাল? তাই সবংশে তোমাকে নিপাত করিবার জন্য তোমার বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, তোমার উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিব; যদি কোনও কারণে তুমি বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ কর অমনি শাপ দিয়া তোমার বংশ শুদ্ধ ভস্ম করিয়া দিব। কিন্তু তুমি যে আশ্চর্য্য সংযম ও সহিষ্ণুতা সহকারে আমার সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছ, তাহাতে তোমার উপর খুসী না হইয়া আমি আর পারিলাম না। তাই শেষকালে তোমাকে আর রাণীকে মুহূর্ত্তকালের জন্য স্বর্গচিত্র দেখাইলাম; দেখিয়া বুঝিবে, তপস্যার কি আশ্চর্য্য মহিমা।

"এতদিন ধরিয়া তুমি মনে মনে যে কি কামনা করিয়া আসিয়াছ— তাহা আমি

সমস্তই জানি। তুমি রাজত্ব, ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ করিয়া ব্রাহ্মণত্বই চাহিয়াছিলে। তুমি জান ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা কত দুরূহ। কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার তৃতীয় পুরুষে তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব সংক্রামিত হইবে। তোমার পৌত্র অগ্নিতুল্য তেজস্বী ব্রাহ্মণ হইবে —দেবতা-নরে তাহাকে ভয় করিয়া চলিবে। এখন আমি তীর্থযাত্রায় বাহির হইব, তুমি ইচ্ছামত আমার নিকট বর মাগিয়া লও।"

চ্যবনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কুশিক বলিলেন, "যদি বরই দিবেন, তবে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, আমার বংশে যেন সকলেই ব্রাহ্মণের যোগ্যতা লাভ করে, ধর্ম্মে যেন তাহাদের মতি থাকে।"

"তথাস্তু" বলিয়া চ্যবন অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।



শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

[অভিধেয় সাধনভক্তিতত্ত্ব—কৃপা ও সাধুসঙ্গ]

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মহতের কৃপা লাভ করা—ভক্তিপথের এই তো নিশানা। যেমন জ্ঞানের বেলায়, তেমনি ভক্তির বেলায়—কর্ম্মদ্বারা ভক্তিলাভ হয় না; কিন্তু সে হইল কামনা-নিবৃত্তির পরের কথা। সংসারকামনাটুকু মনের মাঝে ষোল-আনা বজায় রাখিয়াছ, অথচ এদিকে কৃপার ভরসা করিতেছ—এমনতর ফাঁকিবাজীতে ভগবান্ মিলে না। কৃপালাভের আগে নিজকে কৃপার যোগ্য করিতে হইবে—যে দিক দিয়াও তোমার কম দেনা জমিয়াছে মনে কর? জীব পশুবৃত্ত—প্রকৃতির বশে আকাঙ্ক্ষা করাই তাহার স্বভাব। এক কথায় তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি জবরদস্তি করিতে যাও, তাহা হইলে বাহিরে সে নিবৃত্তির ভান করিয়া অন্তরে কালকূট পুরিয়া রাখিবে। তাই বুঝিয়া শুনিয়া শাস্ত্র তাহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ করিয়াছেন। প্রবৃত্তি যে-সমস্ত কর্ম্মের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহার সকলগুলিকে সমর্থন করা শ্রেয়স্কর না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি কর্ম্মকে বিহিত বলিয়া সঙ্গত পরিমাণে জীবের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করাইতেই হইবে। এইগুলি তার কাম্য কর্ম্ম। তা ছাড়া যে সমাজে সে জন্মিয়াছে, সেই সমাজের প্রত্যেকের সুখ-শান্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নিজের উৎকট বাসনাগুলিকেও সঙ্কুচিত রাখিতে হয়। এই জন্য কতকগুলি কর্ত্তব্যের বিধানও রহিয়াছে। ফল কথা, কামনাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া শাস্ত্র ধর্ম্মসঙ্গত তৃপ্তির ভিতর দিয়া তাহার নিবৃত্তি ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই শাসন সকলকেই মানিতে হইবে।

আগে শাস্ত্রবিহিত বা শুভবুদ্ধির অনুমোদিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া চিত্ত নির্ম্মল

কর, তারপর কৃপালাভের যোগ্যতা জন্মিবে। চিত্ত যদি শুদ্ধ হয়, তখন আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে, যে ঠাকুরটী তোমার অন্তরের নিভৃতে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, তিনি কোন দিকে তোমাকে আকর্ষণ করিতেছেন। যদি কৃপার অধিকারী হও, তখন কৃপার অনুভূতি আপনিই অনুভব করিবে—দেখিবে দীনহীন কাঙ্গালকেও তিনি কি করিয়া কৃপার পাথারে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত সংসার বাসনা ক্ষয় না হইবে, চিত্তশুদ্ধি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কৃপা চাহিয়াও কৃপা পাইবে না—বরং কৃপার ভরসায় বিধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যটুকু পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া আত্ম প্রবঞ্চনায় দুষ্কৃতির বোঝা ভারী করিয়া তুলিবে মাত্র। কৃপা তো তিনি করিয়াই রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম কই?—তাঁহার কথায় সায় দিলাম কই? তাঁহাকে ডাকিবার বেলাতেও যে আমাদের সংসার-বুদ্ধি ছাড়িতে চায় না - সেখানেও যে ফাঁক-তালে কাজ হাসিল করিবার ফিকিরই খুঁজি। তাঁর কিছু শক্তি সামর্থ্য তিনি আমাদের দিয়াছেন, তাঁর সাধ সেইগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহারই লীলার আনন্দ আমরা বাড়াইয়া তুলি—লীলার সূত্র তো তিনি ধরিয়াই রহিয়াছেন অথচ আমাদের এমনই পাটোয়ারী বুদ্ধি যে, তাঁর দেওয়া শক্তি-সামর্থ্যের বলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে সংসারের সমস্ত কাজই "আমার" বলিয়া করিব, কিন্তু তাঁহাকে ডাকিবার বেলায় যত অশক্তি আর অসামর্থ্যের দোহাই পাড়িয়া নিজকে ভুলাইব। বাস্তবিক দীনতা যাহার জাগিয়াছে, তাহার সকল বিষয়েই দীনতা; সংসারের কাজেও সে নিজকে দীনহীন কাঙ্গাল—তাঁরই হাতের খেলার পুতুল বলিয়াই জানে। কিন্তু ফাঁকি দিবার ইচ্ছাটাই যাহার মাঝে প্রবল, সংসারের কাজে শক্ত-সমর্থ হইয়াও ভগবানের বেলায় সে অচল হইয়া পড়ে।

এই জন্যই বলিতে হয়, মহতের কৃপা ভিন্ন কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে জ্ঞান বা ভক্তি লাভ করা যায় না, এই কথাটির যথার্থ তাৎপর্য্যটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—সংসার বাসনার নিবৃত্তি হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আমার পক্ষে তিরোহিত হইয়াছে কিনা, তাহা পরখ করিয়া লইতে হইবে। সমস্ত সাধনারই, গোড়া যদি পাকা না হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ দুর্ঘট। কৃপার আশায় নিজকে ভাসাইয়া দেওয়া—সে তো মুখের কথা নয়। নিজের অকিঞ্চনতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে না পারিবে, তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ মন যতদিন আকুল হইয়া না উঠিবে, ততদিন কৃপার কথা তোমার মুখের কথাই মাত্র।

তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে সাধনার চরম লক্ষ্য যা, সেটীকে প্রথম হইতেই মনের সামনে ধরিয়া রাখিতে হইবে—তারপর তার যোগ্যতা যখনই জন্মাক না কেন। কর্ম্মক্ষয়ের জন্য সংসার কর্ত্তব্যই যখন পালন করিতে হইবে, তখনও নিজের অহংবুদ্ধিটাকে বলি দিয়া কৃপার অনুভূতি পাইবার জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে—তখনও বুঝিতে হইবে—যাহা করাইবার তাহা তিনিই করাইতেছেন—এর মাঝে আমার অহঙ্কারের ঠাঁই কোথায়? এই ভাবটুকুর সাধনা কর্ম্মের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। করিতে করিতে চিত্ত যদি কখনও নির্ম্মল হয়, তখন কর্ম্মের ভার আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে—

কৃপার উপলব্ধি তখনই সুস্পষ্ট হইবে।

এ তো গেল চিত্তশুদ্ধির কথা—কর্ত্তব্যের কথা। কিন্তু যাহার স্পর্শে অবোধ জীবের চিত্তে এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির স্ফুরণ হয়, সেই কৃপার কথাই এখন বলিব। যাহাই করি আর যতটুকুই করি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই করিবার যো নাই। বুদ্ধি যদি শুভ দিকে যায়, তবে সে তাঁহার ইচ্ছাতেই যায়; যদি অশুভ পথে গিয়া দুঃখ পাই, আঘাত পাই, তবে তাহা তাঁহারই কৃপার যোগ্যতা লাভ করিব বলিয়া। সুখে দুঃখে, আপদে-বিপদে এই কথাটা যদি স্মরণ থাকে, তবে তিনি যে মঙ্গলময়, তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই পাইব। মঙ্গলময় বলিয়াই তো তাঁহার অহেতুকী কৃপা—জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক—তাঁহার দিকে আমাদিগকে অনুক্ষণ টানিয়া লইতেছে।

কৃপার প্রয়োজন ইহাতেই বুঝি, যখন তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়া দেখি, তিনি ছাড়া আর তাঁহাকে জানাইয়া দিবার কেহ নাই। এই যে ইন্দ্রিয়ের পথে মোহিনী মায়ার অপরূপ বর্ণচাতুরী সাজাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার মাঝে তিনি এমন ভাবেই আড়াল হইয়া রহিয়াছেন যে তিনি না বলিয়া দিলে অনন্তকাল ধরিয়া ইহার মাঝে খুঁজিলেও তো তাঁহাকে ধরিতে পারিব না। তাই বলি, তাহাকে আপন জোরে জানার স্পর্দ্ধা একটা মূঢ় অভিমান বই আর কি? আমাদের জোর আবার কোথায়? যেটুকু গুছাইয়া যেটুকু সাজাইয়া দর্পের ভরে মনে করি—এ আমারই বাহাদুরী, দর্পহারীর লীলাচাতুরীতে নিমিষের মাঝে যখন তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়াইয়া যায়, তখন অত বড় দম্ভও যে চোখের জলে কোথায় ভাসিয়া যায়। খুঁজিয়া দেখিলে জীবনের মাঝে অহরহ এই দর্পহরণের অভিনয় কি দেখিতে পাইব না? কি সংসাররাজ্যে, কি অধ্যাত্মরাজ্যে, দায়ে ঠেকিলে তাঁহার দোহাই দেওয়া ছাড়া আর গতি নাই—গুমোরের দৌড় আমাদের ঐ পর্য্যন্তই।

ধরা দেন তিনি সাধিয়া—নহিলে আমাদের সাধ্য কি যে তাঁহাকে ধরি? আবার যুগ যুগ ধরিয়া লুকোচুরী খেলিলেও, ধরা দেওয়াই তাঁহার স্বভাব, তাই আজ তিনি যতই আড়াল হইয়া থাকুন না কেন—আমার সাধ্য আর সাধনার অভিমান ভাসিয়া গেলে একদিন যে তিনি আপনা হইতেই আসিয়া দেখা দিবেন—এইটুকু আশা—এইটুকু বিশ্বাস সম্বল।

যাঁহাদের তিনি কৃপা করেন, তাঁহাদের মাঝেই তিনি তাঁহার নিদর্শন রাখিয়া যান—তাঁহারাই মহাজন। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেমন নিত্য, এই মহাজনদিগের সঙ্গেও তেমনই নিত্য সম্বন্ধ, কেননা ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারই গণ বলিয়া যখন তাঁহারা পরিগণিত হইয়াছেন, তখন হইতেই স্বভাবগুণে মায়ামুগ্ধ জীবকে ভগবানের চরণে আকর্ষণ করারও তাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে। এই অধিকারের বলেই গুরুরূপে তাঁহারা জীবকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয়—এই তিনটী হইল সিদ্ধপথের অবলম্বন। মনুষ্যত্ব হইলে আপনা হইতেই মুমুক্ষুত্ব জন্মিবে। আবার ভগবানকে পাইবার জন্য তীব্র লালসা জন্মিলে মহাপুরুষ-সংশ্রয়ও অনায়াসে লাভ হইবে।

চিত্তটী নিষ্কিঞ্চন করিয়া, যে শ্রীগুরুর

মূর্ত্তিতে ভগবান্ নরলোকে প্রকট হইয়াছেন, তাঁহারই পায়ে নিজকে লুটাইয়া দিতে পারিলে কৃপার ধারা আপনিই ঝরিয়া পড়িবে। যদি অহং ছাড়িতে পার, তবে দেখিবে, কৃপা ছাড়া তোমার এক পা-ও চলিবার সাধ্য ছিল না—এখনও নাই। ভগবান কি লৌকিক বিষয়ের মত কার্য্যকারণের ডুরিতে বাঁধা? তিনি রসময়, রসস্বরূপ—তাই জীবের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক রসের ভিতর দিয়া—প্রেমের ভিতর দিয়া। তাঁহার রসোচ্ছল প্রেমোচ্ছাস আপনার মাঝে সংবরণ করিতে পারিতেছেন না—তাই না তিনি জীবজগতে রসের আবেশে ঢলিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। এই রসের সাক্ষাৎকার না পাইলে, শুধু তোমার জপ তপ আর যোগ যাগের আড়ম্বর দিয়া কি সে রসিকের মন ভুলাইতে পারিবে? তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধই এই—নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহার বংশীরবে ব্রহ্মাণ্ডভূতলকে পুলক-চঞ্চল করিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে—আর অজানা আবেশে রসে ডগমগ হওয়ায় আমরা তাঁহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছি। যোগ জপ-তপের এইখানেই সমাধি—এইখানেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপার বিলাস। সে কৃপা মহতের মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই এ নরজগতেও আমরা তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাই সাধনার গোড়ার কথা—মহাপুরুষের আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ভরত রহূগণকে বলিতেছেন (৫, ২০, ১২)—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাৎ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

—হে রহূগণ, তপস্যা দ্বারা নয়, যজ্ঞ দ্বারা নয়, দান দ্বারা নয়, বেদাভ্যাস বা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম দ্বারা নয়—কিম্বা অগ্নি, বরুণ বা সূর্য্যের উপাসনা দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া যায় না। মহতের শ্রীচরণ-ধূলির অভিষেক ভিন্ন তাঁহাকে পাইবার আর উপায় নাই।

বস্তুতঃ তপঃ, দান, যজ্ঞ ইত্যাদি সমস্তই অবান্তর সাধন মাত্র। এ সমস্ত পরিমিত বস্তু, সুতরাং ইহাদের দ্বারা পরিমিত ফলই পাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু অপরিমেয় ভগবৎ তত্ত্ব লাভ হইবে কি করিয়া?—এইখানেই কৃপার অধিকার—যে কৃপা স্বয়ং অহৈতুক, নিরবধি, নিখিল সম্বন্ধ সুধার সার—সেই কৃপার বলেই মর্ত্ত্যেরও মন্দস্থলে ভগবানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে। তুমি নিমিত্তের দোহাই দিয়া এ রহস্যের ভেদ করিতে পারিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন—(৭, ৫, ৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

—যে শ্রীভগবানের চরণস্পর্শে সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া যায়, নিষ্কিঞ্চন মহৎ পুরুষগণের পদরজের অভিষেক বরণ করিয়া না লইলে সে শ্রীচরণে কাহারও মতি হয় না।

নিষ্কিঞ্চন না হইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, যদি সংসারের আসক্তি ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন না হইতে পার, তবে অন্ততঃ নিষ্কিঞ্চনের দাস্য অবলম্বন কর—উহাতেও তোমার সংসারাসক্তি শিথিল হইবে। সংসারের হাটে যে ঠাকুরটী তোমাকে নাচাইয়া ফিরিতেছে, তার বড় অভিমান। সেই-তো তোমার মন হরণ করিবার জন্য কতই না তার ছলা কলা,

কিন্তু তবুও তোমার চিত্তে একটী ধূলিকণারও প্রতি আসক্তি থাকিতে সে কিছুতেই কাছে ঘেঁসবে না। সবটুকুই তার একার চাই—তার দখলে সে সবীক সাজতে পারে না। সেই জন্যই তো তোমার আশে পাশে কত রূপে, কত ছলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তুমি ডাক লেওসে ধরা দেয় না হৃদয়-দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলে "ওই যে ঘরে আর কাহাকে লুকাইয়া রাখিয়া আমাকে ডাকিতেছিস্ ও তোর মিছার ডাকাডাকি। আমি কি কাহারও এঁটো কুড়াইয়া বেড়াই!"

এইজন্যই নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজনা করিতে হইবে—নিষ্কিঞ্চন হইয়া যাঁহারা তাঁহাকে পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেবা করিয়া নিষ্কিঞ্চনতার ব্রত শিখিয়া লইতে হইবে। এই নিষ্কিঞ্চনের দলই তো ভাগবতের "মহতো মহীয়ান্", মহতের সেবা অর্থে এই সর্ব্ব-ত্যাগীদেরই সেবা। ইঁহাদের সেবায় কি ফল?—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শৌনকাদির প্রতি সূত বলিতেছেন (১, ১৮, ১৩)—

তুলয়ামো লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

—শ্রীভগবানের সঙ্গ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গও ক্ষণকালের জন্য যাহারা পায়, স্বর্গবাস বা অপবর্গের সঙ্গে তাহাদের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না; আর মরণই যাহাদের ধর্ম্ম, সেই তুচ্ছ মানুষের ছার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাহার আর কি তুলনা হইবে?

'ভক্তিসাধনের' ভিত্তিই হইল সাধুসঙ্গ। ভক্ত পৌরুষের অভিমান রাখেন না—প্রাণের আকুলতায় তাঁহার ভজনা—ভগবানের লীলা-রসের পিপাসু তিনি। তাই প্রিয়বিরহে সন্তপ্ত হৃদয় যেমন প্রিয় সঙ্গীর সঙ্গলাভ করিয়াও কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়, ভক্তও তেমনি ভক্তের সঙ্গে প্রিয়সমাগমের সুখই অনুভব করেন। ভক্ত সঙ্গে যাহার রুচি হইল না, ভক্তিতে তাহার অধিকার জন্মিবে কি করিয়া?

উদাসীনভাবে পথে চলিতে চলিতেও যেমন কোনও দেবাগন্ধে মোহিত হইয়া মানুষ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, মহতেরাও তেমনি অহেতুকভাবে জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ভগবদ্ভক্তি স্ফুরিত করিয়া দেন। আমরা সাধু-সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি—মহতেরই গুণে, নিজের গুণে নয়। আমাদের সুকৃতি যতটুকু তাহার চেয়েও তাঁহাদের কৃপা অধিক নতুবা মূঢ় পাষণ্ডকে যাচিয়া তাঁহারা প্রেম বিলাইতেন না। মহতের এই স্বভাব দেখিয়াই বুঝি, ভগবানের কৃপা অবিশ্রাম কি করিয়া আমাদিগকে নিত্যধামের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি যে দয়াল, তাহা মহতের দয়া হইতেই বুঝিতে পারি।

এই অহেতুক কৃপার বর্ষণ—মরমে মরমে এই নিত্য আকর্ষণ ইহার আভাসটুকু চিত্তে জাগিলে কি আর জীব স্থির থাকিতে পারে? বিষয়-বিমুখ পিপাসী ইন্দ্রিয় তখন মহতের সেবায় আপনাকে তৃপ্ত করিতে চায়—শ্রীগুরুর সেবায় আত্মসমর্পণ করে। এই ঐকান্তিক সেবা হইতেই সংসার বাসনা নির্বীজ হইয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় চরাচর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাই মহাজনেরা বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

পথের সঙ্কেত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দুঃখের পর সুখের পালা। দুঃখ বরং সহা যায়, কিন্তু সুখ সহ্য করা বড় কঠিন। জিজ্ঞাসা করিতে পার, সুখ কি আমার প্রতিকূল যে তাহাকে আবার সহিয়া যাইতে হইবে?—হাঁ, দুঃখ যদি তোমার প্রতিকূল হয়, তবে সুখও প্রতিকূল বই কি? সুখ-দুঃখের দুইটার একটা দিয়াও তোমার লক্ষ্যের পরিচয় দেওয়া চলিবে না। যাহাকে তুমি ইষ্ট ভাবিয়া আঁকড়িয়া রহিয়াছ, তাহার প্রতিকূল কিছু আসিয়া উপস্থিত হইলে, দুঃখ বলিয়া তাহাকে তুমি প্রাণপণে খেদাইয়া দিতে চাও, কিন্তু যতটুকুকে তুমি ইষ্ট ভাবিয়াছ, তাহাই যে তোমার সব, উহার পরেও যে আর কিছু নাই—তাহা তোমাকে কে বলিল? এখনকার মত এইটুকু ইষ্টই তোমার কাছে সুখের বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু এ সুখটুকু যখন অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, তখন দেখিবে আর তাহাতে মধু নাই—এখন তার চেয়েও বড় আর একটা কিছু চাই। সুখের পিছনে পিছনে ছুটিলে দেখিবে, এমনি করিয়া তোমার সমস্ত সুখের স্বপনই নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে, সুখ বলিয়া যাহাকে ধরিতে যাইতেছ, পলক না ফেলিতে তাহা দুঃখের কালিমায় কালো হইয়া উঠিতেছে। এটা নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য—তাই অতি সহজ বলিয়াই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। আবার সহজ বলিয়াই ইহার সঙ্গে জিতিয়া আসা কঠিন। কিন্তু তবুও গোড়া হইতে কথাটা জানিয়া রাখা ভাল। কি করিয়া দুঃখকে এড়াইতে হইবে, আমরা সন্তানকে সেই শিক্ষাই দিই, কিন্তু সুখের হাত হইতে যে কি করিয়া বাঁচিতে হইবে, তাহার সন্ধানটা বলিয়া দিই না। অলীক সুখের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া কত জীবন যে পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব কি কেহ রাখে?

তাই বলি, দুঃখের আঘাতের মত সুখের অভিঘাতের উপরেও কড়া নজর রাখিতে হবে। দুঃখ স্পষ্ট কথা বলে, তাই তাহার বিরুদ্ধে চিত্তকে উত্তেজিত করা সহজ। কিন্তু সুখের ছলনা যেমন করিয়া ইন্দ্রিয়ের সমস্তগুলি দ্বার সন্তর্পিত করে,—তাহার মোহ কাটাইবে কিসে? এইখানে বিচারবুদ্ধিকে আরও সজাগ করিয়া তুলিতে হয়—চিত্তকে এমন হুঁসিয়ার করিতে হয় যে, তোমার হুকুম ছাড়া, বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কোনও [illegible] সে যেন তোমার অন্দর মহলে ঢুকিতে না দেয়। কেবল অবিশ্রাম খবরদারী চাই—হোক না সে দুঃখ, কি সুখ। যদি জোর করিয়া তাহাদের হটাইতে না পার, তবুও তীব্র অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তাহাদের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া রাখ—কাহার কি রূপ, কি শীল, সব চিনিয়া রাখ—দেখিবে এক দিন না একদিন তাহারা জাল গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

[illegible] যে সুখ বাহির হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে, তাহার কথাই বলি। ইন্দ্রিয়ের সমস্তগুলি দরজা খোলা রহিয়াছে; সে পথ দিয়া সারাক্ষণ কত যে ভাবের আনাগোনা চলিতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

ইহাদের সকলগুলিই যে ভাল, তাহা চিনিব কি করিয়া? যাহাতে আরাম আনে, তাহাই যে ভাল, কিম্বা যাহাতে পীড়া দেয়, তাহাই যে মন্দ, তাহা তো নয়। বাহিরের আরাম বা পীড়ার তলে তলেও আরও এমন একটী তাৎপর্য্য লুকাইয়া থাকে, বাহিরের সঙ্গে যাহার চেহারা মিলে না। নিজের মাঝে ডুব দিয়া সেইটুকুর পরিচয় তোমাকে লইতে হইবে। ইহার পরখ চিত্তের অবসাদ আর দীপ্তিতে। চিত্ত এলাইয়া পড়া আর অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠা—এই দুইটীর মাঝে পার্থক্য করিতে শিখ। কি সুখে, কি দুঃখে, যদি দেখ তোমার মাঝে সম্মোহনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তবে জানিবে, ধরে এমন ঢুকিয়াছে—গা ঝাড়া দিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা কর। সুখের এই সম্মোহনের মাদকতা বড় তীব্র—ইহাকে চিনিয়া লওয়া দায়। একটার পর একটা করিয়া ঢেউ আসিতেছে, আর একে একে ইন্দ্রিয়পথে যেন তাণ্ডব জুড়িয়া দিতেছে—আর তুমি ভাবিতেছ, এই তো জীবনের চরম স্ফূর্ত্তি—এ কি কখনো মিথ্যা হইতে পারে?—কিন্তু এর মাঝে একবার খুঁজিয়া দেখিয়াছ কি, যে বুদ্ধি জাগিয়া থাকিয়া তুচ্ছ ব্যাপারটীরও হিসাব রাখিত, সে কোথায় টলিয়া পড়িয়াছে?—যে বীর্য্যশক্তি স্বাধীনভাবে ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করিত, সে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে? এই তো মোহ। ইহার পর নিজকে চিনিয়া লইবার জন্য চেষ্টা কর, দেখিবে আর পারিতেছ না; অথচ অন্তরের মাঝে যাহা পাইতেছ, তাহারও কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারিতেছ না—বিষবাষ্পের মত সে যেন ক্রমে তোমার সমস্ত শরীর ছাইয়া ফেলিতেছে ক্রমেই যেন তুমি কোন অতলে তলাইয়া যাইতেছ—জাগিয়া থাকিয়া নয়—তমশ্ছন্ন গভীর তন্দ্রার আবেশে।

ইন্দ্রিয় সুখের চরম পরিণাম এই। সে যে সুখ, তাহা না হয় মানিলাম, নাহলে তোমাকে সে ভুলাইল কি করিয়া?—কিন্তু তাহার মাঝে দীপ্তি কোথায়? মেঘ-ভাঙ্গা সূর্য্যের আলো যেমন নিঃশব্দ সঞ্চারে আকাশের গায় ছড়াইয়া পড়ে, জগতের কোনও বস্তুকে আচ্ছন্ন করে না—প্রত্যেকটী রেখা পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া তোলে—তেমনি করিয়া যদি কেহ তোমার হৃদয়ে আলো জ্বালিয়া দিত—তবেই মানিলাম, তাহা সত্যকার সুখ। তাহাকেও সুখই বলি, কেননা সে ও তোমার ইন্দ্রিয়পথ ধরিয়াই অন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু একের স্পর্শ বুদ্ধিকে ম্লান করে, প্রতিভাকে আবৃত করে, কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া দুর্ব্বিবহ তমোচ্ছন্ন জড়তার বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়—অথচ তাহাও তোমার কাছে সুখ। আর এক সুখে, তোমার কিছুই চুরি করে না বরং নবই বাড়াইয়া দেয়, তাহার আলোতে বুদ্ধি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, প্রতিভা জাগিয়া উঠে, বিপুল কর্ম্মশক্তি যেন শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহে সঞ্চরণ করিয়া ফিরে।—খাঁটী সুখ চিনিবার এই কষ্টিপাথর। দুরা কুসঙ্গও সুখের—সাধু-সঙ্গও সুখের, তবে আর দুইয়ে প্রভেদ হয় কিসে?

এই তো গেল মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া যে সুখ তোমাকে আবিষ্ট করিয়া রাখে, তাহার কথা। তা ছাড়া পাওয়ার তৃপ্তিও আছে। শুধু ইন্দ্রিয়ের উপর নয়—সাক্ষাৎ ভাবে চিত্তের উপরও সুখের মোহকর প্রভাব রহিয়াছে। যাহা তুমি কোনও দিন প্রত্যাশা কর নাই—অথচ অতর্কিতে আজ যাহা আসিয়া জুটিল,

তাহাকে তুমি কি ভাবে গ্রহণ করিবে? একটা নূতন কিছু পাইয়াছ বলিয়া উচ্ছ্বাসে ফেনিল হইয়া উঠিবে?—এইটাই হয়ত স্বাভাবিক। মনের উপর অতর্কিত দুঃখের আঘাত আর অতর্কিত সুখের আঘাত—দুই-ই সমান ক্ষতকর—দুই-ই তোমার ভাবকেন্দ্র অস্থান করিয়া দেয়। কিন্তু সুখে যদি বিচলিত হও, তবে বুঝিবে দুঃখ পাইবার দিনও নিকট হইয়া আসিয়াছে। আজ যাহাকে পাইয়া খুসী হইয়াছ, কাল যদি তাহার কোনও বিপর্যয় ঘটে, তবে সে ক্ষতির ভার সামলাইবে কে? তুমি তো নূতন পাওয়ার আনন্দে মনে মনে নূতন রঙে তোমার চারিপাশকে রঙাইয়া তুলিয়াছ—তোমার সে রঙীন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে কি তুমি সহজে তা সহিতে পারিবে? আর স্বপ্ন এক ভাবেও চিরদিন থাকে না—তারও ভাঙ্গা গড়া আছে—তুমি তার সঙ্গে তাল রাখিবে কি করিয়া?

দুঃখের বেলাতে যাহা বলিতেছিলাম, সুখের বেলাতেও তাই বলি। এখানেও তোমাকে সাক্ষীর আসন গ্রহণ করিতে হইবে—সেইখান হইতে আনন্দের বীর্য্য সুখের অভিঘাতকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যাহা চাও নাই, অথচ অযাচিতভাবে যে সুখের পসরা আজ ঘরে উঠিয়াছে—তাহাকে তেমনি অযাচিতই থাকিতে দাও, কেননা বাস্তবিকই তো তাহার উপর তোমার কোনও দাবী নাই। কি করিয়া সে যে তোমার ঘরে আসিল, তাহা তুমি জান না—অথচ চিরকালই যে সে এখানেই থাকিবে, তাহাই বা কি করিয়া মানিয়া লইয়া আহ্লাদে নাচিয়া ওঠ? হয়ত মনে কর—বিধি তোমার উপর সুপ্রসন্ন, তাই না চাহিতে এ নিধি তোমার মিলিয়াছে। কথাটা একদিকে ঠিক; কিন্তু বিধি তো কেবল তোমার মুখ চাহিয়াই জগৎটাকে সৃষ্টি করেন নাই যে, আজ তোমার উপর প্রসন্ন বলিয়া কাল আবার অপ্রসন্ন হইবেন না!

কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না, সুখের নিমিত্ত ঘটিলে তোমাকে দুঃখ করিতে বলিতেছি। ভবিষ্যতের আশঙ্কা করিয়া উপস্থিতের দিকে মুখ বাঁকাইয়া থাকাও কাপুরুষতা—তাহাতেও সূক্ষ্মতর সুখের বাসনা অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে। আসলে চাই স্থৈর্য্য—উচ্ছ্বাস নয়। পাইয়াছ বলিয়াই নাচিয়া উঠিও না—বা পাইলে না বলিয়াই মুসড়াইয়া পড়িও না। সুখ আর দুঃখ জীবন তরীর দুই দিকের দুইটী দাঁড়; এই দুইটীরই তাল সামলাইয়া তরী বাহিয়া চলিতে হইবে—একটীর উপর ঝোঁক দিলে চলিবে না। সেই জন্যই চাই স্থির সাক্ষীর সত্যপূত অবিচল দৃষ্টি। দেখ, আজ কি আসিল; যাহা আসিল, অবিচল ভাবে তাহাকে গ্রহণ কর; আবার কাল যদি সে চলিয়া যায়, তাহার জন্য দুঃখ করিও না। যদি বল, দুঃখ না করিয়া পারি কই?—তবে বুঝিব, যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাহাকে বড় বেশী জোরের সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলে—তোমার যতটুকু তোমার মাঝে লাগিয়া রহিয়াছে, তার সবটুকু দিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিয়াছিলে; তাই আজ সমস্ত পুঁজি খোয়াইয়া দেউলিয়া হইয়া বসিয়া আছ।

কিন্তু সুখের ছলনাতেই বা তোমার সবটুকু হারাইবে কেন? তোমার যে তুমি—সে তো লীলার রসিক; সুখ-দুঃখের হাটে হাসিয়া কাঁদিয়া ফিরিবার লোক তো সে নয়! তাই নিজের মাঝে ডুবিয়া গিয়া সেই আনন্দময়

পুরুষটীর সঙ্গে ভাব করিতে চেষ্টা কর। সে যে দিন স্বেচ্ছায় দুঃখের পসরা সাজাইয়া দিয়াছিল, সে দিন যেমন হাসিমুখে তাহার দান মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলে, আজ তার দেওয়া সুখের বোঝাও তেমনি তাহারই মুখপানে চাহিয়া মাথায় তুলিয়া লও। মনে রাখিও, এ ও বোঝা মাত্র—এ ও তোমাকে শুধু এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে মাত্র—তোমার নিজের আরামের জন্য সে তোমার ঘাড়ে ইহা চাপাইয়া দেয় নাই।

এই বোঝা বহিবার শক্তি তোমার তখনই হইবে, যখন বাসনাকে মন হইতে দূর করিতে পারিবে। সুখ তো চাইবেই না—কেননা এখন তোমার যত চাওয়া, সমস্তই নকল চাওয়া। তোমার ভিতরে চাহিবার প্রেরণা যিনি জোটাইয়া দিয়াছেন, তিনিও একটা বড় চাওয়াই চাহিতেছেন—কিন্তু তুমি কি তার সন্ধান পাইয়াছ? যত দিন নিজকে বুঝিতে না পারিবে—কোথায় তোমার শক্তি, কোথায় অশক্তি, তাহা না চিনিতে পারিবে—ততদিন কেবল ছোট নজরের চাওয়াটাই চাহিতে জানিবে। তোমার সে ছোট চাওয়ার সঙ্গে তাঁর বড় চাওয়ার তো কোনও দিন মিল হইবে না—তাই দেখিবে, যাহার কাছে চাহিতেছ, তাঁহার আর খামখেয়ালীর অন্ত নাই। কিন্তু সব গোল মিটিয়া যাইবে, যখন সমস্ত সঙ্কোচের বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়া তোমার সবটুকু তাঁহার মাঝেই ছড়াইয়া পড়িবে। নিজের জন্য—ক্ষুদ্র আধারের জন্য তখন আর তোমার কোনও কিছুর প্রয়োজন হইবে না—চাহিবারও কিছু থাকিবে না। কিন্তু তার পরেও যদি চাওয়া জাগে, সে আর তোমার চাওয়া নয়—সে তাঁরই চাওয়া তোমার আধারের ভিতর দিয়া সার্থকতা খুঁজিতেছে—তখন তাঁহার মুখপানে চাহিয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিতে পারিবে, "মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।" এইটুকু লক্ষ্য; ইহাকে মনে গাঁথিয়া লইয়া পথে চলিতে হইবে। কালাকালের বিচার করিলে চলিবে না।

এই সঙ্গে মমতার কথাও বলি। তরুণ জীবন যখন মমতার সহস্র বন্ধন দিয়া সংসারকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে, তখনও তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবার প্রয়োজন আছে। ভালবাসা হৃদয়কে যেমন কানায় কানায় পুরিয়া রাখে, তেমনি আঘাতে বেদনায় সে সমস্ত চিত্ত বিষাইয়াও তোলে। এর আকর্ষণও কম তীব্র নয়, বরং অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ইহারই গোপন ধারা সংসারের সমস্ত তৃপ্তিতে—সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষায় চিত্তক্ষেত্রকে প্রতিমুহূর্ত্তে সরস করিয়া তুলিতেছে। তাই এই আনন্দের, সম্মোহনের এত বড় শক্তিটারও পরিচয় তোমাকে লইতে হইবে।

এখানে শুধু একটী কথা মনে রাখিও। একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "ভালবাসার জগতে এমন কথা মনে করিও না যে, তুমি বিশিষ্টভাবে কাহাকেও ভালবাস—বা তোমাকেও বিশিষ্টভাবে কেহ ভালবাসে; শুধু এই ভাবনায় ডুবিয়া যাও যে—তুমি প্রেমিক নও—তুমি প্রেমস্বরূপ।" জ্ঞান যেমন তোমার পক্ষে সহজ ও অনায়াস—প্রেমও তাই—সে তো আত্মারই স্বরূপ। কিন্তু সংসারে জ্ঞানকে যেমন বুদ্ধির খাপে পুড়িয়া খাটো করিয়াছ, প্রেমকেও তেমনি নিত্য মমতার বেষ্টনীতে বেড়িয়া সঙ্কীর্ণ করিতেছ।

তাই এখানেও তোমাকে লোভ ছাড়িতে হইবে। বিশিষ্টের প্রতি লোভ—বা বিশিষ্ট

ষ্টের ভালবাসার প্রতি লোভ থাকিলে অতৃপ্তির দাহে পুড়িতেই হইবে। বিচারের বিভীষিকা দেখাইয়া প্রেম হইতে তোমাকে নিবৃত্ত হইতে বলিব না—কেননা আনন্দের সাধক তুমি, তোমার ভিতরে যদি প্রেম স্ফূর্ত্ত না হইয়া উঠে, তবে যে সকলি মিথ্যা। কিন্তু সেই প্রেমকে লাভ করিবার জন্যই মমতাকে বলি দিতে হইবে—সমস্ত বিশিষ্ট সম্বন্ধকে নির্ব্বিশেষের মাঝে ডুবাইয়া সেইখানেই প্রেমের যথার্থ স্বরূপ তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। চরমে দেখিবে—আনন্দের রসোচ্ছ্বাস যে জগতের সব জায়গায় সান্দ্র হইয়া রহিয়াছে—তাহাই প্রেম—তাহাই সত্য। মমতায় সুখ আছে, দুঃখ আছে—সুতরাং মোহও আছে; কিন্তু ইহাতে আছে শুধু মুক্তির আনন্দ—হৃদয়ের অটুট পরিপূর্ণতা।

ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা আর ভালবাসার আকর্ষণ—এই তিন রূপে সুখ নিত্য তোমার সম্মুখে সাজিয়া আসিতেছে। সে চায় তোমার সবটুকু তাহাকে ঢালিয়া দাও—কিন্তু সাবধান, তোমার আর সব তুমি যাহাকে-তাহাকে বিলাইয়া দিতে পার, কিন্তু তোমার তুমিকে যেন না বুঝিয়া না চিনিয়া কাহারও পায়ে সঁপিয়া দিও না। যাচিয়া কাহারও তোষামোদ তো করিবেই না, কেহ যাচিয়া দিতে আসিলেও হুঁসিয়ার থাকিবে নিতে গিয়াও তোমাকে কিছু দিতে হইল কি না। ঔদার্য্য পরে দেখাইও—আগে আত্মরক্ষা করিতে শিখ। চোখ মুখ আগে ফুটুক্, তার পর মনের আনন্দে নীলাকাশে পাখা মেলিও। যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে এ কথা মানিয়া চল, তবে দেখিবে, এই কঠোর সতর্কতায় তোমার দুঃখ তো বাড়েই নাই—অপরের দুঃখও তুমি বাড়াও নাই। (ক্রমশঃ)

শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য

শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন—"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি—দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।" বাঙ্গালীর ঘরে এ নীতির অমর্য্যাদা আমরা বড় কোথাও করি না। প্রথম পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অত্যধিক লালন আর তারপর দশ কিম্বা ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত প্রচণ্ডবেগে তাড়ন—এই উভয় সঙ্কটের মাঝে পড়ে আমাদের ছেলেরা দস্তুরমত মানুষ না হয়ে একটা অনিয়ম আর অসামঞ্জস্যের বোঝা হয়ে পড়ে। চাণক্যনীতির দোষটা এই যে, এর কোথাও মানব-শিশুর প্রকৃত মর্য্যাদা স্বীকার করা হয়নি। শিক্ষার আরম্ভ যে একেবারে শিশুর গর্ভচ্যুতির পর থেকেই, বেশীমাত্রায় লালনের প্রতি মনোযোগ দিলে সে কথাটা ভুলে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। আবার তেমনি জন্মমাত্রেই যে মানুষ কেবল কতগুলি অপরাধের পুঁটুলী হয়ে জন্মায় না—তাড়ন শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় সে কথাটাও খেয়ালে আনেন না। আসল কথা, মানুষের সন্তানকে ঠিক আমাদের ওজনে বিচার করলে চলে না। কেননা নানাকারণে আমাদের রুচি আর প্রবৃত্তি এমন বিকৃত হয়ে

আর ঝোঁক ধরে রয়েছে যে, শিশুর উপর তার সমস্ত আইন কানুন না ও খাট্‌তে পারে। তাই, যদি অন্ধ স্নেহ আর ক্ষমাহীন নির্বিচার ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে পর্য্যায়ক্রমে সন্তানকে লালন আর তাড়নই করি, তাতে আমাদের প্রবৃত্তির চরিতার্থ ঘট্‌তে পারে, কিন্তু সন্তানের শিক্ষার ফল কি দাঁড়াবে—সেটা ভাবার বিষয়।

প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে, যে বস্তুটীর উপর আমরা শিক্ষা শাস্ত্রের আইন-কানুন প্রয়োগ করছি, কাদার তালের সঙ্গে তার উপমা চললেও বাস্তবিকই সে আর কাদার তাল নয়—সে একটা জ্যান্ত মানুষ। তারও মন আছে, হৃদয় আছে, যুগযুগান্তর সঞ্চিত মানবজাতির সাধারণ অভিজ্ঞতার পুঁজি আছে, পূর্ব্বপুরুষের মনোবৃত্তির প্রভাব আছে। এতগুলর উপরেও আবার তার মাঝে আছে তার বিরাট সম্ভাব্যতা; ব্রহ্মবীজ তার মাঝে নিহিত রয়েছে—আমাদের শ্রদ্ধায়, আমাদের সন্তর্পণ সেবায় ও ভালবাসার স্পর্শে সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে একদিন মহান্ বনস্পতির আকার ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশের সামাজিক শিক্ষাবিজ্ঞানকে এই কথাটাই আগে স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের স্বাভাবিক গতি ঊর্দ্ধমুখীই—সে যদি নেমে আসে, তাহলে তার জন্য তার স্বভাব তত দায়ী নয়, যত আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দায়ী।

এই কথা স্বীকার করলে শিক্ষার মূল ধারাটাই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। তখন দেখা যায়, শিক্ষকের কর্ত্তব্য কেবল গড়ে-পিটে তাড়া দিয়ে বদ্ ছেলেকে সায়েস্তা করা নয়; যে ভাল হবার জন্য স্বভাবতঃই উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তার চারদিক এমন করে উন্মুক্ত করে দেওয়া, যাতে সহজে প্রকৃতির নিয়মেই সে ভাল হয়ে উঠ্‌তে পারে। অর্থাৎ মানব-প্রকৃতির মহত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য নীতির প্রবর্ত্তন করাই তখন শিক্ষকের কর্ত্তব্য। কবির কথায় বলতে গেলে, কেবল বোঁটাতে আঘাত করে, পাপড়ি ছিঁড়ে ফুল ফোটাবার চেষ্টা ছাড়তে হবে; যে গুণী অমনি এসে ফুল ফুটিয়ে দিয়ে যায়—তার সেই সহজ অথচ গোপন রহস্যটী শিক্ষককে শিখে নিতে হবে।

যেমন বীজের অঙ্কুরিত হবার শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে আমরা কেবল জমী তৈরীর দিকেই বিশেষ মন দিই, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি সন্তানের মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা রেখে পারিপার্শ্বিককে সব রকমে তার বিকাশের অনুকূল করে গড়ে তুলবার চেষ্টাই আমাদের আগে করতে হবে। ভাল মন্দ দুই-ই যে আছে, তা স্বীকার করি। কিন্তু তবুও মানুষ যে কত যুগ যুগ বিবর্ত্তনের পর কত মন্দকে ডিঙ্গিয়ে আজ মানুষ হবার অধিকার পেয়েছে, এই কথাটা স্মরণ করে তার ভাল হবার অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে তো কিছুতেই অশ্রদ্ধা করতে পারি না। কৃত্রিম সামাজিক সংস্কার যার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি, এমন শিশুর মাঝেই আমরা দেখি, ভাল হবার সম্ভাব্যতা তার কত বেশী—ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্বে সে কত সহজে মন্দের উপর জয়লাভ করছে। যে মন্দটুকুর বীজ নিয়ে শিশু জগতে আসে, আমাদের কুশিক্ষার গুণে তার চেয়েও ঢের মন্দ সে এখানেই সংগ্রহ করে; আমাদের অসাবধানতা আর অবিচারে আমাদের কৃতকর্ম্মের বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়া দিয়ে আমরাই আবার তার দণ্ড বিধান করতে যাই। ছেলে আসলে

তত মন্দ নয়, যত মন্দ আমরা তাকে করে তুলি।

এই মন্দের ভাগটা যাতে কমই থাকে, কৃত্রিম উপায়ে তাকে আর যাতে বাড়তে না দেওয়া হয়, তার দিকে দৃষ্টি রেখেই শিক্ষার অনুকূল পারিপার্শ্বিক গড়ে তুলতে হবে। এই আনুকূল্যই হল শিক্ষানীতির মূলমন্ত্র; যে শাসন বা সংরক্ষণ করতে হবে—তা অনুকূল হয়েই করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মহত্ত্ব চাই, ঔদার্য্য চাই, স্বাতন্ত্র্যের অধিকার দেওয়া চাই। যদি আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখতে পারি, অথচ সন্তানকে অসঙ্কোচে সব দিকে চলতে ফিরতে স্বাতন্ত্র্য দিতে পারি—তবে যা তার মন্দের পুঁজি, তা দিনে দিনেই উজাড় হয়ে যাবে, কেননা তার মাঝে ভালর জোরটাই যে বেশী। সমস্ত শরীরের চেষ্টা যেমন নিজকে সুস্থ রাখা, তেমনি শিশুরও অন্তর্নিহিত সমস্ত প্রাণশক্তি তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যই অটুট রাখবার চেষ্টা করছে। আমাদের এ ক্ষেত্রে কেবল দু'জায়গায় সাবধান হতে হবে। প্রথমতঃ দেখতে হবে, নূতন করে যেন আর মন্দটা সন্তানের মাঝে সংক্রামিত না করি; দ্বিতীয়তঃ, যেটুকু মন্দ রয়েছে, আশঙ্কায়, অনাচারে বা অধৈর্য্যে তার উপর উগ্র হয়ে উঠে যেন তার বেগ বাড়িয়ে না তুলি। কিন্তু সবার উপর চাই চারিদিকের উদার উন্মুক্ত আবহাওয়া।

মন্দের কথায় এখানে বংশানুক্রমের প্রসঙ্গ আসতে পারে। মন্দটাই যার বংশে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, এমন ছেলের বেলাতেও কি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেওয়ায় মন্দটাই প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠবে না? স্বাতন্ত্র্য নীতির পরিবর্ত্তে তার বেলাতে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করাই কি শ্রেয়ঃ হবে না?

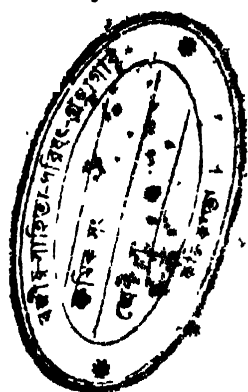
এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার পূর্ব্বে মন্দের স্বরূপ কি, তা বুঝে নিতে হবে। অনেক অবস্থাতেই যে মন্দ অভ্যাসটাকে আমরা খুব জটিল আকারে দেখতে পাই, তার আসল প্রণোদক নিদানটা হয়ত তত মারাত্মক নয়—এমন কি খুঁজলে তার একটা biological basis আবিষ্কার করাও কঠিন নয়। এমন একটা সহজ নিদানই অবস্থার বিপর্য্যয়ে পড়ে এমন জটিল আকার ধারণ করে যে, মূলতঃ প্রতীকার সহজসাধ্য হলেও এখন ডাল পালার বহর দেখে আমরা আর তার দিকে সোজাভাবে এগোতে পারি না। তবে এ হল পরিণত বয়সের কথা—প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে মন্দটা বেড়ে গিয়ে যখন হাতছাড়া হয়ে পড়েছে, তখনকার কথা। কিন্তু বংশধারার অনুবর্ত্তনে এই মন্দের বীজটা যদি সন্তানে সংক্রামিত হয়, তবে তা আদিম সহজ আকারেই প্রকাশ পাবে। এ অবস্থায় তাকে সন্তর্পণে চালিয়ে নেওয়া তত দুরূহ হবে না। স্বভাব বৃত্তিগুলির মাঝে যদি তখন বাছাই করা যায়, তবে দেখা যাবে, সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি যা, শিশু তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। অর্থাৎ জন্মের আধারে ভাল মন্দ দুই-ই তার মাঝে রয়েছে। পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্যে এই ভালগুলিকে ফুটবার সুযোগ দিলে অথচ মন্দগুলিকে অনুকূল খাদ্যের অভাবে নিৰ্জ্জীব করে ফেলা তখন সহজ হবে। যে মন্দ প্রবৃত্তিগুলি সুযোগ পেলে কালে নানা জটিল মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করে, ছোট বেলা হতেই তাদের চিনে নিয়ে পারিপার্শ্বিকের সুব্যবস্থার ফলে তাদের কেবল মাত্র biological tendencyর কোঠায় আটকে রাখা নিশ্চয়ই আমাদের হাতে।

কিন্তু মন্দের প্রথম প্রকাশেই শঙ্কিত হয়ে আমরা যদি তাকে অস্বাভাবিক উপায়ে চাপা দিবার চেষ্টা করি অর্থাৎ কোন্ আদিম মনোবৃত্তির আশ্রয়ে কি করে এ বিকার ফুটে উঠ্‌ল তার কোন হিসাব না রেখে, শুধু ভবিষ্যতে এর ফল কি দাঁড়াবে, তাই কল্পনা করে কঠোর শাসননীতির প্রবর্ত্তন করি, তাহলে কিছুতেই ফল ভাল হবে না। অনেক সময় নিয়মিত জ্বর ভোগের পর আপনা হতেই যেমন জ্বরের বিরাম হয়, তাকে চাপতে গেলেই তা যেমন মাথায় চড়ে বসে বিকার ঘটায় এ সব প্রবৃত্তিও অনেকটা তেমন। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যোগ না ঘটিয়ে কোনও স্থায়ী মানসিক পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। তাই কোন্ আদিম ইচ্ছার প্ররোচনায় প্রবৃত্তি জেগেছে, তা যদি আমরা ধরতে না পারি, তা হলে বাইরে থেকে বাধা দিয়ে ভিতরের ইচ্ছাটাকে আরও প্রবল করে তুলব মাত্র। বাধার সঙ্গে লড়াই করাটা একটা জীবধর্ম্ম বলে, বাধা পেলেই প্রবৃত্তি যেন আরও জোর ধরে ওঠে। কিন্তু ভিতরের সঙ্গে যোগ রেখে, তার পথে তাকে কতকটা চলতে দিয়ে যদি ধীরে ধীরে তার মোড় ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে ঝঞ্ঝাটও কমে, কাজও পাকা হয়। তাড়ন নীতির যাঁরা পাণ্ডা, তাঁরা একথাটাও মনে রাখবেন যে, "সবুরে মেওয়া ফলে" প্রবাদটা একেবারে ফাঁকা নয়—বিশেষতঃ শিশুর মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাবার বেলায়।

উপরে যাদের কথা বললাম, সেগুলো মৃদু রকমের প্রবৃত্তি—যে ভাল-মন্দের নমুনা আমরা সচরাচর ছেলেদের মাঝে দেখতে পাই। কিন্তু এছাড়া একরকম স্বাভাবিক অপরাধ-প্রবণতাও আছে। সে ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই অপরাধ করবার ইচ্ছা শিশু কিছুতেই দমন করতে পারে না। একজন ইংরেজ চিকিৎসক এর একটা সাংঘাতিক রকমের উদাহরণ দিয়েছেন। সে একটা দশ বার বছরের ছেলে। তার আর কোন দোষ নাই, কিন্তু ছোট থেকেই সে সমানবয়সী ছোট ছেলে দেখ্‌লেই ভুলিয়ে নির্জ্জন জায়গায় নিয়ে যেত। সেখানে তার সঙ্গে প্রথম নানারকমে ভাব করে, তার পর তাকে ধরে আচ্ছা করে চাবুক লাগাত, এবং অবশেষে তার গলা টিপে ধরত। এমনি করে সে অনেক ছোট ছেলেকে মেরে ফেলেছিল। আর সব বিষয়েই সে ভাল কিন্তু তার এই সমবয়স্ক ছেলেদের হত্যা করবার প্রবৃত্তিকে কিছুতেই সে দমন করতে পারত না—কি করে যে তার মাঝে এ প্রবৃত্তি জাগত, তাও সে কিছু বল্‌তে পারত না। অবশ্য এ দৃষ্টান্তটা চরম, কিন্তু খুঁজলে আমাদের চারিদিকেই স্বাভাবিক অপরাধ-প্রবণতার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এগুলোকে বাগ মানানো যে শক্ত, তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তবু পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যে এর উপরেও খাটে তা স্বীকার করতেই হবে। তাই অপরাধের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোনও ব্যতিক্রম না করে, কেবল অপরাধের দণ্ড দিলেই এর কোনও প্রতীকার হবে না—অপরাধের যাতে সুযোগ না ঘটে, তারই চেষ্টা আগে করতে হবে। তা ছাড়া স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই স্নায়ুঘটিত বিকার মাত্র। এ বিকার স্নায়ুজালের সঙ্গে এমন গভীর ভাবে জড়িত যে অপরাধের প্ররোচনা অপরাধীর অবচেতনার ভিতর থেকেই আসে, সুতরাং সাক্ষাৎ ভাবে তার ইচ্ছাকে সে কোনও রকমে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। এই জন্যই অপরাধের আকার-প্রকারও প্রায়ই একই রকমের হয়। এই সূত্রটুকু ধরে যদি আমরা এর চিকিৎসা আরম্ভ করি, তবে যে কিছুই ফল হবে না—তা বলা চলে না। তবে উৎপীড়ন দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। এর আর এক প্রতীকার হচ্ছে, যে অবচেতনা থেকে প্রবৃত্তির প্রেরণা আসে, তার উপর শক্তি প্রয়োগ করা। এটা কতকটা সম্মোহনের সামিল। এর কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

—— ——

ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } শ্রাবণ { ৪র্থ সংখ্যা

মিত্রাবরুণৌ

[ঋগ্বেদসংহিতা ১।২১।১২]

যদ্ধ ত্যদ বাং পুরুমীহ্লস্য সোমিনঃ
প্র মিত্রাসো ন দধিরে স্বাভুবঃ।
অধ ক্রতুং বিদতং গাতুমর্চ্চত
উত শ্রুতং বৃষণা পস্ত্যাবতঃ॥

আ বাম্ ঋতায় কেশিনীরনূষত
মিত্র যত্র বরুণ গাতুমর্চ্চথঃ।
অব ত্মনা সৃজতং পিন্বতং ধিয়ো
যুবং বিপ্রস্য মন্মনামিরজ্যথঃ॥

যো বাং যজ্ঞৈঃ শশমানো হ দাশতি
কবি র্হোতা যজতি মন্মসাধনঃ।
উপাহ তং গচ্ছথো বীথো অধ্বরম্
অচ্ছা গিরঃ সুমতিং গন্তমস্ময়ূ॥

যুবাং যজ্ঞৈঃ প্রথমা গোভিরঞ্জত
ঋতাবানা মনসো ন প্রযুক্তিষু।
ভরন্তি বাং মন্মনা সংযতা গিরো
দৃপ্যতা মনসা রেবদশাথে॥

বন্ধু ভাবি যজমান পাত্র ভরি রাখে সোমরস—
বীর্য্যে যাহা চিত্ত ভরি দেবতার জাগায় হরষ;
রচেছে সে যজ্ঞভূমি— কীর্ত্তি তার করে অচঞ্চল,—
গৃহীর মিনতি শোন— বর্ষ ঘরে কামনার ফল।

যজ্ঞভূমে তোমাদের হোমশিখ হের দীপ্যমান,—
হে মিত্রাবরুণ যথা পাদস্পর্শে বাড়ায়েছ মান;
ভক্ত হৃদি-মুখরিত কীর্ত্তিগানে তৃপ্ত আজি হিয়া,
পূর্ণ কর চিত্ত মম পুণ্যাশিষে ঋদ্ধি বরষিয়া!

উচ্ছ্বসিত স্তুতিগানে হবিঃ যেই করে সমর্পণ—
কবি সেই হোতা, তার যজ্ঞ শুধু গীতি আয়োজন!
কাছে তার যেও দেব, পূজা তার ঠেলিও না পায়—
আমাদেরো মনে গাঁথা কথা যেন বৃথা নাহি যায়।

তোমাদের সাজায়েছে দিয়ে মনো-দীপ্ত জ্যোতিঃ-রেখা—
চিত্র যথা এঁকে যায় কর্ম্মপটে আদি চিত্র-লেখা;—
হৃদয়ের কথা যত, ছন্দে গাঁথি দিয়াছে ঢালিয়া—
ব্যাপ্ত কর আয়োজন দৃপ্তিহীন চিত্তখানি দিয়া।

নচিকেতার সাধনা

[কঠোপনিষৎ—প্রথম অধ্যায়, প্রথম বল্লী]

বাজশ্রবস দেবতার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া যজ্ঞ করিতেছেন—কিন্তু যজ্ঞের দক্ষিণা দিবার বেলা এমন কতকগুলি গাভী দান করিলেন, যাহারা "পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ"—জন্মের মত যাহারা ঘাস-জল খাইয়াছে, জন্মের মত যাহাদের দুধ দোওয়া শেষ হইয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যাহাদের লোপ পাইয়াছে। আশ্চর্য কিছুই নয়।—আমরাও নিত্য এমনি শিববিহীন সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞের অভিনয় করিতেছি। সাধু শাস্ত্র সদাচার বলে, সর্বস্ব তোমার বিলাইয়া দাও,—আমরাও সে অনুশাসনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সকলই বিলাইয়া দিবার ভাণ করি। কিন্তু অন্তরের ফাঁকি কি অন্তর্যামীর কাছে লুকান থাকে?

তবে এই মিথ্যাচার-রত সংসারের মাঝেও নচিকেতার মত কেহ থাকে, আত্মোৎসর্গের এই উৎকট প্রহসন যাহার দিব্যদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নগ্নতায় কদর্য হইয়া দেখা দেয়—পরিণাম ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু তাহার এই সংসার-ব্যাবৃত্তি আসে কোথা হইতে?—শ্রদ্ধা হইতে। শ্রদ্ধা কি?—আস্তিক্যবুদ্ধি অর্থাৎ আছে বলিয়া বিশ্বাস। শুধু এখানেই নয় বা যাহা দেখিতেছি, তাহাও নয়; এই দেখার পরপারেও ইহারই মাঝে অন্তর্গূঢ় হইয়া আরো কিছু আছে—প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তাহার সত্তা অনুভব করিতেছি—তাহারই বিরাট্ অনুভূতি সংসারের ক্ষুদ্রকেও অনির্বচনীয় মহিমময় করিয়া তুলিতেছে;—এই যে দৃশ্যের ওপারে অদৃশ্য সত্তার প্রতি অন্তরের সুনিশ্চিত আত্মসমর্পণ—ইহারই নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার দৃষ্টি ব্যাপক—অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া জীবনকে আরও সুদূরবিস্তৃত বলিয়া সে দেখিতে পায়—সে বিস্তৃতির সীমা কোথায়, তাহা সে জানে না।

নচিকেতার মাঝে এই শ্রদ্ধা "আবিবেশ" আবিষ্ট হইল; তাই সংসারের প্রহসনে তাহার অন্তরাত্মা ক্লিষ্ট পীড়িত হইল। ন; যে শ্রদ্ধা দেশকাল লঙ্ঘন করিয়া তাহার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিল, তাহার উদ্ভব কোথা হইতে, তাহার প্রামাণ্য কোথায়? এইখানেই হিন্দুর দর্শনের সঙ্গে অপরের ভেদ। তর্ক তাহার কাছে প্রমাণ নয়—প্রমাণ স্বানুভূতি। তর্ক দিয়া যদি তত্ত্বকে প্রমাণ করিতে যাও, তবে তাহাকে অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় বলিবে; কিন্তু অন্তরের বলে তাহাকে নিঃশঙ্ক করিয়া জানিলে দেখিবে, সে তোমারই বুকের কাছে। এই যে সহজ বিশ্বাসটুকুকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া—ইহা সকলের পক্ষে সহজ নয়। জীবনের পরিধি যদি এই দৃশ্য জগৎ বা জীবনটুকুতেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ইহার সমস্ত আন্তর অনুভূতিকে তর্ক দিয়া যাচাই করিয়া লইবার প্রবৃত্তি জন্মে। কেননা রূপের বাহিরে অপরূপের কথা যদি কেহ

বলে, তবে তাহা যে নিতান্তই আকস্মিক; সুতরাং সঙ্গত যুক্তি না থাকিলে তাহাকে মানিয়া লইবার ভরসা কে করিবে? বৈজ্ঞানিক তাহার স্বল্প-প্রসার দেশে আর কালে বুদ্ধির মাপকাঠিটী লইয়া বসিয়া আছে—যাহা কিছু অভিনব, তাহাই সে ওই এক স্কেলে মাপিয়া 'পাশ' করিয়া দিবে। এই হইল আধুনিক জগতের সত্য নিরূপণের পদ্ধতি।

কিন্তু যাহারা মৃত্যুর সঙ্গেই সব শেষ হইয়া গেল বা জন্মের সঙ্গেই সকলের গোড়া পত্তন হইল বলিয়া মানে না অর্থাৎ জীবনটাকে যাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তর পর্য্যন্ত টানিয়া দীর্ঘ করিতে পারে—তাহাদের পক্ষে অন্তরের অনুভূতির মূল্য বড় কম নহে। তাহারা মানে, বুদ্ধির পরিপাকে ভাব এমন জায়গায় আসিয়া ঠেকিতে পারে, যেখানে ভাষার সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আর ব্যক্ত করা চলে না। অথচ ভাষার পথটুকু অতিক্রম করিবার জন্য তাহাকে প্রচুর অবকাশও দেওয়া হইয়াছে—শুধু একটা জন্মের মাঝেই তাহার সমস্ত বিবর্ত্তনকে ঠাসিয়া রাখিবার চেষ্টা হয় নাই। এই জন্যই যে সমস্ত অস্পষ্ট অনুভূতি অন্তরকে ব্যাকুল করে, অথচ বুদ্ধির সঙ্গে যাহাদের ওজন মিলে না, বহুজন্মার্জ্জিত মার্জ্জিত সংস্কারের দোহাই দিয়া তাহারা আমাদের কাছে টিকিয়া যায়, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরাও যেন চেষ্টা করিলে ওই দূরাগত অবিস্পষ্ট সাগর-নির্ঘোষের একটু-আধটু আভাস শুনিতে পাই। জীবনটা অতি দীর্ঘ বলিয়াই হিন্দু তাহার মাঝে বহু রহস্যের সমাবেশ করিতে পারিয়াছে এবং পরীক্ষাধীন বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া তাহাদিগকেই অজ্ঞেয় তত্ত্বের নির্দ্দেশক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই জন্য তাঁহার কাছে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের চেয়ে আপ্ত বড়; এই জন্যই গুরু শিষ্যের কাছে দার্শনিক তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির পাহাড় নামাইয়া আনেন না, তাঁহার প্রমাণের প্রথম সূত্রই—"শ্রদ্ধা—গুরু-বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।"

নচিকেতার এই শ্রদ্ধাই তাঁহাকে সংসার হইতে বিমুখ করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, এখানে আত্মোৎসর্গের যে মিথ্যা অভিনয় চলিতেছে, একটী সত্যপূত জীবনের আহুতি দিয়া এই মিথ্যা ক্রন্দন না করিলে সংসার অচল হইয়া যাইবে। তাই ব্যাকুল অন্তরে তিনি পিতার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার প্রিয়, তুমিও আমার প্রিয়, তাই তোমার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করিতে হইবে। আমাকেও তুমি উৎসর্গ কর—নহিলে সব যে যায়।' এই আত্মোৎসর্গের মহিমা সংসার বুঝিল না—সে ভাবিল ইহা অনধিকারচর্চা; এতদিনই দেওয়া আসিয়াছি, সংসারের প্রাঙ্গণে যদি কাহারও প্রাণ কাঁদিল, তবে লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া সংসার তাহার অনধিকারচর্চার পাওনা শোধ লইতে আসে। তাই নচিকেতার মিনতিতে বিরক্ত হইয়া পিতা বলিলেন, "তোকে আমি যমকে দিলাম।" সংসারের সীমা ঐ পর্য্যন্ত। যে কেহ তাহার আঁতে ঘা দিল, তাহাকেই সে যমের বাড়ীর সীমানায় খেদাইয়া দিয়া ভাবে—আপদ চুকিয়া গেল। কিন্তু উৎসর্গই যাহাদের সাধনা, যমের দুয়ার হইতেই যে তাহাদের যাত্রার আরম্ভ। মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা যুগে যুগে অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছে—মৃত্যুর বিভীষিকা কি তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারে?

শ্রদ্ধা আর উৎসর্গে সত্যের পথ উন্মুক্ত হইবে। জগতে যাঁহারা নূতন বার্ত্তা আনিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার ইতিহাসই এই। গর্ভিণী যেমন অন্তরস্থ সন্তানকে আপনার সত্তায় অনুভব করে—অচেনা-অজানা হইয়াও যে তাহার নাড়ীর সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার সুনিশ্চিত সত্তাকে রসানুবিদ্ধ মমতা দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নিবিড় ভাবে অনুভব করে—এই নূতন ভাবের ভাবুকেরাও তেমনি শ্রদ্ধার আবরণে সত্যকে অবিস্পষ্ট অথচ সুনিশ্চিত রূপে অনুভব করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহজগতের আকর্ষণ তখন তিল তিল করিয়া তাহাদের খসিয়া পড়ে—প্রাণ চায় কেবল উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিতে—যাহা কিছু সঞ্চয় সমস্তই বিলাইয়া দিয়া, যত আবরণের বাধা সব ঘুচাইয়া তাহাকেই চোখে চোখে চিনিয়া লইতে—যে অন্তরে থাকিয়াও আড়ালে রহিয়াছে, অথচ প্রকাশ-বেদনায় অন্তরকে মুহুর্মুহুঃ উন্মুখ করিতেছে।

এই উৎসর্গের দেওয়ানা কোথায় গিয়া থামে?—মৃত্যুর দুয়ারে। সমস্ত রহস্যের মীমাংসা সেইখানে। অজানা ভাবিয়া তুমি-আমি শঙ্কিতচিত্তে তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছি—তাই আমাদের জীবনে অভিনবের জন্ম হইল না—যাহা শ্রীহীন, পর্য্যুষিত, তাহারই মিথ্যা আড়ম্বরে আমাদের দিন কাটিয়া গেল। শ্রদ্ধা যাহাকে উৎসর্গের পথে টানিয়া আনিয়াছে, সে-ই জানে পুরাতনের মাঝে বারবার আবর্ত্তন করিয়া সত্যকে পাওয়া যায় না—সত্যে একমাত্র পথ মৃত্যু। না চাহিলেও পুরাতন-সেবীকে এই মৃত্যু আসিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায়; মৃত্যুর ভাষায়—"অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে"—বিত্তমোহে মূঢ় হইয়া যখন সে ভাবে, ইহার পর আর কিছুই নাই, তখনই সে বারবার করিয়া মৃত্যুর বশ হয়। এমনি "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" যাহারা তাহাদেরই মৃত্যু। কিন্তু উৎসর্গপথিকের মৃত্যু—ভীষ্মের মতই স্বেচ্ছামৃত্যু। মৃত্যু তাহাকে সংসার হইতে ছিনাইয়া আনে না—সে যে যাচিয়া আসিয়া মৃত্যুর দ্বারে অতিথি।—মৃত্যুর কাছে সে যে "ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।"—মৃত্যু মিনতি করিয়া তাহাকে বলেন—"নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু—হে ব্রহ্মন্, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার কল্যাণ কর।" নচিকেতার শ্রদ্ধাদীপ্ত উৎসর্গ এমনি করিয়া মৃত্যুকেই বশ করিয়াছিল।

মৃত্যু যখন করায়ত্ত হইল, তখনই সত্যের প্রকাশ। ইহাই নচিকেতার প্রতি মৃত্যুর বর। জীবনের ক্রমোন্নয়, সাধনার ধারা পর্য্যায়ক্রমে ইহার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহার উদার সত্য মানুষের সমস্ত সম্বন্ধকে, সমস্ত কর্ত্তব্যকে এবং সমস্ত জিজ্ঞাসাকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। নচিকেতার তিনটী বর অধ্যাত্মসাধনারই প্রতিরূপ।

প্রথম বরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধের প্রকাশ। সংসার হইতে মুখ ফিরাইয়া যে চলিয়া আসিয়াছিল, সংসার মৃত্যুর হাতে যাহাকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, সে আজ মৃত্যু মন্থন করিয়া অমৃত লইয়া ফিরিয়া চলিয়াছে—তাই সংসারের সঙ্গে আর তার বিরোধ নাই, তার উপর আর তার কোন ক্ষোভ নাই। তাই সংসারের কল্যাণ-কামনায় তাহার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্কীর্ণ মমতার সম্বন্ধ বিশ্বব্যাপী করুণার মাঝে আত্মপ্রসার লাভ করিয়াছে! উৎসর্গীর হৃদয় তাই গাহিতেছে—সংসার যেন আজ "শান্ত-

সঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ—ত্বৎপ্রসৃষ্টো মাভিবদেৎ প্রতীতঃ—তাহার সমস্ত সঙ্কল্প যেন শান্তিতে অভিষিক্ত হয়, মন যেন প্রসন্ন হয়, কল্যাণ-সম্পন্ন হয়—আমি ফিরিয়া গেলে সে যেন আমাকে চিনিতে পারিয়া কাছে ডাকিয়া নেয়।" তা হয়; উৎসর্গ কখনও বৃথা যায় না। সংসার যাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিল, সে যখন মৃত্যুঞ্জয় সত্য লইয়া আবার ফিরিয়া আসে, তখন সংসার সব ভুলিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লয়। এমনি করিয়া সত্যসাধকদের যুগে যুগে আমরা চিনিয়া লইয়াছি। কেননা মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সার্ব্বভৌম সম্বন্ধ—মৃত্যুর মাঝে তাহা শেষ হইয়া যায় না। যায় না বলিয়াই লোক-লোকান্তর হইতে ঋণের বোঝা তোমার আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসে। শাস্ত্র বলেন—ইহাই পিতৃঋণ; ঋণ হউক না হউক, মানুষের সঙ্গে মানুষের ইহাই নাড়ীর যোগ। এই যোগটুকু আছে বলিয়াই উৎসর্গীকেও আবার মানুষের মাঝেই ফিরিয়া আসিতে হয়—মানুষও তাহাকে ভুলিতে পারে না। মৃত্যুর প্রথম প্রসাদে নচিকেতা মানুষে মানুষে এই সার্ব্বভৌম সত্য-সম্বন্ধেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

মানুষের ঋণ শোধ করিয়া তারপর দেবতার ঋণ। ইহাকেও শোধ করিতে হইবে উৎসর্গ দ্বারা। মানুষের সমস্ত দৈন্য দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়াও উৎসর্গী তাহার করুণাভরা হৃদয়খানি মানুষের উপরেই স্থাপন করিয়াছে—তাহারই কল্যাণ কামনা করিয়াছে। কিন্তু মানুষের উপরেও কিছু নাই কি?—যেখানে "ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি; উভে তীর্ত্বা-শনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে—যে স্বর্গলোকে কোনও ভয় নাই, মৃত্যু নাই, জরাভীতি নাই—ক্ষুৎপিপাসারূপ দেহের বন্ধন কাটাইয়া, মনের শোক দূরে ঠেলিয়া আনন্দ যেখানে উছলিয়া পড়িতেছে।" —এমন কিছু যদি থাকে, তবে তাহাকে পাইবার পথ কি?

এ ও সেই উৎসর্গের পথ। শুধু "শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে—শস্যমিবাজায়তে পুনঃ"—ইহাই তো মনুষ্যের চরম নিয়তি নয়। জরামৃত্যুহীন আনন্দলোকে দেবতারা যে তাহার উৎসর্গের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন—মানুষকে তাঁহাদের অমৃত রসের অধিকারী করিবার জন্য! দেবতাদের এই প্রতীক্ষারও মূল্য আছে—তাহাই মানুষের দেবঋণ। যজ্ঞাগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়া ইহাও তাহাকে পরিশোধ করিতে হইবে। দেবতাদের প্রতীক অগ্নি মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছেন—মানুষ তাহার সংসার বেদিকার উপর উৎসর্গের মন্ত্রে সেই অগ্নিকে সমিদ্ধ করিয়া আপনাকে তাহাতে আহুতি দিবে—তবেই দেবলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের যোগ হইবে—জন্মমৃত্যুর স্তর হইতে একধাপ উঠিয়া মানুষ অমৃতের অধিকার লাভ করিবে।

এই অমৃতের সন্ধানেই মানুষের কর্ত্তব্যের সূচনা। মর্ত্ত্য বস্তু দিয়া অমৃত পাওয়া যায় না—ইহা সত্য। কিন্তু মৃত্যুই বলিতেছেন —"অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্—অনিত্য জিনিস দিয়া আমি নিত্য পাইয়াছিলাম"—কি করিয়া?—অগ্নিচয়ন করিয়া। অর্থাৎ অনিত্যকে সঞ্চয় করিয়া নয়—হোমাগ্নিতে তাহাকে আহুতি দিয়া। তাই মর্ত্ত্য দিয়া অমৃতের সন্ধান মিলে শুধু ত্যাগে। অমৃতের জন্য এই ত্যাগই অগ্নিচয়ন—সমস্ত জীবনের লক্ষ্যই এই ত্যাগ। নচিকেতা

দ্বিতীয় বরে এই ত্যাগের মন্ত্র শিখিয়া লইলেন—মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে মহান্ ও সার্ব্বভৌম সত্য, ইহাতে তাহাই প্রকাশ হইল।

ত্যাগের অগ্নিচয়নেই জিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে। উৎসর্গের ভিতর দিয়া আমরা মানুষকে পাই, দেবতাকেও পাই। সুখে-দুঃখে কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলে তবে দেবতার সঙ্গ মিলে। কিন্তু মানুষ আর দেবতার মাঝেই তো সমস্ত রসের পরিসমাপ্তি হইয়া যায় নাই; কিম্বা এ কথাও তো চরম নয় যে ইহকে ছাড়াইয়া গেলেই তবে পরব্রহ্মকে পাওয়া যাইবে। এ-ও তো গতির কথা, কিন্তু এ গতিতে প্রতিষ্ঠা-ভূমি গড়িয়া দিতেছে কে? কাহার শক্তিতে আমরা ইহলোকে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলি, আবার পরলোকের জরামৃত্যুহীন আনন্দের মাঝেও বিধৃত হইয়া থাকি?—ইহাকেই জানিতে হইবে।

এই জানাও মানুষের আর এক দায়—ইহাই ঋষি-ঋণ, ইহাও তাহাকে শোধ করিতে হইবে। চারিদিকে একটা সংকোচের আঁটা-আঁটির মাঝে মানুষের জন্ম। কিন্তু গাছ যেমন চিরকাল বীজের আবরণের মাঝেই রুদ্ধ থাকে না—মানুষেরও তেমনি এই সংকোচের আবেষ্টনের মাঝে পঙ্গু হইয়া থাকিলে চলে না। তাহার স্বভাবধর্ম্ম তাহাকে কেবল বাহিরের দিকে—বিস্তারের দিকেই টানিতেছে। এই আকর্ষণের হুকুম মানিয়া নিজকে ছাড়িয়া দিতে পারিলে, তবেই তার আনন্দ। আর যতদিন না সে নিজকে ছাড়িতে পারিতেছে, ততদিন সে ঋণী। ঋণ তাহার মানুষের কাছে—ঋণ দেবতার কাছে—ঋণ ব্রহ্মবিদ্ ঋষিসম্প্রদায়ের কাছে। মানুষের সম্বন্ধকে উদার করিয়া, সর্ব্বস্ব দক্ষিণ যজ্ঞে দেবতার সাযুজ্য লাভ করিয়া সে পিতৃ-ঋণ আর দেবঋণ শোধ করে। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ ঋণ—ঋষি-ঋণ। অমৃতস্য সেতুঃ যিনি, তিনি গুহাহিত হইলেও অপ্রকাশ থাকেন নাই, তাঁহার প্রকাশের কাহিনী যে যুগ হইতে যুগান্তরে হৃদয়ে হৃদয়ে জানাজানি হইয়া গিয়াছে। এই হৃদয়-রহস্যের মাঝেও মানব-সন্তানকে প্রবেশ করিতে হইবে—যে অমৃত তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার আস্বাদও লইতে হইবে। ইহাই তার ঋষি-ঋণ। ইহার শোধ দিতে গেলেও উৎসর্গের প্রয়োজন। এই উৎসর্গে তাহাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহকালের মৃত্যুতেই অমৃতের জিজ্ঞাসা জাগে। তাই ত্যাগের ব্রত উদ্‌যাপনে আপনি জিজ্ঞাসার কথা আসিয়া পড়ে।

এই জিজ্ঞাসাই নচিকেতার তৃতীয় বর। ত্যাগের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; আপনাকে সর্ব্বভূতে মৈত্রীযুক্ত করিয়াছে—সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া দেবভোগ্য অমৃতপানে অজর অমর হইয়াছে। এইবার সর্ব্বভাবমুক্ত চিত্তে বিগতান্ধকার উদার নির্ম্মুক্ত আকাশে উষার প্রথম কনকরেখা স্নিগ্ধ হইয়া দেখা দিল—চিত্তে জিজ্ঞাসা জাগিল। ইহাই নচিকেতার "প্রেতে বিচিকিৎসা।" নববধূর প্রথম সম্ভাষণের মত এ জিজ্ঞাসার বস্তু সুনিশ্চিত হইয়াও শঙ্কা-বিধুর; তাই লৌকিক ন্যায় অনুসরণ করিয়া নচিকেতা বলিলেন, "এ জিজ্ঞাসা যেন—বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।—মানুষের মাঝে এ যেন, কেহ বলে সে আছে, কেহ বলে নাই।" কিন্তু নচিকেতার শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় জানে, এ শুধু বিচিকিৎসার বস্তু নয়—এ সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই যমের মুখে দেবতাদের সন্দেহের

কথা শুনিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না—দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, "হে মৃত্যু, দেবতারাও এ বস্তুকে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন, তুমিও বলিতেছ, ইহার কথা ভাল করিয়া জান না—কিন্তু ও কথায় আমি ভুলি না। আমি জানি—বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ—তোমার মত এই তত্ত্বের বক্তা আর কাহাকেও পাইব না, আর এই বরের মত বরও আর কিছু নাই।"

ঠিক কথা! অন্তরের এই সুদৃঢ় প্রত্যয় লইয়া সংসারে প্রত্যেকটী নিশ্বাস বহিয়া গিয়াছে, এই প্রত্যয়ই বুকে বাঁধিয়া মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি আমার সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞের অবশেষটুকু না লইয়া আজ ফিরিয়া যাইব? না, তাহা হইবে না! মৃত্যুই এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিবে, মৃত্যুই না আবরণ ঘুচাইয়া দিয়া সত্যকে আরো বুকের কাছে আনিয়া দেয়। মমতার শেষ গ্রন্থিটী পর্য্যন্ত যে ছিঁড়িয়া দিতে পারে—সে যদি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না করিতে পারে, তবে কে করিবে? শ্রদ্ধা জীবনকে এতদিন পরিচালিত করিয়াছে—অন্তরে যাহা প্রচ্ছন্ন, তাহারই শক্তিতে, আজ জিজ্ঞাসা মৃত্যুর মাঝ দিয়া তাহার মীমাংসা করিবে—যাহা সুনিশ্চিত হইয়াও অস্পষ্ট ছিল, তাহাকে আবরণহীন সুস্পষ্টতায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

এইবার চরম সত্যের সাধনা আরম্ভ হইল। স্থূলের সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে—এইবার সূক্ষ্মের সঙ্গে যুঝাযুঝি স্থূলের মৃত্যুতে সত্যের দুয়ারে প্রথম আঘাত পড়িল, অন্তরের সূক্ষ্ম শক্তিগুলি বিকশিত হইয়া উঠিল। ইহকালের সমস্ত ভোগ্য পদদলিত করিয়া বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াছিলে, এইবার পারত্রিক ভোগের সঙ্গে লড়িতে হইবে—অমুত্র-ফলভোগবিরাগ দ্বারা বৈরাগ্যের সাধনা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই সংগ্রামের শেষেই জিজ্ঞাসার উত্তর মিলিবে।

মৃত্যু আসিয়া বলিতেছেন—"মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বাং কামভাজং করোমি,—হে নচিকেতা মহাভূমিতে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও, সমস্ত কামনারও শ্রেষ্ঠ কামনা তোমার তৃপ্ত করিব।"

নচিকেতা উত্তর করিলেন—"না, আমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর চাই।"

যম বলিলেন "যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে, সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব—মর্ত্ত্যলোকে যে সমস্ত কাম্য দুর্লভ, তার সমস্তই তুমি ইচ্ছামত আমার কাছে চাহিয়া লও।"

নচিকেতা তবু অটল।

শেষবার যম বলিলেন, "আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো, মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ—নচিকেতা, এই দেবদুর্লভ কাঞ্চন সহিত কামিনী তোমায় দিলাম, ইহাদের দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করাইয়া লও কিন্তু মরণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।"

নচিকেতা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"মিথ্যা চেষ্টা তোমার। সর্ব্বং জীবিতম্ অল্পমেব—সত্যের কাছে সমস্তই, জীবনকেও আমি তুচ্ছ বলিয়া জানি, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে—এই বাহন আর নৃত্যগীত তোমারই থাকুক; ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ—মানুষ বিত্ত দিয়া তৃপ্ত হইবার নয়। যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো, নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে—শ্রেষ্ঠ যিনি, গূঢ় রূপে সকলের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট যিনি, তাঁহাকে ছাড়িয়া নচিকেতা আর কাহাকেও বরণ করিয়া লইবে না।"

মৃত্যু হার মানিলেন; স্থূলের মৃত্যুতে যে সূক্ষ্মের ভোগ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহাও পরাজিত হইল—মরণের মুখে সত্যের শাশ্বত দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। শ্রদ্ধা আর উৎসর্গের সাধনায় আজ নচিকেতা সিদ্ধকাম—সত্যকে লাভ করিয়া ঋণত্রয় হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। ওঁ শান্তিঃ

বর্ত্তমান সমস্যা

—•—

[এই রচনাটী লালা হরদয়ালের কাছে স্বামী রামতীর্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—লাহোর Youngmen's Indian Associationএর বাৎসরিক অধিবেশনে পাঠ করবার জন্য। পরে The East and the West পত্রিকায় তরুণ ভারতের প্রতি রামের বাণীরূপে এটা প্রকাশিত হয়।]

চাই একতা—চাই মিলন। মিলনের যে কি প্রয়োজন, তা সবাই প্রাণে প্রাণে বুঝছে। নানাদিক থেকে অগণিত শক্তি ক্রিয়া করছে—তাই তাদের ফলও হচ্ছে বন্ধ্যা, কিন্তু সমস্ত শক্তির সামঞ্জস্য করে একটা বিশিষ্ট পরিণাম যুক্ত কোনও শক্তির তো উদ্ভব হচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ব্যক্তির কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা স্রোতে ভেসে চলছে যেন—কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে? সহস্র সহস্র সমাজ আর সম্প্রদায় আপন খেয়ালখুসী মত যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই নৌকার দাঁড় টানছে—কিন্তু কর্ণধার তো কেউ নাই। দাঁড় যেখানে আছে, সেইখানেই থাক্—তুমিও আপন ঠাঁয়ে বসে থাক - নড়ো-চড়ো না—কিন্তু সবাই একটা দিক লক্ষ্য করে বেয়ে চল। যদি চলার মাঝে এমনি সুর বাঁধতে পার, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য আনতে পার—তবেই উন্নত হবে। এমনি করে নিজের জায়গাটীতে আঁট হয়ে বসে আনন্দ মনে বেয়ে চল—বেয়ে চল। সমগ্র জাতির স্বার্থে এইটুকুর প্রয়োজন—আর বহুর স্বার্থের মাঝেই একের স্বার্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এমন ভাবুকের মত কথা বলা সহজ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে ঐক্য আর সামঞ্জস্যের নিদারুণ অভাব এতদিন ধরে আমাদের চোখের উপর সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে—কেন?

এর মূল কারণ হচ্ছে—

(ক) কার্য্যকরী বুদ্ধির অভাব, আর

(খ) জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি।

আমরা একে একে তার আলোচনা করব।

(ক) কার্য্যকরী বুদ্ধির অভাব

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে খোরাশানের আলবেরুণী এই দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি একজন প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক ও মার্জ্জিতবুদ্ধি পণ্ডিত ছিলেন। প্লাটো (Plato) ও আরিষ্টোটল্ (Aristotle) তিনি যেমন আগ্রহ করে পড়েছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থও তেমনি করে পড়েছিলেন। ভারতবর্ষের তখনকার অবস্থা তিনি যেমনটী দেখেছেন, তেমনটী লিখে রেখে গিয়েছেন। হিন্দুর দর্শন, কাব্য ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে মন্তব্য করে গিয়েছেন। যে সমস্ত পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, তাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনি অজস্র প্রশংসা করে গিয়েছেন।

কিন্তু সাধারণ লোকের আর স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার কথা তিনি যা লিখে গিয়েছেন, তাতে সকল আশা ভরসা নিভে যায়। দেহে, বুদ্ধিতে, নীতিজ্ঞানে এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে তারা হীনাদৃত, পদদলিত, সমাজে,

ধর্ম্মে, স্ত্রী [illegible] পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তাদের চিত্ত বীর্য্যহীন—দেহ বিধ্বস্ত। গজনীর মামুদের নেতৃত্বে যে সমস্ত মুসলমান বছরের পর বছর ভারতবর্ষ লুটতে আসত—তাদের সামনে থেকে এই সমস্ত হতভাগোরা বিশৃঙ্খল হয়ে দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাতে থাকত—মুসলমানেরা ধুলার মত তাদের ঝেঁটিয়ে নিত।

এর পর বাবর ভারতবাসীদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—কোনও বিষয়ে এদের প্রতিভা নাই, মৌলিকতা নাই, দক্ষতা নাই। শ্রমশিল্প বা চারুশিল্প সম্বন্ধে এদের ব্যবহারিক জ্ঞান এক রকম নাই বললেও হয়—এদের স্থাপত্য বিদ্যা নাই, উদ্যান বা পয়ঃপ্রণালী নাই, বাকদের ব্যবহার পর্য্যন্ত নাই। এমন কি বাবর এমন অভিযোগও করেছেন যে, এরা একে অপরের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পর্য্যন্ত পারে না। এই সমস্ত মন্তব্যের মাঝে ব্যক্তিগত সংস্কার বা অতিশয়োক্তির কথা বাদ দিয়ে ধরলেও, যে বর্ণনাটুকু আমরা পাই, কষ্টকর হলেও তা স্বীকার করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই। ভারতবর্ষের যে পতন হয়েছে, তার মূল কারণই হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।

এই সমস্ত বিদেশী ঐতিহাসিকেরা যা বলেছেন, কলম-কালীতে তা উলটিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষেও সহজ—বামের পক্ষেও সহজ। কিন্তু তবুও তো জান—নিজের চোখে দেখে এঁরা যা লিখে গিয়েছেন, সে তো স্পষ্ট কথা—নিছক সত্য! আজও যার প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখছি, তাকে না করি কি বলে? ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবের জন্যই তো ভারতবাসীর এমন সামাজিক দুর্গতি। হাতে পায়ে খেটে খেতে তার ঘৃণা; জাত আর সম্প্রদায়ের মাঝে তার হাজার রকম অস্বাভাবিক ভাগাভাগি; দেশ ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতে তার অনিচ্ছা; তার সমাজে বাল্যবিবাহ—স্ত্রীজাতিকে জোর করে সে শারীরিক আর মানসিক দুর্গতির আঁধারে ডুবিয়ে রেখেছে।

সমাজের যে সমস্ত গলদ, তা দূর করা সহজ নয়। বার্ক (Burke) ঠিকই বলেছিলেন, "সংস্কার জিনিষটা দূরে দূরেই রাখতে হয়, তা নইলে আমরা চটে যাই।" আচার-বন্ধন ছিন্ন করা বাস্তবিকই একটা কঠিন কাজ। সমাজসংস্কারের জন্য যারা খাটবে, সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধ আর কু সমালোচনা তাদের উপর এসে পড়বেই—তাই ধরে মনোমালিন্য, বুঝবার ভুল, মতভেদ, অনৈক্য ইত্যাদি এসে জুটবেই। এই অনৈক্য যাতে না হয়, তার জন্য কি সব ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে থাকব আর নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি বলে মনে মনে গুমোর করব? তোমার মুক্তিও খুঁজে নিবে, অথচ সমাজের দিকে তাকাবে না—এমনটা যদি বাস্তবিকই সম্ভব হত! যে সমাজ ডুবতে যাচ্ছে, সে কি তোমায় অমনি ছাড়বে? সে যদি ডোবে, তোমাকেও তার সঙ্গে ডুবতে হবে, আর যদি ভাসে, তোমাকেও ভাসতে হবে। অপূর্ণ সমাজে থেকে যে কোনও মানুষ পূর্ণতা লাভ করবে, এমন মনে করাটাই পাগলামী। তার চেয়ে বরং শরীর থেকে হাতখানা কেটে ফেলে মনে করো সেটা খুব শক্তসমর্থ হয়ে উঠবে।

বহুদিন ধরে এই অবৈদান্তিক চিন্তা ভারতবাসীর মনে আশ্রয় পেয়েছে, আর তাতেই আজ সমাজ এমনি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে যে তার দিকে চাইতেও দুঃখ হয়!

হে তরুণ, ভবিষ্যের সোণার স্বপন তোমরা—ভাবতের ভবিষ্যৎ তোমাদেরই ভবিষ্যৎ—তোমরাই তার জন্য দায়ী। যারা ভীরু, তারাই দলে পুরুব সম্মোহনে মুগ্ধ হয়, তাদের কুসংস্কার নির্ব্বিচারে মেনে নেয়। বাইরের শাসক যেই হোক না কেন, সে শুধু নামেই আছে; মানুষের মন আর চিন্তাকে শাসন করছেন সত্যস্বরূপ প্রাণ-স্বরূপ আত্মা যিনি। বিশ্ববিদ্যালয় হতে তুমি বি-এ বা এম্-এ ডিগ্রী পেতে পার; কিন্তু তুমি বীর হবে না কাপুরুষ হবে, তা নির্ভর করছে শুধু তোমার উপরেই। বল কোনটা তুমি চাও? তুমি গোলামের গোলাম হতে চাও না রাজার রাজা হতে চাও?

নিউটনের (Newton) গতি-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্রে বলছে, যে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা যায়, তার সরল গতির পরিবর্ত্তন হয়। কত শতাব্দীর পর শতাব্দী হতে আচার আর কুসংস্কারের ধারা ধরে, আমাদের অস্বাভাবিক বিরোধ-প্রবণতা ও ততোধিক অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য দেশের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এই প্রাচীন জড়ত্ব দূর করে একঘেঁয়ে গতির ধারা পরিবর্ত্তন করবে কে? কে নূতন শক্তির প্রয়োগ করে প্রয়োজন মত এই অন্ধগতির মোড় ফিরিয়ে দিবে, তার বেগ বাড়িয়ে দিবে—কল্যাণের দিকে এই বিরাট জড়পিণ্ডকে আবর্ত্তিত করবে?—সে তোমরা—যারা তরুণ—যাদের চরিত্র বল আছে, বৈদগ্ধ্য আছে। কাজ চলুক—কাজ চলুক। অতীতকে বর্ত্তমানের ছাঁচে ঢেলে বর্ত্তমানের উপযোগী করে তোল—আর পরিশুদ্ধ বীর্য্যশালী বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের স্রোতে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত ভাসিয়ে দাও। পূর্ব্বপুরুষের উত্তরাধিকার ছাড়া আমাদের চলবে না; যে জাতি এ গৌরব ছাড়তে চাইবে, বাইরের আঘাতে তার মৃত্যু নিশ্চয়। তার চাইতেও বিপদ বেশী, যদি কেবল পূর্ব্বপুরুষের পুঁজিটুকুর গর্ব্ব নিয়েই বসে থাকি; যে জাতি তা করবে, ভিতর থেকে আঘাত পেয়ে তাকে মরতে হবে।

তুমি যদি সত্যকে ধরে জীবন যাপন করতে যাও, তাহলে তোমার জন্য সমাজে অনৈক্য অসৌজন্য বাড়বে—এই আশঙ্কাই না করছ? তুমি কি সত্য সত্যই তাই মনে কর? একা হলেও অটল হয়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে; এর উপর আর ওজর দেখিও না—এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের অধিকার। দুর্ব্বার স্রোত তোমারই অনুকূলে, তোমার মাঝেই জোয়ারের জল ফেঁপে উঠেছে। যারা অতীতের দাবী করে, তারা করুক; ভবিষ্যৎ যে তোমার হাতে, যদি সত্যের পথ হতে বিচলিত না হয়ে তুমি চল! যদি জাতির কথাই বল, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস কর—যে মিলন ন্যায়ধর্ম্মের অনুকূল নয়, তা কোন দিন টিকবে? লোককে আঁধারে রেখে তুমি তাদের মিলাতে পারবে? ভ্রান্তি আর কুসংস্কারের কাছে জন্মে জন্মে দাসখৎ লিখে দিয়ে তুমি সমস্ত জাতির মাঝে সামঞ্জস্য আনবে?

মনে কর, যত নাবিক নৌকাখানা বাইছে, তারা সব একদিকেই বাইছে; কিন্তু তাদের লক্ষ্য যদি থাকে উলটা দিকে—বিনাশের দিকে, সত্যের দিকে যদি তারা না চলে—তবে তাই কি তুমি ভাল মনে কর? এমন নৌকা ডুবো পাহাড়ে ঠেকে চুরমার হয়ে যাবে—আর যত শীঘ্র তা হয়, ততই ভাল। মিলন কেবল সত্যেই হতে পারে। সত্যে আর শুচিতায় কেবল সবার সাথে এক হওয়া

চলে। যারা সমস্ত জাতিকে এক করবে বলে সাধনা করছ, তারা আগে চেয়ে দেখ, কত অমানুষের ভ্রান্তি এর মাঝে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে—আগে তাদের বিদায় করতে হবে। যদি সত্যের জন্য, শ্রেয়ের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করে থাক, কিছুতেই পিছ-পা হয়ো না। আজ যদি দেখ, লোকের উপর অত্যাচার হচ্ছে, কাল যদি দেখ, কর্ম্মীদের উপর উৎপীড়ন হচ্ছে, তাতে নিরাশ হয়ো না। এতে এই প্রমাণ হচ্ছে যে, দেশের নাড়ী এখনো বসে যায়নি —তার ভিতরে প্রাণপুরুষ জেগে আছেন, তার শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে!

আদর্শ আচরণ যা, তার মাঝে কোনও দুঃখ নাই—সে পূর্ণ শান্তি—তার চারদিকে কেবল প্রেমের স্নিগ্ধ আলোকের অজস্র ধারা। কিন্তু যে সমাজে এখন পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র আলোকপাতও অসহনীয় যন্ত্রণার কারণ হয়, সেখানে দুঃখহীন শান্তি আর নবজাগরণের আলোক কি করে আশ্রয় পাবে? তাই বর্ত্তমান অবস্থা দেখে যদি তোমার মনে হয়, তোমার আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা এ সমাজে স্বভাবতঃই সম্ভব নয়, তবে অন্ততঃ তোমার আদর্শটা যাতে বাস্তব হয়, তারই চেষ্টা কর। এরই প্রয়োজন আর সবগুলির সব চেয়ে বেশী। বড় বড় মানুষ আর তাদের ছোট্ট ছোট মত—এই নিয়ে কোনও দেশ বড় হয় না; দেশ বড় হয়, ছোট ছোট মানুষের বড় বড় মত নিয়ে। শান্তির কথা বলছ? পশুর মত নিশ্চিন্ত আরামে পড়ে থাকাও তো শান্তি, কবরের তলে বিশ্রাম করাও তো শান্তি। কিন্তু আমরা চাই জীবন্তের শান্তি—মৃতের শান্তি তো নয়। মানুষ যখন অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে মরছে, তখন তোমার প্রদীপটা ধামাচাপা দিয়ে রাখার চেয়ে মোটেই যদি তোমার প্রদীপ না থাকত, তবে সেই ছিল ভাল। একটা কথা বল্‌লে দেখি, গলদ শুধরে যায়; অথচ সেই কথা যে না বলে, সে শুধু পাষণ্ড নয়—কাপুরুষ।

(খ) প্রজাবৃদ্ধি

এই ব্যাপার নিয়ে ম্যালথাস (Malthus) কিম্বা অন্যান্য অর্থশাস্ত্রবিদেরা কি বলেছেন, তার আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই। ম্যালথাস কেবল জীববিদ্যার সিদ্ধান্তগুলির পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। এ সম্বন্ধে প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদেরা কি বলছেন, তাই দেখা যাক। হাক্সলী (Huxley) বলেন, সমাজ যেন বন-জঙ্গলের মাঝে একটা ফুল বাগান। সামাজিক বিবর্ত্তন, তিনি একে নৈতিক বিবর্ত্তন সংজ্ঞা দিয়েছেন, ঠিক যেন উদ্যানবিদ্যার আইন-কানুন মেনে চলে—কিন্তু প্রাকৃত বিবর্ত্তনের সঙ্গে তার মিল নাই। প্রাকৃত বিবর্ত্তনের মাঝে অবিরাম কেবল বেঁচে থাকবার তীব্র প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু নৈতিক বিবর্ত্তনে এই বিরোধটা মিটে গিয়েছে। যে সমস্ত নিমিত্তে তার উদ্ভব হয়েছিল, তারা আর নাই। হেনরী ড্রামণ্ড (Henry Drummond) দুইটা বিবর্ত্তনেরই ঐকান্তিক ঐক্য দেখাবার জন্য খুব চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু এত ডাক-হাঁক সত্ত্বেও ডারুইন (Darwin) ও হাক্সলীর সিদ্ধান্তকে তিনি একটুকুও হটাতে পারেননি।

এ কথা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না—একটু খানিও জ্ঞান যার আছে সেই অস্বীকার করতে পারবে না—যে, মালী যদি আগাছা উপড়িয়ে স্বচ্ছন্দ প্রজননকে বাধা না দিত, বাগানে যদি যা তা জন্মাতে পারত

না দিত, তাহলে প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের নিয়মই সেখানে খাটত—বাগানটাও পয়মাল হয়ে যেত—আবার সেই প্রাচীনকালের মত নির্ম্মম বিরোধের রাজত্ব আরম্ভ হয়ে যেত—শান্তি আর সমৃদ্ধি কোথায় উড়ে যেত। তেমনি, কোনও একটা সমাজেও যদি দেখা যায় যে তার প্রজাসম্পদ যতটুকু বিস্তৃত হবার তা হয়েছে, অথচ তার পরেও অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনও একটা বিধান করা হয়নি, তবে সমাজের মাঝেই একটা ভীষণ গণ্ডগোল বেধে যাবে—সুখ শান্তি সেখানে থাকবে না—ধর্ম্ম থাকবে না, নীতি থাকবে না—ঐশী বিধানের কোনও মর্য্যাদা থাকবে না।

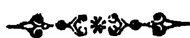
এমনি সঙ্কটের সময়েই যত জাতির বিকৃতি আর অধঃপতন আরম্ভ হয়। রোম হোক, গ্রীস হোক্, যে কোন রাজ্যই হোক্ না কেন, তার মূলে ছিল এই প্রজাবৃদ্ধির সমস্যা। ভারতবর্ষও বহুদিন হলো এই সঙ্কটসন্ধিতে এসে পৌছেছে, কিন্তু তার মূল নিদানটার কোনও প্রতীকার এ যাবৎ আমরা করিনি। জগতে ভারতবর্ষের মত এত জনবহুল অথচ দরিদ্র দেশ আর কোথাও নাই। যে কোনও সাধারণ ভারতবাসীর গৃহস্থালী সমগ্র জাতিরই প্রতীক।—আয় যৎসামান্য; অথচ তার উপরই ফি-বছরে খানে ওয়ালা লোক বাড়ছেই; আবার তার উপর অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অপরিমিত ব্যয়ভার—তার সঙ্কোচ করবারও বেচারাদের সাধ্য নাই। যদি খাবার থাকে একটীর কি দু'টীর, আর জীবের সংখ্যা যদি হয় অগুনতি, তাহলে এক গোয়ালের গরুর মাঝেও যে গুঁতোগুতি লেগে যায়। বিরোধের এই সমস্ত মূল কারণ দূর না করে লোকের কাছে শান্তির মহিমা প্রচার করতে যাওয়া প্রচার কার্য্যের ভেংচানো মাত্র।

আমাদের দেশের লোক শান্তিপ্রিয়—অন্তরে অন্তরে তারা বড় ভাল মানুষ। তাই তারা শান্তিতে থাকতে চায় বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে দেহের ধর্ম্ম এসে যখন তাদের চেপে ধরে, তখন ঈর্ষ্যা আর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না করে তারা কি করবে? প্রজাবৃদ্ধি সমস্যার যদি কোনও মীমাংসা না হয় তাহলে জাতীয় একতা, স্বজাতি-প্রেম ইত্যাদি বড় বড় কথা কেবল আকাশকুসুমের কল্পনা হয়েই থাকবে। এ গ্রন্থি ছেদ আমাদের করতেই হবে—নইলে মৃত্যু একেবারে অনিবার্য্য। সামাজিক পরিবেষ্টনের মাঝে আমাদের ঘরের লোকেরই নিত্য দুঃখ, নিত্য জ্বালা-যন্ত্রণা; সেখানে সমবেদনা আর নিঃস্বার্থপরতা যে কিছুতেই জন্মাতে পারে না—এ একেবারে জীববিজ্ঞানের সত্য। এই জনবহুল দারিদ্র্যের ভ্রূকুটী সামনে নিয়ে, হে ভারতবাসী, তুমি প্রেম আর সমবেদনার বৃথা জল্পনা-কল্পনা করছ—এ তোমার অতিমাত্রায় দুরাশা।

যারা পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেছে, তারা জানে, একটা জড়পিণ্ড তার আন্তর ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে—যদি তার অন্তর্বর্ত্তী কণিকাগুলি পরস্পরের নিকট হতে এমন ভাবে সমদূরবর্ত্তী থাকে, যাতে প্রত্যেকটী অণু তার চারিদিকে এতখানি অবকাশ পায় যে অন্যান্য অণুগুলির মতই সে তার নিজের স্ব-চ্ছন্দ বজায় রেখে গতিশীল হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনপিণ্ড সম্বন্ধে কি তা বলা যেতে পারে? তার প্রত্যেকটী ব্যক্তি কি তার ছন্দ ঠিক রেখে নিজের সহজ গতিটুকুর অনুশীলন

করতে পারে?—অপরের সঙ্গে কি তার বিরোধ ঘটে না? তার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতি-বিধির জন্য তার চারদিকে অবকাশ আছে কি? একজন খেতে পেলে যদি দশজন শুকিয়ে মরে, তাহলে জাতির ভারকেন্দ্র ঠিক রাখবার জন্য তোমাকে সত্য সত্য একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হয়। তা না হলে ভারতবর্ষের ভাগ্যে আছে শুধু অন্ধ প্রকৃতির ভীষণ ভালবাসা। আমাদের মত অস্থায় দশায় যারা পড়েছে, তাদের কাছে সেটা কি মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, তা মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্ব্বেই বলেছেন, সে হচ্ছে—মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ আর ভূকম্প।

আপদের কথা অনেকই বলা হল। এখন এর প্রতীকার কি? প্রতীকার তো কেবল একটা নয়। সে কথাই বলছি।



বেদান্ত-সার

—*—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—কর্ম্মবিচার]

নিত্যকর্ম্মের তাৎপর্য্য

নিত্য কর্ম্মের নিত্য-বিশেষণ লইয়া যে সূক্ষ্ম আপত্তি উঠিয়াছিল, তার আলোচনা আমরা করিয়াছি। এখন ইহার তাৎপর্য্য ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। নিত্যকর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ আমরা ধরাবাঁধা কতগুলি কাজের তালিকা বুঝি, যাহারা নব্যভাবের ভাবুক, তাঁহারা কতকগুলি অর্থহীন ও অনাবশ্যক (!) কাজের বোঝা ঘাড়ে করিতে নারাজ। কিন্তু কথাটা আমরা অন্যদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিতেও তো পারি। জীবনের লক্ষ্য যাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা সেই লক্ষ্যের অনুকূল কর্ম্মে নিজের শক্তিটুকু সঁপিয়া দিতে দ্বিধা করিবে কেন? কর্ম্মকে তাহারা ভিতর হইতে দেখিবে; সুতরাং তাহা বিশিষ্ট কোনও অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও তাহার সার্থকতার পরিমাপ হইবে কর্ম্মীর অন্তরস্থিত রসানুভূতির দ্বারা—বাহিরের কোনও সুবিধা-কুবিধার দ্বারা নয়। নিজের লক্ষ্য বস্তুতে যে তন্ময় হইতে পারিয়াছে, সে তাহারই রসে কর্ম্ম করিয়া যাইবে, সমস্ত কর্ম্মই সে তাহার লক্ষ্য ভাবনা দ্বারা ভাবিত করিয়া লইবে। কর্ম্মের মাঝে তাহার সার্থকতা আছে এই অন্তরঙ্গ রসানুভূতিতেই। বাহিরের প্রতি সে উদাসীন, সুতরাং তাহার পীড়নকে সে অনুভব করিবে কেন?

বৈদান্তিক কোন্ ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্ম করিবে? সে চাহিবে তাহার ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে। সুতরাং তাহার কাছে ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। নিজকে সে বিভূ, মহান্ বলিয়া জানে। অতএব এই বিশ্বজগৎটাই যে তাহার মাঝে ওতপ্রোত—সমস্তই যে তাহারই অন্তরঙ্গ, জগতের সঙ্গে এই আত্মীয়তাটুকু সর্ব্বতোভাবে অনুভব করাই তাহার পুরুষার্থ। কাজেই তাহার প্রতিদিনের কর্ম্ম এই ব্রহ্মণ্য-ভাবদ্বারাই অনুপ্রাণিত হইবে। সে বেদের শাসন মাথায়

তুলিয়া লইয়াছে। তাই বেদনিরূপিত যজ্ঞসাধনাই তাহার কর্ম্মের প্রাণ—পঞ্চ মহা যজ্ঞানুষ্ঠান তাহার নিত্যকর্ম্মের স্বরূপ। সে যজ্ঞ তাহাকে মনুষ্যে, দেবতায়, পিতৃপুরুষে, ঋষিসংঘে, এমন কি আকীট সর্ব্বভূতে পর্য্যন্ত আত্মবিস্তার করিতে শিখাইতেছে :—তাহার গৃহস্থালী সকলকে লইয়া। যদি এই তাৎপর্য্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে শাস্ত্রানুশাসিত কর্ম্মসমূহ পালন করিয়া যায়, তাহাতে তাহার জাতের স্বাতন্ত্র্য কি কোথাও ক্ষুণ্ণ হইবে? এই বিশ্বজগতে আত্মপ্রসারণের মহাদীক্ষা কি তাহার শাস্ত্রনিরূপিত কর্ম্মের মাঝেও নিত্য নূতন ভাবের উন্মেষ করিয়া নব নব আনন্দে নব নব উৎসবে তাহাকে আহ্বান করিবে না?

হইতে পারে, আজ আমরা নানাদিক দিয়া কর্ম্মের আসর জাঁকাইয়া তুলিয়াছি। সেই স্বল্পতৃপ্ত স্বল্পপরিসর প্রাচীন আদর্শ হয়ত আর আমাদের কুলায় না। তা না কুলাক্, কিন্তু তবুও কর্ম্মের প্রাণ যাহা, আর্য্য হইয়া সেই আর্য্য-সত্য ভুলিব কি করিয়া? দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যে যজ্ঞ আমাদের আর্য্যসভ্যতার বৈশিষ্ট্য, তাহাই যে বৈদান্তিকের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম্ম, কিসের সম্মোহনে সে কথা অস্বীকার করিব? যুগে যুগে সেই যজ্ঞের বাহ্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু মূলে জগতের যে আদিম মহাভাবের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার কোনও ব্যত্যয় হইয়াছে কি? যাহাই করি না কেন, এই যজ্ঞই যে আমাদের ধর্ম্ম, ইহা জানিয়া লইতেই হইবে —বাঁচিলেও ইহাকে ধরিয়াই বাঁচিব, মরিলেও ইহাকে ধরিয়াই মরিব। কাহারও বিধিনিরূপিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কেহ যাইতে পারে না। জগতে আমাদের দিয়া ভগবানের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে যে ধর্ম্ম তিনি দিয়া দিয়াছেন, তাহাকে এড়াইয়া যাইবার সাধ্য আমাদের নাই।

তারপর কর্ম্মের বৈচিত্র্য স্বীকার করিলেও সরল ও স্বল্পতৃপ্ত জীবনের আদর্শ যে জগতে একান্ত নিষ্প্রয়োজন, একথা স্বীকার করিতে পারি না। কালধর্ম্মে আমাদের জীবন যদি জটিল হইয়াই উঠিয়া থাকে, তবে তাহার স্বাস্থ্যটুকু বজায় রাখিবার জন্যই বৈদান্তিকের যজ্ঞনিষ্ঠ সরল জীবনের আরও বিশেষ প্রয়োজন। বৈচিত্র্যের জীবনে যজ্ঞাহুতি তো চাই-ই—তাহা ছাড়াও বৈদান্তিক জীবনের আদর্শও চাই। এই বৈদান্তিকেরা আজ সংখ্যায় বেশী না হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনের স্মৃতি ইহাদের মাঝেই জাগ্রৎ থাকিবে—কর্ম্মের পুঞ্জিত মেঘের বুকে ইহাদের তপঃশুদ্ধ মহিমা বিদ্যুতের মত দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

নিত্যকর্ম্ম সরল দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ —বেদ তাহার অনুশাসক, যজ্ঞ তাহার প্রাণ, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম

নিত্যের পর নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কোনও বিশেষ নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম্ম, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যেমন পুত্র জন্মিলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের বিধান রহিয়াছে। তেমনি, অগ্নিহোত্রীর গৃহস্থের গৃহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেলে ক্ষামবতী যাগের বিধান। এগুলি শ্রুতির অনুশাসন। তাহা ছাড়া স্মৃতির অনুশাসনও আছে, যেমন গ্রহণোপলক্ষ্যে স্নান ইত্যাদি।

নিত্যকর্ম্ম আমাদের নিজকে বাঁধে আর নৈমিত্তিক কর্ম্ম অপরের সঙ্গে আমাদের নানা অবকাশে যুক্ত করিয়া সমাজধর্ম্ম গড়িয়া তোলে। এমনি করিয়া সামাজিক বিবর্ত্তনে সভ্যতায় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনকে পূর্ণ করিতে হইলে ইহাদিগকেও বাদ দেওয়া চলিবে না, কেননা সমগ্রজাতির প্রাণপুরুষ ইহাদিগের ভিতর দিয়াই বিচিত্ররূপে প্রকাশ হইতেছেন। সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বহুর সঙ্গে যুক্ত করে বলিয়া বৈদান্তিকের আত্মপ্রকাশের ইহাও অনুকূল।

জাতেষ্টিকে যে নৈমিত্তিক কর্ম্মের উদাহরণ স্বরূপে ধরা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। মূলে বলা হইয়াছে যে নিত্য প্রভৃতি কর্ম্মের অবান্তর ফল পিতৃলোক ও সত্যলোক প্রাপ্তি। কিন্তু শ্রুতিতে যেখানে জাতেষ্টির বিধান করা হইয়াছে, সেখানে শেষে বলা হইতেছে—"যস্মিন্ জাতে এতামিষ্টিং নির্ব্বপতি, পূত এব তেজস্ব্যন্নাদ ইন্দ্রিয়াবী পশুমান্ ভবতি"—যে জন্মিলে এই যাগ করা হয়, যাগের ফলে সে পবিত্র হইয়া তেজস্বী, অন্নযুক্ত, সমর্থ ইন্দ্রিয়যুক্ত ও পশুযুক্ত হয়।" ইহাতে দেখা যাইতেছে যে যজ্ঞের অবান্তর ফল যজ্ঞকর্ত্তায় সংক্রামিত না হইয়া তাহার পুত্রে সংক্রামিত হইতেছে। সুতরাং কর্ত্তাতেই মুখ্য ও অবান্তর দুইটী ফল সঞ্চারিত না হওয়ায় প্রতিজ্ঞানুরূপ নৈমিত্তিক কর্ম্মের লক্ষণ তো এখানে খাটিতেছে না। এই হইল সংশয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান স্থলে নৈমিত্তিক কর্ম্মের ধরণটা কি তাহাই বুঝাইবার জন্য জাতেষ্টির উদাহরণ লওয়া হইয়াছে—সুতরাং কল্পিত বিরোধে কোনও মারাত্মক দোষ হইতেছে না।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম

প্রায়শ্চিত্তও নিমিত্ত বিশেষে অনুষ্ঠান করিতে হয়। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া যাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা যদি না করা যায়, কিম্বা যাহা নিষেধ করা হইয়াছে, প্রমাদবশতঃ যদি তাহার অনুষ্ঠান করা হয়, তবেই প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন হয়। কিম্বা আরও সহজ করিয়া বলিতে গেলে, যে কোনও পাপক্ষয়ের উদ্দেশে বিহিত যে কর্ম্ম, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, কোনও কর্ম্ম দ্বারা অপর কোনও কর্ম্মের ফল প্রতিরুদ্ধ করা যাইতে পারে কি না। ধর, তুমি কোনও অন্যায়ের অনুষ্ঠান করিলে। কার্য্য-কারণ পরম্পরায় তোমার কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। এখন অপর কোনও কর্ম্মদ্বারা যদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের ফল নিরুদ্ধ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত পড়ে না কি? পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপ কর্ম্ম আর প্রায়শ্চিত্তরূপ পুণ্যকর্ম্ম—এই দুইয়ে অর্থাৎ পাপে পুণ্যে কাটাকাটি চলিবে কি?

এই স্থলে আমরা একটী জটিল সমস্যায় উপস্থিত হই। কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা ভূতেও আছে, চিত্তেও আছে। কিন্তু উভয় ধারার মাঝে পরস্পরের যোগাযোগ স্বীকার করা যায় কোন প্রমাণে? মানসব্যাপার রূপ কোনও পাপানুষ্ঠান দৈহিক কোনও বিকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া? এ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটী কতকগুলি নির্দ্দেশ দেখিতে পাই মাত্র, কিন্তু তাহার মৌলিক বিবৃতি কোথাও পাই না। তাহার ফলে প্রাকৃত জনসাধারণ মানসব্যাপার ও ভূতব্যাপারের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় এমন বিপর্য্যয়

ঘটাইয়া থাকে যে, অনায়াসে একটী ধারা হইতে আর একটী ধারায় কার্য্যকারণের সংক্রমণ তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় সমূহ অনর্থেরও সূত্রপাত হয়। মানসব্যাপাররূপে অনুষ্ঠিত কোনও পাপাচরণকে যদি মানস প্রতিক্রিয়া দ্বারা ব্যাহত না করিয়া কোনও ভৌতিকব্যাপারকেই তাহার ফলনিরোধক বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহাতে বাস্তবিকই পাপের প্রতিরোধ হয় কি? মানসব্যাপারের ফল মনেই সংক্রামিত হয়, ভৌতিকব্যাপারেও তাহার ফল ভূতেই সঞ্চারিত করিয়া থাকে। সুতরাং একের ক্রিয়াতে অপরের ক্রিয়া ব্যাহত হইবে কি করিয়া? কলুষিত চিত্ত লইয়া গঙ্গায় গিয়া শরীরটাকে চুবাইয়া আসিলেই কি মনের কালী ধুইয়া যাইবে?

অথচ ভৌতিক ক্রিয়া যে চিত্তব্যাপারেও প্রভাব বিস্তার না করে, এমন নহে—ইহার প্রমাণ অহরহই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তবে এ দুয়ের সংযোগসূত্র কোথায়? এই এক রহস্য। ঠিক কোন জায়গা হইতে একটা যে আর একটাকে প্রভাবিত করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্যই প্রকৃতির যাহা রহস্য, তাহাকে ভুল বুঝিয়া, সমস্তটায় তাল পাকাইয়া না তুলিয়া, ভৌতিক ও চৈত্তিক ধারার মাঝে কার্য্য-কারণের যে শৃঙ্খলাগুলি আমরা সুস্পষ্ট ধরিতে পারি, সেইগুলি লইয়াই আমাদের নাড়াচাড়া করা উচিত। পাপাচরণে যদি মনে গ্লানি জন্মিয়া থাকে, তবে সেই মনকে ধরিয়াই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—অপরাধ ক্ষালনের ভারটা কেবল ভূতগ্রামের উপর ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। যদি এমন হয় যে অসদাচারে মনের গতি এমন অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে সাক্ষাৎভাবে কোনও গ্লানি তুমি অনুভব করিতেছ না, তবে আত্মানুসন্ধান দ্বারা সেই সূক্ষ্ম মনো-ব্যাপার উদ্ঘাটিত করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তে তাহা হইলে কি ভৌতিক-ব্যাপারের কোনও সার্থকতা নাই? শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানের কি কোনও প্রয়োজনই নাই? আমরা তাহা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ভৌতিকব্যাপারকেও চৈত্তিকব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে, নতুবা শুদ্ধ ভৌতিক অনুষ্ঠান কতদূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা আমাদের কাছে রহস্যই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এই ভূতশক্তির সহিত চিত্তশক্তির যোগ ঘটাইবে কে?—আমাদের ইচ্ছাশক্তি। ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই ভূতের শক্তি চিত্তব্যাপারের পরিণাম ঘটাইতে সমর্থ হয়। সত্ত্ব এবং ভূত হইল নিমিত্ত—চিত্তের ক্রিয়া তাহার আধারে উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। কিন্তু চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবে স্বয়ং ইচ্ছা। ইচ্ছার কর্ত্তৃত্বই প্রধান, ভূত কেবল অবলম্বন। প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মে যে পাপক্ষয় হয়—সে কথার সঙ্গে এই তাৎপর্য্যটুকু যোগ করিয়া দিতে হইবে।

নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার ক্ষালনের জন্য স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রবিহিত দণ্ড স্বীকার না করিলে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় না। একমাত্র জ্ঞানেই কর্ম্মের ফল বন্ধ্যা হইয়া থাকে; সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে, অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মের ফলাফল ও তাহার সহিত নিজের প্রবৃত্তির সম্পর্ক বিচার করিয়া সম্পূর্ণ সহজ বুদ্ধিতে নিজকে নিবৃত্তিমুখী করিতে হইবে। এই নিবৃত্তিমুখীনতাই প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী মানস ব্যাপার। ভৌতিকব্যাপার ইহা ভিন্ন নিষ্ফল। (৮)

শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য

—*—

স্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতার যে চরম দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছিল, সে হচ্ছে একটা রোগের সামিল। সুতরাং রোগীর মতই তাকে সকলের নিকট হতে পৃথক করে চিকিৎসার দরকার। শিক্ষায়তন যে ঠিক চিকিৎসালয় নয়, আর সকল মানুষই যে রোগী নয়, এমন আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়েছি। সুতরাং আমাদের আলোচনা হতে চরম দৃষ্টান্তগুলো বাদ দিলেও ক্ষতি নাই। তবে বংশানুক্রমের কথা ছাড়লে চলবে না। তা ছাড়া আরও এক কথা আছে। সমাজ মানুষের যুগব্যাপী সাধনার ফল। সেই সমাজধর্ম্মের অন্তরের প্রভাব মানবসন্তানের উপর ক্রিয়া করলেও, সে যে জন্মের সঙ্গেই সমস্ত আদিম প্রাকৃত সংস্কার বর্জ্জন করে পুরোমাত্রায় সামাজিক হয়ে জন্মায়, এ কথাটা সব জায়গায় খাটে না। তাই এই আদিম সংস্কারগুলির সঙ্গে বোঝা-পড়া করাও শিক্ষার একটা অঙ্গ। সাধারণ ছেলের যে অপরাধের প্রতি প্রবণতা দেখা যায়, তা প্রায়শঃই এই আদিম প্রাকৃত সংস্কার। যেমন ধরা যাক্, দেহের সঙ্গে নিজকে জড়িয়ে নিয়ে তার প্রতি মমতাসম্পন্ন হওয়া ;—এটা আদিম সংস্কার। সামাজিক পরিণত মানুষ দেহের দুঃখ কষ্টকে একটা কোনও বিশিষ্ট ভাবগত আদর্শের কাছে হয়ত সহজেই বলি দিবে, কিন্তু শিশু তা পারবে না। অত দোষ, দেহের উপর কোনও পীড়নের ভয়ে সে যেমন অন্যায় থেকে নিবৃত্ত থাকে, তেমনি আবার সেই পীড়নকে এড়াবার জন্য অন্যায় গোপন করে মিথ্যাচরণ করতেও শিখে। এখানে কাপুরুষতা বা মিথ্যাচরণ দোষ-মূল এই দেহের প্রতি মমতা। ক্ষমার মাহাত্ম্য শিশুকে বোঝান দায়—সে জানে আঘাতের বদলে আঘাত করতেই হয়। বিরক্তির কারণ ঘটলে তখন সেটাকে প্রকাশ করে ফেলা—কোনও রকম সৌজন্যের আবরু না রেখে—এ ও তার পক্ষে স্বাভাবিক। এগুলিই হচ্ছে, আদিম জৈবধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তি। প্রায় সবখানেই এগুলি অল্প-বিস্তর দেখা দিবে। শিক্ষার বেলায় এগুলির সঙ্গেও বোঝা পড়া করতে হবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই সমস্ত ত্রুটির সঙ্গে আমরা কি রকম বোঝা পড়া করব। সাধারণতঃ দেখতে পাই, "মুষ্টিযোগ লাঠৌষধি"র উপরই আমাদের আস্থা বেশী। প্রথমতঃ এইটা ছাড়তে হবে। হুঁসিয়ার হয়ে দণ্ড দিবার প্রয়োজন যদি কখনও হয়, তা হলে এই ছেলে-বেলাটাই হচ্ছে তার জোর ভাগের সব চেয়ে সেরা সময়। কোথায় থেকে কোন প্রবৃত্তি কি করে জাগছে, কি করে তাকে বাধা দিলে সে বাধা ঠিক খাতে গিয়ে কাজ করবে—এ সব খুব ভাল করে দেখার প্রয়োজন। এই সমস্তটার অবিচারের দরুণ কত রকম মনোবৃত্তি যে আমরা দুমড়ে মুচড়ে একেবারে অস্বাভাবিক করে তুলি, বদখেয়ালে একটা অপরাধের বিচার করে আর কতগুলো অপরাধের সম্ভাবনা যে জুটিয়ে আনি—তা ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। শিশুর মনোযন্ত্রের কাছে আচার্য্য বসুর সূক্ষ্ম-

তম যন্ত্রের সৌকুমার্য্যও হার মানে। ঠিক তার উপযুক্ত পরিচালনা আমরা কখনও কর্‌তে পারব কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও, শিক্ষাটা যে কত গুরুতর আর কত সূক্ষ্মদৃষ্টি-সাপেক্ষ, তা স্মরণ করে আমাদের বিচারবুদ্ধি ও সতর্কতাকে অতিমাত্রায় সচেতন করে তোলা উচিত। কিন্তু আমরা হয়ত মনে করি, একটা রাজ্য পালন করা কত কঠিন আর একটা ছেলে পালন তার তুলনায় কত সহজ।

আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, পারিপার্শ্বিকের প্রতি। প্রকৃতির একটা আইন আছে, সে আইনকে অব্যাহতভাবে ক্রিয়া করতে দিতে হবে। নিজেরা কেবল গাধা পিটে ঘোড়া করবার জন্য তাড়াহুড়া করলে চলবে না। প্রাকৃতিক বিধানের যে কল্যাণময় ও সামঞ্জস্য-সম্পন্ন একটা সার্থকতা আছে, এইটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। কল চালাবার কলা-বিৎ যিনি, তিনিই কল চালিয়ে দিয়েছেন—জীবনের শিল্পী তিনিই, আমরা শুধু মুটে-মজুর মাত্র। আবর্জ্জনা দূর করা আর সময়-মত কারিগরের হাতে মাল-মসলা জুটিয়ে দেওয়া, এই হল আমাদের কাজ। শিক্ষার বেলায় খোদার ওপর খোদকারীর দেমাক্‌টা যদি আমরা ছাড়তে পারতাম, তাহলে কাজ যে কত সহজ ও সুন্দর হত, তা বলা যায় না। ফুলটা ফুটিয়ে তোলবার মাঝে আমাদের যেমন কোন কারিগরি নাই, তেমনি ফুলের মত কচি কচি জীবনগুলি ফুটিয়ে তুল-তেও আমাদের নিজস্ব কোনও বাহাদুরী নাই। আমরা শুধু সন্তর্পণ শ্রদ্ধায় চারদিক থেকে আলোহাওয়ার বাধাগুলি সরিয়ে দিতে পারি মাত্র। ঐখানেই আমাদের প্রকৃত কাজ। শিক্ষার ধারাটাই আমাদের উল্টা দিক হতে দেখতে হবে। ছেলে গড়বার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই—আমরা শুধু গড়তে পারি পারিপার্শ্বিকটা—বিকাশের পরিপন্থী সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করে। আমাদের কৃত্রিম জীবনের সৃষ্ট যে সমস্ত বাধা, সেগুলিকে দূর করে দিয়ে, তরুণ জীবনের অন্তরালে যে প্রাকৃতিক শিল্পশক্তি ক্রিয়া করছে, তাকে নিরাপদভাবে প্রকাশিত হবার জন্য পূর্ণমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে। এই হল শিক্ষার বনিয়াদ।

এতে কেউ মনে করবেন না যে জীবনে ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বটা আমরা অস্বীকার করছি। প্রকৃতির আইনে দ্বন্দ্ব আসবেই—আর আলোক ও আঁধারের দ্বন্দ্বে আলোকই জয় লাভ করবে—এই হচ্ছে শাশ্বত সত্য বিধান। কিন্তু আমাদের নাকি এইটা তর সয় না, তাই তাড়াতাড়িতে সবটাই আমরা নষ্ট করে ফেলি। যা অসুন্দর, যা অশিব, যা অসত্য —তা হতে যদি পারিপার্শ্বিককে মুক্ত রাখতে পারি, তাহলে যে মন্দের বীজ সন্তানের মাঝে আছে—হোক তা আদিম প্রাকৃত সংস্কার বা বংশগত সংস্কার—একদিন তার অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি নষ্ট হবেই; আর সে নষ্ট একেবারে চরম নষ্ট। তার জন্য যতটা দেরী হবে বলে আমরা ভয় করি, ধৈর্য্য ধরে আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করে গেলে দেখব, অসত্যের পরাজয় ততটা দেরীও হয়নি। এ সত্য এত সহজ যে, আমাদের বাঁকা দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়বার নয়।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বৃত্তিরই পরিপুষ্টি ঘটে থাকে। যদি সন্তানের মাঝে এমন কোন মন্দের বীজ থাকে, আদিম সুসংযত আকারেও শিক্ষাব্যবস্থার গুণে যাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি, তবে বয়োবৃদ্ধি

সময় বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মন্দটাও ঘোরালো হয়ে দেখা দিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার গুণও তার উপর ক্রিয়া করবে এবং তার ফলে ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্বটা আরো তীব্র হয়ে উঠ্‌বে। যদি অন্তরমুখী শিক্ষায় ছেলে মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে এই দ্বন্দ্বও অন্তরের মাঝেই জেগে উঠ্‌বে—বা র থেকে কেউ বুঝতে পারবে না, ভিতরে ভিতরে কি প্রচণ্ড অগ্নিক্রীড়াই চলছে। এই অন্তর-দহনেই মানুষকে পুড়িয়ে খাঁটী সোণা করে দেয়। অন্তরের এই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্তির সঙ্গে বিবেকের যে লড়াই চলতে থাকে, তাতে প্রবৃত্তির দংশনজ্বালা তীব্র হলেও, মানুষ বুঝ্‌তে পারে, একটু একটু করে সে সত্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, আর তাই ভেবে সহস্র গ্লানির মাঝেও সে প্রচুর স্বস্তি ও আনন্দ পায়।

সুযোগ পেলেই যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাইরে আত্মপ্রকাশ করত, তাকে এমনি অন্তরের সীমার মাঝে আটকে রাখা যায় কেবলি বিচারবুদ্ধি-পরিচালিত সুশিক্ষার গুণে। প্রত্যেকের জীবনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা তার নিজেকেই করতে দিতে হবে, মহৎ ভাব আর মহৎ আকাঙ্ক্ষা অলক্ষ্যে তার মাঝে সঞ্চারিত করে দিয়ে—এইখানেই হল শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য। যার ভিতরে গলদ, সে যদি নিজে তার শোধ্‌রনের ভার না নেয়, তাহলে বাইরে থেকে আমরা যতই চেঁচামিচি করি না কেন, বিশেষ কিছু ফল তাতে হবে না; ছেলে যদি ছোট হয়, তাহলে আমাদের চেঁচামিচিতে সে কেবল থমকে যাবে; এবং যথারীতি শাসনের পর আমরা যে মুহূর্ত্তে থামব, তার পরের মুহূর্ত্তেই ভিতরের প্রবৃত্তিতে সে আবার যন্ত্রবৎ সেই গলদের কাজটাই করে ফেলবে। আর ছেলে যদি বড় হয়, তবে তর্জ্জন আর গর্জ্জনে তার মাঝে জাগবে শুধু ক্ষুব্ধ আত্মাভিমান—নিজকে হেঁট করতে হবে ভেবেই সে আরো কোমর বেঁধে অন্ততঃ নিজের কাছেই নিজের পক্ষে ওকালতী জুড়ে দিবে। শাসনে যে ছেলে অনেক সময় বাগ মানে না তার কারণ হচ্ছে, কোন দিক যে আমরা ছেলের অন্তর স্পর্শ করতে পারব, তা না ভেবে কেবলি আন্দাজের উপর ঢেলা মেরে থাকি।

মানুষ তো আর জড়পিণ্ড নয়; কাজেই শিক্ষার একটা কল বানিয়ে নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মাঝে একই প্যাটার্ণের কতকগুলি মাল বের করে দেওয়া কোথাও সম্ভবপর নয়। তাই শিক্ষা প্রণালী যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, সব দিক দিয়ে একটা আদর্শ মানুষ তা থেকে গড়ে তোলার ভরসা বৃথা। জগতে যত কাজ চলছে, সমস্তই একটা রফার উপর নির্ভর করে। বাইরে তুমিও সুজন, আমিও সুজন, তাই দুজনে বেশ বনিবনাও হয়ে গেল, আর যে কাজটায় আমরা হাত দিলাম, সুন্দর করে তা হয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে যে কার কি আছে, তা কে বলতে পারে? আমার ভিতরও তুমি জান না, তোমার ভিতরও আমি জানি না—পরস্পর পরস্পরের কাছে আমরা সামলে রয়েছি, তাই আমাদের সমাজ চলছে। এই সামলে থাকাটুকুই শিক্ষার একটা মস্ত ফল। প্রবৃত্তির ধর্ম্মে যেটা বাইরে প্রকাশ পেত, দশের ধর্ম্মে দেশের ধর্ম্মে সেটাকে ভিতরে আটকে রাখ্‌তে জানলেই মানুষ সামাজিক হয়। যার যার অন্তরের বিষে সে নিজেই জ্বলুক, অপরের প্রাণে সে জ্বালা সে ছড়িয়ে দিবে কেন—এই হল মানুষের সামাজিক বুদ্ধির নিদান।

শিক্ষায় যদি মানুষের বাইরে এমনি একটা সামঞ্জস্য আনতে পারে, তার মাঝে যথার্থ সামাজিকতা জাগিয়ে তুলতে পারে, তবেই শিক্ষার বহিরঙ্গ সার্থক হয়েছে বলা চলে। শিক্ষায় সাম্য ঘটাতে পারে এইখানেই—এইখানেই তার কাজের একটা হিসাব পাওয়া যায়। নইলে অন্তরের হিসাব কেবল অন্তর্যামীই জানেন।

কিন্তু অন্তরঙ্গ শিক্ষাকে তো আমরা ছোট বলে মনে করতে পারি না। বরং শিক্ষার বীজ অন্তরে উপ্ত হলেই বাইরে তার ফুল পাতা ছড়িয়ে পড়বে—এইটাই আমরা বিশ্বাস করি। এই জন্যই যতটুকু শাসন, সংরক্ষণ ও সংস্কার করতে হবে, সে ভিতরের দিক থেকেই করতে হবে—বাইরের আয়োজন উপকরণগুলি এমন করে গুছিয়ে নিতে হবে যে অন্তরের সঙ্গে তার কোথাও বিরোধ জমে স্বভাবের বিকৃতি না ঘটায়। যদি ভিতরের দিক থেকে কাজ করতে পারি, তবেই দেখব, বাইরে ক্রমে সাম্য দেখা দিচ্ছে। নইলে টেনে-বুনে বাইরটাকে যেমন-তেমন করে দাঁড় করালেই তো সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হবে না।

ধর আমরা চাই সৌজন্য ও সামাজিকতা। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজ যে কতখানি কড়াক্কড় করে থাকে, তা দেখে আমাদের তাক লেগে যায় এবং আমরাও যথাসাধ্য সাহেবী এটিকেট্ বজায় রাখবার জন্য উঠে পড়ে লাগি। কিন্তু এই এটিকেটের খোসার মাঝে কতটুকু যে আন্তরিকতার শাঁস আছে, সে বিষয়ে সেখানকার সমাজ-ধুরন্ধরেরাই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। অন্তরে ফাঁকি আছে বলেই সমাজ কিছুতেই এ প্রবঞ্চনা বরদাস্ত করতে পারছে না। আমরাই কি তা পারব—না কোন মানুষেই পারবে?

তাই আমরা বলি, কাজ আগে সুরু করতে হবে ভিতর দিক হতেই—ভিতরের ভাবটাই বাইরে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু বাইরের কাজ চালাতে ভিতরের সবটুকুর দরকার কোনও কালেই হয় না। ভিতরে যদি সত্য থাকে, তবে তার এক কণাতেই বাইরের সমস্ত অভাব মিটে যায়। ভগবানের এমনি দয়া যে আমাদের মাঝে তিনি এমন শক্তি দিয়েছেন, যাতে আমাদের ব্যক্তিগত জ্বালা-যন্ত্রণা অতৃপ্তি আমাদের মাঝে রেখেও, বাইরের সঙ্গে আন্তরিক সৌজন্য করতেও আমাদের কোথাও বাধে না অর্থাৎ আমরা দুঃখী হয়েও পরের সেবা করতে পারি। কিন্তু তাহলেই বুঝতে হবে, আমাদের সে দুঃখ বাইরের কামনার জন্য নয়—সে দুঃখ বহির্নিরপেক্ষ যে অন্তরবাঞ্ছা, তারই অতৃপ্তির দরুণ। ঠিক এই অবস্থাটী লক্ষ্য করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাতে জাগাবে আন্তরিকতা—সে আন্তরিকতা নিজের দুঃখ সইতে শিখাবে, নিজের প্রবৃত্তির তাৎপর্য্য বুঝে তাকে সংযত করতে শিখাবে—অথচ পরের দুঃখ দূর করবার জন্য আগ্রহও জাগিয়ে দিবে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষার দুটা দিক—একটা অন্তরঙ্গ আর একটা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ শিক্ষায় আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব জাগবে আর তারই বহিরঙ্গ অভিব্যক্তিতে সামাজিক সাম্য ও সৌজন্য আসবে। এই দুটা দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে; কিন্তু শক্তিপ্রয়োগ করছি, এই অভিমানে প্রকৃতির উপর কারসাজি করলে চলবে না। প্রকৃতির মাঝেও কোথায় দ্বন্দ্ব আর

কোথায় সীমা, সেটুকু বুঝে নিয়ে, সেই প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গেই আমাদের চেষ্টার যোগ ঘটাতে হবে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে ঠিক এই যোগটা ফুটে উঠে না, তাই তার মাঝে নানা অসামঞ্জস্য, নানা বিকৃতি। হাজার হাজার মানুষ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে সব দিক দিয়ে যে কি করে সামঞ্জস্য হবে, সেটা প্রাণে খুব জোর না পেলে কেউ ঠাউরে উঠতে পারে না। কাজেই সংসারে অল্পবিস্তর গলদ থেকেই যাবে। তাই বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, আগাগোড়া দ্বন্দ্বটাই বুঝি সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু আসলে তো তা নয়। একটা ছোট জীবনের মাঝে যে চেষ্টা, যে লক্ষ্য —একটা বৃহৎ সমাজের মাঝেও ঠিক সেই চেষ্টা, সেই লক্ষ্য—সে হচ্ছে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসানে কোনও একটা Utopiaতে পৌঁছান - এখন সে Utopia ব্যবহারিকই হোক্ আর আধ্যাত্মিকই হোক্।

বুঝতে হবে প্রকৃতিও এই Utopiaকে লক্ষ্য করে চলেছে। একে পায় না বলেই তার ব্যথা ও দ্বন্দ্ব, নইলে দ্বন্দ্ব তো ঠিক আত্মার বিশ্রামভূমি নয়। সমগ্র শিক্ষাবিজ্ঞানে আমাদের এই সত্যটাই বিশেষ করে আঁকড়ে ধরতে হবে। যাই করি না কেন, দ্বন্দ্বটা যেন কোথাও আমরা উগ্র করে না তুলি। শিক্ষয়িতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর কোনও দ্বন্দ্ব নাই—আবার শিক্ষার্থীর সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের কোনও দ্বন্দ্ব নাই—সমস্তটা প্রতিষ্ঠান যেন একটা বিক্ষোভহীন, অনুগ্র অথচ অমিতবীর্য্যশালী অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণায় চলছে—এই ভাবটাই শিক্ষাক্ষেত্রে জাগ্রৎ করে তুলতে হবে। এই প্রাণময় অন্তর্গূঢ় শক্তি নিয়েই সন্তানের অন্তরে প্রবেশ করে ভাবের বিদ্যুৎ-স্পর্শে তার প্রাণপুরুষকে জাগিয়ে দিতে হবে। ঠিক স্পষ্ট করে সে বুঝবে না, কোন শক্তি তার ভিতর জেগে উঠছে, অথচ অলক্ষ্যে একটা তীব্র দাহে তার সমস্ত কলুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—তার হৃদয়ের বিপুল দ্বন্দ্ব শুধু তার মাঝেই অবরুদ্ধ থাকবে, বাইরে কেউ তা জানবে না। সে অন্তরের দ্বন্দ্বও তাকে সাম্যের পথেই শুধু এগিয়ে দিবে।

এতো শুধু শিক্ষার সাধনা নয়—এ যে তপস্যা। তাই তপস্যার মতই বাইরটাকে সমস্ত দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ হতে নির্মুক্ত করে প্রশান্ত বীর্য্যে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। মনের সঙ্গে মনের সংঘর্ষে যে আগুন জ্বলে উঠে, সে আগুনে শিক্ষাভূমির আবহাওয়া তপ্ত করে তুললে তো হবে না। কাজেই মানসিক বিক্ষোভ জন্ম হতে দেহ-মনে কোথাও বেসুর বাজিয়ে না তোলে, সেই জন্যই পারিপার্শ্বিকের দিকে আমাদের কঠোর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বাইরের কোনও বিচারশূন্য অতর্কিত আঘাত এসে যদি তরুণ তপস্বীর মনকে তার ঊর্দ্ধমুখী লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট করে, তবে সমস্ত প্রকৃতিই তার প্রতিকূল হয়ে উঠবে—তখন তার নিষ্ঠুর প্রতিঘাত সামলানো বড় সহজ হবে না।

কেউ হয়ত বলবেন—অমন মোলায়েম করে চারিদিক গড়ে তুললে সন্তান কি সৌখীন হয়ে উঠবে না?—সংসারের আঘাত না পেলে সে শক্ত হবে কিসে? আমরা বলি, ভালবাসা যদি একটা সত্যিকার শক্তি হয়, তাহলে এই কোমলতা হতেই তাঁরা এমন একটা শান্ত কঠিন বীর্য্য লাভ করবে, যা নাকি ভবিষ্যতে সমস্ত বিপদের বিরুদ্ধে এদের জয়ী করে তুলবে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগে সন্তান

যদি মানুষ হয়ে ওঠে, তবে তারা কি শুধু কাব্যে গড়া রঙীন স্বপ্ন দেখেই মুগ্ধ হয়ে রইবে? মহৎ হৃদয়ের একটু উত্তাপও কি তাদের মাঝে সঞ্চারিত হবে না?

তা ছাড়া, সঞ্চয়ের একটা সময় আছে—সেটাই হচ্ছে Reynolds-র Age of Innocence; এই সরলতা আর শুচিতা কেবল সৌন্দর্য্যের বীর্য্যেই অব্যাহত থাকতে পারে। সুন্দর এই শৈশব—আনন্দ আর সৌন্দর্য্যের অমৃতধারা পান করেই এর পুষ্টি হবে। পর পর যখন যৌবনের ডাক পড়বে, তখন আপনিই তার ভাববিভোর ঢলঢল চক্ষু হতে জ্বালাময় অগ্নিবীর্য্য সন্দীপিত হয়ে উঠবে। যে যত শান্ত, যত সুন্দর, যত মধুর—তারই শাসন তত অলঙ্ঘ্য;—এ প্রকৃতির আইন।

যদি সকল আঘাত হতে বাঁচিয়ে সন্তানের হৃদয়কে আমরা শিরীষ ফুলের মত সুকুমার রাখতে পারি, অথচ সত্য বীর্য্যে, ত্যাগের দীপ্তিতে তাকে উজ্জ্বল করতে পারি, তা হলে শিক্ষার শেষে সংসার-কর্ত্তব্য পালন করবার সময় যখন আসবে, তখন সংসারের অন্যায় আর অধর্ম্ম কি তাদের শুভ্র সুকুমার প্রেমময় চিত্ত আরো বেশী করে বাজবে না—তাকে প্রত্যাহত করবার জন্য প্রাণ দেওয়াও কি তাদের কমনীয় চিত্তের পক্ষে সহজ হবে না?



ভক্ত মাধবদাস

—*—

[শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ—ঊনবিংশ মালা, দ্বিতীয় চরিত্র]

শ্রীজগন্নাথ মাধবদাস কৃষ্ণ অনুরাগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সিন্ধুতীরে আসিয়া নীলাচলবাসী হইয়াছেন। মনে বিন্দুমাত্র সুখের লালসা নাই—সর্ব্বদাই নিষ্কিঞ্চন ভাব—তাই কাহারও কাছে কিছু না চাহিয়া তিন দিন তিনি অনাহারে পড়িয়া রহিলেন।

ভক্তাধীন ভগবান্—ভক্ত না খাইয়া আছেন, ভগবানের তাহা সহিবে কেন? শ্রীশ্রীজগন্নাথ তাড়াতাড়ি ভোগের সোণার থালায় করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে দিয়া মাধবদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। মাধব রাত্রে এক অন্ধকার কুঠরীতে পড়িয়া আছেন, আভরণের শব্দে সহসা চমকিয়া দেখেন, ঘর আলো করিয়া এক অপূর্ব্ব কন্যা—প্রসাদের স্বর্ণথালী সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। মাধব বুঝিলেন, প্রভুর বড় কৃপা। আনন্দ গদগদ চিত্তে, রোমাঞ্চিত শরীরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থালাখানি ধুইয়া তিনি বাহিরে রাখিয়া দিলেন।

পরদিন শ্রীমন্দিরে মহা হট্টগোল—জগন্নাথের ভোগের সোণার থালাখানা পাওয়া যায় না। পাণ্ডাদের মাঝে এ বলে ও চোর—ও বলে এ চোর। অবশেষে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে মাধবদাসের কুটীরের সামনে থালা পাওয়া গেল। পাণ্ডারা তো

রাগিয়া আগুন—ভণ্ড বেটার এতদূর আস্পর্দ্ধা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর ভোগের থালা চুরী! সকলে মাধবকে কুটীয়া হইতে বাহির করিয়া নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

মাধব নির্ব্বিকার; এত যে নির্য্যাতন, তবুও মুখে হাঁ-না একটা কথা নাই। জগন্নাথের প্রাণে কি ভক্তের অপমান সয়? ভক্তের যত ব্যথা, জগন্নাথ নিজে পিঠ পাতিয়া লইলেন। পাণ্ডাদের উপর আদেশ হইল, "আমার ভক্তকে তোরা এমন করিয়া নিগ্রহ করিলি! দেখ্, ভক্তের ব্যথা আমাকেই বাজিয়াছে—বেত্রাঘাতে আমার পিঠ ফুলিয়া রহিয়াছে!"

পাণ্ডাদের তো চক্ষু স্থির। কি সর্ব্বনাশ—না জানিয়া তাহারা প্রভুরই শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছে! দৌড়িয়া গিয়া সকলে মাধবের পায়ে পড়িল—কত কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিল। কিন্তু ভক্তের কাছে নিন্দাস্তুতি দুই-ই সমান। তাহাদের আর্ত্তি দেখিয়া মাধব একটু মুচকিয়া হাসিলেন মাত্র—তাঁহার কোমল আঁখির করুণ দৃষ্টিতে পাণ্ডারা বুঝিল, তাহারা মার্জ্জনা পাইয়াছে। এইরূপে মাধবদাসের মহিমা লোকের কাছে প্রকট হইল।

একবার মাধবের আমাশয় হইল। সাধু অযাচক, কাহারও সেবা নেন না, তাই কুটীয়া ছাড়িয়া বালির উপর গিয়া পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে রোগ এমন বাড়িল যে উঠিয়া শৌচ করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত রহিল না। দেখিয়া জগন্নাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—প্রভু নিজে আসিয়া ছদ্মবেশে মাধবের জলপাত্রে জল বহিয়া শৌচ করাইয়া দিতে লাগিলেন।

মাধব চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "কে গো তুমি, কাঙ্গালের সেবা করিতে আসিয়াছ? কেন সেবা করিয়া আমার ঋণ বাড়াইবে?" প্রভু বলিলেন, "মাধব, আমি জগন্নাথ—বালির চড়ায় পড়িয়া তুই ছট্‌ফট্ করিতেছিস্, আমি কি করিয়া চুপ করিয়া থাকি ভাই?" মাধব শিহরিয়া উঠিলেন। "সর্ব্বনাশ—তুমি! তুমি আসিয়াছ আমার সেবা করিতে? তোমার কি একটু মানাপমান জ্ঞানও নাই? রত্নসিংহাসনে বসিয়া কত রাজা-রাজড়ার সেবা লও, আর আজ সকল ঠাকুরালী খোয়াইয়া আসিয়াছ এই অভাগার কাছে? লোকে শুনিলে যে টিটকারী দিবে। এখনও কেহ খোঁজ পায় নাই—এই বেলা চলিয়া যাও—নহিলে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কাছে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?"

জগন্নাথ বলিলেন, "ওঃ, ভারি তো। যার যা খুসী বলুক্, তোকে আমি এমন করিয়া ফেলিয়া যাইতে পারব না। তোর দুঃখ দেখিয়া বুঝি আমার আর দুঃখ হয় না?"

"যদি এতই দুঃখ হয়, তবে আমার ব্যারাম ভাল করিয়া দিলেই তো পার।—কেন মিছামিছি লোকের নিন্দা গায় পড়িয়া লইতেছ?" মাধব নিজের ইচ্ছায় রোগশান্তি চাহিতেছেন না—পাছে জগন্নাথকে কেহ নিন্দা করে, এই ভয়ে তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন। শুদ্ধমাধুর্য্য সমুজ্জ্বল প্রেমের রীতিই এই।

মাঘমাসের রাত্রিতে মাধবের গায়ে একখানাও কাপড় নাই—কিন্তু মাধবের তাহাতে কিছু আসে যায় না। জগন্নাথের স্নেহাতুর মন তাহা বুঝিল না। রাত্রে গায়ের সমস্ত কাপড় তুলিয়া নিয়া প্রভু মাধবকে জড়াইয়া দিয়া আসিলেন। মাধব ঘুমে ছিলেন, কিছু জানেন

না—প্রাতঃকালে পাণ্ডারা কাপড়ের খোঁজে আসিয়া দেখে, মাধবের গায় সকল কাপড় জড়ানো।

সকলেই বুঝিল, এ জগন্নাথেরই কীর্ত্তি, তাই ভয়ে কেহ কিছু বলিল না। এদিকে মাধব জাগিয়া দেখেন, গায়ে কাপড়। অমনি রাগ করিয়া সমস্ত টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিলেন—প্রভুর শ্রীঅঙ্গের প্রসাদ বলিয়া একটু সমীহও করিলেন না। মাধুর্য্যে যাহাদের অন্তর ভরা, প্রেমাস্পদের সঙ্গে যাঁহারা একাকার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি কোথায়?

মাধব জগন্নাথের সখা, তাই দুইজনে মিলিয়া নানা কৌতুক-পরিহাস চলে। একদিন এক কাণ্ড হইল। সত্যবাদীর গোপালের বাগানে বড় বড় কাঁটাল [illegible] — জগন্নাথের বড় সাধ, সেই কাঁটাল চুরি করিয়া আনেন। কিন্তু এত বড় [illegible] একজনের [illegible] হইবে না; তাই প্রভু আসিয়া মাধবকে [illegible] গোপালের বাগানে [illegible] — আয় না [illegible] আন — তুইও খাবি, আমিও খাব।'

ননীচোরার সঙ্গে [illegible] প্রভুও বটে, কিন্তু মাধব [illegible] এতটা বাড়াবাড়ি তাঁহার পছন্দ হইল না; তাই সান্ত্বনার ছলে কহিলেন, "না ভাই, আমি কি করিয়া যাই? খাইতে যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তুমি যাও—মানা করিব না; কিন্তু আমার যাইতে মন সরিতেছে না।"

কিন্তু চোরার সঙ্গে কথায় আঁটিবে কে? সে যখন বায়না ধরিয়াছে, তখন তাহার জিদ বজায় থাকিবেই—এ তো জানা কথা। অবশেষে সাধু মাধব সঙ্গগুণে চোরের সঙ্গে চোর সাজিয়া গোপালের বাগানে গেলেন কাঁটাল চুরী করিতে।

পাঁচীল ডিঙ্গাইয়া দুইজনে বাগানে পড়িয়াছেন। জগন্নাথ গাছ হইতে বড় দেখিয়া একটা কাঁঠাল নামাইলেন। দুইজনে নিরিবিলি বসিয়া সেটা ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মালীরা যেন কি করিয়া সাড়া পাইয়া "ধর্ ধর্" করিয়া ছুটিয়া আসিল।

আর কোথা যায়!—পলায়নে মাখন-চোরা চিরদিনই পটু;—ধরিতে আসিতেছে শুনিয়া বেচারা মাধবদাসকে ফেলিয়া পাঁচীল টপকাইয়া উনি তো চম্পট দিলেন। মাধব সোজা সরল মানুষ—অত-শত ছলা-কলা তাঁর জানা নাই—কাঁটাল সামনে লইয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া আছেন। পলাইবার সময় জগন্নাথের উড়নাখানা যে কাঁটা-ঝোড়ে জড়াইয়া রহিল, মাধব তাহা দেখিলেন।

মালীরা আসিয়া মাধবকে ধরিল। তারা তো আর তাঁর মহিমা জানে না—তাই কাঁটাল সহিত তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিল। মাধব নিরুপায়; মালীদের বলিলেন, "ভাই, আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছ কেন? কাঁটাল তো আমি চুরী করি নাই—যে চুরী করিয়াছে, চল তাহাকে দেখাইয়া দিই। আমি কি আসিতে চাহিয়াছিলাম, জগন্নাথই না আমায় জোর করিয়া টানিয়া আনিল। চল, তাহাকে দেখাইয়া দিতেছি—বাঁধিতে হয় তাহাকেই বাঁধ। ও যে এমন কর্ম্ম করিবে, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম! আচ্ছা দুষ্টু, যা হোক্! নিজেই চুরী করিতে আসিল—এখন নিজে পলাইয়া

সাধু বলিয়া আমাকে বাঁধাইয়া দিয়া গেল। ভাই, কাঁটালের দাম নিতে হয়, তোমরা জগন্নাথের কাছে যাও—চোর তো সে-ই। বিশ্বাস না হয়, চল কাঁটা-ঝোড়ে এখনও তাহার ওড়্নাখানা আটকা রহিয়াছে—দেখিবে।"

মালীরা ভাবিল—"লোকটা পাগল নাকি—চুরী করিয়া আবার জগন্নাথকে চোর ধরাইয়া দেয়!"—আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া মাধবকে তাহারা বাঁধিয়া রাখিল।

পরদিন প্রাতে পাণ্ডারা খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া দেখে, মাধব গোপালের বাগানে বাঁধা। তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহারা বাঁধন খুলিয়া দিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। মাধব জগন্নাথের কীর্ত্তি সকলই বলিয়া অবশেষে বলিলেন, "পলাইবার বেলা উত্তরীয়খানা কাঁটাগাছে বাধিয়া গিয়াছিল—এখনও সেখানা সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছে!" সকলে গিয়া দেখে, তাই তো—কাটাঝোড়ে এ যে জগন্নাথেরই ওড়্না।

গ্রামে গ্রামে জগন্নাথের কীর্ত্তির কথা ছড়াইয়া পড়িল। ঠাকুরের ঠাকুরালী দেখিয়া ভক্তসমাজে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। তখনই গোপালের বাড়ী হইতে ভারে ভারে কাঁটাল আর নারিকেল জগন্নাথের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু জগন্নাথের চাতুরালীতে মাধব বড় চটিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই তো!—উনি এখন ভারে ভারে কাঁটাল আর নারিকেল ভেট আদায় করিলেন আর চোরের সঙ্গে আসিয়া সাধু মাধবের কিনা মালীর ঘরে একটা রাত বন্ধনদশায় কাটিল! মাধব আসিয়া জগন্নাথকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—

"হাঁরে চোরা ধৃষ্ট দুষ্ট, শঠ লম্পটিয়া—
তুই চুরি করি আইলি মোরে বান্ধাইয়া?—
হাঁরে, তুই যে চিরদিনকার চোর—তাতো জানিই। ননী-চোরা, নারী-চোরা, মনো-চোরা—এ খ্যাতি তো তোর বরাবরই আছে। এবার কাঁটাল-চোরা বলিয়া বুঝি নাম রটাইলি। বল্ দেখি—তোকে লইয়া আমি যাই কোথায়!"

হায় হায়, কি সহজ সুমধুর ভাব! এ তো গালি নয়—এ যে বেদস্তুতিরও বাড়া! প্রভু নিজেই বলিয়াছেন—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন,
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।"

মাধবের গালাগালি শুনিয়া জগন্নাথ শুধু মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে মাধবের মনে জানি কি হইল—বৃন্দাবনধাম দর্শন করিবার জন্য প্রাণ উচাটন হইয়া উঠিল। জগন্নাথের কাছে বলিয়া-কহিয়া সাধু বৃন্দাবনে চলিলেন।

পথে এক শিষ্যার বাড়ীতে একদিন ছিলেন। মেয়েটী বড় ভক্তিমতী—বহু যত্নে গুরুর সেবা-শুশ্রূষা করিল। বিদায়ের কালে মেয়েটী দেখে—গুরুর পিছনে পিছনে অতি সুকুমার একটী ছেলে হাঁটিয়া চলিয়াছে, পথের পরিশ্রমে মুখখানা যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া মেয়েটীর বড় মায়া হইল—গুরুকে একটু অনুযোগ করিয়া বলিল, "আহা অমন ননীর মত ছাওয়ালটী কোথা হইতে আনিয়াছ ঠাকুর? কই, কাল তো তোমার সঙ্গে দেখি নাই!—আহা, অমন কচি ছেলেটীকে এতটা পথ হাঁটাইয়া আনিলে কোন প্রাণে?"

শিষ্যার কথা শুনিয়া মাধব একটু চমকিয়া উঠিলেন ; কে যে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তখন কিছুই বলিলেন না। ক্রমে সারাপথে কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে মাধব, বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া মাধবের প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল। ভাবের আতিশয্যে সাধু আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া গেলেন—অসহ্য পুলকে কখনও হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গড়াগড়ি যান। নিধুবনে গিয়া শ্রীবঙ্কবিহারীর মূর্ত্তি দেখিয়া মাধব ভাবে গদ্গদ পড়িলেন। দেখিলেন, বৈরাগী শ্রীহরিদাস স্বামী, "কত না প্রণয়ে আর কত না আদরে" বঙ্কবিহারীর সেবা করেন—দেখিয়া মাধব চমকিত হইলেন। হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র উথলিয়া উঠিল—আনন্দে ডগমগ হইয়া সাধু শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বহুক্ষণ ধরিয়া নৃত্য করিলেন। তারপর ভাব সম্বরণ করিয়া যমুনার তীরে গিয়া বসিলেন। সাধু অযাচকবৃত্তি—কাহারও কাছে কিছু চাহেন না। দিনটা কাটিয়া গেল—মাধব উপবাসীই যমুনাতীরে পড়িয়া রহিলেন।

পরদিন উপবাসী মাধব যমুনার তীরে বসিয়া কৃষ্ণগুণগান করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি চনা-ভাজা দিয়া গেল। মাধব বঙ্কবিহারীকে দেখিয়া আসিয়াছেন, হরিদাস স্বামী কত অনুরাগে তাঁহার সেবা করেন তাহাও দেখিয়াছেন—তাই কাল হইতে মনটী বঙ্কবিহারীর কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে। আজ চনাভাজাগুলি পাইয়া পরম আনন্দে বিহারীজীকে তাই দিয়া উদ্দেশে ভোগ দিলেন—তারপর নিজে প্রসাদ পাইয়া যমুনাতীরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামগান করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিধুবনেও হরিদাস স্বামী নিত্যকার মত ঠাকুরের ভোগের আয়োজন করিয়াছেন। বেলা দশ দণ্ড হইতে না হইতেই নানা উপচারে অপূর্ব্ব ভোগের সামগ্রী দিয়া বিহারীজীকে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের ভোগে দুই দণ্ড সময় অতিবাহিত হয় ; হরিদাস স্বামী নিত্যই ঘরে ভোগ দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসেন। তখন ঠাকুর স্বহস্তে সমস্ত সামগ্রী প্রসাদ করিয়া দেন। ভোগশেষে একবার সমস্ত বস্তুর উপর শ্রীহস্ত বুলাইয়া দেন, আর যে বস্তু যেমন ছিল, তেমনই পূরিয়া উঠে।—ঠাকুর যে স্বয়ং প্রসাদ করিয়া দিয়াছেন, বাহিরের লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু পাত্রে ভোগের কিছু না কিছু চিহ্ন থাকিয়া যায়। অন্তের অলক্ষ্যে হরিদাস স্বামী তাহা দেখিয়া ভোগ হইল কিনা বুঝিতে পারেন।

রোজই এমন হয়। সেদিনও হরিদাস স্বামী বিহারীজিকে ভোগ দিয়াছেন। কিন্তু ভোগের শেষে ঘরে গিয়া পাত্রে ভোগের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। হরিদাস মহা চিন্তায় পড়িলেন। হায় হায়, এ কি হইল?—ঠাকুর আজ খাইলেন না কেন? কোনও অপরাধ হইল কি? সাত-পাঁচ ভাবিয়া হরিদাস নির্জ্জনে বিহারীজীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আজ যে তুমি কিছুই খাইলে না ! আমাদের সেবার কোনও ত্রুটী হইয়াছে কি ?"

বিহারীজী একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "না না, তোমার ত্রুটী হইবে কেন ? আজ আমার মোটেই ক্ষুধা ছিল না—সকাল হইতে পেট ভার হইয়া রহিয়াছে, তাই কিছু খাইতে পারিলাম না।"

হরিদাস আস্তে-ব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "কোনও দিন তো এমন হয় না ঠাকুর! তুমি আমাকে ভাঁড়াইতেছ? আমার কি অপরাধ বলিবে না বুঝি!—আজ তোমার এখানে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিব!"

বিহারীজী হাসিয়া বলিলেন, "পাগল আর কি—তোমার অপরাধ কি রে? অপরাধ যে আমারই হইয়াছে, হরিদাস। কাল জগন্নাথী মাধবদাস এখানে আসিয়াছে, জান না? সে-ই আজ সকালে কতকগুলি চনা-ভাজা খাইতে দিয়াছিল; বড় ভাল লাগিল, তাই লোভে পড়িয়া অনেকগুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। আর সেই হইতে পেট ভার হইয়া রহিয়াছে, ডাকিতেছ।—সত্যই হরিদাস, আজ আর লেশমাত্র ক্ষুধা নাই।—এই দেখ—" বলিয়া বিহারীজী উদ্গার তুলিলেন।

ঠাকুরের রঙ্গ দেখিয়া হরিদাস হাসিয়া ফেলিলেন। আর কথাটী না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হরিদাসের মন হরিষে বিষাদে টলমল করিতেছে। বিষাদ এই জন্য যে, আজ আর ঠাকুর কিছু খাইলেন না। আর হর্ষ এই ভাবিয়া যে, "না জানি সে কেমন ভক্ত, যে শুধু চনা-ভাজার লোভ দেখাইয়া আমার ঠাকুরটীর মন ভুলাইয়া নিয়াছে! আহা, তার চনা-ভাজায় কি অমৃত ছিল গো যে আমার ননীতোলা ক্ষীর সব ফেলিয়া তারই জন্যে তাহার কাছে হাত পাতিয়াছে।"

এই সমস্ত ভাবিয়া হরিদাসের মন আনন্দে উতলা হইয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে তিনি সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বরং একটু রাগেরই ভাণ করিয়া চেলাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও তো বাপু, দেখতো যমুনার তীরে কোথাকার কে মাধবদাস আসিয়াছে। বিহারীজীর হুকুম, তাঁহাকে এখনি পাকড়া করিয়া লইয়া আইস—আজ চনা খাওয়াইয়া সে ঠাকুরের পেট ফুলাইয়া দিয়াছে।"

চেলারা তখনি যমুনার তীরে ছুটিল। সেখানে অচিনা জন দেখিয়া মাধব দাসকে ঘিরিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারই নাম জগন্নাথী মাধব দাস?" মাধব বিনম্র করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এই অধমই বটে। কি আজ্ঞা হয়?" "শীঘ্র উঠ বিহারীজী তোমাকে ডাকিতেছেন—আর দেরী করিও না।"

"বিহারীজী ডাকিতেছেন—এত ভাগ্য আমার!"—আনন্দে মাধব বিভোল হইয়া পড়িলেন—তখনই পুলকিত শরীরে চেলাদের সঙ্গে বিহারীজীর মন্দিরে ছুটিয়া চলিলেন।

নিধুবনে গিয়া আবার শ্রীবিগ্রহ দেখিয়া মাধবদাস প্রেমাবেশে জ্ঞানহারা! ভক্তকে দেখিয়া হরিদাস স্বামীরও আনন্দের আর সীমা নাই। বড় যত্নে মাধবদাসকে সম্মুখে বসাইয়া তিনি বারবার তাঁহার আপাদমস্তক নিরখিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "না জানি কি মধু এর হৃদয়ে! ইঁহাকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ কি এক দণ্ডও থাকিতে পারেন!"

তারপর মাধবকে চমকিত করিবার জন্য শ্লেষ করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার এ কেমন রীতি? চনা খাওয়াইয়া আজ ঠাকুরটীর পেট ফুলাইয়া দিলে? ওই দেখ, ঠাকুর আজ আর কিছুই খাইলেন না—যত মিষ্টান্ন সব অমনিই পড়িয়া রহিয়াছে—বারবার শুধু তোমার চনাভাজারই উদ্গার উঠিতেছে। আচ্ছা ভাই, অমন দ্রব্য তুমি কোথায় পাইলে? না কোনও গুণ করিয়াছ?

তোমার চনার সোয়াদ কি এতই মিঠা যে ঠাকুরের মুখে ক্ষীরননীও কাটল না ?"

হরিদাসের কথা শুনিতে শুনিতে মাধব যেন কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। মুখে আর কথা সরে না—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একবার হরিদাসের দিকে তাকান, আবার বিহারীজীর দিকে তাকান। মনে হইল, সেই যে সকালে চনা ভোগ দিয়াছিলেন! হরি হরি। বিহারীজী বুঝি তবে—

হরিদাস আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না—ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য হইলে মাধবদাসের বুক ফাটিয়া কান্না পাইতে লাগিল। উন্মাদের মত আলুথালু হইয়া হরিদাস স্বামীর হাত ধরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"ভাই, আমার মত নিষ্ঠুর আর এ জগতে দেখিয়াছ কি ? এ কি কুমতি হইল আমার ?—যে কমলমুখে গোপিকার ক্ষীর সর ননীও রুচে না—সেই মুখে কোন প্রাণে আমি কতক গুলা চনা তুলিয়া দিলাম ? একটু মায়াও হইল না কি ?"

মাধবের আর্ত্তি দেখিয়া হরিদাসের দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল আহা, এ কোন্ রসিক মানুষ গো। বিধাতা কি রসে ইহার হৃদয় পূরিয়া দিয়াছে'—হরিদাস স্বামীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল—ভাবাবেশে তিনি মাধবকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুইজনের নয়নের ধারার আর বিরাম নাই; শিষ্যেরা মন্ত্র-মুগ্ধের মত চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরে শ্রীবিহারীজীর মুখ প্রসন্ন হাসিতে উজ্জলিয়া উঠিল।

হরিদাস মাধবকে দুই চারিদিন নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। কয়দিন নিধুবনে যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল—কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠীতে দিনগুলি স্বপ্নের মত পার হইয়া গেল।

তারপর হরিদাস স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাধবদাস ভাণ্ডীর-বনে গিয়া দর্শন দিলেন।

পথের সঙ্কেত

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুখ আর দুঃখ জীবনের বাইরের দিক—ইহাদের গোড়ার কথাটা হইতেছে প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির মাঝে যেগুলি সোজাসুজি অন্তরে বাহিরে বিপ্লব ঘটাইয়া তোলে, সংসারের পথে নিত্য যাহাদের সঙ্গে পরিচয়—তাহাদের আমরা নাম দিয়াছি রিপু। সাধারণতঃ রিপুর উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের কান্না হাসির মেলা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রিপুকে বশ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, সাক্ষীর আসনে বসিয়া তাহাদের হাল-চাল সমস্তই খুঁটিয়া খুঁটিয়া চিনিয়া রাখা। অন্ধভাবে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দাও বলিয়াই প্রবৃত্তির মোহপাশ কাটাইয়া উঠিতে পার না; তেমনি অন্ধভাবে কেবল হাত-পা ছুঁড়িয়া আকুল বিকুলি করিলেই তীরে পৌঁছাইতে পারিবে না—বরং কোথাকার ফাঁস কোথায় যে আঁটিয়া বসিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আরও দিশাহারা

হইয়া উঠিবে মাত্র। সুখ-দুঃখ আর প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে সজাগ হইয়া লড়িতে হইবে। অন্তরে প্রদীপ না জ্বালিলে কিছুতেই এ অন্ধকারে পথ পাইবে না। সেই প্রদীপ জ্বালার ভূমিকাই হইল, নিজের অন্তরবৃত্তির উপর তীব্র দৃষ্টি রাখা। যাহা হইবার হউক—কিন্তু তোমার চক্ষু এড়াইয়া একটী ধূলি-কণাও যেন গলিয়া না যায়।

চাই কেবল বিচার—কেবল বিচার। পরের বিচার করিতে ভালবাসে সবাই—কিন্তু নিজের বিচার করে কয়জনা? তোমার প্রত্যেকটী নিশ্বাসের পর্য্যন্ত জবাবদিহী তোমার নিজের কাছে করিতে হইবে। হয়ত সকল গলদ এড়াইয়া যাইবার সাধ্য প্রথম হইল না—কিন্তু গলদের ইতিহাসটা তোমার স্বচক্ষে দেখিয়া রাখা দরকার, তার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ একটা কিছু অভিমত থাকা দরকার। দিনরাত এমনি করিয়া নিজকে উল্‌টি পালটি করিয়া দেখিতে থাক, আপনি দুরন্ত প্রবৃত্তি একদিন তোমার বশ হইবেই হইবে।

কিন্তু এই সমস্তই হইল বাইরের কাজ। জীবনের যাহা তোমার লক্ষ্য, তাহার সাধনা এখনো তোমার কাছে গৌণ। তুমি শুধু চাহিতেছ নিরপেক্ষ হইতে; তার জন্যই বাইরের যত কিছু অবলম্বন, বিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া একে একে তুমি তাহাদের বিদায় করিলে। কিন্তু তবু অবলম্বন তো একটা চাই। বাহিরকে যখন প্রত্যাখ্যান করিলে, তখন ভিতরকে আরো জোর করিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে। ভিতরকে ধরিবে কি দিয়া?—ভাব দিয়া।

ভাব হইল তোমার সত্যরূপ। প্রবৃত্তি দিয়া ইহাকেই তুমি ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে, আবার প্রবৃত্তির আবরণ ঘুচাইয়া ইহাকেই অন্তরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। এক কথায় ইহা কি বুঝাইয়া উঠা যায় না। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে যে না শিখিয়াছে, সে ইহার স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতেও পারে না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশে এইবার যে পথের মুখেই ভাবের পাথেয় সম্বল করিয়া যাত্রা করিয়াছে, তাহার তো কোন ভাবনাই নাই। কিন্তু এমনি সুনিশ্চিত একটা কিছু যাহারা না পাইয়াছে, তাহাদেরই যত বিপদ। ভাবের স্বরূপ চিনিবার জন্যই তাহাদের সাধনা—আর তাহার প্রাথমিক সোপানই হইল ভিতরটাকে ঝাঁটি দিয়া নির্ম্মল করা।

ভাব কেমন একটা সহজ কথায় তাহার পরখ হইবে। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, নিজের সঙ্গে যদি তেমন করিয়া জানাশুনা করিবার চেষ্টা করিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার ভিতরে সবচেয়ে চোখে বিশ্রী ঠেকিতেছে—অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলতা। তুমি যাহা কিছু করিতেছ বা ভাবিতেছ, সমস্তই যেন একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোল। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে একটা বদ্ধ কুঠরীর মাঝে মানুষকে আটকাইয়া রাখিলে, সে যেমন হাঁপাইয়া উঠে—এই হট্টগোলে পড়িয়া তোমার অন্তরাত্মাও তেমনি হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। কোনও কাজেরই একটা কিছু স্থির লক্ষ্য নাই—কি দিয়া যে তুমি কি চাহিতেছ, তাহার কোনও একটা দিশা নাই। হয়ত কাজে, কর্ম্মে, ভাবে, চিন্তায় বাহিরের একটা কিছু লক্ষ্য আছে, কিন্তু সেই লক্ষ্য অনুসারে তোমার প্রত্যেকটী চেষ্টাকে তো তুমিও সামলাইয়া আনিতে পার নাই। তাই লোক-দেখানো ভাবে তুমি কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছ বটে, কিন্তু

অন্তর তাহাতে কিছুতেই সায় দিতেছে না। একটা ভালর সঙ্গে দশটা মন্দ কোথা হইতে জড়াইয়া আসিতেছে, আর তাহা নিয়া চিত্ত একেবারে অশান্ত, অতৃপ্ত ও উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছে।

অধিকাংশ লোকের মনেই এই অবাজকতা। ভাল আছি বলিয়া যাহারা নিজকে আশ্বস্ত করিতেছে, তাহাদেরও এই দশা। লাভের মাঝে তাহারা আরও বেশী অন্ধ—কেননা নিজের দুর্দ্দশার কথাও তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। বাস্তবিক এমন হয়; উত্যক্ত থাকাটাই মানুষের এমন মজ্জাগত হইয়া দাঁড়ায় যে এই অবাজকতার প্রতি যেন তার অন্তরের টান পড়িয়া যায়। কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে যাহারা মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা জানে, এ কি বিষম জ্বালা! ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই তাহারা এত ছটফটি।

ভাব ঠিক এর বিপরীত জিনিষ। সে যেন অন্তরের রসমূর্ত্তি। যত বিপদ ভিতরে বাহিরে ঘটিতে থাকুক, সমস্তই মনে করিবে যেন তুমি এ অমৃত লাভ করিয়াছ। ইহার কাছে কোনও অনিয়ম নাই, কোনও বিরোধ নাই, কোনও অশান্তি নাই। যত বিপরীত অভিজ্ঞতাই হউক না কেন—সমস্তই আসিয়া ঠিক ইহার সঙ্গে খাপ খাইয়া যাইবে। একদিকে কাজ করিতেছ আর একদিকে মনটা হাঁপাইয়া উঠিতেছে, এমন অবস্থা আর তখন থাকিবে না। বহু আকাঙ্ক্ষার পর ভালবাসার জনকে দেখিলে চিত্ত যেমন অনায়াস আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, কিছু না করিয়া না ভাবিয়াও মনে হয়, বুক যেন ভরিয়া উঠিয়াছে, ভাবও তেমনি। সে আপনিই পূর্ণ—বাহির হইতে কিছু জোটাইয়া আনিয়া তাহাকে ভরিয়া তুলিতে হয় না—বরং তাহারই আলো পড়িয়া বাহিরের ক্ষুদ্রতম কণিকাটুকু পর্য্যন্ত আনন্দে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠে।

কতকগুলি ভাবনা, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি ইত্যাদির সমষ্টিতে মানুষ তৈরী। এগুলি যে সব সময় বিশ্লিষ্ট অবস্থাতেই পাওয়া যায়, তাহা নয়। এর সমস্তগুলি জড়াইয়া চেতনার উপর যে একটা বিশিষ্ট রক্ষের ছাপ পড়ে, তাহাই হইল মানুষের প্রকৃতি। ব্যক্তি হিসাবে এই প্রকৃতি ভিন্ন এবং সাধনা হিসাবে ইহার গাঢ়তার মাঝেও তারতম্য আছে। যখন কোনও একটা বিশিষ্ট বৃত্তি দ্বারা তুমি উদ্বোধিত নও অর্থাৎ বাহিরে করিবার বা ভাবিবার কিছু না থাকাতে মনটা যখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, সেই সময় তুমি কি প্রকৃতির, তাহার সন্ধান পাইবে; এই সময় যার চেতনা যত উজ্জ্বল বোধ হইবে, বুঝিতে হইবে, সে তত সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই অবস্থায় আমাদের ভিতরটা যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে বলিয়াই মনে হয়—যেন ভিতরে কোন রস নাই, আনন্দ নাই—সমস্তই যেন অসাড় নিশ্চল। ভিতরটা এমন হইলে বাহির হইতে উত্তেজনার খোরাক জুটাইয়া তবে তাহাকে চাঙ্গা রাখিতে হয়—বাহিরের অবলম্বন ছাড়া সে একদণ্ডও খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না।

এই হইল চিত্তের বাহ্যমুখীনতা। এমন চিত্ত হইতে যদি সমস্ত আশ্রয় সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সে ঘোর তামসিকতার অন্ধকারেই ঢলিয়া পড়িবে। বাহিরের উপকরণ ছাড়া তাহার ওই একমাত্র তৃপ্তির নিদান রহিয়াছে—জড়ত্ব। বাহিরটা নিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত লম্ফঝম্প চলিল, ততক্ষণ বেশ—তার পরই সমস্ত আলো নিবিয়া গেল—এই হইল

সাধারণ মানুষের প্রকৃতি। এই প্রকৃতির উপরই ভাবকে জয়ী করিতে হইবে।

একটা তোরঙ্গ যদি বোঝাই থাকে, তবে তাহার ভিতর অন্য কিছু পুরিতে হইলে, আগেকার যত কিছু জিনিষ সমস্ত নামাইয়া সেটা খালি করিয়া নিতে হয়। ভাব সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। চিত্তের বহির্মুখীনতা বা তামাসকতা আর ভাব—এ দুয়ে যেন তেলে-জলে সম্পর্ক, একটা থাকিতে আর একটার ঠাঁই কিছুতেই হইবে না। এই জন্যই ভিতরটাকে একেবারে ফাঁকা করিবার জন্যও শিক্ষা চাই

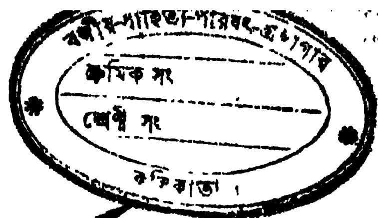
মন তো কত সময় অমনি ফাঁকা হইয়া যায়; কিন্তু সে ফাঁকায় কোনও কাজ দেয় না কেননা তার উপর তোমার কোনও কর্তৃত্ব খাটে না। যখন নাকি পুরা মজলিস্ চলিয়াছে, তখন সমস্ত ঝাঁটাইয়া তাহাকে ফাঁকা করিতে পার কিনা, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ভিতরে কতটুকু সার আছে না আছে, তখনই তাহার খোঁজ পাইবে। অমনি তো মনের মাঝে কত ভাবনা আসিতেছে, যাইতেছে—তোমার খবরদারীর কোনও অপেক্ষাও রাখিতেছে না। কিন্তু একবার যদি তাহাদের আসিতে মানা কর, তবেই দেখিবে সমস্তটা মন টলমল করিতেছে। কর্তার হুকুম আসিতে মানা; অথচ না আসিলেও নয়, তাই সমস্তটা মন যেন দিশা-হারা—কোথায় কি ভাবে আশ্রয় সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এর ফলে তোমার মাঝে একটা অশান্ত জন্মিবে। পূর্ব্বে চঞ্চলতা যেমন ছিল, সমষ্টি মনের রূপ এখন এই অস্বস্তিও হইবে সমষ্টি মনের রূপ। তবে চঞ্চলতা তোমার হাতধরা ছিল না, কিন্তু এই অশান্তকে তুমি নিজে ডাকিয়া আনিয়াছ; তাই ইহাকে দিয়া স্বচ্ছন্দে তোমার কাজ হাসিল করিয়া লইতে পারিবে।

ভাল হওয়া মন্দ হওয়া সমস্তই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণ প্রকৃতির মাঝে ইচ্ছার রূপ ততটা সুস্পষ্ট নয়—অসাধারণ একটা কিছু করিতে গেলেই ইচ্ছা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়। তখনও ইচ্ছার একটা সুস্পষ্ট অবলম্বন চাই। মন হইতে যখন সমস্ত তাড়াইবার ইচ্ছা করিতেছিলে, তখন ইচ্ছার কর্মক্ষেত্র সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না, কেননা সমস্ত বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা ঠাহর করিয়া ওঠা কঠিন; তাই একটা তাড়াইলেও আর একটা ভূত আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিত। কিন্তু ইহাদের দৌরাত্মকে আমল না দিয়া তোমার নিজের সৃষ্ট অশান্তের সন্ধান যখন পাইলে, তখন এমন একটা কিছু পাইলে, যাহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট আকার পাওয়া যাইতে পারে, অথচ সমস্ত চিত্তবৃত্তিরই যাহা প্রতীক।

এইবার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে একাগ্র করিয়া এই অশান্তকে তাড়াইবার চেষ্টা কর। দেখিবে, তোমার মাঝে যেন আলোক আর আঁধা-রের দ্বন্দ্ব আরম্ভ [illegible]। অস্বস্তি যখন ভিতরটাকে টানিয়া নামাইয়া আঁধারে ডুবাইয়া দিতে চায়, তখন ইচ্ছাশক্তি আসিয়া তাহাকে [illegible] আর অমনি আঁধার [illegible] আবছায়ার মত একটু আলো [illegible] উঠে।

এই সঙ্গে [illegible] দরকার। আলো আর [illegible] দ্বন্দ্ব [illegible] কেবল বাহিরে [illegible] করিয়া গভীরের [illegible]; অর্থাৎ কেবল [illegible] করা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] গভীরে তলাইয়া যাইতে হইবে—[illegible] করিতে হইবে যাহাতে এমন একটা কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়া তুমি দাঁড়াইতে পার, যেখান হইতে এই দ্বন্দ্বটা নিরপেক্ষ ভাবে তোমার অন্তশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে। এমনি করিয়া তলাইয়া গিয়া যদি অশান্তের হাত হইতে বাঁচিতে চেষ্টা কর, তবে ক্রমে তোমার আঁধার ঘর আলোয় ভরিয়া উঠিবে। এই আলোকময় অন্তরেই তখন ভাবের প্রতিষ্ঠা হইবে। (ক্রমশঃ)

——※——



ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৫শ বর্ষ } ভাদ্র { ৫ম সংখ্যা

বিষ্ণোর্ব্বীর্য্যাণি

[ঋগ্বেদসংহিতা —১।২১।১৫]

বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং
যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং
বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ॥

প্র বিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম
গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে।
য ইদং দীর্ঘং প্রয়তং সধস্থম্
একো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ॥

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং
নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা
[illegible]

তা বাং বাস্তুন্যুশ্মসি গমধ্যৈ
যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ
পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

গাহি বিষ্ণু-বীর্য্য গাথা—শোন বিশ্ব!—এই মর্ত্ত্যভূমি
প্রতি অণুমাঝে তাঁর মহিমারে রহিয়াছে চুমি'।
লোকোত্তর দিব্যধাম স্তব্ধ ওই চাহি তাঁর পানে,
ত্রিপাদ বিক্ষেপে তাঁর কীর্ত্তি ভায় নিখিলের গানে।

ধ্যানলিপ্ত বাগ্‌দীপ্ত স্তুতি তাঁরে করিনু অর্পণ—
বাণী যাঁর সিংহাসন-বন্দনীয়, কামনা-তর্পণ!
স্পন্দহীন দিব্যধাম ওই যাহা সুদূর-প্রসার—
ত্রিপাদ-বিক্ষেপে তার আদি-অন্ত হেরি একাকার!

হৃদয় আনন্দে গড়া করিলাম প্রিয় তাঁর পথ,—
দেবতার সঙ্গ যাচি' ভক্ত যেথা পূর্ণ মনোরথ।
বন্ধু তিনি সবাকার—ব্যাপ্ত বিশ্ব তাঁর মহিমায়—
বিষ্ণুর পরম ধামে মধুধারা উছলিয়া যায়।

ভূরিশৃঙ্গ গাভী যেথা বন্ধহীন করে বিচরণ—
বিষ্ণুপদে দম্পতীর, গতি সেথা করি আকিঞ্চন;
উদ্ভাসিত আছে সেথা অকুণ্ঠিত শ্রেষ্ঠ তাঁর ধাম,
নিখিলের কণ্ঠে যেথা ফোটে তাঁর কল্পতরু নাম।

অন্তর্দৃষ্টি

—*—

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন লইয়া যখন জগতে রহিয়াছি, তখন ইহাদের ধর্ম্ম মানিয়া ইহাদের কথা শুনিয়া যে পরিচালিত হইব— ইহার মাঝে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু মানুষ তো ঠিক প্রকৃতির হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। প্রকৃতির আইনকে সে সচরাচর লঙ্ঘন করিতে পারে না বটে, কিন্তু তবুও সে আইন গাছ-পাথরের উপর যেমন অব্যাহত ও অন্ধভাবে খাটে, মানুষের উপর তেমন করিয়া তাহা খাটে না। বন্ধন এখানে আছে, কিন্তু ফাঁকও তেমনি আছে। বাঁধুনীর বৈচিত্র্যের মাঝেই মানুষের স্বচ্ছন্দ বিহারের পথ রহিয়াছে। জড় বা পশুত্বের কাছে আইন যেখানে একটা এবং সেটাও যেখানে অলঙ্ঘ্য— মানুষের কাছে প্রকৃতি সেখানে পাঁচটা কানুন আনিয়া উপস্থিত করিতেছে এবং তাহার মাঝ হইতে একটা বাছিয়া লইবার বা মিলাইয়া-মিশাইয়া নূতন একটা কিছু সৃষ্টি করিবার স্বাতন্ত্র্য দিতেছে। এই স্বাতন্ত্র্যটুকু পাইয়াই মানুষ সৃষ্টিরহস্যের এক মহাসন্ধিস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখান হইতে ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তাহার নিয়তি মুক্তির দিকে না বন্ধনের দিকে। পশুর মাঝে প্রবৃত্তি দেখি—মানুষের মাঝে দেখি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই-ই। এই দেখিয়া প্রকৃতির মাঝে কোন্ পর্য্যায়ে তাহাকে ফেলিব?

সূক্ষ্ম তার্কিক হয়ত বলিতে পারেন, মানুষের স্বাতন্ত্র্যের কথা যাহা বলিতেছ, চরমে তাহার কোনও সত্যতা নাই; সে-ও আইনের গণ্ডীতে জড়ের মতই বাঁধা। হইতে পারে; কিন্তু চরমটা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না দেখি, সে পর্য্যন্ত এ কথা আমরা কেহ বিশ্বাস করি কি? "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"— এ কথা ভুল হউক, মিথ্যা হউক, কিন্তু তবুও এখন আমাদের কাছে এইটাই বাস্তব। স্বাতন্ত্র্য আসলে থাকুক আর না থাকুক, এর অভিমানটুকু আমরা পুরামাত্রায় উপভোগ করিতেছি নই কি?

এই যে স্বাতন্ত্র্যাভিমান, এক দিক দিয়া ইহা ক্ষতিকর হইলেও অপর দিক দিয়া ইহাই আমাদের বাঁধন ছিঁড়িবার সঙ্কেত দেখাইয়া দিতেছে। ঠিক জড় বা পশু আমরা নই বলিয়াই প্রবৃত্তিকে সব সময় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। স্বেচ্ছায় কিছু করিবার ক্ষমতা বাস্তবিকই আছে, কি নাই—সে তর্ক না করিয়াও অন্ততঃ এইটুকু তো দেখিতে পাই যে, এই স্বেচ্ছা পরিচালনের অভিমান লইয়াই আমরা প্রকৃতির বিধানের মাঝে বাছাই করিবার অধিকার পাইয়াছি। প্রকৃতির সমস্ত বিধানই শিলাভারের মত নিথর বলিয়া আমাদের কাছে মনে হয় না, তার একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিবার স্পর্দ্ধাও আমাদের মাঝে জাগে। এই হইতেই তো আমাদের ভাল আর মন্দ, পাপ আর পুণ্যের উৎপত্তি। গাছ-পাথরের পাপ পুণ্য নাই, কিন্তু মানুষের আছে, কেননা মানুষের একটা স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আছে। এই অভিমানের পথ দিয়াই দেহ, মন, ইন্দ্রি-

ষের প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত করিবার দুঃসাহসও মানুষ করিয়া থাকে। প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসরণ করা তাহার পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি এই নিবৃত্তির ধর্ম্ম অনুসরণ করাও তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কম স্বাভাবিক নহে।

এই জন্যই বলি, প্রকৃতির দাস হইয়া থাকা মানুষের নিয়তি নয়। এই জন্যই তাহার মাঝে এত দ্বন্দ্ব, এত আন্দোলন। যাহা সে দেখিতেছে, শুনিতেছে, ঠিক তাহারই বিপরীত একটা কিছু থাকা যে খুবই সম্ভব, এ কথা সে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে। তবে মানুষ যদি বেশী মাত্রায় সভ্য হয়, তখন হয়ত বিশ্বাসের স্থান সংশয় আসিয়া দখল করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত জগতের শতকরা নিরনব্বই জন লোক বোধ হয় এতটা সভ্য হয় নাই। তাই সরল ভাবে দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত একটা চরম নির্ভরকে আঁকড়িয়া থাকা এখনো তাহার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। মানুষের ভগবদ্বিশ্বাসের মূলই এইখানে। সে দুঃখ পাইতেছে দুঃখ দিতেছে; যে প্রকৃতির সীমান্তে সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বারবার তাহারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে—কিন্তু তবুও সরল ভাবে সে বিশ্বাস করে, তাহার এই দেখা-শোনার পরপারেও কিছু আছে। পশুস্তর হইতে উন্নীত অসভ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতম মানুষ পর্য্যন্ত, এই বিশ্বাতিগ সত্তায় বিশ্বাস একেবারে মজ্জাগত। এ বিশ্বাস যেখানে নাই, সেখানে যে মানুষের মন অসুস্থ ও ব্যাধিগ্রস্ত,—সমগ্র এবং অখণ্ড মানবসমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়া এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি না কি?

সাধারণের অতীত অসাধারণ কিছু রহিয়াছে, ইহা যদি মানুষের মর্ম্মচর প্রত্যয় হয়, তবে তার জন্য একটা লোলুপতা তাহার থাকিবেই। এই লোলুপতাকে সার্থক করিবার জন্য কিছু না কিছু সে করিবেই। দেহটা পোষণ করিবার জন্য তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন, প্রবৃত্তির বশে সে তাহা তো অহরহই করিতেছে। কিন্তু দেহাতীত কিছু যখন রহিয়াছে, তখন তাহার জন্যও কিছু স্বার্থত্যাগ, কিছু অনাসক্তি তাহাকে দেখাইতে হইবে। এইজন্যই সে সংসারের প্রয়োজনে যাহা কিছু করে, ঠিক তাহার বিপরীতে কিছু-না-কিছু করিয়া অন্তরের সেই গূঢ়তম পিপাসাকেও তৃপ্ত করিতে চায়। এইরূপ দেহ-প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেষ্টা হইতেই তাহার শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের উদ্ভব—এক কথায় আমরা বলি, এই তাহার ধর্ম্ম-পিপাসা। এইগুলি নিয়াই সে বিশ্বাতিগকে ছুঁইবার চেষ্টা করিতেছে।

মানুষ বাধার সঙ্গে লড়িয়া আনন্দ পায়, কেননা ইহাতেই তাহার স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্ত্তি। এই স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়াই সে এক অপরূপ লোকের সন্ধান পায়, যাহার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া দুঃখ সহিয়া সে নিজের মাঝে নূতন নূতন শক্তির প্রেরণা অনুভব করে। বাধা যে তাহার চারিদিকেই, ইহা সে চলিতে ফিরিতে সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছে। চারিদিক হইতে কে যেন তাহাকে আঁটিয়া ধরিতেছে, আর তাহার মাঝে একটা অপরূপ সত্তা সর্ব্বদাই এই সঙ্কোচের পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রয়াস করিতেছে—ইহারই নাম হইল জীবন। জীবনের এই দ্বন্দ্ব যেমন বাহিরে, তেমনি অন্তরে। দেহধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে কিম্বা তাহার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইলে যেমন জড়ের সঙ্গে

লড়িতে হয়, তেমনি অন্তরের সঙ্কোচের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলেও বিরুদ্ধ অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে লড়িতে হয়। জীবনের পক্ষে এই দুইটা লড়াই-ই প্রয়োজন। জড়বিজ্ঞান আর অধ্যাত্মবিজ্ঞান—এই উভয়েই মানুষের জীবনের অভিব্যক্তি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই দুইটী ধারা লইয়া দুইটী সভ্যতা বা জীবনের বিশিষ্ট অভিব্যক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নিরপেক্ষভাবে দেখিতে হইবে, ইহাদের মাঝে কে জীবনকে স্ফুটতর করিয়া তুলিয়াছে।

অভিব্যক্তির আদিতে দেহ, আর অন্তে চৈতন্য—প্রাকৃত-ভূমি হইতে মানুষ এই ক্রম ধরিয়াই তাহার সাধনা আরম্ভ করে। অর্থাৎ তাহার চেষ্টা, জড়কে অতিক্রম করিয়া সে অজড়কে লাভ করিবে। এইজন্যই অভিব্যক্তির কিছুদূর পর্যন্ত দেহধর্ম্মই মানুষের জীবনের সবখানি জুড়িয়া থাকে। এই দেহধর্ম্মের মাঝে একটা মোহ আছে—শাস্ত্র যাহাকে প্রবৃত্তি সংজ্ঞা দিয়াছেন; অভিব্যক্তির প্রথম স্তরে তাহাই মানুষকে গ্রাস করিয়া বসে এবং এই মোহের জন্যই কি অধ্যাত্মবাদী, কি জড়বাদী উভয়ই সাধনার মাঝে দেহের কথাটাকেই বড় করিয়া তুলে। জড়বাদী যেমন দেহ স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত উপায় আবিষ্কারেই নিজের চেষ্টাকে পর্য্যবসিত করে, অধ্যাত্মবাদীও তেমনি দেহের গণ্ডীর মাঝে দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিয়াই তাহাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ দেহাতীতের সত্তা অপেক্ষা দেহধর্ম্মের বিভীষিকাই তাহার সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেহের অত্যাচার কিছুদূর পর্য্যন্ত চলিবেই। কিন্তু মানুষের মুক্তিস্পৃহাই আবার তাহাকে বলিয়া দেয়, যেমন করিয়াই হউক, কি বাহিরের প্রয়োজনে, কি অন্তরের প্রয়োজনে, কোথাও দেহটাকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। এই বোধ সার্ব্বভৌম না হইতে পারে, কিন্তু তবু ইহা ঐকান্তিক সত্য। এইখান হইতেই মানুষের প্রাকৃত দৃষ্টির ব্যাবৃত্তি। অর্থাৎ এতদিন পর্য্যন্ত মানুষ চাহিয়াছে দেহ হইতে দেহাতীতের দিকে, এইবার তাহাকে চাহিতে হইবে দেহাতীত হইতে দেহের দিকে। যাহার মাঝে এই বোধটী সুস্পষ্ট হইয়া জাগিয়াছে, সে জীবনের একটা মস্ত সঙ্কট হইতে বাঁচিয়াছে। কি প্রমাণে যে মানুষ এই সত্যকে জানিয়া লয় অর্থাৎ দেহে থাকিয়াই কি করিয়া দেহাতীতের সত্তাকেই সে তাহার জীবনের রস বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা কেহ গুণিয়া গাঁথিয়া বলিতে পারে না। যেমন স্বভাবের প্রেরণায় মানুষের মাঝে স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে, তেমনি স্বভাবের প্রেরণাতেই কাহারও কাহারও কাছে দেহাতীতের সত্তা দেহ হইতেও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহারাই মানবজাতির আদি-গুরু। বিচিত্র ভাবাবিবর্ত্তনের মাঝে মানুষ—জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক—ইহাদের নির্দ্দেশকেই লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রাকৃত বিবর্ত্তনের কথা এখানে আসিতে পারে। দেহের অভিব্যক্তি, মনের অভিব্যক্তি যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট ক্রম ধরিয়া চলে, ইহাই এ যুগের সব চেয়ে বড় আবিষ্কার। তাই আজকালকার বৈজ্ঞানিক, মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই প্রাকৃত অভিব্যক্তির দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে চান। এই বৈজ্ঞানিকরাই এখন বলিয়া বসিবেন, দেহ হইতে দেহাতীত যে সত্য, এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ দাও—একটী হইতে আর একটীর অভিব্যক্তির অবিচ্ছিন্ন ক্রমনির্দ্দেশ করিয়া

দাও, তারপর দেহাতীতের অভিজ্ঞতাকে প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে বল; নতুবা তোমার গায়ের জোরের কথা কে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে? এই কথার উত্তর দিতে গিয়াই দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু তবুও ইহার উত্তর মিলে নাই। পাশ্চাত্যভূমি প্রতি পদে নিজের গড়া বিজ্ঞানকে মানিয়া চলে—তাই দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টকে আবিষ্কার করা তাহার সাধনা, অদৃষ্ট হইতে দৃষ্টকে মানিয়া লইতে সে রাজী নয়। এই জন্যই বুঝি অজড়ের প্রামাণ্য দেখাইতে গিয়া জড়ভূমি হইতেই সে সাধনা আরম্ভ করিয়াছে—জড়কে নিঃশেষ করিয়া তবে 'অজড়'কে সে বুঝিবে এই তার পণ। কিন্তু সে কবে হইবে? মানুষের বুদ্ধি কি এতদূর পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিবে? তা ছাড়া, কে জানে মানুষের সহজ বুদ্ধিকে অবহেলা করিয়া তর্কবুদ্ধিকে যে সে বড় করিয়া দেখিতেছে, ইহাতে তাহার শ্রেয়ঃ মিলিবে কি না।

প্রাকৃত বিবর্ত্তনের পথ ধরিয়া দেহাতীতকে পাওয়া যায় কি না, তাহার প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত মানুষের কাছে আসিয়া পৌঁছায় নাই—অন্ততঃ সে প্রমাণের অপেক্ষায় মানুষ চিরকাল বসিয়া থাকে নাই। সে এই বিবর্ত্তনকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেখিয়াছে। কে যে তাহাকে ইহার প্রেরণা জুটাইয়া দিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য বোধ যেমন মানুষের মাঝে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত, দেহাতীতও তেমনি করিয়া স্বতঃই মানুষের কাছে ধরা দিয়াছেন—ইহাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা। কি করিয়া যে এই অভিজ্ঞতা একটী জাতির সমগ্র সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা পাই উপনিষদে। উপনিষদ্ একটা বিরাট্ জাতির বিরাট অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এই ইতিহাসের মাঝে আমরা দেখি—অজড়কে যে মানুষ পাইয়াছে, তাহারই কথা নানা ছন্দে সে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে। ইহার মাঝে সর্ব্বত্রই দেখি প্রত্যক্ষ দর্শনের সুস্পষ্টতা, হৃদয়ের সহজ ও জীবন্ত অনুভূতি; কিন্তু কোথাও তো দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টের প্রমাণ টানিয়া বাহির করিবার জন্য তর্কের চেষ্টা নাই। প্রত্যক্ষদর্শী যেমন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা সহজভাবে অনাড়ম্বরে বলিয়া যায়, গোড়াতেই প্রমাণের জন্য যুক্তি-তর্ক ফাঁদিয়া বসে না—এখানেও তাই। এই চরম ও পরম অনুভূতিকে পাইয়া মানুষ প্রমাণশাস্ত্রকে এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া বলিতেছে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্—মানুষ অনেক বলিয়া, অনেক শুনিয়া, অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া এই আত্মাকে পায় না; কিন্তু এই আত্মা আসিয়া যাচিয়া যাহাকে বরণ করিয়া লন, সেই তাঁহাকে পায়—তাহারই কাছে তিনি তাঁহার তনুটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেন।" একি অপরূপ প্রণয়-লীলা!—এর মাঝে বিবর্ত্তনের যুক্তি টানিয়া আনিবে কোন্ অরসিক?

জড়কে অতিক্রম করিবার প্রেরণা ও তাহার অনুকূল অনুভূতি মানুষের মাঝে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই অজড়কে সে সহজ বুদ্ধিতে বিশ্বাস করিতে পারে। আর এই অরূপের পথে চলিবার বিধিই এই। এখানে বুদ্ধির বিকার দিয়া অন্তরের সহজ প্রজ্ঞাকে আবরিত করিয়া তারপর বুদ্ধির পথে বিচার করিয়া করিয়া চলিলে কোনও দিন পথের অন্ত পাওয়া যাইবে না। সংশয়ী হয়ত ইহার

কারণ চাহিয়া বসিবেন। কিন্তু সব জিনিষেরই কার্য্য-কারণ লইয়া টানাটানি করিলে মানুষের সহজাত রসবোধ আহত ও ক্ষুন্ন হইয়া পড়ে। বিচার যে কোথাও করিব না, একথা আমরা বলিতেছি না—কিন্তু বিচারের কাছে অন্তরের সুষমাকে যেন বলি না দিই, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশ্লেষণে সৌন্দর্য্য ক্ষুন্ন হইয়া যায়—অন্তরের পক্ষে এটা কম ক্ষতি নয়। একটা বস্তুকে অখণ্ডভাবে ধারণা করিতে পারিলে তবেই তাহার তাৎপর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৌন্দর্য্যও স্ফুট হইয়া উঠে, এবং এই অখণ্ড বোধকে আশ্রয় করিয়া যে বিচার-বিশ্লেষণের অধিকার আমরা পাই, তাহা যুগপৎ বুদ্ধি ও বোধিকে তৃপ্ত করিয়া আমাদের মাঝে পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যের অনুভূতি আনিয়া দেয়।

অরূপের প্রসঙ্গে যদি বিচারবুদ্ধিকে নিম্ন আসন দিয়া আমরা স্বাবাসকী অনুভূতিকেই প্রধান করিয়া তুলি, তবে তার্কিকের পক্ষে বা জড়প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষে তাহা রুচিকর না হইতে পারে। কিন্তু তর্কের ভাষা ছাড়া মর্ম্মের ভাষাও একটা আছে এবং এ সংসারে তাহার প্রভাবও নিতান্ত সামান্য নয়। সাধারণ ব্যাপারের মাঝেই বা আমরা তর্ক লইয়া কারবার কার কতটুকু? শুধু কথা বলা আর শোনা—এই ছইটা সহজ ব্যাপারের উপরই না জগতের মনের আনা ভিত্তি। কিন্তু এর মূল কথাটা কি? যে বলে সে-ই বা নিঃসঙ্কোচে বলে কোন্ অধিকারে, আর যে শোনে, সে-ই বা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে কোন্ ভরসায়? এইখানেই মানবহৃদয়ের এক অভিনব রহস্য। যে বলে আর যে শোনে, তাহাদের ছুই জনেরই অন্তঃকরণ যদি এক ভিত্তিতে আসিয়া না দাঁড়ায়, উভয়ের মনোবৃত্তি যদি একই রঙের না হয়, তবে আর নিঃসঙ্কোচে বলাও চলে না, অসংশয়ে শোনাও চলে না। মর্ম্মে মর্ম্মে যোগ থাকা চাই—তবেই আদান-প্রদান চলিতে পারে। এই মর্ম্মানলীন যোগ তো ব্যবহারিক জগতেরই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। তবে আর ইহাকে যুক্তি-তর্ক হইতে কম প্রামাণ্য মনে করি কি করিয়া? যাহা জগতের স্বভাব, তাহা মানুষের গড়া যুক্তি হইতেও বড়। মানুষে মানুষে যে এই চিরন্তন মর্ম্মযোগ—ইহা হইতেই অদৃষ্টকে আমরা দৃষ্টের মাঝে প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করি। সমস্ত মানুষের যে মর্ম্মগত অনুভূতি তাহাদের পরস্পরকে প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের ডোরে বাঁধিয়া দিতেছে—সত্য তাহার মাঝেই; নিয়ন্তা সে ই—যুক্তি-তর্ক শুধু স্বভাবের বিকার মাত্র।

সহজের অনুভূতিকে জীবনের সমস্ত চেষ্টার উপর জাগ্রৎ করিয়া রাখাই যে স্বভাবের অনুকূল, মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্য স্ফুরণের অনুকূল, এ কথা যিনি সমগ্রকে দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তবুও ইহার মাঝে গোলযোগ ঘটে। যে স্বাতন্ত্র্য মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়, সেই স্বাতন্ত্র্যই আবার তাহাকে বাঁধিতেও কৃপণতা করে না। মানুষ যদি সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের বশ থাকিত, কিম্বা প্রকৃতিকে একেবারে উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি লাভ করিত, তাহা হইলে এ দ্বন্দ্বের তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। প্রাণ চায় জড়কে অতিক্রম করিতে, অথচ জড়ের আকর্ষণও তাহাকে মোহের শিকলিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—এমন অবস্থায় হতভাগ্য মানুষ মুক্তি-পিপাসায় কেবলই খুঁটার চারিদিকে দাড়টা জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধনটা আরো কসিয়া তোলে মাত্র। এইজন্য যাহা সহজ, তাহার তাহা কাছে তখন আদর্শ। অরূপের আভাস চকিতের মত প্রাণে পিপাসা জাগাইয়া যায়, অথচ রূপের মোহও সম্পূর্ণভাবে তাহার সংজ্ঞা লোপ করিতে পারে না, এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়িয়া মানুষ কি করিয়া স্বভাবকে চিনিতে পারিবে? দ্বন্দ্ব যে স্বভাবের ব্যতিক্রম।

এই জন্য অসত্যকে অসত্য বলিয়াই নিরুপায় মানুষকে প্রথমে তাহার সঙ্গে লড়াই করিতে হয়—সহজভাবে সত্যের সাক্ষাৎ সে প্রথমে পায় না। স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির বিকারে যত পাকে সে নিজকে জড়াইয়াছে, আগে

সেই পাকগুলি তাহাকে খসাইয়া লইতে হইবে—কর্ম্মফল আগে খণ্ডিতে হইবে। এই জন্যই হাতের কাছে প্রথম যে বাধা, তাহাকে লইয়াই তাহার কারবার। পূর্ব্বে দেহের কথা বলিয়াছি। যদিও দেহের দিকে তাকাইলে মানুষ সব দিক দিয়া আপনাকে অস্বাভাবিক রূপে খর্ব্ব করিয়া দেখে, তথাপি স্বভাবকে ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রথম তাহাকে এই দেহরূপ স্থূলতম আবরণটাই খসাইতে হইবে।

কিন্তু এইখানেই আবার সাধককে প্রাকৃত দৃষ্টি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হইবে। দেহ বাধা বটে, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য সমস্তটুকু চেষ্টা কেবল তাহার গণ্ডীর মাঝেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। এই দেহটাকে দিনরাত ঠেলিয়াগুঁতাইয়া কিছুতেই হটাইতে পারিবে না, যদি দেহের সৃষ্ট বাধার প্রকৃত স্বরূপটা না বুঝিতে পারি। প্রাকৃত বুদ্ধি বলিবে, দেহ যখন পথ আগলাইয়া বসিয়াছে, তখন জোর করিয়া উহাকে সরাইয়া দাও। কিন্তু সে যে-গভীরস্থানের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সন্ধান কি লইতে হইবে না? অদৃষ্টকে না মানিতে চাহিয়া কেবল দৃষ্টকে লইয়াই যদি নাড়াচাড়া আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে কেবল বর্ত্তমান প্রবৃত্তির পক্ষে যেটা বাধা, সেইটাই ভাসিয়া উঠিবে—কোনও চরম নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে তো পারিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞানের মাঝে এইখানেই জড়ত্বের সৃষ্টি—এখন সে বাহ্যবিজ্ঞানই হউক, আর অন্তর্বিজ্ঞানই হউক। স্থূল বাহ্যবিজ্ঞানও কেবল দৃষ্ট বাধাটাকেই দেখিতে পায়। তাহাকে ঠেলিয়া সে যে কোথায় যাইবে, কাহাকে পাইবে, তাহা সে জানে না—কেননা দৃষ্টাতিরিক্ত অদৃষ্টকে সে মানে না। তেমনি অন্তর্বিজ্ঞানকেও যাহারা স্থূলদৃষ্টিতেই দেখে, তাহারাও কেবল বর্ত্তমান বাধাটাকেই বড় করিয়া দেখে এবং কি করিয়া তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবে, সেই বিভীষিকাতেই আকুল হইয়া পড়ে। বিভীষিকা ইহাতে তো দূর হয় না; না কেননা যাহা বিকারের মূল, তাহাকে ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে শুধু এক একটা সাময়িক লক্ষণ দেখিয়া তাহারই প্রতীকারে যে সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করে, তাহাকে কে কেহ সুচিকিৎসক বলে?

অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশের পথে তাহা হইলে আমাদিগকে এই কয়টী কথা তলাইয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, আমরা যে প্রকৃতির অনুবর্ত্তী, জীবনে এই কথাটার চেয়ে আমাদের যে স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আছে, এই কথাটারই মূল্য বেশী। কেননা, স্বাতন্ত্র্য একটা দেহাতীত রূপাতীত বস্তুর ইঙ্গিত আমাদের কাছে আনিয়া দেয়। এই দেহাতীতের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বোধে পরিস্ফুট হইয়াছে।

আবার এই স্বাতন্ত্র্যাভিমান হইতেই জীবনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি—সে দ্বন্দ্ব অন্তরে এবং বাহিরে। ইহার মধ্যে মানবেতর অভিব্যক্তির আদিতে বাহিরের দ্বন্দ্বটাই জড়রাজ্যে ও অধ্যাত্মরাজ্যে উভয়ত্র প্রকট হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং এখানে আবার আমাদের নূতন করিয়া একটা যুদ্ধক্ষেত্রের সৃষ্টি।

দেহাতীতকে সহজ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে যাইয়াই এই যুদ্ধের সূত্রপাত। অধ্যাত্মজীবনের প্রকৃত আরম্ভ এইখানে। এইখান হইতেই প্রাকৃত মানুষকে তাহার দৃষ্টি প্রাকৃত ভূমি হইতে পরাবর্ত্তিত করিয়া, অপ্রাকৃত হইতে প্রাকৃতভূমিতে সৃষ্টিধারা কি করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি—ইহা অপ্রাকৃতের প্রতি হৃদয়ের সহজবুদ্ধি প্রণোদিত শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার সম্বল লইয়া আবার প্রাকৃত বাধার সঙ্গে লড়াই সুরু করিতে হইবে—তবেই বাধা দূর হইয়া যাইবে। নতুবা প্রাকৃতভূমিতে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শক্তিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

সমস্যা পূরণ

—*—

সমস্যার কথা বলেছি, এখন তার পূরণের উপায় কি, তাই বল্‌ছি।

(১) এই যে একটা অন্ধ সংস্কার রয়েছে যে, ভারতবর্ষ হতে এক পা বাইরে বাড়ালেই তোমার স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত আটকা পড়বে—এই সংস্কারটা এ দেশ হতে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। এ দেশে যাদের স্থান অকুলান হচ্ছে, তারা বেরিয়ে পড—বাইরে ছড়িয়ে পড়। সেই গল্পে শোনা কুয়োর ব্যাঙ হয়ে তোমার কি সুখ? সবাই মিলে যে ভারতবর্ষকে তোমরা রুদ্ধ-বায়ু অন্ধকূপ করে তুলছ, এ কি আর চোখ মেলে কোনও দিন দেখবে না?

(২) এমন একদিন ছিল, যখন এখানে যাঁরা আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁদের পক্ষে বহুপুত্রের পিতা হওয়া সৌভাগ্যের কথা ছিল। কিন্তু সে দিন চলে গিয়েছে—এখন আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; আজকাল গোষ্ঠী বড় হলে সেটা বিধাতার অভিশাপ। আর পরিণাম চিন্তাহীন যে সমস্ত অজ্ঞেরা মনে করে, ছেলে হলেই তবে তাদের স্বর্গ মিলবে, একবার মরবার আগেও তারা চোখ দুটো খুলে চেয়ে দেখুক, বংশবিস্তার করে করে ভারতবর্ষে আজ গৃহস্থালীকে তারা কি নরককুণ্ড করে তুলেছে। এমনি করে যারা কাম-ভোগপ্রদ স্বর্গের কামনা করে, গীতায় যখন ভগবান তাদের নিন্দা করেছেন (গীতা ২।৪২-৪৫), তখন অর্জ্জুনের একটা কুতর্কের উপরই তিনি কটাক্ষ করেছিলেন। অর্জ্জুন তর্ক করেছিলেন যে পুত্র-লাভেই মানুষের স্বর্গ লাভ হয়। তোমাদেরও ঐ শ্লোকগুলি বেশ করে পড়ে দেখা উচিত এবং তার মাঝে যে মহত্ত্ব রয়েছে, তা প্রাণে প্রাণে বোঝা উচিত।

বিয়ে কর—পশুর মত বংশবৃদ্ধি কর—কায়ক্লেশে বেঁচে থাক—তারপর বন্ধনদশায় অক্কা পাও—এই হচ্ছে এদেশের নীতি, এত দিন ধরে এই শাসন আমরা মেনে এসেছি। আজ দেশ হতে এই বিষ আমাদের নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমরা কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই খালাস। কখনো বলি, মুসলমান শাসনই আমাদের অবনতির মূল, কখনো বা বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে দোষ দিই, কখনও বা ভারতবর্ষের ধর্ম্মগুলিকে গাল দিই, আবার কখনও বা শিক্ষাপদ্ধতির কাঁধে চেপে বসি। হতে পারে, এ সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার মাঝে কিছু সত্য আছে। কিন্তু আসল গলদ হচ্ছে আমাদের, যে-সম্বন্ধে আমাদের সৃষ্টি-পুষ্টি, যে সম্বন্ধের উপরেই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীর মাঝে যা নাকি সব চেয়ে পবিত্র, সব চেয়ে পুরাতন সম্বন্ধ—সেই যৌন সম্বন্ধকে যে আমরা অশুচি করে তুলেছি, এই হচ্ছে আমাদের গোড়ার গলদ। মানবসংস্কারের মাঝে এই যৌন-সংস্কারই হল সব চেয়ে পবিত্র এবং সব চেয়ে গুরুতর; আবার এর মর্য্যাদা রক্ষা করবার বেলাতেই আমরা সব চেয়ে অসংযত, অবৈজ্ঞানিক, নির্লজ্জ। যতই না কেন কোষ্ঠী আর জ্যোতিষ গণনার আড়ম্বর কর আর যতই না কেন মাঙ্গল্যানুষ্ঠান কর—বেদমন্ত্র পড়ে

নানা যাগ-যজ্ঞ করে বিবাহটাকে জাঁকিয়ে তোলবার চেষ্টা কর—তবু বল্‌ব বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিবাহ অকালোচিত, অশুভ এবং অশুচি। যখন গ্রহ-দেবতার দোহাই দিয়ে কাঁচ বয়সের ছেলে-মেয়েকে বিবাহের নামে জুড়ে দিই, তখন থেকেই ঘরে অলক্ষ্মী ঢোকে; আর সে ঘরে গ্রহ দেবতার শুভ দৃষ্টি থাকে কি করে? তারা এ দৃশ্য দেখে লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যান—কেন না পশুর মাঝেও তো এমনটী দেখা যায় না। নিজকে ধারণ করবার বয়স যাদের হয়নি, এমন ছেলে-মেয়ের পুরোহিত যখন হন, তখন বেদমন্ত্র আর কিছুতেই সে অকাল বিবাহের অনু-মোদন করতে পারে না—তার সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হয়ে যায় আর ভবিষ্যতে সমস্ত জীবন ধরে তার ফল বন্ধ্যা হয়ে থাকে। ধর্ম্মলক্ষ্মী অনুষ্ঠানাডম্বরের মাঝে মানুষ যখন বিত্তহীন দুটী দুর্ভাগাকে বিবাহের নামে মিলিয়ে দেয়, আর তার ফলে দেশে কেবল অসমর্থ, আতুর, অযোগ্য বিলাসক্তদের বংশ বেড়েই চলে, তখন কি করে এ কথা মানব যে, এমন পূতিগন্ধের মাঝে বিয়ের ফুলের সৌরভ আর সৌন্দর্য্য বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে!

হে তরুণ ভ্রাতৃ—থামাও, থামাও—এ অত্যাচার থামাও। তোমরা যুবক, ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতেই—তোমরাই এ কুপ্রথার উচ্ছেদ কর। ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে নিজের কথা ভেবে, বংশের কথা ভেবে এই নির্বিচারে অসময়ে অন্ধভাবে বিবাহ করার প্রথা উচ্ছেদ কর। এতেই জাতির জীবন পবিত্র হবে আর প্রজাবৃদ্ধি সমস্যার কথঞ্চিৎ মীমাংসা হবে।

তুমি কি মনে কর, এ সমস্ত কথার কোনও মূল্য নাই? দেখছ না কি, অন্ধ-অনুষ্ঠানের ফলে দুর্ভিক্ষে তোমায় শুকিয়ে মরতে হচ্ছে—মৃত্যু তিল তিল করে তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। এর মাঝে অতি-রঞ্জন তো কিছুই নাই। অতি কঠিন সত্য, বাস্তবের নিদারুণ বিভীষিকা এর মাঝে যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শিশু সন্তানের বিবাহ আর কন্যাবস্থাতেই বৈধব্য—জগতের মাঝে এ দুটী ব্যাপারই কি সবচেয়ে বিসদৃশ নয়? জগতের যে কোনও সভ্যজাতিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তোমাদের মাঝে মনুষ্যবীর্য্য আছে বলে কেউ স্বীকার করবে? তাই যদি হয়, তবে এই অমাঙ্গলিক, অস্বাভাবিক প্রথার ধ্বংস না করে কি করে তুমি স্থির হয়ে আছ? ঐ দেখ, বৈধব্যহত শিশু কন্যার কোমল বাহুলতা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত—তোমার আশ্রয় ভিক্ষার জন্য!—তোমার দেশাচারের চিতানলে চোখের সম্মুখে তিল তিল করে জীবন্ত সতীর দাহ হচ্ছে—ঐ তার অশ্রু-সজল করুণাহীন দৃষ্টিতে দেবতার করুণ জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছে—সে তোমার আশ্রয় চায়!—তুমি তার দেবতার মান কোথায় রাখলে? এই যে ভগবানের রোষক্ষুব্ধ হুহু-ঙ্কার—কতদিন আর তুমি এর প্রতি বধির হয়ে থাকবে? তারই মর্ম্মভেদী আহ্বানকে উপেক্ষা কর—দেখবে স্নেহময়ী জননী রক্ত-পিপাসিতা প্রতিহিংসালোলুপা করালিনী হয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন—তাঁর প্রাণময়ী দৃষ্টিতে পৃথিবী কম্পিতা। তোমরা বলছ—শান্তিঃ—শান্তিঃ—কিন্তু কোথায় শান্তি—যতদিন স্বেচ্ছায় এই করাল মূর্ত্তিকে গৃহপ্রাঙ্গনে ডেকে এনেছ?॥

ইউরোপে মানুষ যত হীন অবস্থায় পড়ে, ততই অল্প বয়সে তাদের বিবাহ হয়। কিন্তু তবুও তাদের মাঝেও যারা হীনাদপি হীন,

তারাও ভারতবাসীর মত এত কচি বয়সে বিবাহ করে না। উচ্চ শ্রেণীতে ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে কদাচিৎ কেউ বিবাহ করে। তাদের লক্ষ্য, সন্তান সংখ্যায় কম হবে, কিন্তু সামর্থ্যে যোগ্যতর হবে।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁর জীববিজ্ঞান-তত্ত্বে প্রমাণ করেছেন, মানুষের মানসিক শক্তি যত বাড়বে, তার প্রজনন শক্তিও তত সংযত হবে। আমরা যে কেবল পশুর মত প্রজনন শক্তিকেই বড় করে তুলছি—এ নীচতা হতে কি আর আমরা অব্যাহতি পাব না? আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের শতমুখে প্রসংশা রয়েছে; সেই শাস্ত্রই বলছেন, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত দৈহিক কি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ অসম্ভব। মানুষের যে শক্তি যৌন ব্যাপারে প্রজনন শক্তিরূপে প্রকাশ পায় বা যৌন-চিন্তা করতে দিতে যা অপব্যয়িত হয়, তাকে সংযত করে নিজের আয়ত্তে আনলে তাই **ওজঃ রূপে** পরিণত হয়—যা নাকি অধ্যাত্মশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার।

যৌনবৃত্তির উপর তোমাকে প্রভুত্ব স্থাপন করতেই হবে। যে মূঢ়, সে তার পশুবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখতে পারে না। যে যৌনসম্বন্ধ প্রকৃতির সব চেয়ে পবিত্রতম সম্বন্ধ, তাই নিয়ে যে হতভাগ্য কেবল ছিনিমিনি করে, সে জানে না যে তিল তিল করে সে তার রক্তমোক্ষণ করছে—যে শুভ্র রক্তবিন্দুতে তার জীবনীশক্তির প্রতিষ্ঠা, তারই সে অপব্যয় করছে। এই ভাগবতী শক্তির অপব্যবহারই হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল। প্রবৃত্তিকে পাশব বলে আমরা তার জঘন্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করি। নির্ব্বিচার যৌন সম্পর্কের দরুণ পশুর মাঝে হীনতা ও লঘুতা রয়েছে, তা না হয় স্বীকার করলাম। তারা অতিরিক্ত মাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে জীবন-সংগ্রামকে দিন দিন সঙ্কুল করে তোলে—তাই নীতির নিক্তিতে ওজন করে তাদের চলনকে আমরা গাল দিতে পারি। তবুও কেবল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—এমন অপবাদ পশুকে তো আমরা দিতে পারি না। মানুষ পশুর চেয়ে নিজেকে উন্নত বলে বড়াই করে, কেননা তার প্রবৃত্তির উপর সে বিচারের রাশ টানতে পারে। কিন্তু সেই মানুষই যখন নির্ব্বিচার বংশবিস্তারে পশুকেও টেক্কা দিয়ে যায়, নিষ্প্রয়োজনে এবং অশুচি-চিত্তে প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় পশুকেও যখন সে হার মানায়, তখন বিধির বিধানে সে যে অধঃপতিত হীনাদপি হীন হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

চাই ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য। প্রাণপণ চেষ্টায় তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ক্রমবিবর্ত্তনের নিষ্ঠুর চক্র-পেষণে তোমাদের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে, যদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতে না পার। তোমাদের সমস্ত আশা ভরসার ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য। ক্রমবিবর্ত্তনের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে, অসভ্যদের মাঝে যেমন নিকট রক্ত-সম্পর্ক থাকলে যৌনবৃত্তিকে সে ক্ষেত্রে সংযত রাখাই প্রথা দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আজও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন অব্যাহত রাখতে হলে তোমাদেরও শুচি মন ও শুচি দেহ নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। হে ভারতবাসী, এর অভাব হলে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। এ সহজই হোক্ আর কঠিনই হোক—তোমার দেশের জন্য, তোমার দেহের জন্য, তোমার ধর্ম্মের জন্য, ইহকাল পরকালের জন্য তোমাকে অটুট ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য

না থাকলে শৌর্য্য কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য না না থাকলে একতা কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে শান্তি কোথায়?

(৩) **শিক্ষা**—আমেরিকা বা ইংলণ্ডের সাধারণ লোকেরাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের চেয়ে বুদ্ধিবিবেচনা বেশী রাখে। কেন এমন হয়? তার মার্জ্জিত বুদ্ধির একটা নিদান হচ্ছে সুলভ দৈনিকপত্র প্রচার। আমাদের দেশের কালেজে যে বিদ্যা প্রচার হয়, আমেরিকা, জাপান বা ইংলণ্ড সংবাদপত্রের সাহায্যে তার চেয়ে বেশী জ্ঞান বিস্তার হয়। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবিস্তারের জন্য যা করছেন, তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র নিশ্চয়ই। কিন্তু আসলে এটুক কাজ দর্কারের আধাই নয়। আমাদের জনসাধারণ যে এমন অশিক্ষিত—আমাদের স্ত্রীজাতির মাঝে যে এমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভীষণ দুর্গতি—তার জন্য দায়ী তো আমরাই। কুক্রিয়ায়, কদাচারে, জড়তায় যে জীবনীশক্তির ক্ষয় আমাদের দেশে হচ্ছে, তা দিয়ে আমাদের স্ত্রীজাতির অবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন, সর্ব্বসাধারণের মাঝে শিক্ষাবিস্তার প্রয়োজন, আত্মোন্নতি প্রয়োজন, দেশের উন্নতি করা প্রয়োজন।

এর একটা খুব সহজ এবং আশুফলপ্রদ উপায় হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলির উন্নতি করা। দেশীয় ভাষাতে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নূতন নূতন সংবাদপত্রের প্রচার কর, আর যে সমস্ত পত্র চলছে, তাদেরও যথাসাধ্য উন্নতি কর। এ সম্পর্কে যে সামান্য একটু-আধটু চেষ্টা হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে এই জন্য যে, শিক্ষিতদের মাঝে অগ্রগণ্য যাঁরা, তাঁরা দেশীয় ভাষাকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করে চলবারই চেষ্টা করেন।

মাতৃভাষাকে তোমাদের শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। এবার আমি পঞ্জাবের কথাই বলছি। এখানকার Youngmen's Indian Association খুব সরল হিন্দীতে কিম্বা নাগরী অক্ষরে ছাপানো সরল পঞ্জাবী ভাষায় একখানা পত্রিকা বের করুক। তার মাঝে ফার্সী বা সংস্কৃত শব্দের জাঁক মোটেই থাকবে না। যে বিষয় তোমরা নিজেরা বোঝ না বা জান না, তাই নিয়ে আড়ম্বর করবার কু-অভ্যাস ছাড়তে হবে। খুব অনায়াস চেষ্টায় লিখে যাবে যা ভাবছ তাই লিখবে কারু অনুকরণ করতে যেও না। কলেজের ছেলেরাও তো ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে পারে। নিজেরা পড়াশুনা করবার বেলায় যদি কোনও উচ্চ ভাব বা উচ্চ চিন্তা কোথাও পেয়ে থাক, তাহলে মাতৃভাষায় তা প্রকাশ করবার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করা উচিত। এতে পাঠকদের চেয়ে তোমাদের উপকার হবে বেশী, যদিও কেউ এমন ভাবতে পারে যে, লেখকের চেয়ে এতে পাঠকের উপকার বেশী। তবে এ কাজে খুঁটিনাটির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই।

প্রথম সংখ্যার গোড়াতে হিন্দী বর্ণমালা আর সহজ ও পরিচিত হিন্দী শব্দের একটা পাঠ থাকলে ভাল হয়। তারই সাহায্যে কলেজের ছেলেরা তাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা বা অন্যান্য আত্মীয় স্ত্রীলোকদের একটু আধটু লিখতে পড়তে শিখাবে। এই কলেজের ছেলেরাই হল দেশের শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রদূত—এ কাজে তাদের আনন্দ তো হবারই কথা।

সরকারী ইস্কুলের ভরসায় বসে থাকলে চলবে না—এই মহৎ দায়িত্ব তোমাদেরই বহন করতে হবে। ভারতবর্ষকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে তার সর্ব্বত্র স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার করা প্রয়োজন। তবে আর তুমি কেন সে কাজে আগে বাড়াবে না? সমস্ত প্রদেশে একটী স্ত্রী, একটী পুরুষও যেন নিরক্ষর না থাকে, তারই চেষ্টা আগে করতে হবে। দেশের বুকে যে অশিক্ষা আর অজ্ঞানের কলঙ্ক রয়েছে, তা মুছে ফেলতেই হবে। যে তার বাড়ীর পাশের হাড়ি-ডোমকে শিক্ষা দিতে কি তোমার লজ্জা হয়, ভয় হয়? ছি: শত ধিক তোমার ভদ্রতায় আর নীতি শিক্ষায়। যারা দরিদ্র, অশিক্ষিত—মায়ের মত ভালবাসা দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে তাদের শিক্ষা দাও। এ কি কম পুণ্যের কাজ?

তোমাদের যুবক-সমিতির মুখপত্রে ক্রমে পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, জ্যোতিষ, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রাথমিক পাঠ হিসাবে আলোচনা আরম্ভ কর। প্রথমে যতটুকু সাধ্য সহজ ভাষায় আগ্রহ জাগাবার মত করে লিখতে আরম্ভ কর - ক্রমে রচনার রীতি পাকা হয়ে আসবে। এই পত্রিকায় বাম হিন্দী অক্ষর ব্যবহার করতে বলেন, কেননা হিন্দী যে কালে ভারতের জাতীয় ভাষা হয়ে উঠবে, তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। স্ত্রীজাতিকে ও সাধারণ লোককে শিক্ষা দেওয়া তোমার এক প্রধান কর্ত্তব্য—এই কর্ত্তব্য যথারীতি পালন করতে পারলে পরিণামে তোমারও প্রচুর মঙ্গল হবে। কিন্তু এর চেয়েও কাযাকরী এবং প্রয়োজনীয় আর একটা কাজ যে রয়েছে, তাও যেন ভুলে যেও না—অন্যান্য উন্নত দেশে গিয়ে কৃষি ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা কর, সে শিক্ষা দেশময় ছড়িয়ে দাও।

(৪) *প্রশ্ন*—এ সব কথা শুনতে শুনতে কি বড় অধীর হয়ে পড়ছ—আমার রচনাটা কি বড় দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে? তা যাই হও না কেন, তবু তোমাদের শেষ পর্য্যন্ত মন দিয়ে শুনতে হবে। যে একটী কথা বাম জানেন, সে কথাটী তোমাদের না শুনিয়ে তিনি তো ছাড়বেন না। ওহে নবযাত্রীর দল তোমাদের কি বিশেষ ঠেকা কাজ বাকি রয়েছে এখন? হতে পারে, কিন্তু তবু এই বুড়ো মাঝি আজ তোমাদের ছাড়বে না—তার শেষের কথাটী তোমাদের শুনে যেতেই হবে। বামের এ কথাটী শোনার চেয়ে তোমার কোনও গরজই বেশী হতে পারে না।

পারিবারিক, সামাজিক বা জাতীয় যে কোনও কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমার কর্ম্মকাণ্ড; কিন্তু কোনও মহৎ কর্ম্মই তো আঁধারে আঁধারে করা চলে না। তবে হাঁ পিশাচের কর্ম্ম আঁধারেই হয় বটে। শ্রদ্ধার শিখাটী প্রাণে উদ্দীপ্ত না রেখে, বিশ্বাসের দীপটী অন্তরে না জ্বেলে তুমি কিছুই করতে পার না—এ ছাড়া এক পা ও অগ্রসর হবার যো নাই তোমার। এই যে খুঁটিনাটী আদেশ আর উপদেশ নিয়ে দিনরাত তোমাদের কানের কাছে ভজানো হচ্ছে এ সবই হলো তোমার জীবনের স্থূলভাগটা—দেহটা। কিন্তু আত্মা না থাকলে তো দেহ দাঁড়াতে পারে না। সকল কর্ম্মের সিদ্ধির মূলে হচ্ছে শ্রদ্ধা আর জ্ঞান—তাই হল কর্ম্মের আত্মা। জড়বাদী, সংশয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, নিরীশ্বরবাদী, অজ্ঞেয়বাদী ইত্যাদি সকল বাদীই—তাদের মতবাদে যে জীবন্ত ভাব রয়েছে, অজ্ঞাতসারে তাকেই মেনে চলে। অনেক সময় দেখা

গিয়েছে ধর্ম্মের ধুরন্ধরদের চেয়ে তাদের শ্রদ্ধার পরিমাণই যেন বেশী।

ধর একটা রবারের কারখানা রয়েছে। হাজার হাজার লোক তাতে কাজ পাচ্ছে, দেশে বাণিজ্য বিস্তার হচ্ছে, ধনবৃদ্ধি হচ্ছে, দরিদ্র শ্রমিক-সম্প্রদায়ের উন্নতি হচ্ছে, জাহাজ কোম্পানী, রেল কোম্পানী, পোষ্টাফিস ইত্যাদি অনেক কারবারেরই তার দরুণ কাজ বাড়ছে, আয় বাড়ছে। এই সমস্তই যে হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে একটী রাসায়নিক সূত্র। সেই অদৃশ্য রাসায়নিক ক্রিয়াটী যদি না চলত, তা হলে এত জাঁক আসত কোথা হতে? তেমনি তোমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনও কাজই এগুবে না—যদি অন্তরের সেই শক্তির সঙ্গে, মহিমার সঙ্গে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তার যোগ না ঘটে। সেই হচ্ছে তোমার হৃদয়ের আবর্ত্তন, মনের খোলস বদলানো—সেই তোমার আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য—তোমারি অন্তরের অন্তরে ভাগবত বিবর্ত্তন। কার্লাইল বলেছিলেন, "শ্রদ্ধাই হচ্ছে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।" যে জাতির মাঝে শ্রদ্ধা যতটুকু, তার ইতিহাস ততখানি মহান, ফলপ্রসূ, আত্মার উন্নায়ক। এই যে আরবেরা ছিল—তার মাঝে একটী মানুষ এলেন মহম্মদ—তার পর এক শতাব্দীর আশ্চর্য্য বিবর্ত্তন। এ দেখে মনে হয় না কি, এ যেন একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ: যা নাকি আঁধারে কালো হয়েছিল, তার মাঝে কোথা হতে একটী আগুনের ফিন্‌কি ছুটে পড়ল। কিন্তু তাতেই আরবের মরুভূমির বালি বারুদের মত জ্বলে উঠলো—দিল্লী হতে গ্রানাডা পর্য্যন্ত তার শিখা আকাশ স্পর্শ করে লক্ লক্ করে উঠলো।—আল্লাহো আকবর—ভগবানের চেয়ে বড় আর কিছুই নাই।

যা বাস্তবিকই মহৎ, তার উদ্ভব হয় অন্তরের গোপন গভীর উৎস হতে। যে সম্পূর্ণরূপে ভাগবত ভাবে নিজকে নিমজ্জিত না করেছে, অন্ততঃ আংশিকরূপে সে ভাব ধারণ করেও সিদ্ধির জন্য অবিরাম চেষ্টা না করছে, সে যেখানেই থাক না কেন, যত জাঁকজমকই থাক না কেন, তার সত্তার কোনও মূল্যই নাই—সে জীবিত নয়, মৃত।

এমন কি হার্বার্ট স্পেন্সার পর্য্যন্ত তাঁর শেষ গ্রন্থে যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন, সে যেন রাজহংসের মৃত্যুসঙ্গীতের মত। হাঙ্গরীর বহুমস্তিষ্কবিশিষ্ট কোন এক প্রাণীর পরীক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্সার বলেছেন, "আমাদের চিন্তাধারা—চেতনাশক্তি ভাবকে আশ্রয় করেই রয়েছে; আর যাকে বলছি বুদ্ধি, সে হচ্ছে শুধু বাইরের খাপটা। অন্তঃকরণের কথা বলতে গিয়ে ভাবের উল্লেখ আমরা প্রায়ই করি না, কিন্তু সেই হল তার আসল জিনিষ। ভাব হচ্ছে প্রভু, আর বুদ্ধি যেন তার ভৃত্য।" সাধারণ লোকে ভাবকে হৃদয়ে স্থাপনা করে—সেখানেই শ্রদ্ধা আর ধর্ম্মবুদ্ধির আশ্রয়—ওখান হতেই মানুষ কাজের প্রেরণা পায়, কাজ করবার শক্তি পায়।

স্পেন্সার আরও বলেছেন, "যদি চাকরেরই (মস্তিষ্ক) তোয়াজ কর আর মনিবকে (হৃদয়) খেয়ালে না আন, তাহলে কিছুই ফল হবে না।" স্পেন্সার ছিলেন সংশয়ীদের পাণ্ডা আর জেম্‌স্ হচ্ছেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের পাণ্ডা; অথচ দুজনের সিদ্ধান্তে কি আশ্চর্য্য মিল! জেম্‌স্ বলছেন, "অধ্যাত্ম অনুভূতি যে-কোনও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মতই নিঃসন্দেহে প্রমাপক বলে গণ্য হতে পারে; বরং তর্ক দিয়ে আমরা যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করি, অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রামাণ্য তার চেয়েও বেশী।" বাগাড়ম্বরের

জগতে ভেসে না থেকে নিজের মাঝে আরও একটু তলিয়ে যাও—সেখানে দেখ, তোমার সত্তার মূল আশ্রয় কোথায়। তোমার মাঝে যে সত্য, সমস্ত প্রকৃতিতেও সেই অখণ্ড সত্য; সেই সত্যের অনুভূতিতে অবগাহিত হও—সেই সত্যস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হও!—তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রাণবন্ত বিগ্রহ হতে হবে যে তোমায়!

এইতো—এইতো জীবন—এইতো অমর জীবন—এই শক্তিরূপে প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে পড়া! এর রোষদৃপ্ত একটী দৃষ্টিপাতে ব্রহ্মাণ্ড যে চূর্ণ হয়ে যেতে পারে।—

"আমি আসছি—অনির্বাণ জ্যোতিস্ময় মহিমায়, তাই জগৎ সরে দাঁড়াচ্ছে আমায় পথ করে দিতে—আঁধারের স্তূপ কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।—

"হও না তুমি অভ্রভেদী গিরিরাজ, সাবধান—সাবধান! আমার পথরোধ করবার দুঃসাহস যেন করো না—তোমার পঞ্জরাস্থি খণ্ড-বিখণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।—

"রাজা তুমি?—তুমি সেনানী?—আমার খেয়াল খুসীর খেলার পুতুল যে তোমরা! এই যে দেখ প্রলয়বন্যার বহ্নিস্রোত গর্জ্জে আসছে!—পথ দাও—পথ দাও!—

"আমারি রথচক্রের সাথে বিধির বিধান, দেবতার লীলা আবর্ত্তিত হচ্ছে!—বজ্র-নির্ঘোষে আমারি মহিমা আকাশের প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে!—

"দূর কর—দূর কর ছার এ মায়ার ঘোর—জাগো বীর—জাগো—ছেঁড় বাঁধন!—বাঁধনহারা—মুক্ত তুমি—মুক্ত তুমি!—

এই যে জ্ঞান—যার একদিকে রয়েছে ক্ষয়হীন বিপুল শক্তি, তারই আর একদিকে রয়েছে সুস্নিগ্ধ অবিচল শান্তি।

"অমরার শান্তিধারা ঝরে পড়ছে—যেন শাঙন রাতের টিপি টিপি বাদলের ধারার মত, ছন্দে গীতে অমৃতের ধারা এই যে গলে পড়ছে—চারিদিকে 'আজ অমিয়াধারা—'রিমি ঝিমি শবদে বরিষে!'

"মহিমা আমার মেঘের মত লঘু আনন্দে ভেসে চলেছে—তারি বুক হতে তারকাবিন্দুর মত এক একটা জগৎ ঝরে পড়ছে—চারিদিকে এই অমিয়াধারা—'রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।'"

"আমার নির্ঝরের বাদলহাওয়া ছন্দে-তালে নেচে নেচে চলেছে তার স্পর্শে ঝরা পাপড়ির মত এক একটী জগৎ ঝরে পড়ছে, চারিদিকে ওই অমিয়াধারা—'রিমি-ঝিমি শবদে বরিষে।'

"আমার নিশ্বাসের সুরভি নিশ্বাস বয়ে চলেছে কি অপরূপ ভঙ্গিমায়—তারই তালে লতার মত নুয়ে নুয়ে পড়ছে কেউ—শিশির বিন্দুর মত ঝরে পড়ছে বা কেউ!—চারিদিকে আজ অমিয়াধারা—'রিমি-ঝিমি শবদে বরিষে।'—

"আমার আলোক-সুষমা যেন ক্ষীর-সমুদ্রের মত ঢেউয়ের দোলায় নৃত্য করছে—ধীরে, ধীরে তার ঢেউয়ের মালা উঠছে, পড়ছে, নাচছে।—তারই ফেনোচ্ছল শীকর-কণিকায় অনন্ত জগতের সৃষ্টি—তারই শিকর-বাষ্পে তারকার বৃষ্টি!—চারিদিকে আজ অমিয়াধারা—'রিমি-ঝিমি শব্দে বরিষে!'

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ!*

---

*স্বামী রামতীর্থ

ভক্ত মাধবদাস

—*—

ভাণ্ডীর বনে এক উঁচু টিলা ছিল। সেই টিলার উপর এক ব্রহ্মচারী থাকিত। কি জন্য সে ঘর ছাড়িয়াছে, তা সেই জানে। মেজাজটা তার যতদূর রুক্ষ হইতে হয়—ভক্তির লেশমাত্রও তার মাঝে কেউ খুঁজিয়া পাইবে না। একলা মানুষটা, অথচ তার ঘরভরা চাল, আটা, ঘি, তেল, চিনি—যেন এক মুদীর দোকান খুলিয়া বসিয়াছে আর কি! কাজের মাঝে শুধু ভিক্ষা করিয়া ঐ সংগ্রহ করা আর তার হিসাব লইয়া মাথা ঘামানো। ভাণ্ডারের এক কণা বস্তু অতিথি-সজ্জনকে দেওয়া তাহার কুষ্ঠিতে লেখে না—পাছে কেহ চাহিতে আসে, সেই ভয়ে বেচারী টিলার উপর একটা রাস্তা পর্য্যন্ত রাখে নাই। উপর হইতে এক দড়ির শিকল ঝুলাইয়া তাহাই বাহিয়া উঠানামা করে।

ঘুরিতে ঘুরিতে মাধব সেই টিলার তলায় আসিয়া উপস্থিত। নিশিদিন মাধব কৃষ্ণ প্রেমে বিভোল, কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই—কি করিতে কি করেন নিজেই তাহার হুঁস রাখেন না—টিলার তলায় আসিয়া মাধব অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। উপর হইতে ব্রহ্মচারী তাহা দেখিল। যার যে ভয়—মাধবকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোথাকার কোন ভিখারী এখানে আসিয়া আবার আড্ডা গাড়িয়াছে—দৈবাৎ যদি কিছু চাহিয়াই বসে। ব্রহ্মচারী টিলার উপর হইতে মনের ঝাল মিটাইয়া গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল।

মাধব একটু সচেতন হইয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। সাধু সর্ব্বজ্ঞ, পরের দুর্গতিতে তাঁর প্রাণ গলিয়া যায়—ব্রহ্মচারীর দুরবস্থা দেখিয়া মনে ভাবিলেন, ইহার বিষয়াসক্তি দূর করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম শিক্ষা দিতে হইবে। কৃপালু মাধব তাহার গালাগালির উত্তর না দিয়া একেবারে টিলার উপরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী তো রাগিয়া অস্থির। মাধব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কিগো, আমাকে দেখিয়াই যে অত গালাগালি দিতেছ, ব্যাপারখানা কি? ও হরি! তাই তো, তোমার ঘরে এত জিনিষ মজুত রাখিয়াছ! —বেশ, বেশ, এতে বহুদিন সাধু-সজ্জনের সেবা চলিবে।"

মাধবের কথায় ব্রহ্মচারী দাঁত মুখ খিঁচাইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া মারিতে আসিল। মাধব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার এ কেমন ব্যবহার ভাই? ঘর বাড়ী স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া আসিয়াছ—তবে আর গোলা বাঁধিয়া এ সব জিনিষ জমা করিয়াছ কাহার জন্য? নিজেও খাইবে না, অতিথি সজ্জনকেও এক কণা দিবে না, তবে আর এ সঞ্চয়ে তোমার ফল কি?"

কিন্তু কার কথা কে শুনে? কিছুতেই ব্রহ্মচারীকে রাগ মানাইতে না পারিয়া অগত্যা মাধব একটু মুচকি হাসিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু মাধবের কি আশ্চর্য্য বিভূতি!—তিনি চলিয়া আসিবার পরেই ব্রহ্মচারীর সমস্ত চাল ডালে পোকা লাগিয়া গেল। পোকায় একেবারে সমস্ত ঘর ছাইয়া

গেল। দেখিয়া ব্রহ্মচারীর তো হৃৎকম্প উপস্থিত! তখনি সে ছুটিয়া গিয়া মাধবের পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু, আমি অধম, না বুঝিয়া তোমার চরণে অপরাধ করিয়াছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমার সমস্ত ঘর কাঁড়ায় ছাইয়া ফেলিয়াছে— না জানি ইহার পর আর কি হয়। আমার যা আছে, তার অর্দ্ধেক তোমায় দিব, তুমি এর একটা বিহিত কর।"

মাধব বুঝিলেন, এইবার ঠিক ঔষধ ধরিয়াছে। তবুও আসক্তি এখনো যায় নাই— তাই বিপদে পড়িয়া বেচারা আধা-আধি বখরা বন্দোবস্ত করিতেছে। মাধব একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কেন ভাই, তুমি তো একলা মানুষ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সাধু হইতে আসিয়াছ, তোমার কেন এত সঞ্চয়ের পিপাসা থাকিবে? এ কি তোমার স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াইবে? বরং ভগবান্ যাহা দিয়াছেন, তাহা অভাবী সজ্জনকে বিলাইয়া দাও না কেন? বিষয় লইয়া মজিয়া থাকিবার জন্য তো সাধু হও নাই। শ্রীকৃষ্ণভজন ছাড়িয়া এ কি তুমি করিতেছ, তুমিই একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।"

মাধবের কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীর চমক ভাঙ্গিল। মাধবের পায়ে পড়িয়া সে বলিল, "আমার অপরাধের দণ্ড তুমি বিধান করিয়াছ, তুমিই আমায় উদ্ধার কর। কি করিয়া আমি ভগবানকে পাইব বলিয়া দাও।"

মাধব তখন সস্নেহে মধুরস্বরে ব্রহ্মচারীকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিষয়ের উপর টান না কমিলে ভগবানের উপর টান হয় না, তাই প্রথমতঃ তাঁহাকে বিষয় বৈরাগ্যের কথা শুনাইলেন। তার পর সাংখ্য প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপদেশ দিলেন। পরিশেষে সকল সাধনার সার শ্রীকৃষ্ণভজনতত্ত্ব উপদেশ দিলেন। সাধুসঙ্গের মহিমা তন্মুহূর্ত্তে ফলিয়া গেল। মাধবের কথা শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারীর মন ফিরিয়া গেল—শ্রীকৃষ্ণানুরাগে তাহার চিত্ত, তদ্গত হইয়া গেল।

কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনধামে থাকিয়া মাধবদাসের আবার নীলাচলের কথা মনে পড়িল —বৃন্দাবন ছাড়িয়া মাধব নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে এক শিষ্যের বাড়ী। গুরুর উপযুক্ত শিষ্য—তাঁহার বাড়ীতে গ্রামের সকল বৈষ্ণবের মেলা। সন্ধ্যা হইতেই বৈষ্ণবেরা সেখানে একত্র হন—নামগান, লীলাকীর্ত্তন, গ্রন্থপাঠ, ইষ্টগোষ্ঠিতে পরম আনন্দে রাত কাটিয়া যায়। মাধব গ্রামে আসিয়া লোকের মুখে সকল কথা শুনিয়া মনে বড় প্রীতি পাইলেন, ইচ্ছা হইল স্বচক্ষে একবার শিষ্যের গুণপনা দেখিয়া যাইবেন।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে শিষ্যবাড়ীতে গেলে গুরুকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তাহাতে ভজনের রসভঙ্গ হইবে ভাবিয়া মাধব স্থির করিলেন, ছদ্মভাবে শিষ্যের নিকট যাইবেন। এক দিন সন্ধ্যাবেলায় মাধব, যে অঙ্গনে কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহারই এক কোণে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া আসিয়া বসিলেন। অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনের সুধাতরঙ্গ উঠিয়াছে দেখিয়া মাধব আনন্দে আত্মহারা—মনে লোভ হইল, এমন বস্তুটী নিত্য আস্বাদ করিবার কোন একটা উপায় করিতে হইবে।

সঙ্কীর্ত্তনের বিশ্রামকালে মাধব শিষ্যকে গিয়া বলিলেন, "আমি একজন দীনহীন কাঙ্গাল, তোমার ঘরে একটু আশ্রয় চাই। যদি দয়া করিয়া আমাকে তোমার ঘরে রাখ,

আর শুধু দুবেলা দু'মুঠা খাইতে দাও, তবে এ কাঙালের একটা উপায় হয়। আমি না হয় তোমার গরুর সেবা করিব।"

শিষ্য আবছায়াতে গুরুকে চিনিতে পারিলেন না—কোনও গৃহহীন কাঙ্গাল ভাবিয়াই তাঁহাকে গোশালায় গরুর সেবায় নিযুক্ত হইবার অনুমতি দিল।

সেই অবধি মাধব শিষ্যের বাড়ীতে রহিয়া গিয়াছেন; সারাদিন গরু চরান আর সন্ধ্যায় সঙ্গোপনে অঙ্গনে আসিয়া কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। ক্রমে এমন করিয়া একমাস কাটিয়া গেল, শিষ্যও বড় একটা কিছু লক্ষ্য করিলেন না।

একদিন মাধবের আর একটী শিষ্য আসিয়া সে বাড়ীতে উপস্থিত। দুই গুরুভায়ে পরম প্রীতি—স্বজন পাইয়া ভক্তের ঘরে আনন্দ যেন আরো উথলিয়া উঠিল। দুই চারিদিন পরে নবাগত শিষ্যটী কি কাজে যেন গোহালে গিয়াছেন, গিয়া দেখেন, অন্ধকারে এক কোণে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এক সাধু ধ্যানে বসিয়া আছেন—দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর করিয়া ধারা পড়িতেছে। মূর্ত্তি দেখিয়া শিষ্য একটু চমকিয়া উঠিলেন, বাড়ীরই একজনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে থাকে গো?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "কর্ত্তা এক নূতন রাখাল রাখিয়াছেন, সেই এখানে থাকে।"

শিষ্যের মনে একটু সংশয় হইল, "রাখালের এমনধারা কি হয় কখনো?—এমন করিয়া ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে—দুই চক্ষে প্রেমের ধারা বহিয়া পড়িতেছে—এ মূর্ত্তি কোথায় যেন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়…… ……তাই কি?…… কিন্তু তিনি এখানে আসিবেন কি করিয়া—আর তাও কি শিষ্যের বাড়ীতে আসিয়া রাখালগিরি করিতেছেন, কেহ জানিতেছেও না? অথচ সেই মূর্ত্তি, সেই ভাব—ভ্রমই বা বলি কি করিয়া?"

নিদারুণ সংশয়ে সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে শিষ্য গিয়া গুরুভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, দেখ'সে গোয়াল ঘরে এ কে বসিয়া আছে।" তাঁহার উদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়া গৃহস্থের বড় বিস্ময় হইল, আস্তে-ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে—কে গোয়াল-ঘরে? কাহাকে দেখিলে সেখানে? বড় যে তোমায় চঞ্চল দেখিতেছি ভাই!" বলিতে বলিতে গুরুভায়ের পিছনে পিছনে তিনিও আসিয়া গোয়ালের দুয়ারে দাঁড়াইলেন।

সেখানে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তো তাঁহার চক্ষু স্থির। সর্ব্বনাশ!—এ যে গুরুদেব—এই হীন রাখালের বেশে! হায়, হায়, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়! গৃহস্থ বসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন—"মুখে নাহি সরে বাণী, মনে ধকধকি!"

গোলমাল শুনিয়া ক্রমে গোয়ালের দুয়ারে লোক জমিয়া গেল। গৃহস্থ মাধবের পায়ে পড়িয়া আর্ত্তি করিতেছেন, "হায় প্রভু, এ কি করিলে তুমি—কেন এ অভাগাকে নরকে ডুবাইলে।" চরণস্পর্শে মাধবের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল; চক্ষু মেলিয়া দেখেন, চারিদিকে বহু লোক জমিয়া গিয়াছে, আর শিষ্য দুটী তাঁহার পায়ে মাথা কুটিতেছেন। দেখিয়া মাধব লজ্জা পাইয়া ভাব সম্বরণ করিলেন।

শিষ্য চরণে পড়িয়া বিলাপ করিতেছেন, "প্রভু, তুমি এমন করিয়া আমার নিগ্রহ করিলে কেন? আমি যদি অপরাধীই

হইয়াছিলাম, তবে সাক্ষাতে আসিয়া আমাকে দণ্ড দিলে না কেন? কেন আমার এ বিড়ম্বনা—তুমি কি ভাবিয়া আমাকে এমন করিয়া ছলনা করিলে প্রভু?"

মাধবদাস ধীরে ধীরে তাঁহাকে উঠাইয়া সস্নেহে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তোমার তো কোনও অপরাধ নাই—কেন অমন করিতেছ? আমি জানি, 'তুমি মোর অতি প্রিয় গুণের সাগর'—পৃথিবীতে তোমার মত আমার কয়জনা? তোমার ভজনা দেখিবার জন্যই ছাপাইয়া তোমার ঘরে আসিয়াছিলাম। পাছে প্রকাশ হইলে রসভঙ্গ হয়, তাই অমন করিয়াছি। ইহাতে তোমার তো কোনও অপরাধ হয় নাই।"

মাধবের প্রবোধে শিষ্য আশ্বস্ত হইলেন। গুরুকে পাইয়া ঘরে যেন মহোৎসব লাগিয়া গেল—তখন, "যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কথন!"

কয়েকদিন পরে মাধবদাস আবার পথে বাহির হইলেন। মাঝে আর এক শিষ্যের বাড়ী—তিনি জাতিতে বণিক্। একবার পুরুষোত্তমধামে গিয়া মাধবকে মিনতি করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন, "একবার তোমাকে আমার বাড়ী যাইতে হইবে।" সেই অঙ্গীকার অনুসারে মাধব আসিয়া বণিকের বাড়ীতে উঠিলেন।

বণিক তখন বাড়ীতে ছিলেন না। বণিকের স্ত্রী বৈষ্ণব দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বসিবার আসন দিলেন, যত্ন করিয়া পা ধোয়াইয়া দিলেন। কিন্তু অতিথির আহারের কি আয়োজন করিবেন, ভাবিয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ইনিই যে তাঁহার স্বামীর গুরু, বণিকের স্ত্রী তাহা জানিতেন না।

ঘটনাক্রমে সেদিন এক ব্রাহ্মণ সেই বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। তিনিও মাধবের শিষ্য—কিন্তু কিছু গর্ব্বিত ও বহির্ম্মুখ। উপরে তিনি রাঁধিতেছেন, এমন সময় বণিকের স্ত্রী গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাড়ীতে আর একজন অতিথি বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহার আহারের কি উপায় করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। তিনি পথশ্রমে বড় ক্লান্ত। যদি আপনার হাঁড়িতে একমুষ্টি চাল বেশী দেন, তাহা হইলে তাহাতেই দুজনার হইতে পারে,—বৈষ্ণবকে আর তাহা হইলে কষ্ট করিয়া রাঁধিতে হয় না।"

ব্রাহ্মণ জানেন না যে মাধব আসিয়াছেন। তাই একটু রুক্ষ ভাবে উত্তর করিলেন, "আমি তোমার বস্রয়ে বামুন না কি? কে তোমার অতিথিকে রাঁধিয়া দিবে—আমি তো পারিব না। এমন কথা যদি বল, তার চেয়ে বরং তোমার এ সমস্ত সিধা লইয়া চলিয়া যাও—আমার আহারের কোনও প্রয়োজন নাই।"

বণিকের স্ত্রী আর কিছু না বলিয়া ভয়ে নামিয়া আসিলেন। মাধব নীচ হইতে সমস্তই শুনিতে পাইলেন। বণিকের স্ত্রী অগত্যা দুধ আউটিয়া তাহা দিয়াই সাধুসেবা করিলেন। দুগ্ধপান করিয়া মাধব আবার বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, পথে বণিকের সঙ্গে দেখা। বণিক পরম আদরে আবার গুরুকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন, ভক্তিভাবে তাঁহার বহু পরিচর্য্যা করিলেন।

গুরু আসিয়াছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণও নামিয়া আসিয়া গুরুর পায়ে দণ্ডবৎ করিলেন। কিন্তু মাধব তাঁহাকে দেখিয়া রুষ্টভাবে বলিতে

লাগিলেন, "তুমি নরাধম; অতিথি বৈষ্ণব-সেবার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে পার না? তোমার মত শিষ্যের আমি মুখ দেখিব না; এখানে যদি থাক তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান ছাড়িয়া যাইব। বণিকের স্ত্রী বৈষ্ণবের জন্য এক মুঠা চাল তোমার হাঁড়িতে দিতে চাহিয়াছিল, আর তুমি তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলে? আমার স্বার্থে আমি কিছু বলিতেছি না—কিন্তু বৈষ্ণবের প্রতি তোমার এই ব্যবহার? তোমার মত বহির্ম্মুখ দুরাচার কখনও শ্রীকৃষ্ণ ভজনের অধিকারী হইতে পারে না। তুমি দূর হও আমার সমুখ হইতে।"

ব্রাহ্মণ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া মাধবের চরণে পড়িয়া নানা কাকুবাদ করিতে লাগিলেন। মহাজনের ক্রোধ আর কতক্ষণ থাকে? শিষ্যের অনুতাপ আসিয়াছে দেখিয়া মাধব প্রসন্ন হইলেন ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এবার জন্মভূমির অভিমুখে চলিলেন, উদ্দেশ্য পূর্ব্বাশ্রমে গিয়া মাতার চরন দর্শন করিবেন।

মাধব মাতার কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন, মাতাও পরম স্নেহে পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু মাধবের মা যিনি—তিনি তো মাধবের মত সন্তানেরই মাতা—তিনিও "ভজনানন্দ ভাগবতোত্তম।" পুত্রকে দেখিয়া মায়ের আনন্দ হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু আশঙ্কাও জন্মিয়াছে। পুত্র পূর্ব্বাশ্রমে আসিয়া পাছে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে মাতা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মাধব, এখানে তোর ঘর-বাড়ী স্ত্রী-পুত্র সকলই রহিয়াছে—এখানে আসাটা তোর ভাল হয় নাই। মানুষের মন কখন কি হয় বলা যায় না—হঠাৎ মোহ জন্মিতেও আটক কি? তাই বলি, তুই এখনই এখান হইতে চলিয়া যা—আর এক মুহূর্ত্তও তোর এখানে থাকা উচিত হইতেছে না।"

মাধব আর কথাটী না বলিয়া হাসিমুখে মাতাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। ধন্য মাতা—ধন্য সন্তান!

নীলাচলে বহুদিন পরে মাধব ফিরিয়া আসিয়াছেন—জগন্নাথের মুখে হাসি আর ধরে না। আবার দুই সখাতে পীরিতির লীলা পীরিতির খেলা চলিতে লাগিল।

ভারতবর্ষের সাধনা

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"—মানুষ বিত্ত দ্বারা তৃপ্ত হইবার নয়—জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতবর্ষের এই সিদ্ধান্ত। আজ বিত্তমোহে যখন সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, তখন বিত্তের প্রতি ভারতবর্ষের এই অনাস্থাকে কেহ যথার্থভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ স্থবির ভারতবর্ষের ধমনীতে রক্তস্রোত আজ ক্ষীণ হইয়া বহিতেছে, আজ যদি তরুণ জগতের অদম্য কর্ম্মোচ্ছ্বাসের দিকে তাকাইয়া সে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে যায়, তবে তাহার কথায় অপরে হাসিবে মাত্র—যৌবনের মত্ততার কাছে বার্দ্ধক্যের স্থিরপ্রজ্ঞা কিছুতেই শ্রদ্ধা পাইবে না। এর সঙ্গে আরও একটা কথা আছে। বিত্তের সঞ্চয় উজাড় করিয়া দিয়া ভারতবর্ষ যে বৈরাগ্যের পরম নিধি অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করে, অপরে বলে এই বৈরাগ্যের প্রতি লোলুপতাই নাকি তাহাকে এমনি করিয়া কাঙ্গাল করিয়াছে—ইহার জন্যই বীরভোগ্যা বসুন্ধরার উৎসবাঙ্গনে আজ সে পরমুখাপেক্ষী, অপাঙ্‌ক্তেয়।

আমাদের যে দৈন্যদশা, অপরের সঙ্গে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে গিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বৈরাগ্য চির অভয়, বীর্য্যশালী, বিত্তের ঝুলি রিক্ত হইলেও তাহার দান। কবিরার ক্ষমতা অসীম;—কিন্তু এর মাঝে কোন গুণটা আজ আমাদের আছে? সর্ব্বোপরি আমরা অতৃপ্ত। বিত্তকে যে ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে বিত্ত হইতেও একটা মহত্তর তৃপ্তি নিজের মাঝে পাইয়াছিল;—কিন্তু আমাদের মাঝে সে তৃপ্তি কোথায়? বিত্তসঞ্চয়ের সামর্থ্য আমাদের নাই, তাই আমরা তৃপ্ত; কিন্তু সঞ্চয়ের সুযোগটুক্ যদি আসিয়া জুটে, তবে অন্তরের বীর্য্যশালিনী প্রজ্ঞার বলে আমরা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারি কি? ভিখারীর মত লোলুপ হইয়া পরের উচ্ছিষ্টটুকু লইয়াই কাড়াকাড়ি জুড়িয়া দিই না কি?—এই আমাদের জাতিগত স্বভাব; ইহাকে বৈরাগ্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া পরের কাছে নিজকে ফাঁপাইয়া তোলার চেষ্টা মিথ্যাচার—কাপুরুষতা।

তাই ভাবি, গলদ আমাদের এক জায়গায় আছেই। অথচ জগৎ জুড়িয়া আর সবাই যে পথে চলিয়াছে, আমাদেরও সেই পথ ধরিলে চলিবে না। এখানকার আবহাওয়ার গোলযোগেই এই ব্যাধির সৃষ্টি, ইহার ভেষজও এখানেই খুঁজিতে হইবে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা তাহার চরম পরিণতি পর্য্যন্ত সঙ্গী হইয়া আসে, তার পরই হয়ত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সেটা মোড় খাইয়া বাঁকিয়া যায়। এই বাঁকটুকু সোজা করিতে হইলে একেবারে মূলে হাত না দিলে তো চলিবে না—কার্য্য-কারণের সূত্র ধরিয়া পরিণতির চরম অঙ্ক হইতে বিকৃতির বর্ত্তমান স্তর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতে হইবে। একটা জাতির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিটুকু থাকা চাই।

কিসে কি হইল, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়—কিন্তু মূলটা কি, তাহাই

আমরা বুঝিতে চাই। সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির যোগ আছে, সেই জন্য প্রত্যেক ব্যষ্টি জাতিরই সমষ্টি জগতের ইষ্টসিদ্ধির পক্ষে একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব সকলে এক রকমে বহন করে না। সমষ্টির ধর্ম্মের সঙ্গে যাহার যোগ যত নিবিড়, বিবর্ত্তনের পথে কালের সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনাও তত অধিক। কোনও গাছ আপনাকে ধ্বংসের মাঝে বিসর্জ্জন দিয়াও প্রকৃতির সঙ্গে আপনার দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইয়া লয়। নিজে মরিয়াও বীজের মাঝেও কেহ বাঁচিয়া থাকে—আবার কেহ তাহাও থাকে না। জগতে ইহাদের যে কি প্রয়োজন ছিল, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনে গুহাহিত প্রাকৃতশক্তি বিচিত্র আকারে স্ফূর্ত্ত হইতেছে, তাহার সকলগুলিই কি আমরা চিনিতে পারি?—হয়ত প্রাকৃতিক সান্দ্রীকৃত শক্তির স্ফুরণই তাহার প্রয়োজন। যাক সে কথা!

কিন্তু কেহ কেহ বাঁচিয়া থাকে বনস্পতির মত। সে আপনাকে ধ্বংস করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সমাপন করে না—আপনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শাখা হইতে মূল বাহির করিয়া পৃথিবীর সঙ্গে সে সংযুক্ত হইয়া থাকে। কালে হয়ত তাহার আদিম মূলটা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কিন্তু তবুও তো কেহ বলিতে পারিবে না—সে মরিয়াছে। তাহার একটা মূলের জায়গায় আজ কত মূলে সমস্ত কানন ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের কেহই তো মৃত্যুর মাঝ দিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করে নাই—সেই আদিম আশ্রয়ে অন্তর্গূঢ় শক্তির প্রেরণায় যে রসের স্রোত তাহাকে পুরাকালে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, আজও তাহা সেই পুরাতন আশ্রয়েই সংস্থিত হইয়া চলিয়াছে—তাহার জীবনের ধারা তো কোথায় খণ্ডিত হয় নাই।

আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের বাঁচিয়া থাকাও এমনি বনস্পতির মত। তাহার উন্মেষের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সে কেবল মরিয়া মরিয়াই বাঁচিয়া থাকে নাই—আপনাকে বিস্তার করিয়া করিয়াই সে বাঁচিয়া রহিয়াছে—তার এই দেহ পুনর্জ্জন্মলব্ধ দেহ নহে—এ তার সেই আদিম প্রাণের প্রেরণায় সঞ্জীবিত পুরাতন দেহই। ইহাকে আঘাত করিলে তাহার বেদনা সহস্র বৎসরের স্মৃতিকে আলোড়িত করিয়া সেই আদিম বেদনার সঙ্গে গিয়াই যুক্ত হইবে।

জগতের মাঝে তাহার এই অতিদূর বিস্তৃত সুমহৎ জীবনের সার্থকতা কি তাহাই আমাদের বুঝিতে হইবে। কেবল টিকিয়া থাকার দায়িত্বটাও যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়, তাহাও আমাদের তলাইয়া দেখিতে হইবে।

প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের একটা লক্ষ্য আছে—সেই লক্ষ্য হইতেছে, তাহারই অন্তর্নিহিত শক্তির বলে তাহার নিজকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া। রূপ হইতে অরূপে একটা গতায়াতের পথ আছে। সেই পথেই বিশ্বজগৎ নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে—যাহা রূপ তাহা অরূপে সমাহিত হইতেছে, আবার যাহা অরূপ তাহা রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। এই হইল শক্তি-লীলার চিরন্তন ইতিহাস। সত্য উভয়ই—একটীকে দেখিলে আর একটীকেও তাহার সঙ্গে জানিতে হইবে। এ মীমাংসা শুধু যুক্তি-তর্কের মীমাংসা নয়—আমাদের অনুভবে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র।

এই অনুভূতিকে জীবনে যাহারা জাগ্রত করিতে পারিয়াছে, জড়ের বন্ধন অবশ্যম্ভাবী হইলেও তাহাদের পক্ষে তাহা ঐকান্তিক নহে। এই জন্যই জীবনকে অত্যন্ত ব্যাপক করিয়া, জড়ের সীমা অতিক্রম করিয়া, অজড়ের মাঝে তপোদৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়াই তাহারা জীবনের মীমাংসা খোঁজে। কিন্তু এই দৃষ্টি পাইতে হইলে বীর্য্যসঞ্চয় প্রয়োজন। কারণ জড় আর অজড় এই দুইয়ের সম্মিলনে জীবনের প্রকাশ হইলেও আমরা এখনও প্রাকৃত জড়ভূমিতেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—আমরা রূপ-জগতেরই জীব, অরূপের স্বানুভূতিকে রূপের ভাষাতে ফুটাইয়াই তবে আমরা তাহার ব্যবহার করিয়া থাকি। তাই গুহাহিত যে অরূপ, তাহার সাক্ষাৎ পাইতে হইলে প্রাকৃত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই।

এই যুদ্ধ সবাই করে না—সবাই ইহার সঙ্কেতও জানে না। অন্ততঃ জানিয়া শুনিয়া সবাই করিতেছে না—তবে মহাশক্তির প্রেরণায় অন্তরের গভীরতম প্রদেশে বিবর্ত্তনের সুনিশ্চিত সংক্ষোভ অহরহই চলিতেছে বটে। এই সংক্ষোভ ব্যক্তভাবে কাহারও চেতনায় জাগিয়া উঠে—তখন সে আর জড়ের সীমায় নিজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের যে চেষ্টা, যে গতি—তাহা হইতে বিপরীতবৃত্ত বলিয়া প্রাকৃতভূমির সাধারণ মানুষ ইহাকে আকস্মিক বলিয়াই মনে করে এবং ইহাকে লইয়াই তাহার সংসারের মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবার জন্য সে ঐশী প্রেরণার কল্পনা করিয়া থাকে। যে প্রাকৃত বিক্ষোভ হইতে উদ্বর্ত্তিত হইল, সে বিশেষ করিয়া ভগবানের চিহ্নিত জন—তাহার জীবনের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে, যে মূল্য সংসারের দিবার সামর্থ্যও নাই—অধিকারও নাই। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃত মানুষ এইরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়াই দেখিয়া থাকে।

এই যে ব্যাবৃত্তির ধারণা, ইহা মূলতঃ প্রাকৃত ভূমিরই ধারণা। নতুবা প্রেরণা শুধু একজনকেই আশ্রয় করিয়া তো আত্মপ্রকাশ করে নাই—সবার মাঝেই যে সে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত রস জোগাইয়া চলিয়াছে। প্রাকৃতিক ভূমি হইতে যে উদ্বর্ত্তিত হইতে পারিয়াছে, সে এই কথাটা বুঝিতে পারে। এই জন্যই সংসার হইতে সে নিজকে বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারে না; একই ভাগবত শক্তি প্রবাহের বিলোড়নে প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত ভূমির উদ্ভব—ইহা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। সাম্যের বীজ এইখানে—এইখানেই মিলনের সূত্র। যে প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, ভাগবতী শক্তিকে ধরিয়া আবার তাহার মাঝে নামিয়া আসিবার পথটুকুও সে রাখিয়াছে—এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে।

এই যে জীবনের বিস্তৃতি, এই কারণেই ইহাকে আমরা আকস্মিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহা সম্পূর্ণ স্বভাবানুগত। এ পিঠে দাঁড়াইয়া এ কথা বুঝিতে না পারিলেও ও পিঠে দাঁড়াইয়া ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর এ-ও একদেশদর্শীর মত বোঝা নয়, কারণ এ বোঝায় জগৎ উড়িয়া যায় না। কিন্তু তবুও মানিতে হইবে, জীবনের এমন প্রসার সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এই যে একটা স্তরে আমরা আটকা রহিয়াছি—ইহার পরেও যে আরও কিছু আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য এ যেন সঙ্কেত মাত্র। এই সঙ্কেতকে অস্বীকার

করিবার উপায়ও তো নাই। সমস্ত যুগে, সমস্ত দেশে, কেহ না কেহ এমনি করিয়া প্রাকৃতভূমিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জ্বলন্ত উল্কার মত দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে—একটা নূতন জগতের আভাস তাহারা দিয়া গিয়াছে। ইহারাই জানাইয়া গিয়াছে, এই আঁধারের পরপারেও কেহ আছে। ইহারা তো কেবল আকস্মিক নয়—প্রকৃতির একটা গূঢ়তম পারণামের ফলে ইহাদের উদ্ভব। সেই নিগূঢ় শক্তির স্বরূপ বুঝিয়া তাহারই কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা দ্বারা আকস্মিকতার সামঞ্জস্য করিতে হইবে।

এই সামঞ্জস্যের ভার, শুধু ব্যক্তির উপরই নয়, একটা জাতির উপরও পড়িতে পারে। ইজ্‌র্যাএলাইট্‌রা নিজেদের Chosen People বলিয়া মনে করিত। এ শুধু স্পর্দ্ধা নয়। এমন Divine Choice একটা জাতির উপর পড়িতে পারে—ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এইখানেই এক একটা জাতির বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ সমগ্রের বিবর্ত্তনে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী জাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এমনি কি জাতির ব্যষ্টি ব্যক্তি ভ্রষ্ট হইলেও সমষ্টির মাঝে সেই আদিম Choiceটা লুকাইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না তাহার সার্থকতার দিন আসিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে ভ্রষ্ট হইয়া, শ্রীহীন হইয়াও টিকিয়া থাকিতে হইবে। টিকিয়া থাকার জন্য দায়ী সে নয়—সে দায়িত্ব বিধাতার। অপরের আদর্শেও তাহার ভ্রষ্টশ্রী ফিরিবে না—যাহা তাহার স্বভাব, তাহার অধিকার—তাহাকে জাগ্রৎ করিলেই তবে সে জাগিবে।

রূপ আর অরূপে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার সামঞ্জস্য করিবার ভারই বিধাতা ভারতবর্ষকে দিয়াছেন—তাহার পক্ষে ইহাই হইল Divine Choice। অরূপকে কেহ প্রত্যক্ষ দেখে না, তাই কেহ তাহাকে মানেও না—কিন্তু সে যে অন্তরের মাঝে সদা জাগ্রৎ রহিয়াছে—বিশ্বপটের প্রতি তন্তুতে তন্তুতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে—ভারতবর্ষ ইহা তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ইহারই মাহাত্ম্য জগতের নিকট প্রমাণ করিবার জন্য এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। নাস্তিকতা লইয়া অপরে বাঁচিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা পারে না। অপরের কাছে যাহা যুক্তিতর্ক সাপেক্ষ, তাহা তাহার কাছে এমন আন্তরিকভাবে সত্য যে, রূপাতীতকে বিশ্বাস করিতে তাহার মাঝে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের অবকাশ হয় না। তাহার বেদবাণী তাহার কাছে এই রূপাতীতকেই নানা ছন্দে নানা গানে প্রকাশ করিতেছে। তাহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে মর্ত্ত্য আর ঊর্দ্ধলোকের যে চিত্ত-বিনিময়, তাহা নিঃশ্বাসের মতই অনায়াস এবং সহজ। বিজ্ঞ-সমালোচকের মত প্রকৃতি-পূজা বলিয়া ইহাকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিলে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের চিত্ত বিবর্ত্তনের ইতিহাসটাই পণ্ড হইয়া যায়।

বেদের এই রূপাতীতের স্বচ্ছন্দ বিহার হইতে যে ভাবের সূচনা, পরবর্ত্তী সমগ্র ইতিহাসে তাহাই তার প্রাণপুরুষকে তৃপ্ত রাখিয়াছে। বহির্জগতের কত উত্থানপতন ভারতবর্ষের বক্ষকে আলোড়িত করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার অন্তর কমলে নিষণ্ণ এই যোগিরাজের ধ্যান ভঙ্গ কেহ করিতে পারে নাই। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু তাহার

রাষ্ট্রের ইতিহাস নয়—ইহা তাহার অন্তরের সাধনার ইতিহাস। এই ইতিহাসকে বুঝিতে গেলে শুধু দৃশ্যজগতের মাঝেই আমাদের দৃষ্টি থাকে না—দৃশ্যকে অতিক্রম করিয়া যে অন্ত-হীন অদৃশ্যের মাঝে মানুষের জীবন প্রসারিত রহিয়াছে, তাহার সঙ্গেও আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টাকে মিলাইয়া দেখিতে হয়।

"হেথা নয়—হেথা নয়—অন্য কোন-খানে"— এই ভারতবর্ষের অন্তরের ব্যাকুল বাণী। এ কি শুধু একা তাহারই কথা?—জগতের সমস্ত সুখ দুঃখের সংক্ষোভের অন্তরালে এই সুরটাই কি চিরকাল মন্দ্রমন্দ্র হইয়া বাজিতেছে না? জগৎ ছুটিয়াছে কি রূপের পানে, না অরূপের পানে? রূপের পসরা আজ সে যতই জাঁকাইয়া তুলুক না কেন, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিবর্ত্তনে তাহাকে যে পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সে কতক্ষণ বিদ্রোহ করিয়া থাকিবে? অরূপের মাঝে রূপকে আত্মাহুতি যে একদিন দিতেই হইবে। ভারতবর্ষ এই কথা-টাই অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই রূপের পানে সে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা তাহার অন্তর্যামীর প্রেরণা—ইহাকে লঙ্ঘন করিবার সাধ্য তাহার নাই। শুধু কি তাহার মাঝেই এই প্রেরণা?—তা তো নয়। জগতের সর্ব্বত্র খুঁজিলে দেখিবে, সকল যুগেই এই প্রেরণা লইয়া কেহ না কেহ বাঁচিয়া ছিল—ইহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস বুকে ধরিয়াই কেহ না কেহ প্রাণ দিয়াছে। জগ-তের মাঝে ইহারা ব্যষ্টিশক্তি আর ভারতবর্ষের পক্ষে এই আত্মাহুতির নিয়তি তাহার সম-ষ্টির ভাগ্যালাপ—তাহার জাতির জীবন-রস। অন্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইটুকু মাত্র পার্থক্য। মানবের চরম নিয়তিকে সে তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া আগলাইয়া রহি-য়াছে। তাহার দান চরম দান বলিয়াই, মান-বের বিবর্ত্তনের চরম পর্য্যায় বলিয়াই তাহার প্রতীক্ষা এত দীর্ঘ, তাহার পরীক্ষা এত কঠোর। তবুও তো সে মরিবে না।—শুধু টিকিয়া থাকাটাও এমনি মর্ম্মান্তিক প্রয়োজনে সত্য হইতে পারে—এ কথা কি ঠেলিয়া ফেলা চলে?

আজ চারিদিকে কেবলি বিত্তের চাঞ্চল্য। বিত্তমোহের স্পর্দ্ধা যাহাদের সকলকে ডিঙ্গা-ইয়া গিয়াছিল, নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে আজ হতমান নতশির হইলেও, এখনও তাহারা স্বচ্ছন্দচিত্ত হইতে পারে নাই। তাহাদের মাঝে কেহ বুঝিতেছে—কেহ বুঝিতেছে না। কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস এই ভারত-বর্ষের প্রতি। অপরের চমক ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষকে যেন মত্ততার আবেশ আরও নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে। কি তাহার সাধনা—কি তাহার সিদ্ধি, আজ সে তাহা ভুলিতেছে। তাহারও মাঝে যে দেখি—এই বিত্তের জন্য কদর্য্য লোলুপতা।

কিন্তু তবুও বলিতে হইবে—বিত্তমোহ ভারতবর্ষের নিয়তি নয়, ইহার ভিতর দিয়া আপনাকে সে পাইবে না। তাহার স্বভাব-সিদ্ধ বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে সহস্র যুক্তি উঠিবে জানি—কিন্তু এ কথাও জানি, সে যেদিন বৈরাগ্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিল, সে দিন তো সে বিত্তহীন ছিল না—আত্মার প্রয়োজনে বিত্তের পরিপূর্ণ সঞ্চয়কে সেদিন সে ঠেলিয়াই আসিয়াছিল। এইটুকু না হইলে তাহার বৈরাগ্য মিথ্যা হইয়া যাইত। তাহার সেই আত্ম-নিষ্ঠ, অনন্তপ্রসার সত্যপূত উদার জীবনের কথাই আবার স্মরণ করাইয়া দিই। দারিদ্র্য দূর কর, প্রকৃতির দেনা মিটাও, বসুন্ধরাকে

যথাসাধ্য বুদ্ধিবলে, অধ্যবসায়-বলে দোহন কর, বীর্য্যশালী ও বলিষ্ঠ হইয়া ভোগ আহরণ কর—কিছুতেই আপত্তি করিব না; কিন্তু মনে রাখিও তোমার নিয়তি তোমাকে এখানে আনিয়াই ঠেকাইয়া রাখিবে না। পৃথিবীর সমস্ত বিত্তসঞ্চয় করায়ত্ত হইলেও তোমাকে অহরহ মনন করিতে হইবে—"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"—আমি "আত্মরতি আত্মক্রীড়ঃ—ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" নান্যঃ পন্থাঃ—এই তোমার চিরন্তন নিয়তি—জগতেরও এই চরম নিয়তি। এই নিয়তির সূত্র ধরিয়াই বিধাতা জগতের সঙ্গে তোমাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

[অভিধেয় সাধন ভক্তিতত্ত্ব---সমর্পণ ও শ্রদ্ধা]

সমর্পণ

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিবার ছলে জগৎকে বলিতেছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

—শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৮।৬৪-৬৫

—আমার যে সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য এবং পরম বাক্য, তাহা শ্রবণ কর। তুমি আমার অতি প্রিয়, সেই জন্য তোমার পক্ষে যাহা হিতকর, তাহাই তোমাকে বলিব। আমাতেই মন ঢালিয়া দাও, আমাকেই ভক্তি কর, আমাকেই যজনা কর, আমাকেই নমস্কার কর—তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। এ কথা আমি সত্য সত্য তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কেননা তুমি আমার প্রিয়।

তাঁহাকে সব সঁপিয়া দাও—এই হইল সাধন জগতের পরম এবং চরম কথা। সংসারের জালে দিনের পর দিন জড়াইয়া পড়িতেছ—মনে করিও না, তোমার মন-মত করিয়া সংসারটা গুছাইয়া তুলিতে পারিলেই তুমি অবকাশ পাইবে। যে জালে বেড়া পড়িয়াছ, তাহার বাঁধন এত আলগা নয়। হয়ত মন চায়—একটু ভগবানের ভজনা করি—দিনান্তেও একবার তাঁর কথা মনে করিয়া বিষয়-দগ্ধ প্রাণে একটু শান্তি পাই। কিন্তু তাহা হয় না কেন?—ওই সংসারের জ্বালায়। যদি এর প্রতি আসক্তি থাকিয়া থাকে, তবে তো আর কথাই নাই—সংসার ছাড়িয়া ভগবানের কথা ভাবিতে গেলে মন তখন উচাটন হইয়াই উঠিবে। কিন্তু যদি তেমন আসক্তিও না থাকে, তবুও তুমি রেহাই পাও না। কেন?—মন যে গম্ভীরভাবে বলিয়া বসে, "না হয় সংসার দিয়া তোমার কোনও প্রয়োজন নাই—কিন্তু আর দশটা অসমর্থ অপোগণ্ড যে তোমার মুখ পানে চাহিয়া

আছে—তাহাদের কি দশা হইবে? তুমি বিবাগী হইয়া গেলেই কি তাহাদের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে?"

তাই তো—বড় তো শক্ত কথা। আমার তো আসক্তি নাই—কিন্তু কি করি, কর্ত্তব্যের দায়ে যে আমি বাঁধা।

ভগবানের ভজনায় এই কর্ত্তব্যাভিমানের বাধা হইল এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। মায়ার এই শেষ ছলনা। তোমাকে ভালর পথে যাইতে দিয়াও শেষে এই কর্ত্তব্যাভিমানের বেড়ী তোমার পায়ে যে পরাইয়া দিয়া গেল। ইহার পর আর কি করিয়া তুমি তাঁহার পানে ছুটিবে? এখন যে কেবলই মনে হইবে—"আর দুটা দিন মাত্র। এ সংসারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ তো মিটাইয়াই ফেলিয়াছি—শুধু বাকি আছে এই কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ করা। একবার একটু খাটিয়া-খুটিয়া সংসারটা গুছাইয়া দিয়া যাহাদের সংসার তাহাদের ঘাড়ে ফেলিয়া রাখিয়াই আমি ছুটি লইব।" ভাব তো তাই—কিন্তু দায় কি মিটে কোনো দিন? ওই যে গুছাইবে বলিয়া মনের মধ্যে একটু আঁচিয়া রাখিয়াছ—ওইখানেই তোমার এক কাঁড়ি বাসনা জমা হইয়া রহিয়াছে। ওইখানেই না কত কল্পনা-জল্পনার বাসা—অবশ্য সকলই পরের স্বার্থে!

তোমার মন-মত কিছু হইবার অপেক্ষায় যদি বসিয়া থাক, তবে এ জনম কাটিয়া যাইবে, কিন্তু মন-মত বস্তুটীর দেখা মিলিবে না। তা ছাড়া এই যে বিষয়ের উচ্ছিষ্ট মন—এ তোমার অন্তর্য্যামী গ্রহণ করিবেন কি করিয়া?

সংসার কর আর না কর, সে তোমার পৃথক কথা। কিন্তু দেখিতে হইবে তোমার মনটী বাঁধা রহিয়াছে কোথায়। সঁপিতে হইলে সবটুকু দিতে হইবে—কিছু ভগবানকে দিয়া কিছু সংসারের জন্য তুলিয়া রাখিলে চলিবে না। যে কর্ত্তব্য আর অকর্ত্তব্যের দায় সাধ করিয়া ঘাড়ে তুলিয়া লইতেছ, তাহার কতটুকু হাসিল করা তোমার শক্তিতে কুলাইয়া উঠে? কর্ত্তব্য বলিয়া যেটাকে আঁকাইয়া তুলিলে, তার কতটুকু জের তোমার মিটিল? হওয়া না-হওয়া যখন তোমার হাত নয়, তবে আর করা না-করার জেদটা লইয়া মরিতে যাও কেন? এই খেলা পাতিয়াছেন যিনি, ভাল-মন্দের সমস্ত ঝুঁকি তাঁর পায়েই ফেলিয়া দাও। তিনি তো বলিতেছেন না যে, তাঁর বোঝা লইয়া তুমি অভিমানের পাঁকে ডুবিয়া মর। তিনি চান শুধু তোমার মনটী—সেইটী তাঁহাকে দিয়া দাও—দেখিবে তাহার বোঝা তিনি নিজেই তুলিয়া লইয়াছেন—তোমার সঙ্গে দেনা-পাওনা সকল হিসাব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

সমর্পণ এমনি সহজ ভাব। আর তাহা সহজ বলিয়াই তো এত কঠিন, কেননা এ যে তোমার মর্ম্মস্থলটী ছিঁড়িয়া উপাড়িয়া আনিতে চায়। এত জন্মের অভিমান দিয়া সাজাইয়া তুলিয়াছ এই সংসারটী—এর সকল ভাবনা-চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে যে বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠে! কিন্তু এ তো তোমার সংসারকে ছাড়া নয়—ছাড়িতে হইলে তোমার অভিমানটুকুই ছাড়িতে হইবে। ঐটুকু শিকড়েই এত বড় গাছটাকে আঁকড়িয়া রহিয়াছে—তুমি এর ডাল পালা ছাঁটিয়া আর কতদিনে ইহাকে মাটিতে নামাইবে? তাহাতে ব্যথাও বাজিবে বেশী, আবার নূতন করিয়া ফেঁকড়ী বাহির হইতেও কসুর হইবে না।

তার চেয়ে ওই শিকড়টাকে কাটিয়া দাও—কাজ সহজও হইবে, পাকাও হইবে। সমর্পণ অহঙ্কারেরই সমর্পণ—ওইটিকে বিলাইয়া দিতে পারিলে আর কোনও কিছু বিলাইবার দায়িত্ব তোমার থাকিবে না। তখন কাজের আসর রাখিতে হইলেও তিনিই রাখিবেন—ভাঙ্গিতে হইলেও তিনিই ভাঙ্গিবেন—তোমার আর তাহাতে কি দায়?

ভগবান অর্জ্জুনের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতেছেন—"মন্মনা ভব—মামেবৈষ্যসি"—তুমি আমাকে মনটী বিলাইয়া দাও, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। এ তো শুধু রূপক ছলে কথা বলা নয়—এ যে প্রত্যক্ষ সত্য। ভগবানের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ যোগে যুক্ত হইয়া তোমাকে বলিতে হইবে—"প্রাণের ঠাকুর, এই তো তুমি বঙ্কিম ভঙ্গীতে আমার হৃদয় আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছ—আজ যদি তোমাকে আমার সব না দিব, তবে আর কাহাকে দিব—কে-ই বা আমার ভার নিবে?" সমর্পণ তো শুধু মুখের কথা নয় বা অজানা-অচেনা একটা কিছুর পানে দুইটা ফাঁকা বুলি ছুঁড়িয়া দেওয়া নয়। দিবে যখন, তখন সমস্ত অন্তরে পুলকের শিহরণ পড়িয়া যাইবে; আর যাঁহাকে দিবে, তিনিও প্রত্যক্ষ হইয়া নিবেন—তাঁহারি নেওয়ার খবর তোমার সমস্ত সত্তাকে ছাপাইয়া উঠিবে।

একদিনে তো তা হয় না। হয় না বলিয়াই কর্ম্মের বন্ধনও খাঁ করিয়া ছিঁড়িয়া যায় না। প্রাণে যার রসের জোয়ার না আসিয়াছে, তার কর্ম্মের বন্ধন কি করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবে? সে যদি বলে "আমার সব আমি সঁপিয়া দিলাম"—তবে কে-ই বা তাহা শুনিবে, কে-ই বা তাহাকে জানাইয়া দিবে যে তোমার সঁপিয়া দেওয়া সার্থক হইয়াছে? এই জন্যই সমর্পণের কথা আগে আসিতে পারে না। এতো শুধু একটা মনকে চোখ-ঠারার মত কথা নয় যে, কথাটা বলিয়া ফাঁকতালে আপন কাজ গুছাইয়া লইবে।

এ কথা এত বড় বলিয়াই মহাজনেরা বলিতেছেন—

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান।

বিধি আছে কর্ম্ম কর—ধর্ম্ম পালন কর—তাঁর তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা কর। মনটাকে সংসারের উপর ভাসাইয়া এ সমস্তই করিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার গজনা ভজনা আর নমস্কার করিতে হইলে মনটাকে অতলে তলাইয়া দিতে হইবে। এই জন্যই সমর্পণের কথা—সর্ব্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ। "মন্মনা ভব"—এ আদেশ স্বকর্ণে তোমাকে শুনিতে হইবে; তিনিই তোমার হৃদয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তোমার অন্তরাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া আদেশ করিবেন—"মাং নমস্কুরু।"—তুমি তো নিমিত্ত মাত্র—তিনি না চাহিয়া নিলে, তোমার সাধ্য কি যে দিবার ভরসা পাইবে? যদি অহেতুক কৃপার কথাই বল, তবে এই তো তাঁর অহেতুক কৃপা।

তবে আর তুমিই বা বলিবে কি? প্রাণ তো অহরহ আকুলি-বিকুলি করিতেছে যে একবার সে বলে "তোমায় দিলাম।" কিন্তু সে দেওয়ার কথা মনঃকর্ণ-রসায়ন হইয়া বাজিয়া উঠে কই?—ইহাতেই বুঝিবে, দিবার অধিকারও পাইয়াছ কি না। দেওয়ার অধিকার যখন সত্য হইবে, তখন আর দিবারও স্বাধীনতা থাকিবে না—সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন মথিত করিয়া তাঁর বাণী সপ্তমে বাজিয়া উঠিবে—"প্রিয়োঽসি মে—

তোমায় আমি গ্রহণ করিলাম—তুমি আমার।" এই অঙ্গীকারের পর তোমার আর কি বলিবার বাকী থাকিবে?—

তারপর যদি কখনও সম্বিৎ ফিরিয়া পাও, তবে আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া বলিও —"দিলাম—তোমায় আমার সব দিলাম—ওগো আমি তোমারই!"

আত্মসমর্পণ এই জন্য প্রত্যক্ষ বোধ ছাড়া সত্য হইতে পারে না। তাই সমস্ত অবাস্তব সাধনার পরে ইহার স্থান—এ তাঁর চরম আদেশ।

যাহা চরম, তাহা তো আর একদিনেই পাওয়া যায় না—দিনের পর দিন চাহিতে চাহিতেই তবে তাহা মিলে। তাই সঁপিয়া দিবার অভিমানও যে তোমার নাই—এ কথাটা সত্য হইলেও, যতদিন পর্য্যন্ত নাকি সংসারের হাটে অভিমানের কারবার করিতেছ, ততদিন ওই অভিমানটুকুও রাখিয়া চলিবে বই কি। দিবার সাধ্য নাই জানি, তবু বুক-ভরা আকুলতা লইয়া দিবার চেষ্টা করি—কি জানি কোন দিন কোন অচিন পথে সে আসিয়া ধূলায় লুটানো সকল উপহার তুলিয়া লয়। তাই অন্তরকে দীন হইতেও দীন করিয়া দিবানিশি এই প্রার্থনার স্পন্দন রাখিতে হইবে—"ওগো আমি দিতে চাই আমার যাহা কিছু আছে, সবই সঁপিতে চাই—তোমার সে আদেশ দাও তুমি!"

যোগ্যতা নহিলে কিছুই হয় না। যতদিন অভিমান চূর্ণ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগের যোগ্যতা লাভ করিবার জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, (১১, ২০, ৯)—

তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ না উপস্থিত হইবে, কিম্বা আমার কথা শুনিতে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা না জন্মিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করাই উচিত।

মন প্রাণ তাঁহার দিকে ভাসাইয়া দিতে পারি, এইটুকু আমাদের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু নিজের ব্যবস্থা তো নিজেই করিয়া লইতে পারি না। কর্ম্ম রাখিবেন, কি না রাখিবেন—তাহা তিনিই জানেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁর বিপরীত আদেশ না শুনিতে পাইব, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর এই প্রত্যক্ষ আদেশকে লঙ্ঘন করিব কি করিয়া? যেমন অবস্থায় যেমন আয়োজন-উদ্যোগের মাঝে তিনি রাখিয়াছেন, তাহা মানিয়া যে চলিতেই হইবে। তবে মনটী থাকিবে তাঁর; এই মনের অভাবে এদিক যদি ছারখার হইয়া যায়—তবে তা তিনিই জানেন—আমি আর তার কি করিতে পারি। কিন্তু সাবধান!—যতটুকু দিব—তা যেন খাঁটী হয়, তার মাঝে ভেজাল চালাইবার চেষ্টা যেন না করি।

শ্রদ্ধা

ভক্তির মূল শ্রদ্ধা। সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। ভগবানেই সর্ব্ববস্তুর পর্য্যবসান—এমনি বুদ্ধি না জন্মিলে চিত্তে কখনও ঐকান্তিকতা আসিতে পারে না এবং ঐকান্তিকতা ভিন্ন শ্রদ্ধারও স্থান হইতে পারে না। চিত্তে যখন এমন ভাব হইবে যে, যাহা কিছু করিতেছি বা জানিতেছি, সমস্তই সেই পরাৎপরের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছি, তখনই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইবে। তখন মনে হইবে, একমাত্র তাঁহাকে ভজনা করিলেই সর্ব্ব-

কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে; খণ্ড খণ্ড কর্ম্মের খণ্ড খণ্ড ফল, এবং তাঁহার সংযোগ হইতে চ্যুত হওয়ায় তাহাও ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখকর। কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের মূলে একমাত্র তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার নিয়ন্ত্রণে যে কর্ম্মই করিব, তাহারই ফল হইবে—ভগবানের সান্নিধ্য। এই জন্যই ভগবদ্ভজনই সর্ব্বকর্ম্মের মূল। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (৪,২১,১২)—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।

—গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তাহার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা সমস্তেরই তৃপ্তি হয়, প্রাণকে তৃপ্ত করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়সমূহের যেমন তৃপ্তি হয়, তেমনি অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলেই সমস্ত দেবতার পূজা করা হয়।

শাখা-প্রশাখা ধরিয়া মূলে পৌছান—এ হইল বিচারবুদ্ধির কথা। কিন্তু ভক্তের হৃদয় আবেগে আকুল, বিচারের সতর্কতা তাহার প্রাণে সহে না। তাই যাহা সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বোত্তম, তাহাকে চিত্তের নিভৃতে স্বতঃই আভাসে অনুভব করিয়া সেই অনুভূতিকেই সে আরও প্রস্ফুট করিয়া পাইতে চায়। এই অনুভূতির পথ দেখাইয়া দিবে কে?—ভক্ত-হৃদয়ের অতৃপ্ত হাহাকার। "ধনে জনে জড়াইয়া রহিয়াছি—তবুও হায় প্রাণ কাঁদিয়া বেড়ায় কার আশায়"—এই যে অবুঝের মত বুকের ব্যথা চোখের জলে গলাইয়া পরাণ গুমরিয়া ফিরে—এই হইল ভক্তের কাছে সমস্ত যুক্তির সেরা যুক্তি।

ভক্ত স্বভাব-পাগল। যদি তার পূর্ব্বের ইতিহাস খুঁজিতে যাও, তবে তাহার কাছে তো তার কোনও আভাস পাইবে না। কেননা সে তো জানে না, কে তাহাকে এমন করিয়া পাগল করিয়া দিল—কোন কর্ম্মের ফলে তার আজ এই দশা। হয়ত কর্ম্মফলের পরম্পরা ইহার পিছনে রহিয়াছে—কিন্তু সে কোন জন্মের কথা—কে তার খবর রাখে? আমরা তো শুধু দেখিতেছি—এক পরমাশ্চর্য্য পরমা-নন্দময় রহস্য! কোথা হইতে বানের জল আসিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া গেল, কোনও যুক্তি মানিল না, কোন তর্ক করিল না—একেবারে সহজের স্রোতে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেখানে যাহা দেখা গেল, যাহার অনুভব হইল, তাহা তো আর রচিয়া-সহিয়া যুক্তি করিয়া গড়িয়া তোলা কিছু নয়—সে যে একেবারে অতি প্রত্যক্ষ সত্য—স্থূল চোখের কাছে স্থূল জগৎটা যতখানি প্রত্যক্ষ, তার চেয়েও কোটিগুণে গভীর সে প্রত্যক্ষ!

এই হইল শ্রদ্ধা। তবে ইহারও মাঝে তারতম্য আছে। হয়ত মহাজনেরা যেমন করিয়া জানিতেছেন, পাইতেছেন, তেমন করিয়া কিছু জানিলাম না, পাইলাম না—কিন্তু তবুও অন্তরের মাঝে যেন কাহার নূপুরের রিনিঝিনি অস্ফুটে এক-আধবার বাজিয়া উঠে।—এ ও শ্রদ্ধা। সংসারের আবর্জ্জনা দিয়াই হউক, আর পাণ্ডিত্যের খোলামকুচি দিয়াই হউক, দিনরাত্রি সেই চকিতে-দেখা পরমো-জ্জ্বল রত্নটী ঢাকিয়া রাখিয়াছি। বাহির দেখিয়া বিজ্ঞেরা বুঝিতে পারিবে না—এ কিছু পাইয়াছে, কি না পাইয়াছে। কিন্তু আকস্মিক সৌভাগ্যে আবরণখানা যখন নিমিষের জন্যও সরিয়া যায়—তখন তো আর পাওয়া না-

পাওয়ার সন্দেহ তিলমাত্রও থাকে না। শ্রদ্ধা এমনিই—এমনি করিয়া সকলের অন্তরেই সে লুকাইয়া আছে—আবর্জ্জনা দূর করিয়া দাও, আপনি সে উজলিয়া উঠিবে।

মহাজনেরা বলিতেছেন—যে শ্রদ্ধাবান সেই ভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে এই অধিকারের মাঝেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ব্যবহার দেখা যায়। যিনি শাস্ত্র যুক্তিতে সুনিপুণ, এবং যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ়, তিনি ভক্তির উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্র-যুক্তি জানেন না অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধা আছে, তিনি মধ্যম অধিকারী—ইঁহার পরীক্ষা কঠিন। আবার যিনি শাস্ত্র-যুক্তিও জানেন না অথচ যাঁহার শ্রদ্ধাও কোমল, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী—ইঁহার পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। তবে শ্রদ্ধার বীজ থাকিলেই আর শঙ্কা নাই—তাহার শক্তিতে অধম অধিকারীও ক্রমে ক্রমে একদিন উত্তম অধিকারীতে পরিণত হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

বিগত ২২শে শ্রাবণ ঝুলনপূর্ণিমা তিথিতে অত্রত্য সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমোহন্ত-মহারাজের শুভ জন্মমহোৎসব যথাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত তিথিতে ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমে, কুমিল্লা ময়নামতী আশ্রমে, বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমে, কাশী গম্ভীরাতে ও তত্রত্য মাতৃমন্দিরেও জন্মমহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট, জগৎসী, সন্দ্বীপ, মালসী, কুচবিহার, শিলঘাট, হাওড়া ও হালিসহরস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃকও উক্ত তিথিতে জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জন্মমহোৎসব উপলক্ষ্যে আমরা নিম্ন-লিখিত অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ দে ২০৲, শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র পাল ২০৲, শ্রীযুক্ত তারানাথ দাস মণ্ডল ১০৲, সন্দ্বীপবাসী ভক্তগণ ১০৲। স্থানাভাববশতঃ দশটাকার অনধিক দাতাগণের নাম উল্লিখিত হইল না।

অত্রত্য শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের আশ্রয়ে ও আনুকূল্যে শ্রীমান ধরণীধর মাইতি নামে একটী যুবক বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম

উক্ত জন্মতিথি দিবসে অত্রত্য সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের বগুড়াস্থ শাখাশ্রমের চতুর্থ বার্ষিক মহোৎসবও বগুড়া সহরে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরা সেবাশ্রমের বিগত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে ১২১ জন দরিদ্র ও বিপন্ন রোগী আশ্রম হইতে অবস্থাবিশেষে সেবা, ঔষধ ও পথ্য পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকসকল আশ্রম হইতে ঔষধ পথ্যাদি

পাইয়াছে। সময় সময় সেবকগণ রোগীর বাড়ীতে গিয়া ঔষধ, পথ্য ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সেবাশ্রমের কার্য্যবিবরণী হইতে আমরা নিম্নলিখিত সুসংবাদটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। স্বদেশহিতৈষী ও স্বধর্ম্মানুরাগী পাঠক মাত্রেই উহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন—

"গতবার এই সময়ে আমরা আশ্রমে সেবক ও রোগিগণের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট ৭০০।৮০০ টাকার প্রার্থী হইয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীগুরুর অপার করুণায় স্থানীয় কতিপয় সহৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ মহোদয়ের চেষ্টায় আজ এক প্রকাণ্ড ইষ্টক গৃহের সূত্রপাত হইয়াছে এবং আশ্রমের প্রাঙ্গণ গৃহাদি সহ পাকা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে। এই ব্যয়সাধ্য সদনুষ্ঠানে আমরা স্থানীয় জেলামাজিষ্ট্রেট, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, সবজজ, মুন্সেফ, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ, সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্য লাভ করিয়াছি। জগৎপিতার অপার করুণাধারা তাঁহাদের উপর বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।"

বরিশাল জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁহার মৃতা কন্যার স্মরণার্থে একখানা পাকা কোঠা ঘর দিতে স্বীকৃত হইয়া তৎব্যয়কল্পে সম্প্রতি ১০০৲ টাকা দিয়াছেন। উক্ত কোঠা ঘর নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশ্রমে বর্ত্তমান ইষ্টকগৃহ নির্ম্মাণকল্পে বগুড়ার নবাবজাদা শ্রীযুক্ত অনারেবল সৈয়দ আলতাপ আলী সাহেব বাহাদুর, স্থানীয় কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত রমজান উদ্দিন পাইকার, শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস, শ্রীযুক্ত মণিমোহন রায় ও বগুড়া ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত আশ্রমের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। ভগবান ইঁহাদের মঙ্গল করুন।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ২৮২৪৶১৫ আয় ও তাহা হইতে ২৪৭৩৶ ব্যয় হইয়া ৩৫১৲১৫ তহবিলে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। নিম্নে এককালীন দাতাগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল। বাহুল্যভয়ে ১০৲ টাকার অনধিক দাতাগণের নাম উল্লিখিত হইল না।

মহেন্দ্রনাথ তালুকদার ১০৲, শ্যামাচরণ চৌধুরী জমিদার, ৫০৲, কৃষ্ণপ্রসাদ কর্ম্মকার ১০৲, অজ্ঞাতনামা যথাক্রমে ২০০৲, ১০০৲, ৫০৲, ২০৲ ও ২২৷০, আশুতোষ ঘোষ ইঞ্জিনিয়ার ১০৲, জনৈকা হিতৈষিণী ২৫৷০, হিতৈষী ১০০৲, বগুড়া পুলিশ ফণ্ড ২৫৲, দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় ১০৲, ব্রজেন্দ্রকুমার সেন ১০৲, মহেন্দ্রনাথ প্রামানিক ১০৲, ভবানীচরণ কর্ম্মকার ১০৲, ধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার ১০৲, সোনাউল্লা মিঞা ১০৲, গণপত সরাফ ১০১৷৵০, সেক্রেটারী বগুড়া-বার-লাইব্রেরী ৭৪৷০, জেসরাজ নিউলাল ৩১৲, খাতের মামুদ প্রামানিক ১৭৲, ক্ষুদু সরদার ১৩৲, ফকির উদ্দিন সদাগর ১৬৲, মহম্মদ গুমানী ২১৲, সেখ মোল্লা ২০৲, মনসের উদ্দিন প্রামানিক ১৭৲, নজির উদ্দিন প্রামানিক ১৪৲, বিরাজ উল্লা মণ্ডল ১৯৲, সোটকা প্রামানিক ১১৲, সাবদ উদ্দিন প্রামানিক ২৭৲, হাফিজ উদ্দিন মণ্ডল ১১৲, গতবর্ষে স্বীকৃত দান মধ্যে পূর্ব্বের ভরাশান বাদে ১০৫৲, দশ টাকার অনধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ৭৩৫৶৫—মোট ১৯৮৩৷৫।

গ্রাহকগণের প্রতি

আশ্বিনের পত্রিকা আমরা আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। শারদীয় পূজা উপলক্ষ্যে যাঁহারা স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় পোষ্টাফিসে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন, কিম্বা ভাদ্রের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত ঠিকানা আমাদিগকে জানাইবেন—নতুবা পত্রিকা পাইতে গোলযোগ হইতে পারে।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৫শ বর্ষ } আশ্বিন { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী

[শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য]

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং,
বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং,
হরঃ সংক্ষুভ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধিম্॥

অবিদ্যানামন্তস্তিমিরমিহিরোদ্দীপনকরী
জডানাং চৈতন্যস্তবকমকরন্দস্রুতিশিরা।
দরিদ্রাণাং চিন্তামণিগুণনিকা জন্মজলধৌ,
নিমগ্নানাং দংষ্ট্রা মুররিপুবরাহস্য ভবতী॥

ত্বদন্যঃ পাণিভ্যামভয়বরদো দৈবতগণ-
স্ত্বমেকা নৈবাসি প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া।
ভয়াৎ ত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঞ্ছাসমধিকং,
শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণৌ ॥

শক্তি যদি যুক্ত শিবে—বিশ্ব মাঝে প্রাণের সঞ্চার;
শক্তিহীন যবে শিব—স্পন্দহীন বিভু শবাকার।
হরি-হর-পদ্মযোনি লোটে নিত্য পাদপদ্মে যাঁর,
পুণ্যহীন কাঙ্গালের সাজে সেথা স্তুতি-উপচার?

শ্রীচরণ-শতদল-স্পর্শে তব পুণ্য ধূলিকণা—
তাহারে সঞ্চয়ি' ধাতা নিখিলেরে করেছে রচনা।
সহস্র শিরেতে শৌরি সে রেণুর বহিতেছে ভার,
চূর্ণ করি তারে রুদ্র অঙ্গরাগ রচিয়াছে তার!

অবিদ্যা তিমির-পুঞ্জে জেগেছ মা দীপ্তি তমোহরা;—
চেতনার ফুটে ফুল জড়ে, তার তুমি মধুধারা;—
কাঙ্গালের নিধি তুমি;—মগ্ন যে মা ভব-পারাবারে,
মুররিপু বরাহের দন্তরূপা ত্রাণ কর তারে।

তুমি ছাড়া দেবতারা বিতরে মা করে বরাভয়,
একা তুমি করপদ্মে নাহি কর তার অভিনয়;—
ভয়ে তরি' ভক্তবাঞ্ছা সমধিক করেছে পূরণ
ত্রিলোক-শরণ তব ওই দুটী নিপুণ চরণ!

মাতৃ-মঙ্গল

—•—

(১)

এই জগতের আদি অন্ত খুঁজিতে যাঁহারা সমাহিত হইলেন, জগৎ তাঁহাদের কাছে মিলাইয়া গেল। রহিল কি?—এক অনাদি অনন্ত অক্ষুব্ধ পারাবার—বাক্য মনের অগোচর—নিখিল বিশ্বের চিরন্তন এবং চরম আশ্রয়।—

এই সত্তাই যদি পরম সত্তা হইল, তবে বাক্য মন দিয়া গড়া এ জগৎ আসিল কোথা হইতে?—সেই অক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রও কি জানি কোন বাসনায় সংক্ষুব্ধ হইল—সে স্পন্দনে অখণ্ড খণ্ডে খণ্ডে লীলা চঞ্চল হইয়া উঠিল, নির্বিশেষের বুকে বিশেষের রেখা পড়িল, যেখানে কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ ছিল না, কিছু ছিল না—সেখানে জগতের আদিম সম্বন্ধের সূত্রপাত হইল।

এই সম্বন্ধ কি?—ইহাই লীলার সূত্র—নির্বিশেষে সবিশেষে, সমষ্টিতে-ব্যষ্টিতে, ছোটতে-বড়তে এই সম্বন্ধ। হৃদয়ের রসানুভূতির দিক দিয়া বুঝিতে গেলে এ সম্বন্ধ—সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ। তাই সৃষ্টির সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে ব্যাপক এই সম্বন্ধ।

সৃষ্টির প্রয়োজন কি?—কেহ জানে না, বিচারবুদ্ধি দিয়া কেহ তাহাকে বেড়িয়া পায় না। তবে এই রসের মাঝে নিজকে নিমজ্জিত করিয়া যে দেখে—সে দেখে, এ প্রয়োজন শুধু আনন্দের তাগিদে, শুধু ভালবাসার ইঙ্গিতে। রস স্বতঃসিদ্ধ, তাহার অভিব্যক্তিও স্বতঃসিদ্ধ—তাই জগতের সৃষ্টি।

সৃষ্টি প্রলয়ের সঙ্গে গাঁথা। এক, মমতায় গলিয়া বাসনায় স্পন্দিত হইয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বহু হইতেছেন—এই বিশ্বের এক রূপ। আবার সেই বহু, বিবর্ত্তনের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কি এক অজানা মর্ম্মান্তিক আকর্ষণে একের মাঝে লীন হইতে চলিয়াছে—এই বিশ্বের আর এক রূপ।

এই উজান-ভাঁটার মাঝেই শক্তি বিকশিত হইতেছেন—আনন্দে। লীলার প্রয়োজিকা ইনি—ইনিই মা। সৃষ্টাভিমুখী ভবাভিগামী জীবের ইনি জননী, আবার প্রলয়াভিমুখী অপবর্গগামী জীবেরও ইনি জননী। উভয়ত্রই ব্যষ্টি সমষ্টির রসে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—সন্তান যেমন মাতাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে—বাড়িয়া উঠে।

সৃষ্টিতে ভূমা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া আবরণের পর আবরণ জড়াইয়া ছোট হইয়া নামিয়া আসিয়াছি; কিন্তু নাড়ীর যোগ তো যাইবার নয়। তাই অভিমান এই পর্য্যন্তও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। ইহার উপরেই মা ও সন্তানের সম্বন্ধের ভিত্তি। মা বড়, সন্তান ছোট;—বিশ্লিষ্ট বটে, কিন্তু একটী সূত্র ধরিয়া এখনও যোগ রহিয়াছে—সেইটা ধরিয়াই নামিয়া আসিয়াছি, আবার সেইটা ধরিয়াই উঠিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত মহাসমুদ্রে লীন না হইতেছি, সে পর্য্যন্ত তো সম্পর্ক ঘুচিতেছে না।

প্রলয়েও তাই—সে-ও সৃষ্টির বিপরীত-ক্রমে ছুটিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু মূল সম্বন্ধের তো কোন ব্যত্যয় হইতেছে না। এখানেও সেই সৃষ্টির অভিমানই হইল পাথেয়, ৮

এখানেও দেখি আমি ছোট—যাঁহার মাঝে আত্মহারা হইতে চলিয়াছি—তিনি বড়। এক একটী করিয়া আবরণ যদি খসিয়া যায়, তবে অভিমানের ব্যাপ্তি ঘটে বটে, কিন্তু তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাকে চাই, তাঁহাকেও আর বেড়িয়া পাই না। অতএব আপনা হইতেই তখন লুটাইয়া পড়ে—পরম নির্ভয়ে, চরম নির্ভরে। আবার দেখি, সেই মা আর সন্তান।

জগতের আদি জানি না—অন্ত জানি না—দেখি শুধু ব্যক্ত মধ্য অবস্থার চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চল্যের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখ—কেবলই শক্তির বিলাস; অভিমানের আশ্রয়ে অনন্ত জগৎ জুড়িয়া ভাঙ্গা-গড়া চলিয়াছে। সমষ্টি এখানে ব্যষ্টিকে আগলিয়া রহিয়াছে, নির্ব্বিশেষ সবিশেষকে জড়াইয়া রহিয়াছে, ভূমার বুকে ক্ষুদ্র—আনন্দের চাঞ্চল্যে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কি সৃষ্টিতে, কি প্রলয়ে, কি প্রকৃতির অধঃ-স্রোতে, কি ঊর্দ্ধ স্রোতে—এই শক্তির খেলা—এই মমতার লীলা। এই তো বিশ্বের আদিম রস-সম্বন্ধ—এই তো মা আর সন্তানের চিরন্তন মাধুরী।

এর মাঝে আমাদের সাধনা কোথা হইতে সুরু হইল? মহাশক্তির মাঝে আমরা ধৃত—সঞ্জীবিত—এইটুকু হইল তত্ত্ব-বোধ। অধঃ-স্রোতে যে নামিয়া আসিতেছে বা ঊর্দ্ধ-স্রোতে যে উপরে উঠিতেছে, উভয়ের পক্ষেই তাহা তুল্যরূপে সত্য। কিন্তু এই সত্যকে যখন সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব, তখন তাহাকে স্বীয় গতির সঙ্গে যুক্ত দেখিয়া তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। সত্য তখন আর শুধু নির্ব্বিকার, উদাসীন নহে—আমাদের ভাবের দ্বারা তখন তাহা অনুরঞ্জিত। ঊর্দ্ধমুখী যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সাধনা তাহারই প্রয়োজন, কেননা এবারকার অভিমানের দায়িত্ব তাহাকেই বহন করিতে হইবে। তাই অভিমানকে ঊর্দ্ধমুখে প্রেরণ করিতে হইলে তাহাকে কোন্ সত্যের আশ্রয় লইতে হইবে, তাহা সে-ই নিরূপণ করিয়া লইবে। দেখিয়াছি—মায়ের দুইটী বিভাব; এর মাঝে কোনটীতে আমাদের প্রয়োজন?—

এই বিচার করিতে গিয়া চিত্তের হাহাকারের কথাই মনে হইবে। সে তো নীচে নামিতে চায় না—সে চায় প্রলয়ের মাঝে নিজকে বিসর্জ্জন দিতে। তাই মায়ের বিকর্ষণী শক্তির অভিঘাতে সে বিশ্লিষ্ট হইতে চায় না—তাঁর আকর্ষণে তাঁর মাঝে সে সংশ্লিষ্ট হইতেই চাহিতেছে। তাই কেবলি নিজকে ছাড়িয়া, অভিমানকে ছড়াইয়া মায়ের মাঝে সে নিজকে বড় করিয়া পাইতে চায়।—মাতৃমূর্ত্তি তাহার কাছে সমস্ত নির্ব্বচনের অতীত হইয়া ফুটিয়া উঠুক—ইহাই তাহার প্রাণের কামনা।

কিন্তু এর মাঝেও কথা আছে। গতি আছে, তাহা স্বীকার করি—এখন তাহা ঊর্দ্ধমুখী হউক, আর অধোমুখীই হউক। কিন্তু অভিমানের মাঝে সবটুকুই তো গতির আকারে প্রকাশ পায় না। আমাদের গতি তো একটানা নয়—আমরা থমকিয়া থমকিয়া চলি। তাই গতির মাঝে মাঝে এক একটা স্থিতির বিন্দু পড়িয়া যায়। ইহাই জড়ত্ব। চিত্তকে ইহা হইতেও উদ্ধার করিতে হইবে। তবেই মায়ের আর এক বিভাবের উপলব্ধিও প্রয়োজন। স্থিতিতে নিশ্চল হইয়া থাকিলেও বুঝিতে হইবে, নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয় নাই—আশে পাশে, প্রতি নিঃশ্বাসে সেই বিরাট শক্তির স্পন্দনেই জীবন স্পন্দিত হইতেছে।

স্থির হইয়া রহিয়াছি বলিয়া আমি বিযুক্ত নই। আদি সৃষ্টিধারার সঙ্গে আমার কি যোগ, তখনও তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

তাই মাকে উভয় বিভাবেই জানিতে হইবে। তিনি যে সংসারবন্ধের কারণ, তাহাও আমার কাছে সত্য; আবার তিনিই যে মুক্তির হেতুভূতা—তাহাও পরম সত্য। আমার সাধনায় এই উভয় বোধেরই প্রয়োজন আছে।

(২)

এই তো তত্ত্ব। কিন্তু ইহাকে রসানুবিদ্ধ না করিয়া লইলে সাধনা চলে না। শুধু তত্ত্ব আঁচিয়া রাখিলেই হয় না—উপলব্ধির ভিতর দিয়া হৃদয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘটাইতে হয়। এইখানে আসিয়া আবার নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিতে হইবে। উপলব্ধি শুধু মুখের কথা নয়। মুখের কথাকে সমস্ত সত্তা দিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তবে তত্ত্বের সাক্ষাৎ মিলে। সুতরাং উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা থাকিবে বই কি? সেই বাধাগুলি দূর করিতে হইলেই নিজের ভিতর একটু তত্ত্ব তালাস করিতে হয়। যে সত্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করিব, তাহা কোথায় কোন সংস্কারে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, ভাল করিয়া তাহা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

"মা বলিতে প্রাণ, করে আন্‌চান্—চোখে আসে জল ভরে!"—কিন্তু তবুও তো তেমন করিয়া মা বলিতে পারি না। মানিলাম বুঝিলাম—সৃষ্টিপ্রবাহে যখন ভাসিয়া আসিয়াছি, তখন এই ভাসিয়া আসাটাকে একটা নিবিড় রসের সম্পর্কের মধ্য দিয়া বুঝিতে হইলে "মা" বলা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু আজন্মসঞ্চিত কত সংস্কার আসিয়া যে এই "মা" বলাকে বক্র করিয়া তুলিতেছে, মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ককে বিকৃত করিয়া দেখিতেছে, তাহা বুঝিতে পারি কই? বুঝি, মায়ের উপর সন্তানের অভিমান-আবদার চলে, কিন্তু যেখানে সত্য করিয়া কোনও রসের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সেখানে আবদার আর অভিমান আত্মপ্রবঞ্চনা বই আর কি? মায়ের দিক হইতে বুঝিতে পারি, সন্তানের এই মিথ্যাচারকে তিনি পরিপূর্ণ স্নেহের চক্ষেই ক্ষমা করিয়া তাহাকে বুকে বুকে রাখিয়াছেন—কিন্তু তাহাতে আমার সন্তানত্বের দাবী তৃপ্ত হইল কই?—এই যে সুধা-স্পর্শ, অহরহ নিমিষে নিমিষে বিশ্বকে যাহা বুকে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা সন্তান হইয়া বুঝিতে পারিলাম কই?

তাই বলি, মা বলিবার আগে নিজের সন্তানত্বের দাবীটা যেন স্পষ্ট করিয়া তুলি। চাই যোগ্যতা। অভিমান আসিয়া হয়ত বলিবে, কেন, আমি যোগ্য হই বা না হই—আমি মা-ছাড়া হইতে গেলাম কেন? কিন্তু সে তো বোঝে না, নিজেকে সে-ই যে মাতৃহারা বলিয়া মনে করে, ইহাতেই তো সে মাতৃহারা, নহিলে মা তাহাকে ছাড়িলেন কোথায়! তার অভিমান মায়ের বুকে যে দ্বিগুণ ব্যথা ঘনাইয়া তুলিতেছে, তাহা কি সে জানে বা বোঝে?—মা তো চিরদিনই নিরুপায়। যেখানে স্নেহ বড়, সেইখানেই সহিষ্ণুতা বেশী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহের অভিমান কেবলই আপনার দাবী দাওয়া লইয়া কলরব করিতে জানে—কিন্তু বিশাল স্নেহ সমুদ্রগর্ভের মতই বিক্ষোভহীন। বাহিরে তার আকর্ষণ কেহ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু সে স্নেহ যে অন্তর গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, তিলে তিলে মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার

দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে—চঞ্চল মানুষ তাহা বুঝিবে কি করিয়া ? সন্তান মায়ের উপর দাবী-দাওয়া করিয়া, উৎপাত করিয়া, অত্যাচার করিয়া নিজকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে—কিন্তু মায়ের অটল সুগভীর স্নেহ নিঃশব্দে তাহা সহিয়া চলে। আমরা ভাবি মা নিরুপায় ; কিন্তু মা জানেন, উপায় থাকিলে এই একমাত্র উপায়। কেননা মায়ের ভালবাসা বড়—সন্তানের ভালবাসা ছোট।

কিন্তু এই যে দৃষ্টান্তটা, এটা লৌকিক জগৎ হইতে লওয়া। তাই অলৌকিকে ইহার প্রয়োগ করিতে সাবধান হইতে হইবে। মা সহেন, তবুও ভালবাসেন—এই হইল মায়ের দিকের কথা। সংসারের শিশু মায়ের সঙ্গে অন্ততঃ একটা সত্য সম্পর্কে যুক্ত—তাই মায়ের সহিষ্ণুতা বা ভালবাসার উপর দাবী করিয়া সে প্রশ্রয় পায়। ভগবানে যখন আমরা মাতৃভাবের আরোপ করি, তখন আমরা এ কথাটা ভুলিয়া যাই যে, এটাও আমাদের আরোপমাত্র—এখনও এখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, শিশুর মত চিত্ত সংস্কারহীন নির্ভরপরায়ণ হয় নাই। অথচ আবদার আর অভিমানের পালাটাই আমরা আগে জুড়িয়া দিই—কেননা সেটা সহজ। এমনি করিয়া নিজকে সত্যে প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বেই যদি লীলার পাঠ আরম্ভ করি, তাহা হইলে জড়ত্বের দায়ে তলাইয়া যাইতে হইবে আমাদিগকেই, এবং আমাদিগের পক্ষেই তাহা ক্ষতির কারণ। লাভ ক্ষতির বিচার এখানে আসে এইজন্য যে, সাধকের অভিমান লইয়া আমরাই তো সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং তখন পর্য্যন্ত তো একটা ইষ্টানিষ্ট বোধও সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলাম। আজ মাঝ পথে আসিয়া ভাবের স্রোতে যদি সেটা ভাসাইয়া দিই, তবে তার ক্ষতিটা তো আমাদেরই গায়ে বাজিবে। আর তাই যে হয়, সাধনার ফল দেখিয়া তাহা তো অস্বীকার করিতে পারি না। মা আমার সব সহিতেছেন, তবুও কোলে টানিতেছেন—কিন্তু সে মায়ের কথা। আমি তো আমার কথা, আমার দাবী লইয়াই আসিয়াছিলাম। সুতরাং আমার হিসাব তো আমাকেই রাখিতে হইবে।

লৌকিক দৃষ্টান্ত লইয়া এই তো গেল সাধকের দিকের গোলযোগ। তা ছাড়া ভাবের দিকেও একটা গোল আছে। ভগবানকে যখন মা বলিয়া ডাকি, তখন আদর্শ করি লৌকিক মাকে। এই লৌকিক মাকে যখন আমরা দেখি, তখন তাহাকে কতকগুলি নিমিত্তের অধীনরূপেই দেখি। সংসারের সন্তান মাতৃসত্তায় অনুপ্রবিষ্ট নয়। নাড়ীর যোগ ছিন্ন হওয়ার পর মায়ের জীবন আর সন্তানের জীবন স্বতন্ত্র হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। উভয়ের স্নেহব্যাকুলতা উভয়ের মাঝে যোগ রক্ষা করিতেছে বটে, কিন্তু তবুও দুইটা বিশিষ্ট জীবন বলিয়া সর্ব্বাংশে দুইটী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারে না, অর্থাৎ মা আর নিজের স্নেহ দিয়া সন্তানের স্থূল হইতে সূক্ষ্মতম সত্তাটী পর্য্যন্ত আবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। ইহার ফলে মা আর সন্তানের সম্পর্কের মাঝে প্রাকৃতিক বিকার আসা অনিবার্য্য। ভগবানকে মা বলিতে গিয়া এই সমস্ত বিকারগুলিও আমরা মনের সঙ্গে জড়াইয়া লই এবং তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের কর্ত্তব্যগুলিকে খাট করিয়া দাবীগুলিকে অসম্ভব রকম বড় করিয়া তুলি। লৌকিক মায়ের সঙ্গে লৌকিক

সন্তানের যে সম্পর্ক, তাহাই মাতৃভাবের সাধনার আদর্শ নয়।

তবে আদর্শ পাইব কোথায়? মাকে আর সন্তানকে বহির্জগতের নিমন্ত্রণশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত করিয়া। সে আদর্শের একটা আভাস মিলিতে পারে, যখন মাকে দেখি, আপনার নাড়ীর রসরক্ত দিয়া তিল তিল করিয়া গর্ভস্থ সন্তানকে তিনি বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন;—যখন দেখি মায়ের দেহ, আর সন্তানের দেহ, মায়ের প্রাণ আর সন্তানের প্রাণ এক। সন্তান হইতে হইলে এমনি করিয়াই মাতৃসত্তায় লীন হইতে হইবে। কিন্তু তবুও বলিব, এ আদর্শ সঙ্কীর্ণ। শুধু দেহ আর প্রাণের সাম্য নয়, আরও নিবিড়তর সাম্য চাই—সত্তায় সত্তা নিমজ্জিত করা চাই। এর জন্যই তো সাধনা। সাধনা না করিয়াই ভাবের রসাস্বাদ করিতে যাওয়া মহাভ্রান্ত।

(৩)

রূপের কাঙ্গাল হইয়া মাকে খুঁজিও না। রূপ যে আছে, তাহা তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু এই রূপ যে-অরূপ হইতে প্রতিভাসিত, সেই অরূপের মাঝে মাতৃসত্তার সন্ধান করিতে হইবে। মা রূপেও আছেন, অরূপেও আছেন। কিন্তু আমাদের সাধনা সন্তানত্বের সাধনা। আমরা খুঁজিয়া দেখিব, কি করিয়া আমরা মাকে ধরিতে চাহিতেছি। সৃষ্টির সেই আদিম মুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত কত তনু মন বুদ্ধি দিয়া মায়ের পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাঁর পরিচয়ের অন্ত মিলিয়াছে কি? শিশুর দেহ লইয়া স্থূল মাকে যখন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, তখন সেই জগন্মাতাকেই তার মাঝে পাইয়াছি—কিন্তু সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনের মাঝে; ইন্দ্রিয়ের যোগ তখন সেই মাতৃসত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন, মন তখন অবলুপ্ত। তারপর মনের জাগরণের সঙ্গে যে সন্তান নূতন করিয়া মাকে চিনিল, সে ও কতকগুলি হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি পাইল বটে, দেহের গণ্ডী ছাড়াইয়া মা তাহাকে আরও একটু পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিলেন—কিন্তু তবুও সে দেখাতেই কি মাতৃসত্তায় চরম পরিচয় মিলিল? শুধু এই জন্মের নয়—জন্ম জন্মান্তরের লোক-লোকান্তরের যে অন্তরতম অধ্যাত্ম-যোগ, তাহার নিদর্শন কিছু পাওয়া গেল কি?

এই রূপের পথে মাকে খুঁজিলে হইবে না—নিজকেও রূপের কাঙ্গাল করিয়া তুলিলে চলিবে না। নিজের মাঝে ডুবিয়া যাও—দেহ, মন, প্রাণ অতিক্রম করিয়া কোথায় সেই পরম ভাগবতী সত্তা বীজাকারে তোমার মাঝে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার মাঝে সমাহিত হইয়া মাতৃসত্তার সঙ্গে তোমার যোগ অনুভব কর।—এ জগৎ লয় হইয়া যাক্—ভুলিয়া যাও তনু মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত কোথায় পড়িয়া রহিল।—

এইখানেই আমাদের শিশুত্ব। লৌকিক দৃষ্টান্ত ধরিয়াই বলি—"শিশু যেমন মাকে ডাকে জানে না মা কেমন তার, রাজরাণী কি ভিখারিণী করে না কোন বিচার"—এই তন্ময়তাটুকুই চাই। ভাবশুদ্ধি না হইলে এই তন্ময়তা আসিবে না। এই জন্যই দেখ, আত্মানুসন্ধানও প্রয়োজন; নিজের ব্যাপ্তিটুকুও বুঝিতে হইবে এবং সেই ব্যাপ্তি-বোধের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসত্তারও পরিব্যাপ্তি অনুভব করিতে হইবে। লৌকিক সম্বন্ধের মাঝে প্রকৃতির প্রতি যে নির্ভরতা, এই অলৌকিক সম্বন্ধে তাহার সংক্ষোভ তো থাকিবেই না—এমন কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনও আবরণই তাহার মাঝে থাকিবে না। এই জন্য আমাদের অভিমান সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ না

থাকিয়া মননের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক—সেই পরিব্যাপ্ত অভিমানের সঙ্গে নিজকেও যেমন বড় করিয়া জানিব, আবার মায়ের পায়ে সে অভিমানকে লুটাইয়া দিয়া তাঁহাকেও তেমনি নিবিড় করিয়া পাইব। চরম প্রসারণে অভিমানের পরিধি অনন্তে মিলাইয়া যাইবে—মা আর সন্তান তখন এক হইয়া যাইবে।

(৪)

আরোহণের পর অবরোহণ। যোগারূঢ় সন্তান আবার মাতৃ-অঙ্ক হইতে জগতের পানে নামিয়া আসিবে। তাহার অবরোহণের প্রয়োজন কি তাহা সে জানে না। অভিমানের প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে—এইবার লীলার প্রয়োজনে আবার সৃষ্টির আসরে তাহার নামিয়া আসা। যে জগৎ মিলাইয়া গিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে তাহা সন্তানের চক্ষে জাগিয়া উঠিল; কিন্তু এবার আর তাহার দৃষ্টি জগতের স্থূল আবরণে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিল না—সন্তান দেখিল চিন্ময় দৃষ্টি দিয়া। জগতের অন্তর বাহির তাহার কাছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে!—এ তো জগতের মূর্ত্তি নয়—এ যে তার মায়ের মূর্ত্তি! এই তো মায়ের রূপ—নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ! মা বিশিষ্টা হইলেন, কিন্তু সে বিশেষও অনন্ত বৈচিত্র্যময়—"আদি অন্ত কোথা রে তাঁহার, কোথা তার কূল!"

এসো মায়ের দুলাল—ভাবের অঞ্জন চোখে মাখিয়া আবার তুমি জগতের বুকে ফিরিয়া এস। তোমার নির্ব্বিশেষ অনুভূতিকে সবিশেষের মাধুর্য্যে যে আবার ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তোমার মাতৃ-সত্তার অনুপ্রাণনা দিয়া আবার যে এ জগৎ গড়িয়া লইবে তুমি!

অজ, শাশ্বত, নির্ব্বিকার, সৃষ্টি-বাসনায় বহু হইয়া প্রজাত হইলেন—শক্তিতে, আনন্দে, প্রেমে, লীলায়। কোথায় এই শক্তিময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী, লীলাময়ী মূর্ত্তি? অদ্বৈতের হিমশৃঙ্গ হইতে যে দ্বৈতের যুগলধারা নামিয়া আসিয়াছে, তাহার মাঝে কোথায় চৈতন্যাশ্রিত আনন্দঘন মাতৃমূর্ত্তি?—চাহিয়া দেখ, নিখিল নারীমূর্ত্তিতে মা আমার ফুটিয়া উঠিয়াছেন—"স্ত্রিয়ঃ কলা সকলা জগৎসু!—ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ!" জগতের সমস্ত রূপ, সমস্ত রস এই মাতৃমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে—তাই মা "সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী!" বীজকে ধ্বংস করিয়া অভিনবকে সৃষ্টি করিতেছেন, আপন হৃদয়ের সুধাসার স্তন্য-সুধা দিয়া আপনার সৃষ্টিকে পুষ্ট করিতেছেন—এই তো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবধি নিখিল নারীমূর্ত্তিতে মা আমার জগৎ জুড়িয়া! মূঢ়, মিথ্যা স্ত্রীপুরুষের অভিমান লইয়া মরিতেছ। কোথায় তোমার পৌরুষ?—সে কি জাগিয়াছে? তোমার এই কর্ম্মবিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্যের মাঝে তো দেখিতেছি তোমার অন্তর্নিহিত মাতৃশক্তিরই প্রেরণা!—তুমি পুরুষ কবে? মিথ্যা অভিমান লইয়া মাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিতেছ। তোমার অভিমান থাকিতে মা তো জাগিতে পারেন না। জগৎ মহাবিবর্ত্তনের অপেক্ষায় রহিয়াছে—এখনও "যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে, তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং"—মায়ের এই রূপ প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু চক্ষু থাকিলে এখনও তো এ রূপ দুর্লভ নয়। জাগ—আঁখি মেল!

প্রণব-রহস্য

—*—

সে দিন প্রণব-সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কিছু বলা হয়েছিল, আর তখন এ কথাও বলা হয়েছিল যে সাত-আটটি বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গ শেষ হওয়া সম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষায় এই প্রণব-সম্বন্ধে বড় বড় গ্রন্থ পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে—আর আজ পর্য্যন্তও লেখা চলছে। সত্য কথা বলতে গেলে সমস্ত বেদ-বেদান্ত, হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র একমাত্র এই ওঙ্কারের মাঝে পর্য্যবসিত।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, কিন্তু প্রণবের প্রতি সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—এরাও "আমেন্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তাদের প্রার্থনা শেষ করে। মুসলমানরাও তাই করে বটে, যদিও তারা ঠিক "আমেন" উচ্চারণ করে না—তারা বলে "আমীন।"

সচরাচর তোমরা যে প্রার্থনা কর, তার মাঝে "আমেন" মন্ত্রের সার্থকতা কি? দেখতেই পাচ্ছ, বাক্যের যেখানে নিবৃত্তি, সেইখানেই এই মন্ত্র—এর পর আর বাক-প্রপঞ্চ নাই, অন্তরাত্মা এখানে এসে ভগবানে যেন সমাহিত হয়ে গিয়েছে। এ পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তুমি হৃদয়ের কথা ভগবানের উদ্দেশ্যে ঢেলে দিয়েছ; কিন্তু তার পরেই এমন একটা স্থানে এসে তুমি দাঁড়ালে, যেখানে তোমার সত্তা ভাগবত-সত্তায় নিমজ্জিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। সেই অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় পরম রহস্যে যখন এসে পৌঁছালে—তখনই "আমেন।" তাহলে আমেন কি?—সে তো ওঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের সমস্ত প্রার্থনার মাঝেই আমেন মন্ত্রটী এমন একটী স্থান অধিকার করেছে, যেখানে তার অর্থ হয়, বেদান্ত অর্থাৎ বাক্যের শেষ; আর এই অর্থ হতেই আমরা পাই—সকল বেদান্তের যা সার অর্থাৎ ওঁ।

বেদান্তের সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের শেষ, বাক্যের শেষ—সে এমন একটী স্থান, যেখানে সমস্ত বাক্য সমস্ত চিন্তা এসে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তাই হিন্দু জানে, সমস্ত বেদান্ত ওঁকারে পর্য্যবসিত। বেদে কি অর্থে এই মন্ত্রটী ব্যবহৃত হয়, তা এখন তোমাদের কাছে বলা যাক্—ওঁ=অ, উ, ম।

তান্ত্রিক তার মনমত ওঁকারের ব্যাখ্যা করছে, শৈব তাকে তার নিজের মত করে বুঝছে, বৈষ্ণব দেখছে তাকে তার দিক হতে, আবার অন্যান্য সম্প্রদায়ও আপন জ্ঞানবুদ্ধি মত তার ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে। কিন্তু তোমাদের কাছে ওঙ্কারের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হবে, তা হচ্ছে সার্ব্বভৌম, সমস্ত বেদান্তের তা উৎসধারা।

অ, উ, ম এই তিনটী নিয়ে ওম্। বেদান্তের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী অ বলতে বুঝবে, এই ব্যবহারিক জগৎ, যা নাকি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-বিশিষ্ট, স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যা। এক কথায় বলতে গেলে তোমার জাগ্রৎ অবস্থায় তুমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছ—এই সব।

স্বপ্নাবস্থার যত কিছু প্রত্যয়, সমস্ত বুঝানো হয় উ কার দিয়ে। স্বপ্নাবস্থায় যে

দেখ্‌ছে কিম্বা যা কিছু দেখ্‌ছে—সে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই হল উকার। মনোজগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, স্বর্গ-নরক সমস্তই এই উকারের মাঝে।

আর যা অব্যক্ত, ম তাকেই বোঝাচ্ছে—সেই হল সুষুপ্তি। এমন কি তোমার জাগ্রৎ অবস্থাতেও যা-কিছু তোমার অজ্ঞেয়, তোমার বুদ্ধি যা ধরতে পারে না—তাও এই মকারের অন্তর্গত। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, এই অ, উ, ম অর্থাৎ ওম্ হচ্ছে মানুষের ত্রিবিধ প্রত্যয়ের সমষ্টি, অর্থাৎ তাই সমগ্র প্রাতিভাসিক জগৎ। এই অ, উ, ম-কারের মাঝে একটা মূল তত্ত্ব অনুস্যূত আছে—যাকে শাস্ত্র বলেন "অমাত্রা।" এই অমাত্রা ত্রিবিধ প্রতিভাসের মধ্যে অনুস্যূত ও ব্যাপ্ত রয়েছেন—ইনি অবিনাশী, নির্ব্বিকার—বস্তুর তত্ত্বস্বরূপ। এই অমাত্রার কথা আর একদিন বুঝিয়ে দেওয়া যাবে; আজ শুধু এইটুকু বুঝে রাখ যে ওম্ বলতে সব বুঝায়।

ইউরোপ ও আমেরিকার যত দর্শনশাস্ত্র, সমস্তই শুধু জাগ্রৎ অবস্থার প্রত্যয়গুলি নিয়েই আলোচনা করেছে, স্বপ্ন বা সুষুপ্তির প্রত্যয়ের দিকে তারা নজর দেয়নি। তাই হিন্দু প্রশ্ন করেন, "তুমি অসম্পূর্ণ উপাদান নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছ; কাজেই জগৎ-রহস্যের তুমি যে মীমাংসা করবে, তা সত্য বলে মানুষ কি করে?"

সমস্ত দার্শনিকই জাগ্রৎ অবস্থা নিয়েই আছেন। মিল, হ্যামিল্টন, বার্কলে, স্পেন্সার—এঁরা সকলেই জাগ্রৎ অবস্থায় যে প্রত্যয় মিলে, তাকে ভিত্তি করে নিয়েই আবিষ্কার-আলোচনা চালিয়েছেন। শক্তিই বল, গতিই বল—যাই বল না কেন—সমস্তের মূল তাঁরা এই লোকেই টেনে বের করতে চান। কিন্তু দেখ, তোমাকে যদি একটা গণিতের সমস্যা দিয়ে তার সিদ্ধান্ত নিরূপণ করতে বলা হয়, তাহলে যা যা স্বীকার্য্য, তার সমস্তগুলিই তোমাকে বুঝে নিতে হয় তো? স্বীকার্য্যের একটা অংশমাত্র জেনে, সমস্তটা প্রতিপাদ্য তুমি কি করে প্রমাণ করতে পার?

বেদান্ত সমস্তগুলি স্বীকার্য্যই বুঝে নিতে চান। এ জগতের জ্ঞান তোমার ত্রিবিধ প্রত্যয় হতে, কাজেই তোমার স্বীকার্য্যও তিনটী। সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে এই তিনটীকেই তোমার গ্রহণ করতে হবে।

তোমার জাগ্রদবস্থা আর দুটী অবস্থায় একেবারে লীন হয়ে যায়, তবুও স্বপ্নাবস্থাতে তোমার 'অহং' জাগ্রত থাকে; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতেই কি তুমি মরে যাও? সুষুপ্তিতে তো বুদ্ধি আর ব্যষ্টি অহং একেবারে লয় হয়ে যায়, তবু তোমার "তুমি" তো ঠিক তেমনই থাকে। এইটুকুই হল নির্ব্বিকার অবিনাশী তত্ত্ব—এই সত্যস্বরূপই তোমার আত্মস্বরূপ—তোমার ত্রিবিধ জগতের মাঝে এই তত্ত্বই অনুস্যূত। এই হচ্ছে ওঁকার। মন বুদ্ধি বা মস্তিষ্ককে আত্মা বলে গ্রহণ করবার কোনও অধিকার নাই তোমার। জগৎ যে আছে, তা তুমি কি করে জান? কি করে তোমার বিশ্বসত্তার অনুভূতি হয়? তুমি কিছু ছোঁও, কিছু দেখ, কিছু শোন, কোন বস্তু আস্বাদ কর কিম্বা কারও গন্ধ পাও—এইগুলিই হল অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। এখন যদি বল, এই তো দেখ্‌ছি, ভিক্টর হ্যুগো, রবার্ট ইঙ্গারসল, এমার্সন প্রভৃতি বড় বড় লেখকেরা জগৎ সম্বন্ধে কত কথাই লিখ্‌ছেন, তা হতেই জানছি যে জগতের অস্তিত্ব আছে;—তাহলে জিজ্ঞাসা করি, এই সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থও যে আছে,

তাও বা তুমি জান কি করে? তোমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়েই তাদের সত্তা প্রমাণিত হচ্ছে। জগৎ যে আছে, তার পরোক্ষ বা অপরোক্ষ একমাত্র প্রমাণই হচ্ছে তোমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

যে কোন প্রত্যয়ের বোধ হওয়া বা অন্তঃ-করণের গ্রাহ্য হওয়ার মূল নিদানই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি। ইন্দ্রিয়ানুভূতি তো কেবল জাগ্রৎ অবস্থাতেই হয় না। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি স্থূলরূপে থাকে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতেও কি তোমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যয়-বোধ—এগুলি হয় না? ঠিক স্বপ্নাবস্থার উপযোগী ইন্দ্রিয় কি তখন জাগে না? বাই-রের চোখ বা বাইরের কাণ তখন কাজ করছে না বটে। কিন্তু স্বপ্নরাজ্যে তুমি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু সৃষ্টি কর এবং তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ও সৃষ্টি কর। তাই দেখি স্বপ্নাবস্থাতে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ যেন একই শক্তির সম্মুখ ও পরাঙ্মুখ প্রান্তের মত—একটা পাতারই দুটা পিঠ যেন তারা। স্বপ্নে দৃশ্য এবং দ্রষ্টা একসঙ্গে জেগে ওঠে। স্বপ্ন-রাজ্যের দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয়েই অ উ ম-এর উকা-রের অন্তর্গত, আর যে মূল-তত্ত্ব দৃশ্য আর দ্রষ্টার মাঝে ঢেউ খেলিয়ে যায়, সেই হচ্ছে আত্মস্বরূপ বা ওঙ্কার। বেদান্তের মতে, তোমার জাগ্রৎ অবস্থাতেও ইন্দ্রিয় ও বিষয় একই শক্তির সম্মুখ ও পরাঙ্মুখ প্রান্তের মত পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। স্বপ্নাবস্থাতে যদিও বিষয় যেন স্বতঃ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে বলে মনে হয়, তবুও তাদের পিছনে একটা অতীতের ইতিহাস থাকে। জাগ্রৎ অবস্থাতেও দেখি, অনুভূতির বিষয়গুলি অতীতের ইতিহাস নিয়ে অনুভবিতার সঙ্গে একই সময়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। যখন তুমি বল, এই জগতই সত্য, এই একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব—তখন এ কথাটার ভিত্তি থাকে ইন্দ্রিয় বা অনুভবিতার সাক্ষ্যের উপর। আবার স্বপ্নাভিমানী জীবও তার স্বপ্ন-প্রত্যয়কে বাস্তব বলেই জানে। কিন্তু এ দুই অবস্থার একটীও তো যথার্থ বাস্তব নয়। এ যেন একটা লোক ছবির কুকুরকে সত্যি কুকুর বলে মনে করছে।

ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হল কোথা থেকে? ভূত থেকে। এই ভূতগুলি জান কি করে? ইন্দ্রিয় দিয়ে। কিন্তু এটা কি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই তর্ক হল না? জাগ্রৎ অবস্থা যে প্রাতিভাসিক মাত্র, একথা হতে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। স্বপ্নাবস্থাতেও তাই; যতক্ষণ স্বপ্ন দেখছ, ততক্ষণ মনে হয় তার বিষয়গুলি সত্য। কিন্তু জাগলে আর তাদের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। জাগ্রৎ অবস্থায় সমস্তই স্থূল, কঠিন, প্রত্যয়গ্রাহ্য—কিন্তু সুষুপ্তিতে এ জগৎ কোথায় মিলিয়ে যায়?—যাবে কোথায়?—অথচ নাই—জগৎ নাই। এখান হতেই দেখতে পাচ্ছি, জাগ্রৎ কি স্বপ্নাবস্থাকে বাস্তব সংজ্ঞা আরোপ করা ঠিক হয় না।

হিন্দুরা বলেন, সমস্ত অবস্থাতে যা নির্ব্বিকার, তাই সত্য। যা এক সময় আছে বলে মনে হয়, আবার আর এক সময় ছায়ার মত কোথায় মিলিয়ে যায়, তা নিশ্চয়ই মিথ্যা প্রতিভাসমাত্র। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও সত্যের এই সংজ্ঞাই দিয়েছেন।

স্বপ্নজগতকে তোমরা মিথ্যা বল কোন প্রমাণে?—যখন জাগ তখন তোমার স্বপ্ন থাকে না, তাই স্বপ্ন মিথ্যা। কাজেই মিথ্যাত্বের এই সংজ্ঞা জাগ্রতেও খাটে বই কি? যখন সুষুপ্তিতে গেলে, তখন জাগ্রৎ জগৎ আর রইল না।

অ-উ-ম-এর অ জাগ্রদাবস্থার আপাত-

প্রতীয়মান দ্রষ্টা এবং দৃশ্যকে প্রকাশ করছে। এরা শুধু মূলীভূত আত্মতত্ত্বেরই অবভাসমাত্র।

কিন্তু মানুষ কি অন্ধ সংস্কারের দাস! সে বলে, "এ যে আমার নগদ কারবার। এই যে স্থূল কঠিন জগৎ, এই তো সত্য।" মূঢ়, একমাত্র কঠিন সত্য হচ্ছ তুমি—নির্ব্বিকার অনন্ত তুমি—সেই হল একমাত্র কঠিন সত্য। তা ছাড়া আর সমস্তই ইন্দ্রিয়ের ছলনা মাত্র। এ সিদ্ধান্ত কেউ কেউ মানতে চায় না, কেননা এতে স্বপ্ন আর সুষুপ্তির অবস্থাকে জাগ্রতের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড় করানো হচ্ছে। তারা যেন এই কয়টা কথা একটু ভেবে দেখে।—

ভূগোলকের অর্দ্ধেক জুড়ে সব সময়ই রাত্রি; কাজেই পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষ সর্ব্বদাই স্বপ্ন অথবা সুষুপ্তিতে রয়েছে। যেমন জাগ্রৎ প্রত্যয়ের ভিতর দিয়ে সকলকে যেতে হয়, তেমনি স্বপ্নপ্রত্যয়ের ভিতর দিয়েও প্রত্যেককে এক সময় না একসময় যেতে হয়। তোমার শৈশবটা এমনি একটা সুষুপ্তির মত নয় কি? মৃত্যুও তো তেমনি সুষুপ্তি। শৈশবের প্রথম তিন চার বছর তোমার ঘুমে কেটেছে। তারপর জাগ্রৎ অবস্থায় যে সময়টুকু কেটেছে, তার হিসাব কর। দেখলে আশ্চর্য্য হবে যে, তোমার সমস্ত জীবনের অর্দ্ধেক কেটেছে নিদ্রায় আর আর অর্দ্ধেক কেটেছে জাগরণে। এখন জাগ্রৎ অবস্থায় যা কিছু ঘটেছে তাকেই তুমি আমল দেবে, আর নিদ্রাবস্থায় যা ঘটেছে তাকে কোন আমল দেবে না—এর মানে কি? ঘুমের মাঝে কি তুমি মরেছিলে? —না। তোমার স্বপ্নাবস্থার প্রত্যয় গুলিও তো তোমারই প্রত্যয়, তবে তাদের কেন হিসাবের মধ্যে ধরবে না? যদি জাগ্রদবস্থাই সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী হত, তাহলে রোজ কেন দেখতে পাই—হোক না কেন কেউ জোয়ান, হোক না জ্ঞানী—প্রতি রাত্রেই ঘুম এসে একেবারে হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়ে বিছানায় তাদের পেড়ে ফেলে? জেগে থাকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর না কেন, ঘুমটা যখন এসে চেপে ধরবে, তখন সাধ্য নাই যে চোখ মেলে থাক। জাগ্রদবস্থার যেমন একটা জগৎ আছে, তেমনি নিদ্রাবস্থারও একটা জগৎ আছে। তবেই বলি, জাগ্রদবস্থার হিসাবটা যদি কর, তবে নিদ্রাবস্থার হিসাবটা করতেও তুমি বাধ্য।

ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেরা সংখ্যাধিক্য দেখে সমস্ত বিষয়ের মর্য্যাদা নিরূপণ করে। যদি তাই হয়, তাহলে স্বপ্ন আর সুষুপ্তিকেও ভোটের অধিকার দিতে হয়। জাগ্রদবস্থার প্রামাণ্যে যদি স্বপ্নাবস্থা মিথ্যা হয়ে যায়, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি অবস্থার প্রামাণ্যে জাগ্রদবস্থাও তো তাহলে মিথ্যা হয়ে যায়। তারপর ধর, এই যে গাছপালা রয়েছে, এরা যেন চিরকাল সুষুপ্তিতেই রয়েছে; আর এই ইতর জীবগুলির যেন জীবনভরা স্বপ্নাবস্থা। তোমার কাছে এ জগৎ যেমন মনে হয়, তাঁদের কাছে তা মোটেই মনে হয় না—তোমাদের জগৎ আর তাদের জগৎ আলাদা। তবে তাদের অনুভূতিগুলি হিসাবের মাঝে ধরবে না কেন? তোমার চোখে জগৎটা যেমন ঠেকছে, একটা পিঁপড়ের চোখে, ব্যাঙের চোখে, পেঁচার চোখে বা হাতীর চোখে সে রকম ঠেকছে না। কিন্তু তুমি বলবে, হিসাব করবার বেলায় কেবল মানুষের অনুভূতিগুলিরই হিসাব নিতে হবে, আবার তার মাঝেও জাগ্রৎ জগৎকেই বাস্তব বলতে হবে! কিন্তু পুরা-

পুরি মানুষ যারা, তাদের অনুভূতির প্রামাণ্য যদি গ্রহণ কর, তবে দেখতে পাবে, এই যে জগৎ নিরেট্ বলে মনে হচ্ছে, এটা নিতান্তই ফাঁকা।

তুমি জিজ্ঞাসা করবে, কি করে তা হবে? এই যেমন আমাদের হাক্সলী, স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিকের দল রয়েছেন। তাঁরা সবাই জাগ্রদবস্থার উপরেই অসম্ভব রকম জোর দিচ্ছেন। তবে আর তাঁরা কি করে জগৎকে অবাস্তব বলে মানবেন?—একটু ভেবে দেখ। তুমি তাঁদের হুঁসের কথা শুনবে, না বেহুঁসের কথা শুনবে? তাঁরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বা নাক ডাকিয়ে যে কথাগুলো বলবেন, তা নিশ্চয়ই তুমি আমলে আনবে না। তবে এঁরা সব চেয়ে হুঁসিয়ার থাকেন কখন? তাঁদের কথা নির্ব্বিচারে এবং শ্রদ্ধা সহকারে তখনই মেনে নিতে পারি, যখন বুঝতে পারি, জ্ঞান যেন তাঁদের মাঝ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। যখন এমনি তন্ময় অবস্থায় তাঁরা থাকেন, তখন একবার কাছে গিয়ে দেখো, তাঁদের প্রত্যেকটী লোমকূপ, মস্তকের প্রত্যেকটী কেশ পর্য্যন্ত জগতের মিথ্যাত্ব আর অদ্বৈত-জ্ঞানের যাথার্থ্য প্রমাণ করছে কি না। সে অবস্থায় তুমি-আমি নাই, দ্বৈত নাই, বহুত্ব নাই, অহং নাই, জগৎ নাই। সমস্তটা প্রাতি-ভাসিক জগৎ তাঁর শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। তখন তিনি ভাবস্থ, সমস্ত চিত্তশক্তি তখন কেন্দ্রীকৃত, জগৎ হতে আচ্ছিন্ন—সেই তাঁর পরম অবস্থা। এ অবস্থায় জ্ঞান স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত—আপনি তা ঝরে পড়ছে—ওই সূর্য্য থেকে যেমন নির্ব্বাধে আলো এসে পৃথিবীতে পড়ে, তেমনি করে তাঁর ভিতর থেকে জ্ঞানের দীপ্তি উৎসারিত হচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি কথা বলতে পারেন না। ওখান থেকে নেমে আসলে তবে কথা বলা চলে—তখন নূতন সত্য, নূতন বার্ত্তা তাঁর ভিতর থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, বড় বড় চিন্তা-শীল লেখকদের অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ সর্ব্বোত্তম অনুভূতি হতে এই প্রমাণ হচ্ছে যে, জগতের বাস্তবতা নাই। এ কথাটাকে আরও স্পষ্ট করে বলা চলে। তুমি যখন ভাব, তখন কি কর? ভাববার সময় প্রথমে যে-কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ভাবতে সুরু কর, আর সমস্ত বাদ দিয়ে একটা বিষয়ের উপরেই তুমি জোর দাও। সমস্ত চিত্ত তোমার সেই বিষয়টার উপরেই তখন নিবিষ্ট হয়ে পড়ে; তোমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেষ্টা দিয়ে তুমি কেবল একটা বিষ-য়কেই আঁকড়ে ধর। ক্রমে মন যেন ওই চিন্তাদ্বারাই অনুষিক্ত হয়ে যায়। তার ফলে চিন্তাটী দূর হয়ে যায়, আর একটা নিরবলম্ব অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এসে উপস্থিত হয়—যা নাকি সমস্ত জ্ঞানের উৎসধারা।

মনস্তত্ত্বের একটা প্রসিদ্ধ নিয়ম আছে, একটা বিষয়ের অনুভূতি জাগাতে হলে আর একটা বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয়কে তার পাশে রাখ্তে হয়। মনে যখন কোন দ্বৈত থাকে না, তখন কাজে কাজেই বস্তুজ্ঞান আর টিক্‌তে পারে না। এইটাই হল তন্ময়তার অবস্থা।

টেনিসন যখন 'লর্ড টেনিসনে'র অভিমান ছাড়িয়ে ওঠেন, তখনই তিনি 'কবি টেনিসন।' বার্কলে যখন 'বিশপে'র অভিমান নিয়ে থাক্‌ছেন না—তখনই তিনি দার্শনিক 'বার্কলে।' হিউমের চরিতকার তাঁর ব্যক্তিত্বের যে চিত্রটী এঁকেছে, তাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌লেই

তবে 'দার্শনিক হিউমকে' আমরা পাই। হাক্সলী যখন ঐতিহাসিকের হাক্সলী নন, তখনই তিনি 'বৈজ্ঞানিক হাক্সলী।'

আমাদের ভিতর দিয়ে যখন কোনও আশ্চর্য্য বা মহৎ কাজ হয়ে যায়, তখন তার বাহাদুরীটা নিজে নেওয়া নেহাৎ মূর্খতা। কারণ কাজটা যখন হচ্ছিল, তখন যে অহং কেবল বাহাদুরী খুঁজে বেড়ায়, সে যে ছিলই না। সে যদি থাকৃত, তাহলে কাজটার সমস্ত মাধুর্য্যই যে মাটী হয়ে যেত। আমি করছি—এ বোধ তখন একেবারেই ছিল না। কাজটা হয়েছে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেরণা হতে। কাজেই দেখছি, ভাবুক বল, সাহিত্যিক বল, যার কথাই বল না কেন, তাঁদের সর্ব্বোত্তম অনুভূতি বিচার করে তা হতে যদি কোনও সিদ্ধান্ত করতে যাই, তাহলে বলতে হয় তাঁদের কাজে-কর্ম্মে, এমন কি শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়ে তাঁরা সর্ব্বদাই এই সত্যই প্রচার করছেন যে, জগৎ অবাস্তব। কথার চেয়ে কাজের প্রামাণ্য অধিক। ধর যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় বীর, বড় বড় যোদ্ধা একত্র হয়েছে, মনকে চাঙ্গা করে নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছে। চারিদিকে অবিশ্রাম গুলি বৃষ্টি হচ্ছে—এইখানে গুলি পড়ছে—ওইখানে ক্ষত হচ্ছে—শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, শরীর ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবুও তারা সামনের দিকে এগুচ্ছেই—এগুচ্ছেই। এমন অবস্থায় শারীরিক কষ্ট কষ্টই নয়। কেন? কারণ বাস্তবের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, বাইরের শরীর যে শরীরই নয়, বাইরের জগৎ যে জগৎই নয়। শক্তির স্ফুরণে স্থূল-দেহ আর স্থূল জগৎ তাদের কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। এমনি করে তোমার নেপোলিয়ান, ওয়াশিংটন, ওয়েলিংটন প্রভৃতি সকলেই তোমার কাছে প্রমাণ করছেন, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রমাণ করছেন যে, আত্মশক্তি যখন জাগে, তখন এ জগৎ তুচ্ছ হয়ে যায়—মিথ্যা হয়ে যায়। আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই শক্তি—আত্মাই একমাত্র নির্ব্বিকার, বিক্ষোভহীন পরম সত্য। তাঁর সামনে জগতের আপাত প্রতীয়মান মিথ্যা কোথায় শূন্যে মিলিয়ে যায়।

যোদ্ধার বাহু সবল হল কি করে? যে আত্মার কঠিন, অবিচ্যুত, অলঙ্ঘ্য শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মুহূর্ত্তের মাঝে মানুষের চিত্তে এত চিন্তা, এত তথ্য, এত আবিষ্কার জাগে কি করে? বুদ্ধি বা চিত্তের একাগ্রতা মুহূর্ত্তের জন্য যে আত্মার সত্যস্বরূপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তত্ত্বমসি—সেই সত্যই তুমি—তুমি এ জগতের দীপ্তি—রাজার রাজা তুমি—পুণ্য হতে পুণ্যতম, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতম তুমি।

ওম্—এই মন্ত্রের মধ্যে আদ্যাক্ষর অ হচ্ছে তোমার আত্মরূপী সেই বীজ, যা নাকি জাগ্রদবস্থার প্রাতিভাসিক জড় জগৎকে আশ্রয় দিচ্ছে, প্রকাশ করছে। তেমনি, উ হচ্ছে স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা। অন্ত্যাক্ষর ম হচ্ছে অব্যক্তাবস্থার আশ্রয়; আমাদের বিশিষ্ট বুদ্ধির অজ্ঞাত যা, তারই প্রকাশক।

প্রণব জপ করবার সময় জ্ঞানী তাঁর সমস্ত চিত্তকে একাগ্র করে, সমস্ত ভাবকে উন্মুখ করে অনুভব করবেন যে, আত্মাই হচ্ছেন একমাত্র সত্য, যিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ তিনটা জগৎ প্রকাশ করছেন আবার ধ্বংস করছেন—যেমন উষাকালে সূর্য্য বর্ণের বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন আবার মধ্যাহ্নে নিজের তেজে সংহৃত করেন।

এ সমস্ত জগতই প্রাতিভাসিক। স্বপ্নের মাঝে একটা নেকড়ে দেখলে; তোমার ভয় হল, তোমাকে খেয়ে ফেলবে।' কিন্তু ভয় তো নেকড়ে হতে নয়; তুমি তো নেকড়ে দেখছ না—তুমি দেখছ তোমাকে। তাই বেদান্ত বলছেন, জাগ্রদবস্থাতেও তুমিই তোমার শত্রু, তুমিই তোমার মিত্র। তুমি সূর্য্য—আবার যে সরোবরের বুকে তার আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই সরোবরও তুমি। তুমিই প্রদীপ, তুমিই পতঙ্গ। তোমার নিদারুণ শত্রু যে, সে তো তুমিই—তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। প্রণব জপের সময় তোমার মনকে অনুভূতির এমন উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে হবে যে, যত কিছু ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্বের পুঁজি, সব যেন ঝেঁটিয়ে ফেলতে পার। ভেদ-ভাব একেবারে দূর করে ফেলতে হবে। বন্ধু বা শত্রুর আকৃতি তো স্বপ্নমাত্র—তুমিই শত্রু, তুমিই মিত্র। কাল যা করেছিলে, আজ কি তা আছে? আজ তা স্বপ্ন নয় কি? কালকে যা কিছু হল—কোথায় তারা—কোথায় গেল? এমনি করে জাগ্রতের প্রত্যয়ও মিথ্যা—স্বপ্নের প্রত্যয়ও মিথ্যা। সত্য যা, বাস্তব যা, সে হচ্ছে আত্মা। তিনি এর অন্তরালে। তাঁকেই উপলব্ধি করতে হবে।

কেউ কেউ বস্তুকে ভাবরূপে ভাবনা না করে ভাবকেই বস্তুরূপে ভাবনা করতে চায়। সূক্ষ্মজগৎ বা চিন্তাজগতের সঙ্গে তুলনা করে এই জড় জগৎকেই তারা বাস্তব বলতে চায়। কিন্তু বেদান্তের মতে স্থূল, সূক্ষ্ম দুই জগতই অবাস্তব। তোমাকে এ দুয়েরও উর্দ্ধে উঠতে হবে, কেননা, সুখ বল, শান্তি বল, বিশ্রাম বল, সে মিলবে তখনই—যখন যবনিকার অন্তরালে যে সত্যস্বরূপ লুকিয়ে রয়েছেন—তাঁকে জানতে পারবে।

অ উ-ম—এর মধ্যে অ-কেও মাত্রা বা রূপ বলে, উ-কেও মাত্রা বলে, ম-কেও মাত্রা বলে। কিন্তু ওঙ্কার মাত্রাতেই এসে থামে নি। যে সত্য এই সমস্ত মাত্রার ভিতর দিয়ে অনুস্যূত হয়েছে, ওঁকার সেই সত্যকেই লক্ষ্য করছে। লোকে বলে "আমরা চাই বাস্তব জীবন, কেবল কতগুলি তত্ত্ব দিয়ে কি হবে?"—বটে? কিন্তু জীবনটাই কি? তুমি কি স্বপ্নজীবন চাও, না সুষুপ্তি জীবন চাও, না জাগ্রৎ-জীবন চাও? এ সমস্তই তো প্রতিভাস মাত্র। তোমার আত্মাই তো সত্য—আত্মাই তো বাস্তব জীবন। প্রকৃতির এমন কঠিন আইন আছে, যে চিরকাল ধরে ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় ভোগ করা তোমার চলবে না। ইন্দ্রিয়ের কাছে আত্মবিক্রয় করে ইন্দ্রিয়জগতে, আবদ্ধ থেকে সুখী হওয়া কি সম্ভব? না—এ একেবারে অসম্ভব। এমন সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য কঠিন বিধান আছে, যা তোমাকে কিছুতেই ইন্দ্রিয়সুখে সুখী হতে দেবে না।

আত্মাই সত্য, তিনিই জীবন। আত্মাকে উপলব্ধি কর, দেখবে জড় জগতের ভোগ তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেমন করে প্রদীপশিখার পানে পতঙ্গ ছুটে আসে, নদী যেমন সমুদ্রের পানে বয়ে চলে, ভৃত্য যেমন রাজার পায়ে নত হয়, তেমনি করে জগতের ভোগও তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে—যখন নাকি তুমি আত্মাকে জানবে, বুঝবে—যখন উপলব্ধি করবে, তুমি দিব্য মহিমায় উদ্ভাসিত, তুমি সত্য স্বরূপ। ওঙ্কার এই আত্মারই বাচক।

অ উ-ম—এই তিনটী মাত্রা হতে হিন্দু, বিশেষতঃ বেদ, কি করে তোমার মূলীভূত স্বরূপের সন্ধান বলে দেন, তা বোঝান

গেল। ওঙ্কার অর্থ—সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত পরমতত্ত্ব, অনন্ত সত্য, তোমাব অবিনাশী আত্মস্বরূপ। যখন এই পবিত্র প্রণব জপ করবে, তখন দেহ-মন বুদ্ধিকে আত্মস্বরূপে সংহত করতে হবে—আত্মাতে তাদের লীন করতে হবে। এই সত্য উপলব্ধি করে তারপব তোমাব ভাবেব ভাষায় তাকে ফুটিয়ে তোল, তোমার কর্ম্মেব ছন্দে তাকে ঝঙ্কৃত কব—তোমাব প্রতি লোমকূপে তাকে বিঘোষিত কর। তুমি যে জ্যোতিব জ্যোতিঃ, তপনেরও তপন, রাজার রাজা—বিশ্বের প্রভু যে তুমি—তুমি যে আত্মস্বরূপ—এই সত্য তোমার শিরায় শিরায় বয়ে যাক্, তোমার বক্ষতালে স্পন্দিত হোক্, তোমার প্রতি কেশ, প্রতি রক্তবিন্দু এই সত্যোপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক। গ্রহ-নক্ষত্র তো তোমারই হাতের গড়া—এই দ্যাবাপৃথিবী তো তোমাবই কীর্ত্তি। সমস্ত জগৎ যে তোমাব মহিমা প্রচার করছে—প্রকৃতি যে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে!—ওঁ ওঁ *

*স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা ২২শে ডিসেম্বর, ১৯০২)

ক্ষুব্ধা

এই ক্ষুব্ধ বক্ষ-তলে
কত যুগযুগান্তের দুঃখ-সুখ ব্যাকুলিয়া চলে;—
মুকুলিত যত আশা, সরমের রক্ত-কিসলয়—
মর্ম্ম মাঝে পশি কভু নিয়েছ কি তার পরিচয়?
দেখেছ কি মৌন অনুরাগে
অনিমেষ আঁখিপাতে তব পথে নিত্য কেবা জাগে?—
দিয়েছে সে—কহে নাই কথা;
রক্তে-রাঙা সঙ্গোপন মরমের ব্যথা—
দুটী শীর্ণ বাহু দিয়া
তোমার নয়ন হতে রেখেছে সে নিত্য আগুলিয়া!

তারে তুমি করিও না হেলা—
আশার সমাধি পরে—স্তব্ধ রাতে—আজি এই বিদায়ের বেলা!

পথের সঙ্কেত

—•—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বলিয়াছি, অস্বস্তি লইয়া দিন কাটাইয়া দেওয়া মানুষের যখন স্বভাব, তখন ঠিক তার বিপরীত অবস্থাটাই তোমাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তবে এমন হইতে পারে যে তোমার ভিতর কোথায় অস্বস্তি আছে, তাহা তুমি খুঁজিয়া পাইতেছ না—সাংসারিক হিসাবে মনে হইতেছে—বেশ আছি। এই বেশ থাকাটাও একটা ব্যাধি—ইহারও চিকিৎসা প্রয়োজন। বেশ থাকার চেয়ে চিত্তে যদি অশান্তি থাকে, তবে ঘা খাইয়া চিত্ত সহজে সত্যের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। কাজেই অস্বস্তি না থাকিলেও অস্বস্তি তোমার মাঝে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বেশ আছি যখন মনে হয়, তখন তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কতকগুলি প্রবৃত্তি আসিয়া তোমার দেহ-মনের রাশ ধরিয়াছে, আর তাহারা যে দিকে চালাইতেছে, নির্ব্বাধে সে দিকে তুমি যাইতে পারিতেছ বলিয়াই তোমার মনে হইতেছে বেশ আছি। কিন্তু ঠিক তোমার খুসীমত যদি চলিতে না পার, তাহা হইলে তোমার কি দশা হয়, ভাবিয়া দেখ দেখি! তখন আর বড় গলায় বলিতে পারিবে না যে বেশ আছি!—কাজেই প্রবৃত্তির মাঝে ডুবিয়া থাকিয়া যে অবস্থাটাকে তুমি স্বাধীনভাবে ভোগ করিতেছ বলিয়া মনে মনে স্পর্দ্ধা করিতেছ, আসলে সেটা তোমার অধীনতারই অবস্থা। এই অবস্থার দাসত্ব হইতে তোমাকে উদ্ধার পাইতে হইবে।

নিশ্চিন্ত তৃপ্তিকে কিছুতেই বিশ্বাস করিও না. যদি ভগবানের কৃপায় দৈবপ্রতিকূলতায় এ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া না যায়, তবে তোমাকেই নির্ম্মম হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। যে তৃপ্তিতে অন্তর বাহির আলো হইয়া না উঠে, সুখ দুঃখ, কান্না হাসি সমস্তই মাধুর্য্যে ভরিয়া না উঠে, সে তৃপ্তি আসল নয়। নকল লইয়া তুমি করিবে? আসল তৃপ্তি তোমার স্বরূপ, আর এই নকল তৃপ্তি তোমাকে দাম দিয়া কিনিতে হয়, যখের ধনের মত তাহাকে আগলাইয়া থাকিতে হয়। কাজেই যে পর্য্যন্ত না কি অন্তরের মাঝে এমন কিছুর সাক্ষাৎ না পাইতেছ, যাহার কাছে সমস্তটা জগৎ তুচ্ছ, ততদিন পর্য্যন্ত যে মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া সুখ তোমার কাছে আসুক না কেন—তাহাকে বিশ্বাস করিও না। যাহাই আসুক না কেন, যদি সেটা ভাল লাগে, তাহা হইলে নিজকে জিজ্ঞাসা করিও, এ হইতে বঞ্চিত হইতে হইলে তোমার কোথাও ব্যথা লাগে কিনা। আসল নকলের পরখ এখানেই হইবে। সত্যিকার তৃপ্তি নিত্য বস্তু, তা এক-বার আসে, একবার যায় না—সুতরাং তার সঙ্গে বিরহের কোনও ভয় থাকে না. জোড়া-তাড়া দিয়া তাহাকে টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টারও প্রয়োজন হয় না।

যা কিছু ভাল লাগে, তাহাকেই যদি আঘাত করিয়া চল, তখন কাজেই তোমার ভিতর একটা অস্বস্তি জন্মিবে। মন বলিবে

"নাঃ, এখানে ভাল বলিয়া যাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিতেছি, তাহারই তো গোলামী করিতে হইতেছে, অথচ তাহার থাকা না থাকা তো আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না। কাজেই পড়িয়া-পাওয়া অমন দুই চারিটা ঠুন্‌কো জিনিষ নিয়া ভুলিয়া থাকিব কি করিয়া? এগুলির মায়া আমাকে কাটাইতেই হইবে।" এই ভাব হইতেই চিত্তে অস্বস্তি জন্মিবে। এই অস্বস্তির ব্যথা হইতেই আনন্দের জন্ম। মন আর কিছুতেই ছেলে-ভুলানো খেলানা নিয়া পড়িয়া থাকিতে চায়না, অথচ যাহা খুঁজিতেছে, তাহাও কেহ তাহার হাতে তুলিয়া দেয় না—এই তো অন্তরের জ্বালা। এ জ্বালা কামনার জ্বালা নয়, এ বৈরাগ্যের জ্বালা। এ জ্বালায় দিবানিশি তোমাকে জ্বলিতে হইবে—আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদে অরুচি ধরিয়া যাইবে—মনে হইবে, নিঃশ্বাস ফেলিবার চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত যেন তোমার বৃথা যাইতেছে—এ জগতের এতটুকু বশ্যতাও যেন বুকের উপর একটা জগদ্দল পাথর।

এই অস্বস্তি হইতে জিজ্ঞাসা জন্মিবে। সেই জিজ্ঞাসা হইতেই ভাবের জন্ম। জিজ্ঞাসা দ্বারা মানুষ নিজকে ডিঙ্গাইয়া যায়। যতটুকু নিয়া তুমি নড়িতেছ-চড়িতেছ, ততটুকুতেই খুসী থাক তখনই, যখন চিত্ত মোহাচ্ছন্ন থাকে। আঘাত পাইলে এই মোহ টুটিয়া যায়, তখন কোথা হইতে এ আঘাত আসিল খোঁজ করিতে গিয়া মানুষ নিজকে আরও বড় করিয়া জানিতে পারে। কারণ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ দুঃখের মীমাংসা খোঁজে না, প্রতীকারটাকে সে নিজের হাতেই নিতে চায়। এই চেষ্টা প্রথমতঃ বহির্মুখীই হয় বটে, অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া মানুষ দুঃখের হাত হইতে বাঁচিতে চায়; কিন্তু অবশেষে যখন ইহাতেও আর কুলাইয়া উঠে না, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে নিজের সঙ্গেই একটা মীমাংসা করিয়া লইতে হয়। এই মীমাংসা করিতে গিয়াই সে দেখে, অবস্থার পীড়নে নিজকে সে সঙ্কুচিত মনে করিতেছে বলিয়াই তাহার দুঃখ। কিন্তু যে জায়গাতে ব্যথা, সে জায়গা হইতে মনকে যদি সে আরও উর্দ্ধে তুলিয়া নেয়, তবে আর ব্যথার পীড়া থাকে না। এমনি করিয়া আঘাত হইতে, বেদনা হইতে, অস্বস্তি হইতে মানুষ নিজের বৃহত্তর সত্তার সন্ধান পায়। এই সমস্ত ব্যথার কাঁটা নিশ্চিন্ত আরামে তাহাকে একটা কিছু লইয়া পড়িয়া থাকিতে দেয় না—খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া তাহার মাঝে তাহারা জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তোলে।

এমনি করিয়া ব্যথা পাইয়া, ব্যথা ডাকিয়া আনিয়া সেই ব্যথার সঙ্গে যুঝিয়া নিজকে তোমার বড় করিয়া জানিতে হইবে। যত-টুকুতে তুমি আছ, ততটুকু তুমি নও—তুমি আরও বড়—এই অনুভূতি হইল ভাবের প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। তুমি যত বড় হইতে থাকিবে, এ জগৎটাও তোমার কাছে তত ছোট হইয়া যাইবে অর্থাৎ এখন যেমন তোমার জগৎ আর তুমি একেবারে খাপে-ভরা তলোয়ারের মত মিশিয়া রহিয়াছ, তখন এই সঙ্কোচটুকু আর থাকবে না—তোমার জগৎ হইতেও তুমি তখন বড়। আবার তোমার ব্যাপ্তির অনুপাতে তোমার জগৎও বাড়িয়া চলিবে বটে, কিন্তু তবুও তোমাকে সে কখনো ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। এমনি করিয়া নিজকে শুধু একটা জন্মের গণ্ডীর মাঝে না আটকাইয়া দেশের সঙ্কোচ, কালের সঙ্কোচ কাটাইয়া খুব বড় করিয়া

দেখিতে অভ্যাস কর। নিজকে এমন ভাবে ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করা শুধু কল্পনা নয়, অর্থাৎ কোনও যুগের কল্পনা বা আকাশের কল্পনার সঙ্গে নিজকে জুড়িয়া দিয়া বড় মনে করা নয়; এর মাঝে অনুভূতির এমন একটা গাঢ়তা, এমন একটা নিঃসঙ্কোচতা আছে, যাহাতে বাহিরের কিছুর সঙ্গে তুলনা না করিয়াও নিজের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একটা অন্তর্গূঢ় ধারণা সর্ব্বদা বহন করা চলে।

নিজকে ছড়াইয়া দাও, কিম্বা নিজকে তলাইয়া দাও—একই কথা। যে নিজের সঙ্কোচের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ব্যাপ্ত হইয়া চলিয়াছে আর যে নিজকে অণু হইতেও অণু করিয়া অভিমানের নাট ভাঙ্গিয়া দিতেছে, উভয়েরই এক লক্ষ্য—এই জগতের সঙ্গে সমস্ত হিসাব নিকাশ করিয়া লওয়া। তুমি যেখানেই থাক না কেন, যাহাই কর না কেন, আপনাকে বাঁচাইয়া তবে তোমার অন্য কথা। আর আপনাকে বাঁচাইবার পথই হইল সংসারের সঙ্কীর্ণ মমতার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া। এই তত্ত্ববোধটুকু তোমার চাই-ই চাই। মৃত্যু যেমন প্রকৃতির আইন—তুমি হাজার কাজই কর আর ভালই বাস—তার ডাক যে দিন আসিবে সেদিন যেমন সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই হইবে, ঠিক তেমনি করিয়া তোমার বর্ত্তমানের গণ্ডীও তোমাকে পার হইয়া যাইতে হইবে—কারণ এ তোমার স্বভাবের সত্য।

আজকাল বৈরাগ্যের কথায় মানুষের তর্ক-বুদ্ধিটা প্রবল হইয়া উঠে। সংসার যে সুন্দর ও কল্যাণ, নানা-ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া মানুষ এই কথাটাই পরস্পরকে বুঝাইবার চেষ্টা করে। ভগবানের সৃষ্টিকে অসুন্দর বলিবে কে?—কিন্তু যেমন সংসারে, তেমনি সংসারের বাহিরে, সব জায়গাতেই তোমার স্বার্থকে বড় করিয়াই দেখিতেই হইবে—অবশ্য তার মাঝে স্ব-কথার অর্থ লইয়া মত-ভেদ থাকিতে পারে। তোমার জীবনে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন কি, তাহা তুমি একবার তলাইয়া দেখ, তার পর সংসারকে সুন্দর বলিতে হয় বলিও, কুৎসিত বলিতে হয় বলিও। সংসারকে সুন্দর বলিয়াও তো নিজের স্বার্থটুকু—লইয়াই টানাটানি করিতেছ—, তবে আর তোমার স্বার্থের কাছে তাহার সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রহিল কোথায়? এই স্বার্থই যদি ইন্দ্রিয়-সুখের স্বার্থ না হইয়া আধ্যাত্মিক স্বার্থ হইয়া দেখা দেয়, আর সেই স্বার্থের দরুণ যদি আপাতমনোরমকেও তোমার প্রত্যাখ্যান করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার এমন কি মহাপাপ হইবে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। তবে অধ্যাত্ম-স্বার্থের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক করিতে লোকে পিছু-পা হইবে না বটে। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনটা কেমন, তাহার কিছু মাত্র স্বাদ পাইয়া মানুষ তর্ক করিতে আসে, না বাহির হইতে কেবল আন্দাজের উপর ঢেলা ছুঁড়িয়া বসে? সংসার বড়, না অধ্যাত্ম-জগৎ বড়, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রায় একমাত্র সে-ই দিতে পারে, যে নাকি এই দুইটারই তত্ত্ব ভাল করিয়া আস্বাদন করিয়াছে।

এ পথে পা বাড়াইতে গেলে এমনি কত তর্ক মনের মাঝে উঠিবেই। তুমি ভোগ ছাড়িতে গেলেই ভোগ সহজে তোমাকে ছাড়িবে না। তুমি এখন তাহার এলাকাতেই রহিয়াছ; সে আসিয়া তোমাকে যে যুক্তি শুনাইবে, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ আনিয়া তোমার কাছে হাজির করিবে, তাহাকে কাটাইয়া আসা বাস্তবিকই কঠিন।

হয়ত মনটী ফাঁকা হইয়া গিয়াছে, কোনও কিছুর প্রতি যে প্রাণের টান আছে, এমন কিছু বুঝিতেছ না—ইহার মাঝেই একদিন ঝড়ের মত কোথা হইতে কাহারা আসিয়া তোমার শূন্য রঙ্গমঞ্চে মহাকলরবে নৃত্যগীত জুড়িয়া দিল—সামাল সামাল করিতে করিতে তুমি কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল। এমন পরীক্ষা চলিবেই। যদি গোড়ার কথাটা না বুঝিতে পার, তবে শুধু গায়ের জোরে ইহাদের কোনদিন হটাইতে পারিবে না। এ প্রকৃতির মোহ—এর একমাত্র উপায় জ্ঞান। তার জন্যই তোমার জীবনের তাৎপর্য্য তোমাকে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে। যেমন অবস্থার খপ্পরে পড়িয়াছ, ঠিক তাহার মাঝে থাকিয়া কেবল হাত পা ছুঁড়িলেই নিস্তার পাইবে না—অবস্থার সঙ্কোচ হইতে নিজকে বড় করিতে পারিলেই তবে নিজের সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মিবে, অবস্থার বিপর্য্যয় সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মিবে। বৈরাগ্য এই জন্যই প্রয়োজন।

সংসার তোমার জীবনটাকে শুধু বর্ত্তমান প্রয়োজনের হিসাবে বিচার করিতেছে। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে যতটুকু দেখা যায়, তোমার জীবন তো কেবল ততটুকুর মাঝেই আবদ্ধ নয়। বৈরাগ্য তোমাকে এই কথাটাই বুঝাইয়া দেয়। এর সঙ্গে সংসার কর্ত্তব্যের কোনও বিরোধ হইতে পারে না, কারণ বৈরাগ্য তো জড়ত্ব নয় বা অপ্রেম নয়। তোমার জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা কি, তাহা বুঝিয়া সেই আদর্শকে যদি তুমি ভালবাসিতে পার, তবে সে ভালবাসা যে তোমার সংসারের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশেও সঞ্চারিত হইবে। বড়কে ভাল-বাসিয়া তাহারই জন্য ছোটকে ভালবাসিতে পারিলে তবে ভালবাসার মর্য্যাদা থাকে। সে ভালবাসায় মানুষকে কামনার ডুবীতে বাঁধে না, আত্মার রসরূপকেই স্ফূর্ত্ত করিয়া তোলে। বৈরাগ্যের মাঝে এমনি আত্মপ্রতিষ্ঠ ভালবাসা আছে এবং সেই ভালবাসা জাগিলে, যাহাকে ভালবাসিবে তাহার প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিবার এবং করিবার অধিকারও জন্মিবে।

এমনি করিয়া সংসারকে তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়াও তুমি নিজকে তাহার পাশ হইতে মুক্ত করিতে পার। আসল কথা এই, শুধু একটা খোলসের মাঝে নিজের অত বড় জীবনটাকে পুরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না; তাহাতে নিজেও শক্তি পাইবে না, অপরেরও যথার্থ কিছু হিত করিতে পারিবে না। যেমন জাতির অভি-মান, বিদ্যার অভিমান, ধনের অভিমান অজ্ঞাতসারে মানুষের মজ্জাগত হইয়া যায়, তেমনি তুমি যে শুধু এ জগতের প্রয়োজনের মাঝেই আবদ্ধ নও, এ জগতের সার্থকতার চেয়েও যে একটা বড় সার্থকতা তোমার পক্ষে সম্ভব—এই শ্রদ্ধাকেও মজ্জাগত করিয়া তুলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সংসারের দিক দিয়া কোনও যুক্তি-তর্ক শুনিবার অবসর তোমার নাই, কেননা তোমার এই মহত্তর ধর্ম্ম যাজন করিতে গিয়া সংসারের সঙ্গে কোনও বিরোধ বাধাইবার প্রয়োজনও তো তোমার নাই। বৈরাগ্যের উচ্চভূমি হইতে যদি সংসারের দিকে চাহিতে পার, তবে তোমার পুণ্য দৃষ্টিতে সংসারের সার্থকতা আরও শতগুণে ফলিয়া উঠিবে। সংসার তোমার বৃহত্তর জীবনেরই একটা অংশমাত্র, সে তোমাকে গ্রাস করিয়া বসিলে সে-তো তোমারই দীনতা।

হয়ত বলিবে এমন করিয়া সংসারের সঙ্গে বনিয়া চলা বড় কঠিন হইবে। কিন্তু এ

তোমার অশিক্ষা জাত সংস্কারের কথা। নিজকে তলাইয়া দিয়া সংসার করাটা সহজ মনে করিতেছ বটে, কিন্তু একবার তাহার গণ্ডী হইতে বাহিরে দাঁড়াইতে পারিলে বুঝিতে পারিতে, সেখানেও মূঢ়ের মত কত বড় দুঃসাধ্যকে এতকাল বহন করিয়া গিয়াছ।

ব্যাপ্তি ছাড়া পথ নাই—সঙ্কোচের বাঁধন হইতে নিজকে মুক্ত করিতেই হইবে। মমতা বল, কর্ত্তব্য বল, আত্মোৎসর্গই বল, এই বেড়া-জাল ছিঁড়িয়া বাহিরে আসিতে পারিলে তোমার কাছে ইহাদের আর এক উজ্জ্বলতর অভিনব রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। দৃষ্টিকে উদার কর, তোমার তুমিত্বের সংজ্ঞাকে আরও বড় করিয়া জানিতে চেষ্টা কর; ভাবসংক্ষয়ের সাধনায় ইহাই প্রথম কর্ত্তব্য। যেমন নাকি সংসারের শিক্ষা শিশুকেও দিই, ভবিষ্যতের আশায়—তেমনি মহাভবিষ্যতের আশায় সংসারাতীতের শিক্ষাও তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা তাহার সংসার করাটা পর্য্যন্ত সার্থক হইবে না। (ক্রমশঃ)

বেদান্ত-সার

—*—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—কর্ম্মবিচার]

উপাসনা

তারপর উপাসনা—চিত্তশুদ্ধির ইহা শ্রেষ্ঠতম সাধনা। বৈদান্তিক ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবেন। ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণ দুইটী বিভাব। নির্গুণ ভাবের উপাসনা চলে না, কেননা তাহা বাক্য মন বুদ্ধির অগোচর—কেবলমাত্র "অস্তীত্যুপলব্ধব্যঃ।" লৌকিক ভাবে তাঁহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোন পথ শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন না। তাঁহার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা চলে যে, যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহা হইতে আমরা বিযুক্ত বলিয়া অনুভব হইতেছে, সে অজ্ঞানের আবরণ দূর করাই আমাদের পক্ষে একমাত্র সাধ্য, নতুবা অদ্বয় তত্ত্বে সাধ্য-সাধনভাব থাকিবে কোথা হইতে?

কিন্তু তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণে এই জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন,—তাঁহার নির্গুণভাব সগুণকে অতিক্রম করিয়া। তাঁহার "একাংশেন স্থিতং জগৎ", আবার "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" এই যে একাংশ বলিয়া সগুণ ভাবকে আমরা বিভক্ত করিয়া লইলাম, ইহারও আদি, অন্ত ও ইয়ত্তা নিরূপণ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে—আমাদের অপেক্ষা ইহাও অনন্তগুণে বৃহৎ, পরম রমণীয় এবং পরম বরণীয়,—পরন্তু আমাদের শুদ্ধ মনোবৃত্তিসমূহের আশ্রয়। এই ধরিয়া ব্রহ্মের সগুণভাবের উপাসনা চলে, এবং চিত্তশুদ্ধির পক্ষে তাহা একান্ত প্রয়োজন।

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইয়াও অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন। এই আবরণ তাহার স্বরূপও নয়, সুতরাং তাহার নিত্যতাও নাই। সেইজন্যই জীবের পক্ষে গতির সম্ভাব্যতা রহিয়াছে।

এই গতি যখন তাহাকে ঊর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে, তখন তাহার মাঝে মুমুক্ষুত্ব জাগে। মুমুক্ষুত্বের বীজ সকলের মাঝেই আছে, কেননা জীব যে স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন, ইহা জীবরূপে সে জানিতে না পারিলেও তাহার সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপের নিকট ইহা অবিদিত নহে। অজ্ঞানাবরণরূপ সঙ্কীর্ণ প্রত্যয়েরও দ্রষ্টা কেহ আছেন বলিয়া, অজ্ঞতা এবং সর্ব্বজ্ঞতার যৌগপদ্য হেতু শক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই শক্তি জীবকে যেমন অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছে, তেমনি আবরণ মোচনের দিকেও তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই অন্তঃস্ফূর্ত্ত উদ্বোধন হইতেই উপাসনার আবশ্যকতা।

এক দিকে আবরণ, অপর দিকে নির্ব্বাধ প্রকাশ—উপাসনা এই উভয়ের মাঝে যোগ ঘটাইয়াছে। তাই গুণাচ্ছন্ন মন বুদ্ধি দিয়াও জীব উপাসনার বলে মন বুদ্ধির অতীত বস্তুটীর পানে অগ্রসর হইবার সাহস পায়।

উপাসনার কয়েকটী সার্থক বিশেষণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইতেছে যে, যে সগুণ ব্রহ্ম আমাদের উপাস্য, তিনি শাস্ত্র-বোধিত। মনে করিতে হইবে, যাহা মন-বুদ্ধির অতীত, আমরা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি। শুধু জগৎরহস্যের সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের ঝটিকাকে উদ্দাম করিয়া তুলিয়া বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল কণ্ডূয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রাণের মাঝে অশান্তির আগুন অনুভব করিয়া তাহারই শান্তির জন্য আমরা পথ খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। সুতরাং আমাদের যাহা লক্ষ্য, তাহা সাধনার বিষয়—কৌতূহল তৃপ্তির বিষয় নহে। মন আর বুদ্ধির কসরতে পিপাসা মিটে নাই—তাই মনের কল্পনাতে আর বুদ্ধির বকমারীতে ইষ্টবস্তুর সন্ধান পাইব না। এ অবস্থায় পথের সন্ধান বলিয়া দিবে কে?

এই খানেই হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষত্ব। হিন্দুর দর্শন অপরোক্ষানুভূতিরই দিক্‌দর্শন। সুতরাং বুদ্ধির অধিকার বা মনীষার অধিকার লইয়া ইহার মাঝে প্রবেশ করিলে চলিবে না। সাধক কি সম্বল লইয়া তাহার লক্ষ্যের পানে চলিবে?—তর্ক লইয়া নয়, মেধা লইয়া নয়, প্রবচন লইয়া নয়—শ্রদ্ধা লইয়া। যে পথে সে চলিয়াছে, সে পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"; এই পথের পথিক পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কি বুঝিয়াছেন, কি পাইয়াছেন, শ্রদ্ধানত চিত্তে তাহাই হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বতন যুগের সাধনার ইতিহাস লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহাকে লইয়াই হিন্দুর শাস্ত্র। সেই সাধনার সঙ্গে এই যুগের ব্যক্তিগত সাধনার যোগ ঘটাইয়া এক অনাদি অনন্ত বৃহৎ সাধকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলে যে সত্যের সন্ধান মিলিবে। এই জন্যই হিন্দুর আস্তিক্য তর্কের পরিণাম নয়, তাহা শ্রদ্ধারই চিরসঙ্গী। তাই বেদান্তাধিকারীর উপাস্য শাস্ত্র-বোধিত।

উপাসনার লক্ষণ লক্ষ্য বস্তুতে মনোবৃত্তির স্থিরীকরণ। মন একদিনে স্থির হইবার নয়—বহুদিন ধরিয়া ইহাতে লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। জন্মজন্মান্তরের মলিনতা কি একদিনে কাটিয়া যায়? তবুও ভগবানের এমন ইককণা যে একটী ক্ষুদ্র দীপশিখা যেমন পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে দূর করিতে সমর্থ, তেমনি কণিকামাত্র সাধন-সম্পত্তিও বহুদিনের কলুষ-কালিমা মুছিয়া দিতে পারে। তাই গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" স্বল্পের গুণে

যে তিনি মহাভয় হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করেন, ইহাতে যেমন তাঁহার করুণার পরিচয় পাই, তেমনি একথাও বুঝিতে পারি যে জন্ম জন্ম ধরিয়া আপনার অজ্ঞাতেও তাঁহাকে পাইবার সাধনাই আমরা করিয়া আসিয়াছি। সচেতন হইয়া যতটুকু সাধনা করিয়াছি, অল্প হইলেও তাহার পশ্চাতে বহুযুগের আকর্ষণ সঞ্চিত ছিল।—এ-ও করুণা বই কি!

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া উপাসনা করিলেও কিছু হয় না, যদি উপাসনাতে "আদর" না থাকে। আবেগহীন উপাসনার নির্জ্জীব অনুষ্ঠান তো কতজনাই করিতেছে, কিন্তু তবুও চিত্তের মলিনতা তো দূর হইতেছে না। শুদ্ধ করিতে হইবে চিত্তটাকে; সুতরাং উপাসনাতে যদি সে-ই উদ্বুদ্ধ হইয়া যোগ না দেয়, তবে আচার আর অনুষ্ঠানের বাহুল্যে কোন্ সত্য আমরা লাভ করিব? অনাদরে-উপাসনার ব্যর্থতা আজ আমাদের সমাজে ভয়াবহরূপে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে।

উপাসনায় আর একটী জিনিষ চাই—সেটী নৈরন্তর্য্য। চেষ্টা করিতে হইবে, চিত্ত যাহাতে কখনও ফাঁকে না পড়ে। কারণ চিত্তের ধর্ম্মই এই, একবার সে যাহা সঞ্চয় করে, তখন তখনই তাহা বিলাইয়া দেয় না—আপনার ভাণ্ডারে পুঁজি করিয়া রাখিয়া অতর্কিতে অপ্রত্যাশিত সময়ে তাহাকে সে বাহির করিয়া দেয়। চিত্তের এই সংস্কারপ্রবণতার জন্য সাধককে বড়ই বেগ পাইতে হয়—দেনার দায় যেন তাহার আর কিছুতেই মিটিতে চাহে না। এই জন্যই মনোবৃত্তিকে কোনও একটা লক্ষ্যে নিশ্চল করিতে হইলে তাহাকে অবসর দিলে চলিবে না—কারণ একটুকু ফাঁক পাইয়া যে গলদটুকু একবার ভিতরে ঢুকিবে, পরে আর তাহাকে সহজে তাড়ানো সম্ভব হইবে না।

উপাসনায় তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজন—শাস্ত্রবিশ্বাস, অধ্যবসায়, আদর ও নৈরন্তর্য্য। এইগুলিকে সহায় করিয়া সগুণ ব্রহ্মে মনোবৃত্তিকে স্থির করিতে হইবে—ইহাই উপাসনা।

উপাসনা ও জ্ঞানে পার্থক্য আছে। জ্ঞান অদ্বয়, একরস—উপাসনা দ্বৈতাশ্রিত। এই জন্য উপাসনায় ব্যাপার রহিয়াছে। ব্যাপার ব্যবহারেরই অন্তর্গত। তবে উপাসনা কোনও শারীর ব্যাপার না হইলেও তাহা মানস-ব্যাপার নিশ্চয়ই। মানস-ব্যাপার যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, তাহা হইতে দ্বৈতবুদ্ধি কখনও নিঃশেষে অন্তর্হিত হয় না। তাই উপাসনা সাধন, কিন্তু জ্ঞান সাধ্য সাধনভাব বিবর্জ্জিত।

আবার উপাসনার সঙ্গে নিদিধ্যাসনের এক দিক দিয়া সাদৃশ্য থাকিলেও অপর দিক দিয়া ভেদ রহিয়াছে। উপাসনা সগুণ ব্রহ্মে মনোবৃত্তিকে স্থির করা—এখানে একটা অবলম্বন আছে। কিন্তু নিদিধ্যাসন নির্গুণে পৌঁছিবার পথ। এখানে অন্তরকে নিরবলম্বন করিবার জন্যই তন্ময় হইতে হইবে।

উপাসনার দৃষ্টান্তস্বরূপ যে শাণ্ডিল্যবিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩, ১৪, ১-২), শতপথ ব্রাহ্মণে (১০, ৬, ৩, ২,) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫, ৬, ১) পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া দহরবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা প্রভৃতি আরও সগুণ ব্রহ্মোপাসনার বিধি শ্রুতিতে আছে।

কর্ম্মের প্রয়োজন।

কর্ম্মের লক্ষণ ও ভেদ বলা হইল। এখন তাহার ফল কি, তাহাই বলা হইবে। ফলের

দিক হইতে কর্ম্মকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। একভাগে নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত—অপর দিকে উপাসনা।

নিত্যাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি, ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই হিসাবে কাম্য-কর্ম্মের সঙ্গেও ইহাদের কিছু সম্পর্ক ছিল, কিন্তু বিষয়-কামনা ব্রহ্ম সাধনার পরিপন্থী বলিয়া গোড়াতেই তাহাকে বর্জ্জন করা হইয়াছে—নিষিদ্ধ কর্ম্মের তো কথাই নাই। কিন্তু লৌকিক কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে নিত্যাদি-কর্ম্ম বিধি দ্বারা অনুশাসিত—ইহাদিগের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে।

এইখানে একটা কথা উঠে। কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তাহা বলিয়াছেন; তবে আবার কর্ম্মের বিধান কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে কর্ম্মকে আবার আমাদের নূতন দিক দিয়া বিভাগ করিতে হইবে। প্রথমতঃ কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহারা অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত বলিয়া কেবলই বন্ধন ঘটায়। ইহাদের ব্যাপার প্রবৃত্তি লইয়া, অপর কোনও দিকে ইহাদের লক্ষ্য নাই। নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম্ম এই দলে পড়ে। আবার কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহারা স্বরূপতঃ কর্ম্ম হইয়াও কাঁটা দিয়া কাঁটা খুলিয়া ফেলার মত কর্ম্মের বন্ধনকেই শিথিল করিয়া দেয়। ইহারা নিবৃত্ত্যনুকূল কর্ম্ম। নিত্য প্রভৃতি কর্ম্মকে এই পর্য্যায়ে ধরা যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সংসারবুদ্ধি রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম আমরা ছাড়িতে পারি না—তাহাতে কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হয়। এই জন্য প্রবৃত্তিমুখী কর্ম্মকে রুদ্ধ করিয়া শাস্ত্র নিবৃত্তিমুখী কর্ম্মকে বিধি করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত কর্ম্ম যে কি করিয়া আত্মার ব্যাপ্তি বোধের অনুকূল হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

তাহা হইলে মোটামুটী আমরা দেখিতে পাইতেছি, কর্ম্মের ভালমন্দের বিচার নির্ভর করিতেছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপর। প্রবৃত্তি সহকারে কর্ম্ম করিলে তাহা সাধু হইলেও বন্ধনের কারণ হইবে। আবার নিবৃত্তির ভাব অন্তরে পোষণ না করিয়া কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানেও চিত্তশুদ্ধি ঘটিবে না। আসল কথা এই চিত্তটী লইয়া। ইহাকে সংসারমুখী হইতে দিলেও চলিবে না, কর্ম্মের মাঝে আপাত উদাসীন করিয়া রাখিলেও চলিবে না—ইহাকে একেবারে ঈশ্বরাভিমুখে প্রেরণ করিতে হইবে।

এই জন্যই বেদান্তাধিকারীর পক্ষেও বিধি এই যে, লৌকিক ব্যবহারের অনুকূল যে কর্ম্ম তাহাও তাহাকে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। উপাসনা তো সাক্ষাৎভাবেই ঈশ্বরাভিমুখী—সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা হইতে পারে না। কিন্তু নিত্যাদি যে সমস্ত কর্ম্ম আবহমান বিধি দ্বারা অনুশাসিত, তাহা হইতেও সাধনশক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে চিত্তকে শুধু বিধি পালনে ব্যাপৃত রাখিলে চলিবে না—নিয়মবশ্যতার মাঝে থাকিয়াও সেখানে বুদ্ধিকে ভগবন্মুখী করিতে হইবে। ইহার একমাত্র পথ—সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করা।

নিত্যাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নয়, তাই চিত্তশুদ্ধিকে নিমিত্ত করিয়া তাহা ভগবন্মুখী হইয়া থাকে। এইখানেই উপাসনার সহিত তাহার পার্থক্য। উপাসনা অপরোক্ষ ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এই পরোক্ষত্ব এবং অপরোক্ষত্ব লইয়া নিত্যাদি কর্ম্ম ও উপাসনার ফলে পার্থক্য কল্পিত হইয়াছে। নিত্যাদি কর্ম্মের ফল চিত্ত শুদ্ধি আর উপাসনার ফল চিত্তৈকাগ্র্য। অথচ পরম্পরা ক্রমে উভয়েই ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল। (৯)

* শিক্ষার বহিরঙ্গ

—•—

শিক্ষার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, শিক্ষায় বাস্তবিক কোন সুফল ফলাতে হলে আমাদের কেবল কর্তৃত্বাভিমান নিয়ে তাড়াহুড়া করলে চলবে না—যা বাধা, তাকে মাত্র দূরে সরিয়ে দিয়ে, যা স্বভাব, তাকে ফুলের মত অনায়াসে ফুটতে দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই হল স্বাতন্ত্র্য নীতি। কিন্তু এ হল শিক্ষার অন্তরঙ্গ দিক। এর একটা বহিরঙ্গ দিকও আছে, সেইটা নিয়েই আমরা একটু আলোচনা করতে চাই। তার পূর্ব্বে শিক্ষার লক্ষ্যটা কি, তাই আবার আমাদের স্মরণ করে নিতে হবে।

কোনও পুঁথির বুলি শিখা, শিল্প শিখা বা সামাজিক ও নৈতিক গুণ অর্জ্জন করাই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নয়। এ জগতে মানুষের জীবন নানা কোঠায় ভাগ হয়ে পড়েছে; তার যে কোনও একটা কোঠার উপযুক্ত করে কাউকে গড়ে তুললেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। এখানে পথের বিভিন্নতা থাকলেও, সমস্ত পথ যে কেন্দ্রবিন্দুতে এক হয়েছে, সেইখান থেকে সূত্র ধরে এই জগতের দিকে আমাদের নেমে আসতে হবে এবং সেই মূল একের সঙ্গে যোগ রেখেই শিক্ষার অভিব্যক্তি ঘটাতে হবে—এই হল শিক্ষার লক্ষ্য। আমরা কাউকে শিল্পী করব বা পণ্ডিত করব বা দেশভক্ত করব বা কাজের লোক করব—শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো হল অবান্তর কথা। ওগুলি হবার যোগ্যতা সকলের মাঝে এক রকম থাকে না, সুতরাং এদের ধরে কখনও শিক্ষার সমন্বয় আসতে পারে না। কিন্তু সমস্ত জগৎ যে এক হতে অভিব্যক্ত হয়ে এসেছে এবং ঊর্দ্ধমুখী তপস্যায় আবার সেই একের পানেই ছুটে চলেছে, এই কথাটাকে সমগ্র মানবজীবনের তাৎপর্য্য রূপে গ্রহণ করে শিক্ষার লক্ষ্যকে তারই সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

মানুষ তার হারামণি আবার ফিরে পেতে চায়—তার অন্তর্যামী তার বুদ্ধিকে অহরহঃ সেই পথেই প্রচোদিত করছেন। কিন্তু ফিরে যাবার পথ তো তার একটা নয়। তাই তার জীবনে পথের বৈচিত্র্য থাকবেই। কিন্তু এই বিচিত্র পথ ধরেও সে যে এক লক্ষ্যেই পৌছাবার চেষ্টা করছে, তাকে পরিচালনা করবার সময় এই কথাটাই স্মরণ রাখতে হবে। মানুষের সাধনা যে কেবল শিল্পের সাধনা, বিদ্যার সাধনা বা কর্ম্মের সাধনা নয়—এই সমস্ত অবান্তর বিষয়ের ভিতর দিয়ে সে যে ব্রহ্মত্বেরই সাধনা করছে—এই কথাটী স্মরণ রেখে তার শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য সেই একের প্রতি, পথ তার যত বিচিত্র হোক না কেন। দেশব্যাপী সমগ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানুষের ব্রহ্মত্ব উদ্বোধনের লক্ষ্য জাগ্রৎ হয়ে উঠুক; তাহলে আর স্থূল শিক্ষার যে বৈচিত্র্য, তা হতে মানুষে মানুষে কোনও বিরোধের সম্ভাবনা থাকবে না—অথচ বৈচিত্র্যের মাধুর্য্য ও অব্যাহত থাকবে।

এই অন্তরঙ্গ একের সাধনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্ফুট করতে হলে অন্তরের শিক্ষার প্রতিই আমাদের বেশী জোর দিতে হবে। কিন্তু

শিক্ষার বেলায় অন্তরের কথাটাই আমরা ভুলে যাই। আমরা লেখা-পড়া শিখাই, শিল্প-কলা শিখাই, বাণিজ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতি আরও কত কি শিখাই—কিন্তু অন্তরে যে অহল্যা পাষাণ হয়ে রয়েছে, সত্যের শ্যামস্নিগ্ধ স্পর্শে তাকে জাগাবার কোনও উপায়ই তো করি না। অপরাবিদ্যার জৌলুষে সভ্যতার চাকচিক্য যতই বাড়ুক না কেন, তার পরিণামকে কখনও শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করতে পারব না—কেননা মানুষের বিবর্ত্তন যে মোটেই এই অপরাবিদ্যার সূত্র ধরে হচ্ছে না। অপরাবিদ্যার যতটুকু ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে, ততটুকুকে স্বীকার করে নিয়ে যে-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরাবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিতে পারবে, আমরা তাকেই সার্থক বলে মানব। তার আয়োজন ক্ষুদ্র হলেও পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের মাঝে একটী দীপশিখার মত সত্যের মহিমায় একমাত্র সেই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। জগতের পাটোয়ারি বুদ্ধি আজ তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু অন্তর্য্যামীর অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশে এক দিন এই সত্যের সম্মুখেই জগৎকে অশ্রুসজল হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে।

অন্তরকে জাগাতে হলে অন্তরের নিগূঢ় আয়োজনই সব চেয়ে প্রয়োজন, এ কথা আমরা বলেছি। এখন অন্তরের এই আয়োজন কি করে বাইরেও অভিব্যক্ত হবে, আমরা সে প্রসঙ্গই তুলতে চাই। একেই আমরা বলি শিক্ষার বহিরঙ্গ। কিন্তু এ-ও অন্তরেরই শিক্ষা। অন্তরকে তালছুরস্ত রেখে তার সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের যে শিক্ষাই আমরা জুড়ে দিই না কেন, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কিন্তু এর দিকে নজর না দিয়ে ব্যবহারিক দিকটাকে বড় করে তুললেই গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা হবে। এই কথাটুকু স্মরণ রাখতে হবে।

খুব ছোট অবস্থা থেকেই ধরা যাক্‌ এ অবস্থাতেও স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য দিবেন আচার্য্য—তাঁর নিগূঢ় তপঃশক্তি ও মর্ম্মাবগাহী ভালবাসার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তার ক্রিয়া অন্তরে অন্তরেই চলবে। কিন্তু বাইরে এর সঙ্গে শৃঙ্খলার যোগ করে দিতে হবে। সন্তানের দিক থেকে, স্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খলতা নয়—শৃঙ্খলার সংযমেই তা সার্থক হয়ে উঠে। এ কথাটা আমরা সব সময়ে তলিয়ে দেখি না। আমরা মনে করি, উচ্ছৃঙ্খলতাই বুঝি শিশুর স্বভাব, তাই শাসন করে তাকে আমরা দমন রাখতে চাই। কিন্তু আসলে উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে স্বভাবের বিকৃতি—তার জন্য আমাদের অব্যবস্থাই ষোল আনা দায়ী। নইলে মানুষের জীবনে যে একটা ছন্দ, একটা সুর রয়েছে, তার সঙ্গে চলতেই মানুষ সব চেয়ে বেশী আরাম পায়। যাঁরা অভিনিবেশ করে লক্ষ্য করবেন, তাঁরা দেখবেন, এই ছন্দঃপ্রবণতা শিশুর মাঝে কেমন স্বাভাবিক হয়ে ফুটে ওঠে। উচ্ছৃঙ্খলতায় তার অস্বস্তি বাড়ে বই কমে না। কিন্তু তার মন অতিমাত্রায় নমনীয় বলেই এই অস্বস্তিবোধ বেশীক্ষণ তাকে পীড়া দিতে পারে না—ক্রমে এটা সে হারিয়ে ফেলে। অবশ্য এ সমস্তই আমাদের ব্যবস্থার দোষে ঘটে থাকে। তার পর স্বভাবের বিকৃতি এসে যখন আমাদের আঘাত করে বসে, তখন আমরা হঠাৎ সচেতন হয়ে আইন-কানুনের কড়া শাসনে সন্তানকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাই। কিন্তু তত দিনে হয়ত সর্ব্বনাশের আনন্দ তাকে পেয়ে গেছে শৃঙ্খলা রাখার চেয়ে শৃঙ্খলা

ভাঙ্গাই তখন হয়ত তার পছন্দ বেশী। আমরাও দু চারবার চেষ্টায় শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলি—"না, আর ওকে পেরে ওঠা যাবে না"—এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তার স্বভাবকেই দোষী সাব্যস্থ করে নিজকে খালাস মনে করি।

নিয়মানুবর্ত্তিতা মানুষের প্রকৃতির গভীরতর সত্য—এইটুকু ধরে বহিরঙ্গ শিক্ষার গোড়া পত্তন করতে হবে। যেখানে ব্যবস্থার দোষে প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, সেখানেও অন্য দোষের দিকে দৃষ্টি দিবার পূর্ব্বে নিয়মানুবর্ত্তিতার দিকে আগে নজর দিতে হবে। শুধু শাসন আর আদেশে এ কাজটী হবার নয়। এর জন্য সজীব আদর্শ চাই। অহরহঃ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা, পুনঃ পুনঃ ত্রুটী সংশোধন দ্বারা, কর্ম্মের সজীবতা দ্বারা শিশুর মনে এই ভাবটী জাগিয়ে দিতে হবে যে, তার চার দিকটাই এমনিতর সুরে বাঁধা যে, এর মাঝে তার ব্যবহারে কোথাও বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা দিলে তা এমনি বেসুরা বেজে উঠে যে সেটা তাকে আঘাত না করে ছাড়ে না। এমনি করে তার অন্তর্নিহিত ছন্দোজ্ঞান ও সৌন্দর্য্য বোধ জেগে উঠবে—সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তার মনে জাগবে যে, সে যেন একটা বৃহৎ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত এবং তারই অঙ্গ হিসাবে তার একটা গৌরবও আছে, দায়িত্বও আছে।

এই অনুভূতি হতেই সংযমের সূচনা। অথচ এইটুকুই আমাদের বাঙ্গালী সমাজে ঘটিয়ে তোলা যে কত দুরূহ, তা আমরা সবাই জানি। সকাল হতে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্য্যন্ত আমরা কোনও নিয়মের অধীন নই। নিজের গড়া কোন নিয়ম মানি না বলেই পেটের দায়ে যখন পরের গড়া নিয়ম মেনে চলতে হয়, তখন এ [illegible] দাসত্বের বেদনা দ্বিগুণ তীব্র হয়ে দেখা দেয়। কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, এমনি করে নিয়মের বাঁধাবাঁধির মাঝে চলতে গেলেই তো মানুষের জীবনে একটা কৃত্রিমতা এসে পড়বে, সে তখন কলের সামিল হয়ে পড়বে। এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। কিন্তু নিয়মেরও দুটো রূপ আছে। এক রূপে সে কেবল বাইরে থেকে বাঁধে—শুধু শাসনের জোরে। এমনি বাঁধনে নিয়মানুবর্ত্তিতা স্বাতন্ত্র্যকে পঙ্গু করে অন্তরকে স্ফূর্ত্তিহীন করে তোলে। কিন্তু এই নিয়মই যখন নিষ্ঠার আকার ধরে ভিতরের দিক থেকে মানুষকে বাঁধে, তখন মানুষ স্বেচ্ছায় আনন্দে সে বাঁধনে নিজকে সঁপে দেয়। এই নিষ্ঠার বন্ধনেই স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি স্ফূর্ত্ত হয়, জীবনে যে অন্তর্গূঢ় ছন্দ রয়েছে, তারই সাক্ষাৎ মিলে।

এই ছন্দ জাগাতে হলে শুধু নিয়ম করলেই চলবে না—একটা মানুষের সম্পূর্ণ হৃদয়কে সেই নিয়মের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এইটুকুই বড় কঠিন সমস্যা। যাদের নিয়ে আমরা কাজ করছি, তাদের অপরিণত চিত্ত এখনও বৃহৎ একটা কিছুর ধারণা করতে পারে না অথচ এই বৃহতের অস্পষ্ট অনুভূতি তাদের মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা বুঝতে পারবে, নিয়ম ধরে যে তারা চলছে, শুধু এর মাঝেই তাদের চেষ্টা নিরুদ্ধ থাকছে না—এই নিয়ম দিয়ে আরও বড় একটা কোনও বস্তুকে যেন তারা স্পর্শ করতে চাইছে। শিশুর অবোধ মনে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলা সাধনাসাপেক্ষ। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমস্তটা আবেষ্টন যদি একটা শুদ্ধ

শান্ত হৃদয়ের তালে তালে স্পন্দিত হয়, একটা কল্যাণসম্পন্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি মমতা দিয়ে যদি কেউ তার সবটুকু আগ্‌লে রাখতে পারে, তবেই প্রাণের উত্তাপ এক প্রাণ হতে নিঃশব্দে অপর প্রাণে সঞ্চারিত হবে। যেমন মায়ের নাড়ীর রসের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিও ভ্রূণের মাঝে সঞ্চারিত হয়, তেমনি সর্ব্বগ্রাসী ভালোবাসা দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানকে আচ্ছাদিত করতে পারলে অবোলা প্রাণেও ভাবের স্পন্দন জাগিয়ে তোলা যায়।

নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে অহরহঃ এমনি একটা জীবন্ত অনুভূতিকে জাগ্রৎ রাখ্‌তে হবে। এই অনুভূতি হতে সর্ব্বত্র আনন্দ উৎসারিত হয়ে পড়বে, সেই আনন্দের সঙ্গেই কর্ম্মের চক্র আবর্ত্তিত হয়ে চল্‌বে—তাহলেই আর নিয়মের মাঝে কোথাও বন্ধনের পীড়ন থাকবে না। নিয়মের লক্ষ্যই হচ্ছে বহিঃপ্রকৃতি হতে চিত্তকে ভাবমুক্ত করে ক্রমশঃ অন্তরের দিকে তাকে প্রেরণ করা। বাইরের ভাবনা নিয়েই যদি আমাদের সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাক্‌তে হয়, তাহলে অন্তরের দিকে দৃষ্টি পড়ে না; আর অন্তরের উৎস যদি শুকিয়ে যায়, তবে বাইরের কাজেও আর রসের জোগান পাওয়া যায় না। সমগ্র মানব-জীবনের এইটা হল একটা ব্যাপক সত্য। এর দরুণ প্রস্তুত করে রাখবার জন্যও নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষা প্রয়োজন। কর্ম্মশক্তিকে এমন ভাবে গঠিত করে তুল্‌তে হবে যে, যখন যে অবস্থাতেই মানুষ পড়ুক না কেন, বাইরটাকে সামনে নিয়ে ভিতরটার জন্য সে যেন বেশী করে অবসর ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। এই অন্তর্মুখীনতা শিক্ষা দিবার জন্যই নিয়মের প্রবর্ত্তন—এই কথাটা মনে রেখে নিয়ম বাঁধলে তা হতে কোনও সঙ্কোচের আশঙ্কা থাকবে না। অন্তর্মুখীনতা উদ্দেশ্য, নিয়ম তার উপায়। যিনি নিয়ম করবেন, সন্তানের হৃদয়কে অন্তর্মুখীন করবার সঙ্কেতটাও তাঁকে শিখে নিতে হবে।

নিয়মের প্রবর্ত্তন যিনি কর্‌বেন, তাঁর দিক দিয়ে চাই ভাবের বিশুদ্ধি। নিয়ম যে মহান্ অন্তর্নিহিত সত্যের অভিব্যক্তি, সেই সত্যকে যদি তিনি কায়মনোবাক্যে বহন করে না চলতে পারেন, তবে নিয়মের মাঝে কিছুতেই শ্রদ্ধা থাকবে না, বীর্য্য থাকবে না—এমন নিয়ম করলেও আপনা থেকেই তা বারবার ভেঙ্গে পড়বে। নিয়মের সঙ্গে অন্তরের যোগ না থাকলেই সেটা জবরদস্তি হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর চিত্ত বুদ্ধিবিকাশের দিক দিয়ে অপরিণত হলেও অন্তর দিয়ে অন্তর বুঝবার তার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। যদি নিয়মের মাঝে কোথাও নিষ্ঠার বা ভাবের ব্যতিক্রম থাকে, তাহলে অমনি সেটা তার চিত্তে আঘাত করবে এবং তেমন কৃত্রিম নিয়মের বিরুদ্ধে তার মন আপনা হতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। নিয়ম প্রবর্ত্তন শুধু যারা নিয়ম পালবে, তাদেরই পরীক্ষা নয়, যে নিয়ম করবে, তারও পরীক্ষা বটে।

সকলের পিছনে চাই একটা শুদ্ধ, শান্ত, মহৎ ভাবের আদর্শ। প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে হলে এই হল অভঙ্গ বর্ম্ম। যা কিছু আমরা গড়তে যাই না কেন, নিরঙ্কুশে তা হবার নয়। শিক্ষা-জীবনের ছন্দ জাগানোও সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আমরা বাধাগুলিকে বাইরের দিক দিয়ে দেখছি না—আমরা মনে করছি, যত বাধাই উপস্থিত হোক না কেন, তার পত্তন আনাই বোধ হয় আমাদের অশুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি। যন্ত্রটা আমরা পেয়েছিলাম ভালই, কিন্তু ওস্তাদ নই বলে তাতে সুর তুলতে পারলাম না—তার ছিঁড়ে গেল! এমনি করে প্রত্যেকটা ত্রুটীর জন্য অপরের জবাবদিহী না চেয়ে নিজের কাছে যদি আগে জবাবদিহী চাই, এবং নিজের দোষটুকু শুধরে নিতে পারি, তবে দেখ্‌ব যতগুলি বাধার আশঙ্কা করেছিলাম, ততগুলির সঙ্গে আমার লড়তে হয়নি। তা ছাড়া নিজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ রাখতে পারলে প্রত্যেকটা বাধার যথার্থ মীমাংসা করা সম্ভব হবে; তখন আর আমার অপ্রবুদ্ধ চিত্তে একটা বাধা ঠেকাতে গিয়ে আর দশটার পত্তন করে বসব না।

আলোচনা

—*—

শোকে, দুঃখে, দৈন্যে প্রপীড়িত আমরা—আমাদের ঘরে মা আসিতেছেন রাজরাজেশ্বরীর বেশে। এর কোনটা সত্য?—আমরা যে দীনহীন কাঙ্গাল, এই সত্য—না আমরাও "বহুবলধারিণী রিপুদলবারিণী" জগদ্ধাত্রীর সন্তান—এই সত্য? সারাটা বৎসর মোহে, চাঞ্চল্যে, অবসাদে কাটাইয়া আজ তিন দিনের জন্য দেশ যদি আনন্দে মাতাল হইয়া উঠে, তাহা হইলে এ মত্ততাকে স্বভাবের আনন্দ বলিব না উৎকট ব্যাধি বলিব?—না এ পূর্ব্বযুগের সংস্কার? একদিন হয়ত এই দেশের বুকেই আনন্দের জোয়ার বহিয়া যাইত, পিপাসী সন্তান সত্যই সত্যই প্রাণের আকুলতায় মায়ের দেখা পাইত—আজ বুঝি এই অবসন্ন জর্জ্জরিত জাতির বুকে সেই সুখের স্মৃতিটুকু স্বপ্ন-রেশের মত জাগিয়া আছে। এই ক্ষণিকের আনন্দ মেলা—এ-ও আমাদের পক্ষে স্বপ্ন বই কি?—বীর্য্য হীন, শক্তি হীন সাধন হীন হইয়া কেবল বাহ্য আড়ম্বর দিয়া সত্যকে খাড়া করিয়া রাখিবার যে পণ্ডশ্রম—ইহার লজ্জা হইতে কি আমরা ত্রাণ পাইব না? বাঙ্গালী যে মায়ের কোল-ঘেঁষা সন্তান—সে কেন আজ এমন করিয়া মাতৃহীন হইল? কেন আজ প্রসাদের মত আকুল হইয়া মাকে ডাকিতে কণ্ঠে সে বল পায় না, হৃদয়ে বীর্য্য অনুভব করে না? দিনের পর দিন বিপদ আসন্ন হইয়া আসিতেছে—আর এই ঘরহারা, মা-ছাড়া ছেলেটা যে কেবলি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কুপথে-বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছে। এত যে আঘাত—তবু তার মায়ের কথা মনে পড়িতেছে না কেন?

—*—

সাজা-ও তো এর কম হইতেছে না। অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, বিদ্যার অভাব, ব্যাধির তাড়না, নৈরাশ্যের মনস্তাপ—তার উপর সমস্তটা দেশ আজ জলে ভাসিতেছে। – জিজ্ঞাসা কর, কেন এমন হয়?—উত্তর শুনিবে, কি করিব, ভগবানের মার।—কিন্তু ভগবান্ আমাদেরই বা এমন করিয়া মারেন কেন? হিন্দু আমরা, স্থূলে সূক্ষ্মে একটা সম্বন্ধ আছে স্বীকার করি, পাপের ফল যে অপ্রত্যাশিত দিক হইতে আসিয়া অভিভূত করিয়া দিতে পারে, তাহা মানি। তাই বলি, এই যে অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—প্রকৃতির মাঝে এই যে রুদ্রশক্তির আবির্ভাব, এ শুধু দৈবের মূঢ় নির্ব্বিচার বিধান নয়, আমাদেরও কৃত কর্ম্মের এর সঙ্গে যোগ আছে। ভগবান্ যে সত্য আমাদের মাঝে নিহিত রাখিয়াছেন, আমরা তাহার অবমাননা করিতেছি বলিয়াই তাঁহার রুদ্র-রোষ আজ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—আমরা দুষ্কৃতিকারী, তাই আমাদের বিনাশের এই আয়োজন। সত্যের সঙ্গে যদি যোগ থাকিত, তবে এই বিপ্লবকে হয় অন্তরে, নয় বাহিরে, একদিক দিয়া জয় করিবার শক্তি আমরা পাইতাম। এ কথা ব্যষ্টি জীবনেও যেমন সত্য, একটা জাতির সমষ্টিগত জীবনেও তেমনি সত্য। শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং

করিয়া, বিলিফ কমিটী গড়িয়া, আর ডিস্পেন্সারী খুলিয়া নিস্তার পাইব না। অনাচারে, কদাচারে প্রকৃতির রুদ্র-শক্তিকে আজ ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছি। সত্ত্ব-সাধনা ভিন্ন তাহাকে শান্ত করিবার আর উপায় নাই। অদৃষ্ট-শক্তির প্রচণ্ড তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে—শুধু দৃষ্ট প্রতীকারে আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না—অন্তরের মাঝে ডুবিয়া গুহাহিত সত্ত্ব শক্তিকে জাগাইতে হইবে—মাকে জাগাইতে হইবে।

—*—

কিছুদিন ধরিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ যেমন মাতিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তেমনি নিদারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রাণশক্তির স্ফুরণে যে গতির সঞ্চার হয়, তাহা টিকিয়া থাকে; কিন্তু উত্তেজনার ষ্টিম ঘর্ঘর নাদে একটা গুরুভার ইঞ্জিনকে টানিয়া লইয়া গেলেও, ষ্টিমটুকু চুপসিয়া গেলেই সকল আস্ফালন থামিয়া যায়। পত্রিকা ওয়ালারা এখনো আপনার গোঁ ছাড়িতেছে না বটে, কিন্তু সুর দিন দিন নরম হইয়া আসিতেছে। দেশের লোকের মন বুঝিয়া দেখিলে নেতারা দেখিতেন, একদিন যাহারা ভক্তিতে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাদের মাঝেই হয়ত অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—যেন ভোজবাজীর মত একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হইল না এবং সেজন্য আমি ছাড়া আর সকলেই দায়ী।—উপায় নাই—এই তো আমাদের দেশের স্বভাব। হাততালি দিবার বেলাতেও আমি আছি—দুয়ো দুয়ো করিবার বেলাতেও আছি; কিন্তু যদি কাজ করিতে হয়—সে পরের কথা!

—*—

যে কাজের যে ফল, ভগবান স্পষ্ট করিয়া তাহা আমাদের চোখের সামনে ধরিয়া দিতেছেন—এখনও যেন আমরা অভিমানে মূঢ় হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া না থাকি। যতদিন উত্তেজনা ছিল, ততদিন হিতাহিত বুঝিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু আজ যখন বন্যার জল সরিয়া গেল, তখন এইবার যেন স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখি, সে আমাদের কি দিয়া গেল আর কি নিয়া গেল। এতদিন আমরা জাগিয়া ছিলাম না স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সেইটী যেন আগে বিচার করিয়া দেখি। ঘুমের ঘোরে একটা তীব্র আলো আসিয়া চোখের পরদার উপর পড়িলে একটা স্নায়বিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়—হয়ত আধঘুমে আধ-জাগরণে তখন কত কি দেখিয়া বসি! মহাত্মার আলো আসিয়া আমাদের ঘুমন্ত চোখ তেমনি ধাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল তাঁহার ভাল মন্দ লইয়া তিনি সরিয়া গিয়াছেন—কাজেই আমরা আবার যে তিমিরে—সে তিমিরে!

—*—

জনসাধারণের মাঝে একটা চাঞ্চল্য আসিয়াছিল—কিন্তু সে লোভের চাঞ্চল্য, মোহের চাঞ্চল্য। আমাদের এই আসামেই আমরা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। যে দেশ যত আঁধারে, আচম্কা আলোকে তারই চোখটাটানি বুঝি তত বেশী। খাজার খাজনা এড়ানো, ধান চালের দর কমা—এই হইল দেশবাৎসল্যের মূল উৎস; আর তার সঙ্গে মহাত্মার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নানা অঘটন ঘটিবার কল্পনা—এই হইল দেশাত্ম-বোধের চূড়ান্ত নমুনা। এ সমস্ত কথা লইয়া শ্লেষ করিতে গিয়া নিজের অঙ্গেই তাহা বিঁধে!—এমনি নিরুপায়, এমনি অজ্ঞান, এমনি কাঙ্গাল এই দেশ। শুধু আশার

মরীচিকায় এ অক্ষম কাঙ্গালীকে উত্তেজিত করিয়া তোলা কি কম নিষ্ঠুরতা! ঝোঁক চাপে বড়র মাথায়, কিন্তু তার দণ্ড পায় ছোটরা—এই বুঝি জগতের নীতি।

—০—

"যে মাটীতে পড়ে, লোক উঠে তাই ধরে।" মাটীতে পড়িয়া থাকিয়া কেবল আকাশের পানে হাত বাড়াইলেই উঠা যায় না। এখনো আমাদের গড়িবার যথেষ্ট বাকি রহিয়াছে; কিন্তু তাহার মালমসলা না জুটাইয়া আগেই ভাঙ্গিবার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? দেশের জন সাধারণকে মাতাইয়া কাজ করিব—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার অন্নবস্ত্র সমস্যার মীমাংসা হয় নাই, শিক্ষার অভাবে তার চিত্ত আঁধার হইয়া রহিয়াছে। অবস্থার পীড়নে তাহার মন রহিয়াছে ছোট হইয়া; একটা বড় কিছু তাহার সম্মুখে ধরিলে সে তো তাহার গৌরব বুঝিবে না; সাময়িক উত্তেজনায় ফাঁপিয়া উঠিলেও মহৎ আদর্শের ভিতর হইতে সে তার তেল-নুন্ লকড়ীর সওদাটুকু আদায় করিবার ফন্দীতেই থাকিবে। এদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু যাঁহারা মাতাইবেন, তাঁহাদের মাঝেই বা মতির স্থিরতা দেখি কোথায়? কেবল দু'চার জন বড় লোকের নিষ্ঠাকে উঁচাইয়া ধরিলেই হইবে না—দেশের মাঝে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিরা সংখ্যাভুয়িষ্ঠ কিনা, এই সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হইতে হইবে। কিন্তু আমাদের চিরকালই তো বার রাজপুতের তের হাঁড়ী। দেশের হিত করিব বলিয়া তো কোমর বাঁধিয়াছি, কিন্তু দেশটাই বা কি আর তার হিতটাই বা কি—এক সবটুকু কেহ তলাইয়া দেখি?

—০—

আমাদের অভিমানের সঙ্কীর্ণতাতেই এমন ঘটে। ব্যবহারিক হিসাবে অভিমান জিনিষটার প্রয়োজন আছে বই কি; তবে কিনা তারও ব্যাপ্তির একটা পথ থাকা চাই। আমরা এক দিক দিয়া যেমন "বসুধৈব কুটুম্বকম্" অর্থাৎ নিজের দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিমানহীন, উদাসীন—তেমনি আবার স্বার্থপরেরও একেবারে চরম। আশ্চর্য্য এই যে, এই দুইটী ভাবই আমাদের চরিত্রে বেশ মিলিয়া-মিশিয়া আছে। আমরা বড়াই করি, আমরা উদার আর্য্যজাত, আমাদের মাঝে পাশ্চাত্য Territorial Patriotism নাই; অথচ এ দিকে এক বাড়ীতেই তিন ভাইয়ের জন্য তিন হাঁড়ীর বন্দোবস্ত আছে। "শক হুন-দল পাঠান মোগল" আসিয়া আমাদের কোল জুড়িয়া বসিয়াছে—বিশ্বপ্রেমে গদগদ হইয়া তাহাদের ঠাঁই ছাড়িয়া দিয়াছি—অথচ আমরা বহু ঘরের দুয়ারে হাজার পুরুষের আত্মীয়দের নিত্য অপমান আর নির্য্যাতনে পীড়া অনুভব করিতেছি না। এ কেমন করিয়া হয়?

—*—

আমরা মানি, দুইটা জিনিষ—এক নিজের গরজ, আর এক শাস্ত্রের দোহাই। আমার স্বার্থ লইয়া আমি আছি, আর আমার পরমার্থ লইয়া আমার শাস্ত্রে আছেন (অবশ্য পলিটিকাল শাস্ত্রও এ ক্ষেত্রে বাদ পড়েন নাই); এ দুয়ের মাঝে কে আবার দ্বিতীয় দর্শনের মত সিঁড়ি গড়িতে যাইবে? এই জন্যই বক্তৃতার বেলায় আমরা আদর্শ প্রচার করি, আর কাজের বেলায় নিজের গরজটুকু বজায় রাখি। এমন করিয়া আজ হাজার বৎসর কাটিয়া গেল, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল? অতএব এই ভাবেই আরও কিছু কাল চলুক—তারপর "সহসা একদা

আপনা হইতে" একটা কিছু হইয়া যাইতে আটক কি?—হায়রে মূঢ়!

—*—

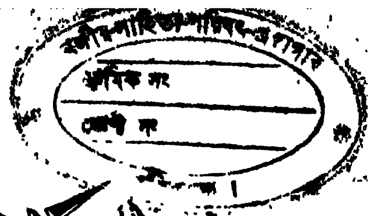
দেশে বিশ্বপ্রেমের অভিমান আছে—ভালই। কিন্তু দেশের হিত করিতে হইলে স্বদেশপ্রেমেরও একটা অভিমান তো থাকা চাই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক-পরিমাণে-আত্মপ্রীতির অভিমানটুকুও ছাড়া চাই। স্বর্গে যখন উঠিতে চাই, তখন মাঝখানকার সিঁড়িটারও যেমন প্রয়োজন, তেমন মাটীর মায়া কাটানোও প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বেশী চালাক। মাটীতে শুইয়া শুইয়া চক্ষু বুজিয়া কল্পনার চোখে স্বর্গে পৌছাইতে পারিলে সিঁড়ি ভাঙ্গিতে যায় কে?

—*—

অনেক আঘাত পাইয়াছি, ভগবানের দয়া থাকিলে আরও আঘাত পাইব। ব্যর্থতার নৈরাশ্যে চারিদিক আঁধার দেখিলেও, একটী আলোর রেখা আঁধারের বুক চিরিয়া চোখে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেখিয়াছি, ভারতবর্ষের জাগরণের ভঙ্গীটা কি।—হয়ত এ স্বপ্ন, কিন্তু সফল স্বপ্নও তো মানুষ দেখে। ত্যাগ ও তপস্যা যখন বিগ্রহ ধরিয়া দেশের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন এই হাজার বছরের নির্জীব দেহের মাঝেও যেন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়া উঠিল! হউক এ ক্ষণিক, হউক এ বিকার, হউক এ অবসাদের অগ্রদূত, তবুও অন্তর বলিয়া উঠিল—"এই তো মুক্তির পথ!" একজনের পুণ্যে এইটুকু হইয়াছে, সহস্র জীবনের উৎসর্গে কি তার সহস্র গুণ ফলিবে না? হয়ত সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে এ সৌভাগ্য লুকাইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তবুও এই যে এ দেশের নিয়তি, সেই ক্ষণিক আলোকপাতে তাহাই বুঝিয়াছি! স্বারাজ্য-লিপ্সায় নয়, ভোগলোলুপতায় নয়, সাম্রাজ্য মত্ততায় নয়—ভারতবর্ষের সার্থকতা ত্যাগে, তপস্যায়, প্রেমে। প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনে এইটী ফুট করিয়া তুলিতে হইবে—এইখানেই আত্মপ্রীতির, দেশপ্রীতির, বিশ্বপ্রীতির সমাধি! ভারতবর্ষ জগৎকে অনেক দিয়াছে—কিন্তু তার এই চরম আত্মোৎসর্গ এখনও বাকী।

—*—

এখনো সে কতদূরের পথ! এখনো তো প্রাণে প্রাণ মিশে নাই, সকলের স্বার্থেই নিজের স্বার্থ প্রস্ফুট হইয়া দেখা দেয় নাই! এখনো কেবল অল্পলাভের আশায় আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া জোড়াতালি দিয়া অঘটন ঘটাইবার চেষ্টাই চলিতেছে। একটা সাময়িক প্রয়োজনকে মাঝে খাড়া করিয়া লোকে বলিল, হিন্দু মুসলমান মিলিয়াছে। অন্তর্য্যামী বোধ হয় অন্তরালে বসিয়া হাসিয়াছিলেন মাত্র। মিলন তো কেবল বিপন্নের সৌজন্য নয়। আপন ঘরে হিন্দু হিন্দুর সঙ্গে মিলিতে পারিল না, আর আজ যে সে হাজার বছরের বিরোধ ভুলিয়া মুসলমানকে ভাই বলিয়া জড়াইয়া ধরিল—এর আন্তরিকতার অভাবটুকু বোধ হয় সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। তারপর প্রয়োজনের তাগিদটা যখন কমিয়া আসিল, তখন আন্তরিকতার মুখোস আপনা হইতেই খসিয়া পড়িল আর দুই ভায়ের রক্তধারায় মাতৃভূমি লজ্জায় বেদনায় রাঙা হইয়া উঠিলেন! তবু আমরা আশা করি, তবু আবার বলি, "হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিবে এবং সেই শ্রদ্ধার শক্তিতে আপন আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পরস্পরের কল্যাণের সহায়ক হইবে—ইহাই তাহাদের মিলনের সূত্র হওয়া উচিত। শিক্ষার বিস্তারে দেশাত্মবোধের স্ফুরণে মনের সঙ্কোচ যতই দূর হইবে, এই মিলন ততই সহজসাধ্য হইবে। ভগবান শ্রদ্ধা, সত্য ও সেবার উপর এই মিলনকে প্রতিষ্ঠিত করুন।"



ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৫শ বর্ষ } কার্ত্তিক { ৭ম সংখ্যা

বিশ্বাতিগঃ

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২১।১৬]

তা ঈং বর্দ্ধন্তি মহ্যস্য পৌংস্যং
নি মাতরা নয়তি রেতসে ভুজে।
দধাতি পুত্রোঽবরং পরং পিতু-
র্নাম তৃতীয়মধিরোচনে দিবঃ॥

তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসি
ইনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীহ্লুষঃ।
যঃ পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভি-
রুরুক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে॥

দ্বে ইদস্য ক্রমণে স্বর্দৃশো-
ভিখ্যায় মর্ত্ত্যো ভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য ন কিরা দধর্ষতি
বয়শ্চ ন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ॥

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভি-
শ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ
বৃহচ্ছরীর বিমিমান ঋক্কভি
র্যুবা কুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্ ।।

দেবের পৌরুষ বাড়ে মর্ত্ত্য হতে লভি তপোবল,
তারি বীর্য্যে বিশ্বপিতা জননীরে করেন সফল।
পুত্র আছে ছোট হয়ে, শ্রেষ্ঠ নাম রয়েছে পিতার,
পেয়েছে তৃতীয় নাম দিব্যধাম অঙ্গভাতি যাঁর।

প্রভু, ত্রাতা, শক্ত যিনি—বিশ্বে যাঁর নাহি অরিভয়,
অম্লান অক্ষয় তাঁর পৌরুষের গাহি মোরা জয়;
ত্রিপাদ-বিক্ষেপে তাঁর ব্যাপ্ত হল নিখিল ভুবন,
কীর্ত্তি তাঁর দিকে দিকে—উচ্ছসিত অনন্ত জীবন।

দুটী তাঁর পদক্ষেপ জানে মর্ত্ত্য—স্বর্গ যার সীমা,
তারি করে আকিঞ্চন—গায় তারা তাহারি মহিমা;
তৃতীয়েরে পাবে কোথা?—বাক্য সেথা ফিরে ফিরে আসে,
পক্ষবলে পক্ষী যথা সীমাহীন নীলাকাশে ভাসে।

ঘোরে চক্র নবতির চতুর্গুণ লভি আবর্ত্তন,
পর্ব্বে পর্ব্বে হেরি তার বিষ্ণুবীর্য্য করিছে নর্ত্তন।
সীমাহীন দেহ তাঁর—স্তুতি তবু বেড়িয়াছে তায়,
যুবা, তবু অকুমার—ডক্তাহুতি নাহি ঠেলে পায়।



নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ

—*—

সত্য সাধনার আরম্ভ কোথা হইতে? যদি উপর হইতে নীচের দিকে অর্থাৎ লীলার দিকে চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে বলিতে পারি, যে চরম পরিণতিকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্টিতে গতির বস সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার সাধনা তো অহরহঃই আমাদের মাঝে চলিতেছে। গাছের ফলটির মাঝে যেমন নিঃশব্দে অথচ অলক্ষিতে রসের পরিপাক হইতেছে, আমাদের মাঝেও তেমনি নানা আবর্ত্তনের মাঝ দিয়া অন্তরের রসরূপটীই বিকসিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং এই হিসাবে বলিতে পারা যায়, সাধনার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও সময় বা উপকরণের প্রতীক্ষায় আমার তো কোনও প্রয়োজন নাই—থাকারা জানি আর না জানি, আমাদের জীবন তো স্ফূর্ত্ত হইয়া চলিয়াছেই।

কিন্তু কথা এই, জীবন যে ফুটিতেছে, এতো আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ এই চোখে পড়াটাই আমাদের সব চেয়ে বেশী দরকার। মনের আড়ালে আবডালে যাহা হইবার তাহা তো হইতেছেই, তাহাকে বাধা দিবার কোনও সাধ্য আমাদের নাই সত্য। কিন্তু ঐ আড়াল টুকু দূর হইয়া সমস্তটা ব্যাপার যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের চোখের সামনে আসিয়া না দাঁড়াইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বসে তো তাহাকে রসিয়া লইতে পারিব না, সুতরাং এক দিকে তাহার শক্তি বন্ধ্যাই থাকিয়া যাইবে। প্রকৃতির শক্তি সার্ব্বভৌমভাবে ক্রিয়া করিতেছে বটে, কিন্তু আমাদের অভিমানের আশ্রয়ে যে শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত শক্তির অন্তর্গত হইলেও, তাহার মাঝে একটা বিশেষ ঝোঁক আছে এবং এই ঝোঁকের দরুণ প্রকৃতির সাধারণ ভাবে ক্রিয়াশীল শক্তিও আমাদের অন্তরের স্পর্শে অসাধারণ হইয়া উঠে। এই জন্যই জীবনের সমস্ত সাধনাই আমাদের চিত্তের প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা জীবনটাই পঙ্গু ও অনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিবে।

তাই সত্যের সাধনায় আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট একটা ধারা চাই। এইটুকুই অভিমানের কারসাজি, এবং যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না হইতেছে, ততদিন ইহার আবদার রাখিয়া চলিতেই হইবে। তবে জগৎটাকে উঁচু নজরে যাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহারা জানেন, অভিমানের এই স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক ক্রিয়াও এক মহাশক্তিরই লীলাবিলাসে স্ফুরিত হইতেছে, সুতরাং ইহার মাঝে স্পর্দ্ধা করিবার তো কিছুই নাই। তুমি আমি সত্যের সন্ধানে কত আয়োজন আর উপকরণ স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছি, কিন্তু জ্ঞানী জানেন, এর সমস্তই ছেলেখেলা—যেখানে নিজের শক্তির স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেছি, সেখানেও আমরা অপরের হাতের পুতুল। তাই তাঁহারা বলেন, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—প্রবচন, মেধা, শ্রুতিজ্ঞান—কিছুই কিছু নয়। এ সমস্তই বুদ্ধির খেলা—বুদ্ধির আইন মানিয়া পরিপাটীরূপে ইহাদিগকে সাজাইয়া লইতে পারি বটে, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা তো বুদ্ধির দ্বারা হইবার নয়।

তবে সেটুকু হইবে কি করিয়া? বিচার

করিয়া তো দেখিতে পাইতেছি,—জগৎ জুড়িয়া যে মহাশক্তির বিলাস, আর আমার এই অভিমানযুক্ত বিশিষ্ট আধারে যে শক্তির খেলা চলিতেছে—এ দুয়ের মাঝে যে একটা বিরোধ থাকিয়া যায়। যদি অভিমানকে বড় করিয়া দেখি, তবে উপস্থিতমত তৃপ্তি তাহাতে মিলিতে পারে বটে, কিন্তু মূলের সঙ্গে যোগ থাকাতে তাহার সমস্ত সাধনাই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আবার যদি সার্ব্বভৌম শক্তির বিলাসকেও বুদ্ধি দিয়া মানিয়া চলি, তবে আমাদের তো আর কিছুই করিবার থাকে না; তবে আর সাধনার প্রয়োজন কি? আপাতদৃষ্টিতে শক্তিতে আর অভিমানে এই বিরোধ দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহার মাঝেও তলাইয়া দেখিবার মত একটা কথা আছে। শক্তি আর অভিমানে যে বিরোধ, তাহা সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির বিরোধ অর্থাৎ তাহা মাত্র আয়তনের বিরোধ। এই আয়তনরূপ ধর্ম্মটী বুদ্ধির সৃষ্টি সুতরাং বস্তুর তত্ত্ব হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা সামান্য। যুক্তি তর্ক ফাঁদিয়া সাধনা করিতে সুরু করি আর না করি, দুই দিক দিয়াই এই মহাশক্তিকে শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যখন দেখিলাম, এক বিরাট্ শক্তিই জগতের মাঝে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং আমার অভিমানের ঘাট ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে,. নিজে কর্ত্তা সাজিয়া আর কিছুই করিবার নাই,—তখন এই মহাশক্তিই আমার মাঝে পরমাত্মীয় হইয়া দেখা দিবেন। রসিকেরা যে বলিতেছেন, "প্রবচন" দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তিনি নিজে আসিয়া যাহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায়"—লৌকিক-দৃষ্টিতে ইহার মাঝে সাধনার বিরতির ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহাতে এমন বোঝা যায় না যে মানুষ হাত-পা ছাড়িয়া অসহায়ভাবে নিজকে একটা অদৃষ্ট শক্তির খেয়ালের অধীন করিয়া দিবে। বরং ইহা হইতে এই কথাই বুঝি, আমি যেমন প্রবচন দিয়া মেধা দিয়া তাঁহাকে পাইব না, তেমনি তাঁহার বরমাল্য হইতেও তো বঞ্চিত হইব না—কেননা তিনি যে যাচিয়া আসিয়া বরণ করিবেন। এ তো শুধু খেয়ালে নয়—তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের মাঝে এইটুকুই যে মর্ম্মচর পরম সত্য। আমার চেষ্টা ছাড়িব তখনই, যখন জানিব, আমার সাধনার চেয়েও তাঁহার আগমন যে নিশ্চিত, এই কথাটাই বেশী সত্য। যদি বুদ্ধি গিয়া বোধি আসিয়া উপস্থিত হয়, সহজভাবে যদি তাঁহাকে অনুভব করিবার শক্তি পাই—আর এ শক্তি পাইব নিশ্চয়ই—তবে আর প্রবচন, মেধা তপস্যার দরকার কি? সুতরাং এই দিক দিয়া পরমাশক্তির সঙ্গে আমাদের অভিমানের বিরোধ মিটাবার একটা পথ আছে।

তবে এ অবস্থা সকলের আসে না। অন্তরে রসের পরিপাক না ঘটিলে একাত্মবোধ সহজ হয় না। আমরা সকলেই সহজ রসের রসিক নই—অভিমানের দাবীটাই আমাদের মাঝে বেশী। সুতরাং অভিমানকে তৃপ্ত করিবার জন্য একটা সাধনার ধারা আশ্রয় করিয়া আমাদের চলিতেই হয়, নতুবা তাল ঠিক থাকে না। ইহাতে দূষ্য কিছুই নাই বরং এইটুকু ধরিয়াই আমরা প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারি। যে অভিমান লইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সংসারে কর্ত্তৃত্বের অভিনয় করিতেছি, হঠাৎ একদিন আত্মসমর্পণের ধূয়া ধরিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে গেলেই সে ছাড়িতে চাহিবে না—অবলম্বনশূন্য চিত্ত তখন আপনা হইতেই জড়তায় এলাইয়া পড়িবে। কাজেই সংসারের সকল কাজই যদি অভিমান-

বশে করি, তবে সাধনাটাও অভিমান লইয়াই করিতে হইবে। আর সাধ্য সাধক ভাব যেখানে রহিয়াছে, সেইখানেই যখন সাধনা— তখন ইহার মূলে অভিমান থাকিবে বই কি?

তবে সংসারের অভিমানের সঙ্গে এই অভিমানের একটা পার্থক্য আছে। সংসার-বুদ্ধি দিয়া আমরা অভিমানকে পুষ্ট করি, আর ভগবদ্‌বুদ্ধি দিয়া অভিমানকে নষ্ট করি। অভিমান অবলম্বন উভয়ত্রই, কিন্তু তাহাদের পরিণতি বিভিন্ন। আসল কথা, চিত্তকে শ্লথ হইতে দিতে নাই - সে তো আমাদের অন্তরের ধর্ম্ম নয়, সুতরাং এমন করিয়া কিছুতেই শান্তি পাইব না। যদি অন্তরে ভাবের লহর খেলিয়া যায়, তাহা হইলে বাহ্যতঃ কর্ম্মবিরতি দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্তরের বীর্য্য কখনও ইহাতে সুপ্ত হইয়া যাইবে না। কিন্তু ভিতরে যদি এই জ্ঞানটুকু সঞ্চিত না থাকে, তবে আত্মসমর্পণের ভাণ করিয়াও কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লইলেও কি নিষ্কৃতি পাইব? তাই বলি, সংসারের অভিমান যদি না ছাড়িতে পারি, তবে সেই অভিমানকে বাহন করিয়াই সত্যের পথে আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে।

সাধনপথের যাত্রীর সম্বল এইটুকু। কিন্তু এই অভিমানকে খাটাইবার একটা কৌশল তো চাই। অভিমান লইয়াই সাধনার সূত্র-পাত—কিন্তু সে সাধনা করিব কি করিয়া? সমস্ত কাজের মাঝেই শৃঙ্খলা চাই; সাধন-জগতেও এলোমেলো ভাবে কাজ করিলে কিছু হইবে না। যেমন নাকি সংসারটা একটা সুনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলায় গুছাইয়া না লইলে তাহা অচল হইয়া পড়ে; তেমনি অন্তরটাকেও একটা নিয়মের গণ্ডীর মাঝে অবরুদ্ধ না করিলে তাহার শক্তিকে একাগ্র করা যায় না। কিন্তু সংসার গুছাইবার ছকটা আমরা মনের মাঝে যত সহজে পাই, অন্তঃসংযমের ধারাটা তত সহজে আয়ত্ত করিতে পারি না। অথচ এই কাজটা না করিলেই নয়। এমন অবস্থায় আমাদের উপায় কি?

অন্তরটিকে গুছাইবার কোনও চেষ্টা না করিয়াই যে আমরা সাধনায় লাগিয়া পড়ি, তাহা আমাদের দেশের এক নিত্যদৃষ্ট ব্যাপার। সকলেই চায় একটা আজগুবি সাধনা— সাধ্য যে কি, তাহার দিকে কাহারও খেয়াল নাই। যদি ধর্ম্মসাধনার সরল পন্থার কথা কাহাকেও বলা যায়, তাহা হইলে সে কথায় তাহার শ্রদ্ধা হয় না; কিন্তু সাধ্যবস্তুর কথা যথাসাধ্য দূরে রাখিয়া সাধনাটাকে যতই ফলাইয়া ফাঁপাইয়া জটিল করিয়া তোলা যায়, মানুষের চিত্তও যেন ততই উত্তেজিত হইয়া উঠে। চিত্তের এ অবস্থা বিকারেরই লক্ষণ; ইহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনাও কম। এই জন্যই দেখি, আমাদের দেশে সাধনার যত বাহুল্য, সিদ্ধি তার অনুপাতে কত কম! ইহাতে সাধনশাস্ত্রের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, অথচ নিজের দোষটাও কেহ তলাইয়া দেখিতে শিখে না।

আমি কি বস্তুটা চাই, এ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যের স্বরূপটা যুক্তিতর্ক দিয়া কেহ বুঝাইতে পারিবে না; সেইজন্য উপনিষদ্ বলিতেছেন, ইহার কাছে প্রবচন, মেধা শ্রুতি সমস্তই ব্যর্থ। তবে উপলব্ধির উপায় কি? উপনিষদ্ দুই চারিটী সংক্ষিপ্ত সূত্রে সেই কথার মীমাংসা করিয়াছেন। আবার সেই পূর্ব্বের কথাগুলি স্মরণ করিতে হইবে।

সত্যদর্শনের মাঝে সঙ্কীর্ণ অভিমানের স্থান নাই। অথচ সাধনার প্রবর্ত্ত অবস্থায় অভিমানই আমাদের পুঁজি। কাজেই এই অভিমানকে সত্যের অনুকূলে পরিচালিত করিতে হইবে। মহাশক্তির সহিত আমাদের কোনও বিরোধ হইতেই পারে না—বরং ওদিক হইতে বিচার করিলে দেখি আমাদের চেষ্টার কোনও স্বাতন্ত্র্যই নাই। কিন্তু তবুও ব্যবহারিক জগতে অভিমানমূলক যে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাতে এই বিশ্বাসটুকু জাগ্রৎ রাখিতে হইবে যে, যাঁহাকে পাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা তিনি যাচিয়া আসিয়া ধরা দিতেছেন বলিয়াই আমাদের মাঝে এই চেষ্টার স্ফূর্ত্তি হইতেছে। সুতরাং এই চেষ্টা আমাদের স্বভাবেরই পরিণতি—ইহার মূলে কাহারও সহিত কোনও বিরোধের প্রসঙ্গ নাই। তিনিই আমাদিগকে চাহিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে পাওয়া আমাদের ধ্রুব। অতএব তাঁহার অভিমুখে আমাদের সকল চেষ্টাই সার্থক—এই বিশ্বাসটুকু মজ্জাগত হওয়া চাই। যে সাধনার পথেই অগ্রসর হই না কেন, চিত্তের এই দৃঢ়তাটুকু সকলের গোড়ার কথা।

চিত্তে শ্রদ্ধার সঞ্চয় লইয়া তারপর সত্যের সাধনা। প্রথমে চাই একটা সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা। সেটা যে কি করিয়া পাইব, উপনিষদ নিষেধমুখে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন—"নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ"—দুশ্চরিত হইতে যে বিরত নয়, সে তাঁহাকে পায় না। এইটুকু বেশ করিয়া তলাইয়া বুঝিতে হইবে, কেননা সাধনার গোড়াপত্তন এখান হইতেই হইয়াছে। তর্ক দিয়া সত্যকে বুঝিবার চেষ্টা বৃথা, দেখাদেখি বড় বড় সাধনার অনুকরণও মিথ্যা - কিরূপে সত্যকে জানিব, তাহার উপায় আমার ভিতর হইতেই স্ফুরিত হইয়া না উঠিলে শুধু শোনা কথায় কোন কাজ হইবে না। এই স্ফুরণের জন্য আমাদিগকে কিম্ভূতকিমাকার একটা কিছু করিতে হইবে না—ইহার জন্য চাই শ্রদ্ধা এবং চিত্তশুদ্ধি। তাঁহাকে পাইবই—এই বিশ্বাসটী আঁকড়িয়া ধরিতে পারিলেই চিত্তে বল আসিবে, তাঁহার প্রতি একটা অননুভূতপূর্ব্ব আকর্ষণে চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিবে। এই ঔৎসুক্য হইতেই চিত্তের গতি অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ করিবে। এইরূপ অনুকূল চিত্ত লইয়া তারপর প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই।

যে সমস্ত দুষ্ট সংস্কার সত্যপথে বিচরণের বাধা, তাহারাই "দুশ্চরিত।" এই দুঃশ্চরিতের আবর্জ্জনা চিত্ত হইতে না সরাইতে পারিলে কিছুই হইবে না। সাধনপথে চলিতে গিয়া অনেকে কেবল অন্ধের মত হাতড়াইয়া বেড়ায়। তাহারা চায় সত্যবস্তুটীকেই, কিন্তু কোথা হইতে যে কাজ আরম্ভ করিবে, তাহার কোন দিশা খুঁজিয়া পায় না। এইখানে বুঝিতে হইবে, চিত্ত বাহ্যমুখী আকর্ষণ সহিয়াছে, তাই ইন্দ্রিয়পথে তাহা বার বার ছুটিয়া যাইতেছে। এমনিতর বুদ্ধিতে তো আমাদের শ্রেয়ঃ কি, তাহা চিত্তে জাগিবে না। সুতরাং সত্যের সাধনায় প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে, চিত্ত হইতে, ব্যবহার হইতে, দৈনন্দিন জীবন হইতে সকল রকম উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করা। এটা বাইরের কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এইটুকু না হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে না—যে তত্ত্ব জানিবার জন্য আমাদের এত আকিঞ্চন, তাহাকে ধারণা করিবার শক্তিই জন্মিবে না।

বৃহৎ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা কত শাস্ত্র-যুক্তি লইয়াই না মাথা ঘামাই। কিন্তু একটী দীপশিখায় অন্ধকার কক্ষ যেমন

করিয়া আলোকিত হইয়া উঠে তেমনি করিয়া শাস্ত্র পাঠেও সত্যের আভাস কি সকলের হৃদয়ে দীপ্ত হইয়া উঠে? বুদ্ধি দিয়া বোঝা আর হৃদয় দিয়া বোঝার মাঝে যে পার্থক্য আছে, তাহা নিজে অনুভব না করিলে কেহ ধরিতে পারে না। হৃদয় জাগে নিষ্ঠায় এবং শুচিতায়। আচারে যে অশুচি প্রমাদী, সে কখনও সত্যকে ধারণা করিতে পারিবে না। ধারণাশক্তি বাড়ে কোনও কলকৌশলে নয় বা বুদ্ধির অনুশীলনেও নয়—কায়মনোবাক্যে শুচি ও সংযত হইতে পারিলে আপনা হইতেই বুদ্ধি-গৃহীত তত্ত্বের উপর হৃদয়ের আলোক পড়িয়া এক অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়।

রসিক হইতে হইলে আধারটি আগে নির্ম্মল করা চাই। ইহার উপায়গুলি বহুযুগ হইতে আমাদের সমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া ক্রমে সমাজধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। চলার সঙ্কেতই হইল "চারিত"—ইহাই আচার। এই আচারকে যুক্তিতর্ক দিয়া নানা দিক হইতে খণ্ডন করিবার একটা ঔদ্ধত্য আমাদের মাঝে আজকাল দেখা দিয়াছে, কিন্তু সত্যকার উপকার ইহাতে কতটুকু হইতেছে, তাহাই বিবেচ্য। অবশ্য এ কথা মানিতেই হইবে যে দীপ্তিহীন চিত্তে অন্ধভাবে একটা কিছু মানিয়া গেলেই সত্যলাভ হয় না—চিত্তকে সজাগ রাখিয়াই আচারকে মানিতে হইবে। কিন্তু অবিনয় প্রকাশ করিলেই তো চিত্তকে সজাগ রাখা যায় না। প্রাচীন সংস্কারকে যখন আঘাত করি, তখন এইটুকু আমরা বিচার করি না যে, ইহার মাঝে কোন্ গূঢ়তম উদ্দেশ্যটী প্রচ্ছন্ন ছিল, কিম্বা কত যুগের অভিজ্ঞতা হইতে ইহার জন্ম।

যেমন একদিকে আচার সম্বন্ধে আমাদের ঔদ্ধত্য, অপরদিকে তেমনি আবার নিশ্চেষ্টতা। এই দুইটীই সত্যলাভের পক্ষে প্রবল বাধা। যাহারা আঘাত করিতেছে, তাহার বুদ্ধির দর্পে কেবল ভাঙ্গিয়াই চলিয়াছে, নিজের অন্তরের মাঝে কোনও একটা চরম আশ্রয় গড়িয়া তুলিতেছে না। আবার যাহারা নিশ্চেষ্টভাবে অন্ধ অনুবর্ত্তন করিয়াই খুসী, তাহারাও দিনের পর দিন আপনার জালে আপনাকে জড়াইয়া চিত্তকে জড় করিয়া তুলিতেছে। এই দুয়ের স্থানেই শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জ্ঞান মিলে—প্রণিপাতেন-পরিপ্রশ্নেন; যেমন চিত্তকে নত করিতে হইবে, তেমনি জিজ্ঞাসাকেও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এই সংযত এবং জিজ্ঞাসু বুদ্ধি লইয়া যদি আচারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় প্রবঞ্চিত হইবার কোনও কারণ থাকে না। আচারের মাঝে খাঁটী যেটুকু, স্তূপাকার মেকী হইতেও প্রকৃত পিপাসী চিত্ত অনায়াসে তাহা চিনিয়া লইতে পারে। কেবল সমালোচনা আর লম্বা-চৌড়া মন্তব্যই বিজ্ঞতার পরিচয় নয়—যাহার সমালোচনা করিতেছি, প্রাণের টানে যজন ভজন করিয়া তাহারসম্বন্ধে একটা কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই।

এই তো গেল যাহারা সংশয়ী তাহাদিগের যুক্তিতর্কের কথা। কিন্তু যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ প্রাণে সত্য জানিবার পিপাসা জাগিয়াছে, অথচ যাহারা কোনও একটা পথ পাইতেছে না, তাহাদের পক্ষে প্রথম কর্ত্তব্যই সদাচারী হওয়া—দুশ্চারিতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সুচরিতকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা। যদি বিচার শক্তি থাকে, তবে তীক্ষ্ণ বিচার দ্বারা আপনার অন্তরের প্রয়োজন অনুসারে

নিয়ম ও নিষ্ঠার আদর্শটী আমরা নিজেই গড়িয়া লইতে পারি। কিন্তু বিচারশক্তি যাহাদের দুর্ব্বল, তাহাদেরও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না—নিজে আবিষ্কার করিতে না পারিলে অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইবে, যোগ্যতর ব্যক্তির আচার এবং উপদেশের অনুসরণ করিতে হইবে। চিত্তে যদি সত্যলাভের ব্যাকুলতা থাকে, তবে এই অনুবর্ত্তনে কোথায়ও মারাত্মক কোনও ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিবে না—যেখানে ভুল হইবে, অন্তরই সেখানে সাড়া দিয়া উঠিবে।

নিয়ম সংযম চাই-ই চাই—যুক্তি-তর্কের চেয়েও বেশী চাই। কারণ নিয়ম-সংযমের অনুষ্ঠানের মাঝে এমন একটা গতিবেগ আছে, চিত্তের দীপ্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাহা দিনের পর দিন কল্যাণের পথে প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে। নিজের চেষ্টায় কিছু করিতে পারিলে তবেই দেনা-পাওনার একটা হিসাব দাঁড় করানো যাইতে পারে; তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, আমি এই-টুকু করিয়াছি, আর তাহার ফলে এইটুকু পাইয়াছি। এমনি কার্য্যকরী একটা অভিজ্ঞতা ছাড়িয়া যদি কেবল দার্শনিক বাচালতা করিয়া বেড়ান যায়, তাহাতে নিজের কোনও লাভ তো হয়ই না—অপরেরও অনিষ্ট হইতে আটকায় না। বিচারে বুদ্ধির পরিচালনা হয় বটে, কিন্তু সেই বুদ্ধি যদি আচারের অবলম্বন না পায়, তবে তাহার সমস্ত কৃতিত্ব কেবল ধূমোদ্গারেই পর্য্যবসিত হইবে।

মোট কথা, একটা কিছু করিয়া চিত্তকে অবলম্বন দেওয়া চাই। আবার সে করাও আজগুবি কোনও কিছু নয়। এই যে নিত্যকার চলাফেরা, এর মাঝেই করিবার কত কিছু রহিয়াছে। মুখে বড় বড় বুলি আওড়াই অথচ আহারে বিহারে ব্যবহারে প্রবৃত্তির তাড়নায় বেহুঁসের মত কাজ করিয়া যাই—এই তো আমাদের প্রথম গলদ। বড় বড় সাধনার আর সংস্কারের কথা ভুলিয়া রাখিয়া আগে এইখান হইতে কাজ সুরু করিতে হইবে। কায় সংযত হউক, বাক্য সংযত হউক—চিত্ত আপনিই সংযত হইয়া আসিবে; আর সংযত চিত্ত হইতে যে নির্ম্মল প্রতিভার স্ফুরণ হইবে, তর্কবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর তাহার কাছে কোন ছার? সত্যের পথ তাহার আলোকেই আলোকিত হইয়া উঠিবে।

তাই দিশাহারা হইয়া যেখানে পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কোনও পথের সন্ধান পাইতেছি না—অথচ কোন অজানার বিরহবেদনায় সমস্ত হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে—তখন আর কোনও কর্ত্তব্য সম্মুখে না দেখিতে পাইলেও আপনাকে যেন শুচিতায় ও সংযমে অভিষিক্ত করিবার জন্য চিত্তের সমস্ত চেষ্টাকে আমরা নিযুক্ত করি। তাহাকে জানিব কি করিয়া? আমাদের নিজের বিদ্যা বুদ্ধি দিয়া নয়। তবুও আমাদেরও তো তাহার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। তাহার নিকট হইতে যতটুকু পিছাইয়া আসিয়াছিলাম, সে আমাদের অভিমানের দর্পে; তবে এই অভিমান লইয়াই আজ আবার তাহার চরণ পানে অগ্রসর হইলাম—জানিবার অধিকার যতদিন পর্য্যন্ত না জন্মায়, ততদিন সর্ব্বপ্রযত্নে, এই চেষ্টা করিব—আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত কলুষকালিমা যেন নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া যায়—আমরা যেন কায়মনোবাক্যে দুশ্চরিত হইতে বিরত হই—আমরা যেন শুচি হই—সংযত হই। পথ আপনিই মিলিবে।

স্বরূপ-সিদ্ধি

—*—

ইহুদীদের ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করে একবার নিজের হাতের কারিগরির দিকে তাকালেন—তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন—তাঁর সৃষ্টি তাঁর কাছে এতই সুন্দর, এতই মহৎ বলে মনে হল। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে এমনি একটা কথা আছে, আর কথাটাও মিথ্যা নয়। একটু ভেবে দেখ—"প্রভো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক", এমনি একটা প্রর্থনায় যে মনোভাব প্রকাশ পায়, বেদান্ত তাকে আরো জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বৈদান্তিক বলছেন, "আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে - আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে!" স্ত্রী যখন স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে যায়, তখন সে স্বচ্ছন্দে বলতে পারে "আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে" - স্বামীকে তখন আর তার বলতে হয় না যে "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক" --কেননা তখন যে তারা দুয়ে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। যদিও স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিশিয়ে দিতে স্ত্রীকে যথেষ্ট বেগ' পেতে হয়েছে - কিন্তু বার, বার চেষ্টার ফলে পতিব্রতা স্ত্রী যখন দুয়ের মাঝের ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে দিতে পেরেছে, তখন হতে স্বামীর কর্ম্মকে নিজের কর্ম্ম বলে জেনেই তার জীবনে আনন্দ উথলে উঠেছে। ঠিক এমনি করে বৈদান্তিকও এই বিশ্বরহস্যের সমস্তই নিজের বলে অনুভব করে আনন্দ পান। জ্ঞানের আলো যাঁদের হৃদয়ে জ্বলছে, ইংরেজ কবির ভাষায় তাঁরা বলতে পারেন, "পাথরের দেওয়াল দিয়েই কারাগার গড়া যায় না, লোহার শিক দিয়েই খাঁচা হয় না—মন যার শুদ্ধ শান্ত, সে তাকেও তপোবন বলে মানে।"

কিন্তু যারা অজ্ঞান, আত্মাকে যারা জানে না, স্বার্থপরতায় আর আত্মম্ভরিতায় যারা আচ্ছন্ন, তাদের কাছে রাজপ্রাসাদও কারাগারের মত, কবরের মত, নরকের মত ভয়াবহ হয়ে উঠে। সদাসর্ব্বদা তুচ্ছ বাজে চিন্তা, হীন কলুষিত বাসনা, কাল্পনিক আশঙ্কার অত্যাচার—এই সমস্ত দিয়ে তারা নিজেরাই নিজের পায়ে বেড়ী পরায়।

বেদান্ত দেখাচ্ছেন যে, তোমার সুখ তোমার হাতেই; সংসারের বাসনা-কামনার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক যে তারা তাতে বাদ সাধতে আসবে? সত্যকে প্রাণে জাগাও, দেখবে তুমি মুক্ত। বৈদান্তিক সিদ্ধি লাভ করা তোমাদের কাছে এত কঠিন কেন জান? তোমাদের ইয়োরোপ আর আমেরিকার অধিকাংশ লোকেই মনে করে, বেদান্ত সাধনা করতে হলে তাদের নিজকে বুঝি ব্রহ্ম করে তুলতে হবে, তাদের মাঝে ব্রহ্মত্বের আমদানী করতে হবে বুঝি! কিন্তু বেদান্ত বলছেন, তুমি যে ব্রহ্ম হয়েই আছ! ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন যে তোমার আর সত্তা নাই, এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। তোমার ব্রহ্মত্ব আজ আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হবে না—একে শুধু জানতে হবে, বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে। তোমার মাঝের এই মহান্ সত্যকে তোমার ব্যবহারে লাগাতে হবে শুধু।

ধর, একটা লোকের ঘরে মেলা টাকা পোঁতা আছে, কিন্তু সে তার কথা জানে

না; আর একটা লোক আছে, তার ঘরে কোনও টাকা পয়সা নাই। টাকার জন্য তারা দুজনেই মাটী খুঁড়তে লাগল। এখন যার টাকা আছে, অথচ তার কথা ভুলে গেছে, সে খুঁড়তে খুঁড়তে টাকাটা পাবে, কিন্তু যার ঘরে টাকা পোঁতা নাই, সে কিছুই পাবে না। তোমাদের মাঝেও অমূল্য সম্পদ্ লুকানো রয়েছে—কৃপণের মত তাকে আর চাপা দিয়ে রেখো না—তাকে কাজে লাগাও। সম্পদ আর তোমাকে সঞ্চয় করতে হবে না—তাকে ব্যবহারে লাগাতে পারলেই হল। তোমার আত্মা স্বভাবতঃই পাপশীল, কলুষিত নন; কারু পাপে তাঁর পতন হয়নি, আবার আর-কারু পুণ্যে তাঁর উদ্ধারও হবে না (অথচ খ্রীষ্টানেরা তাই ভেবে থাকে)।

এই একটা কাঠের ফলক রয়েছে—এটা একটা কঠিন নিরেট বস্তু। তুমি ফলকটাকে বারবার মেজে ঘষে মুছে কি কখনও স্বচ্ছ করতে পারবে?—কখনও না। আর এই যে আয়নাটা, এটাও ময়লা হয়ে আছে—একে একটু মুছে নিতেই এ স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। কিন্তু একে স্বচ্ছ করবার জন্য তোমাকে নিজের চেষ্টায় কিছুই করতে হয়নি—যে স্বচ্ছতা তার মাঝে স্বভাবতঃই ছিল, তুমি তাকেই অভিব্যক্ত করে তুলেছ মাত্র। কাঠের ফলকটা স্বভাবতঃই স্বচ্ছ ছিল না, কাজেই চেষ্টা-যত্ন করেও তাকে স্বচ্ছ করা গেল না।

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে স্বভাবতঃই এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে, তার মুক্তি হবেই—এতে এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে আত্মা স্বভাবতঃই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—শুধু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর উপর একটা কলুষের আবরণ পড়েছে মাত্র। মুক্তির প্রতি এই সহজ ও সার্ব্বভৌম বিশ্বাস হতে আমরা এই কথা বুঝতে পারি, যারা গোঁড়ামী করে আত্মাকে স্বভাবতঃ পাপশীল বলে মনে করে, তারা ভুল বুঝেছে। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা ওই কাঠের ফলকটার মত চিরদিনই অস্বচ্ছ, তাকে আর কিছুতেই স্বচ্ছ বা শুদ্ধ করা যাবে না। কিন্তু মানুষের সত্য স্বভাব হচ্ছে ব্রহ্মত্ব। মানুষ যদি ব্রহ্মস্বভাব না হতো, তাহলে এ জগতে কদাচ প্রবক্তা বা মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হতো না।

রাম বলছেন, "ভয় করো না—বেরিয়ে পড়। তোমার সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করে বীরের মত তোমার জন্মস্বত্বের অধিকার নাও—বল, সোঽহম্।" ভয় পেয়ো না—ভয়ে কেঁপো না।

সিনাই পর্ব্বতে ঘুরতে ঘুরতে মুশা একটা ঝোপে আগুন জ্বলছে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে কে আছ? কে তুমি?" অবশ্য মুখ ফুটে এতগুলি কথা না বললেও, তাঁর ঝোঁপটার সম্বন্ধে ভারী কৌতূহল জন্মেছিল, কেননা ওটাতে আগুন জ্বলছে, কিন্তু পুড়ছে না—এ তো এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তখন সেই ঝোপের ভিতর হতে উত্তর এলো—"আমি যা আছি—আমি তাই আছি।" এই যে বিশুদ্ধ, ভাবজ্ঞেয় "আমি আছি"র বোধ—এই হল তোমার আত্মা।

তোমার আত্মা, তোমার স্বভাব হল ঠিক যেন হীরকের মত উজ্জ্বল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। স্ফটিকের পাশে কালো একটা কিছু রাখ, স্ফটিকটা কালো দেখাবে; তার পাশে লাল কিছু রাখ, স্ফটিকটাও লাল হয়ে যাবে—ইত্যাদি। বাস্তবিক স্ফটিকের কিন্তু কোনও

রং নাই—স্বভাবতঃ সে বর্ণাতীত—লাল কাল বা কোনও রং তার মাঝে নাই। সোজা কথায় "স্ফটিক যা আছে—ঠিক তাই আছে।" তেমনি তোমার শুদ্ধস্বভাব আত্মাও যা আছেন, ঠিক তাই আছেন—এই হল "আমি আছি"র স্বরূপ।

ধর ভারতবর্ষের একটী লোক। এই যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ, এর পাশে সে যেন একটী কালোরঙ্গের ন্যাকড়া রেখে দিল—সে যেন তার দেশের রং। এই রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয়ে স্ফটিকটা কালো হয়ে গেল। তখন শুদ্ধ "আমি" হয়ে গেল—"আমি হিন্দু।" আবার আমেরিকাতে এই অবর্ণ, অনাম, অরূপ স্ফটিকের বা আত্মার পাশে একজন ইয়াঙ্কি রাখল এক টুকরা হলদে ন্যাকড়া; আর অমনি বিশুদ্ধ "আমি" হয়ে গেল "আমি একজন আমেরিকান।" তারপর আর একজন এসে এই স্বচ্ছ স্ফটিকরূপ আত্মার পাশে এক টুকরা লাল ন্যাকড়া এনে রেখে দিল—অমনি বিশুদ্ধ "আমি" রঞ্জিত হয়ে দেখা দিল, "আমি স্ত্রী।" আর একজন আত্মার পাশে আর একটা কোন রং ধরল—অমনি তা হল, "আমি একজন দিগ্বিদিগ্‌গজ।" এমনি করে দেখি, জগতে কেউ বলছে, "আমি খ্রীষ্টান", কেউ বলছে, "আমি হিন্দু", কেউ বলছে, "আমি ইয়াঙ্কি" কেউ বলছে, "আমি জন বুল", কেউ বলছে "আমি বালক", কেউ বলছে, "আমি নারী", কেউ বলছে "আমি সিংহ", কেউ বলবে "আমি বাঘ"—ইত্যাদি।

এর মাঝে দেখ্‌ছি, সত্য শুধু সেই আত্মস্বরূপ, যাঁর মাঝে কোন বর্ণ নাই, কোনও মালিন্যের স্পর্শ নাই; সেই জ্যোতির্ম্ময় আত্মা, বা ওঁকার বা অহং-স্বরূপই সর্ব্বত্র অনুস্যূত—তাঁর কোনও বিকার নাই। তিনি সর্ব্বদাই এক। কাজেই সত্যের মাঝে বাস্তবিক কোনও বর্ণসমাবেশ তো নাই। এক খণ্ড স্বচ্ছ কাচের পাশে যে কোনও একটা রং রাখ, রংটা কাচের মাঝে ঢুকে পড়ে না—শুধু কাচের উপর প্রতিফলিত হয় মাত্র, তার গায়ে লেগে যায় না। স্ফটিক সর্ব্বদা বর্ণহীন স্বচ্ছই থাকবে। আত্মস্বরূপ বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বগামী—তোমার সর্ব্বত্রই তাঁর প্রকাশ। সিংহ, ব্যাঘ্রও এই আত্মার ভাবকেই বিকাশ করছে। এই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপই তুমি। তোমার পাশে যে রঙ্গীন ন্যাকড়ার টুকরাটা পড়ে রয়েছে, তার সঙ্গে নিজকে মিশিয়ে ফেলো না। কারণ ওটা তুমি সব সময় ছিলে না—এমন এক সময় ছিল, যখন তোমার অবর্ণ অরূপ আত্মা অন্য রূপকে আশ্রয় করে ছিল। এই আমির বাস অন্য দেহে ছিল। জন্ম-জন্মান্তরের এমন সময় গিয়েছে, যখন তুমি নিজকে মনে করেছ, আমি সিংহই, কি আমি বৃষ—কি অন্য একটা কিছু।

আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলেই সুখ, তাতেই মুক্তি—এই আত্মাই বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ নির্ব্বিশেষে চিরকাল জাগ্রৎ রয়েছেন। এই বিশুদ্ধ আত্মসত্তাকে কাল স্পর্শ করতে পারে না, কেননা পূর্ব্ব জন্মেও এই আত্মসত্তা একই ছিল। দেশধর্ম্মেও এতে কলঙ্ক স্পর্শ করে না, কেননা সমস্ত ভূতদেহই এই আত্মসত্তা দ্বারা অধ্যুষিত। এই আত্মসত্তার কাছে সমস্ত কালের সংজ্ঞা—"এখন" আর সমস্ত দেশের সংজ্ঞা—"এখানে"। এই শুদ্ধ অহং অনন্ত সত্যকেই প্রকাশ করছে, যে সত্যে কোনও বিকার নাই। এই আত্মসত্তাকেই প্রণব দ্বারা ব্যক্ত করা হয়—বিশুদ্ধ অহং প্রত্যয় বা "সোঽহং"ই প্রণবের সার।

কারসীতে ওম্ গিয়ে দাঁড়ায় "ও-অম্"

অর্থাৎ "সোঽহম্"—"অহং ব্রহ্মাস্মি।" ওম্ অহং-প্রত্যয়ের বিশুদ্ধ ভাবটীকে প্রকাশ করে।

বৈদান্তিক বলছেন—

"ওগো বন্ধু, হাজার রূপের মাঝে তুমি লুকোচুরী খেলতে চাও, কিন্তু তোমাকে তো আমি অমনিই চিনেছি। আ চিনেছি তোমায়—মায়ার অবগুণ্ঠনে মুখখানি তোমার আবরিত করে চলেছ তুমি—অথচ সবার মাঝেই না ছড়িয়ে পড়েছ!

"সাইপ্রেসের ফুটন্ত কুঁড়িটীর মাঝে, ওগো সুন্দর, তুমিই যে ফুটে উঠ্‌ছ—তোমাকে তো ভুল করিনি আমি। তটিনীর নির্ম্মল প্রাণ-ধারায় সবার মনোহরণ করে চলেছ তুমি—তোমায় কে ভুলতে পারে, বন্ধু?

"জলস্তম্ভ যখন আপন গর্ব্বে আকাশ ভেদ করে উঠে, তখন ওগো লীলাচতুর, তোমায় তো আমি চিনতে পারি। আবার মেঘ যখন বিচিত্র হয়ে গড়তে গড়তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ওগো চঞ্চল, আমার আঁখিতে যে ধরা পড় তুমি।

"প্রান্তরের শ্যামল তৃণাসনে ফুল ফুটিয়ে তুমি বিচিত্র হয়ে আছ ওগো সুন্দর, তার মাঝে যে তোমায় চিনতে পেরেছি। তরু যখন তার সহস্র বাহু প্রসারিত করে আকাশকে আলিঙ্গন করতে চায়, তখন তোমার মধুর আলিঙ্গনের আভাস যে পাই তার মাঝে।

"শিখরে শিখরে যখন প্রভাতের মধুর আলো উজলে উঠ্‌ল; তখন জানি বন্ধু, সবার প্রাণে আনন্দ জাগাতে, তুমিই যে হেসে এসেছ—, তাই তো তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ি তখন। তারপর মাথার উপর এই আকাশ যখন আলোর লহরে লহরে স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন তোমাকেই যে প্রাণরূপে আকর্ষণ করে নিই—জানি, সবার বুকে আসন পেতেছ তুমি।

"বাইরে আর ভিতরে আমার চেতনা যা কিছু আমার কাছে ফুটিয়ে তুলছে, তার মাঝে তোমাকেই জেনেছি—তোমার বাণীই শুনেছি। আমার জপের প্রতি বর্ণে বর্ণে তোমাকেই ডেকেছি আমি।"

বাবা মুশার সম্বন্ধে দু চারটা কথা বলতে চান। মুশা ঝোপের মাঝে কথাগুলি শুনবার সময় দেখতে পেলেন, কাছেই একটা সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। দেখে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। বুক ধড়ফড় করতে লাগল, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল—মুশা তখন বেহুঁস। কিন্তু তখনই আবার কে বলল, "ভয় পেয়ো না মুশা, ঐ সাপটাকে চেপে ধর দেখি—ওর মাঝে ভয়ের কি আছে?" মুশা তবু ভয়ে কাঁপছেন, তখন আবার শোনা গেল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন মুশা?—ধরে ফেল সাপটাকে।" মুশা সাহস করে সাপটাকে যেই ধরলেন, অমনি সেটা একটা সুন্দর দণ্ড হয়ে গেল। আ। এ গল্পটার মানে কি? "সাঁপ" হচ্ছে "সাঁচ" অর্থাৎ সত্য। বোধ হয় জান, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচ্য জাতিরা সত্যকে বা চরম তত্ত্বকে সর্পরূপে কল্পনা করে থাকে। হিন্দুর শেষ নাগ সত্যের প্রতীক। সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে, তার একটা প্যাঁচের মাঝে আর একটা প্যাঁচ—আর লেজটা থাকে মুখের মাঝে। এ জগতেও তো তেমনি দেখছি, কুণ্ডলীর মাঝে কুণ্ডলী পাকানো রয়েছে—সবই এখানে বৃত্তাকারে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, আর সবারই চরম প্রান্ত দুটা মিলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে প্রকৃতির আইন—বিশ্ব জুড়েএই আইনের দখল।

সাপকে ধরাই হল নির্ভীক হৃদয়ে বিশ্ব-বিধাতার আসনে আপনাকে স্থাপন করা—আপনাকে বিশ্বরাট বলে জানা। বীর্য্যের সঙ্গে নিজকে প্রতিষ্ঠা কর বিশ্বেশ্বরের আসনে—তাঁর সঙ্গে তোমার একাত্মবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠুক।

মুশা যে জাতির মাঝে জন্মেছিলেন, তারা তখন পরাধীন হয়ে জীবন যাপন করছিল। সে যুগে ইহুদীদের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। আপন দেশ হতে বিতাড়িত হয়ে তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা নিজে যেমন অগুণ্তি অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে ছিল, তেমনি তাদের ভগবানকেও তারা দাঁড় করিয়েছিল—এক মহা জুলুমবাজ করে। ইহুদীদের ভগবান একেবারে স্বেচ্ছাচারীর সেরা। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুও নাই। ষাঁড়গুলি যদি এক হয়ে একটা ধর্ম্মসভা করত, তাহলে তারা ভগবানের সংজ্ঞাটা কেমন দিত? তাদের কল্পনায় ভগবান হতেন একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়, যে আর সকল ষাঁড়কে গুঁতিয়ে চীৎপাৎ কর্‌তে পারে। যদি সিংহ-দের ধর্ম্মসভা বস্‌ত, তাহলে তাদের ভগবান হতেন একটা প্রকাণ্ড তেজীয়ান জোয়ালো সিংহ—তাদের মাঝে সব চেয়ে ভীষণ যে, তারি মত। আপন সামর্থ্যের আর সংস্কারের বাইরে কিছু কল্পনা করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব? নিজকে কি নিজে ডিঙ্গিয়ে যেতে পার?—পার না। সিংহেরা যদি বিচার যুক্তি করে ভগবানকে খাড়া করতে যায়, তাহলে তাঁকে তারা মস্ত একটা সিংহই বানাবে। তেমনি ভয়াতুর লোকেরা যদি ভগবানের কল্পনা করতে যায়, তাহলে তারা ভগবান্‌কে করবে একটা গোলামখানার কর্ত্তা—একটা জুলুমবাজ, দাঙ্গাবাজ লোক, যার ভয়ে সবার পিলে চমকে উঠে। এমনি করেই ইহুদীদের ভগবান হয়েছেন, একজন মহান্ শাসক, মহান্ প্রভু।

অধিকাংশ প্রাচ্য বিশেষতঃ সেমেটিক ভাষায় ভগবানের নাম "মালিক"—তার অনুবাদ করা হয় "প্রভু।" কি করে এই সংজ্ঞার সৃষ্টি হল, তা নিয়ে একটু আলোচনা করা মন্দ হবে না।

ইহুদীদের মাঝে বহু সম্প্রদায় ছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একটা বিশিষ্ট দেবতা ছিল। এক সম্প্রদায়ের দেবতার নাম ছিল মোলক্ (Moloch)। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে এই ইজরালাইট সম্প্রদায় সকলের উপর প্রভুত্ব লাভ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোষ্ঠী-দেবতা মোলাকও আর আর দেবতাকে অভিভূত করে সমগ্র ইহুদী জাতির দেবতা হয়ে দাঁড়ায়। সেমেটিক জাতিদের মাঝে যে সগুণ একেশ্বরবাদ প্রচলিত আছে, আর ভগবানের নাম যে তারা "মালেক" দিয়েছে—তার ইতিহাস এই। তখনকার যুগে একেশ্বরবাদের সীমাতে পৌঁছানই ছিল বিজ্ঞানের চরম উন্নতি; সবাই এই অজ্ঞেয় রহস্যের মাঝে অবগাহন করবার জন্য সচেষ্ট ছিল। এটা ঠিক তাদের ধাত-সই ছিল। এখন সে দিনকাল বদলে গেছে। মানুষ আর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় না—তারা চায় স্বায়ত্ত-শাসন। আমেরিকাতেও লোকে চায় স্বাধীনতা, ইংলণ্ডের লোকেও চায় স্বাধীনতা—সব যায়গাতেই ওই এক বুলি। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে বটে। সবই উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে—সবারি ক্রমবিকাশ হচ্ছে। সুতরাং পূর্ব্বে ভগবানের সম্বন্ধে যে

একটা জবরদস্তির ভাব পোষণ করা হত, সেটা ছেড়ে দিয়ে বেদান্তের শিক্ষামত "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলে মুক্তের অভিমান নিয়ে ভগবানকে আজকাল বুঝ্‌তে হবে। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের পরিসর যেমন অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত করে আনা হয়েছিল, তেমনি সেমেটিক জাতিসুলভ এই সগুণ ঈশ্বরের জবরদস্তি হতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্ম্মজগতেও মুক্তির বাতাস বইতে দিতে হবে। ইহুদীরা যেমন রাষ্ট্রে পরাধীন হয়ে বাস করত, তেমনি তাদের দেবতাও ছিল মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন একজন জুলুমবাজ প্রভু। তোমরা আজকাল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করছ যখন, তখন তোমাদের দেবতাও হওয়া উচিত— আত্মা। আজকালকার দিনে মানুষ দাস হয়ে থাকতে চায় না—দাসত্বের শৃঙ্খল দিনের পর দিন ভেঙ্গে পড়ছে। জগতের ক্রমোন্নতি ঘটছে—সব জিনিষই ভালর দিকে ছুটে চলছে। শুধু তোমার ঈশ্বরের ধারণাটাই কি আজ পঙ্গু হয়ে থাকবে?—না।

এক সময়ে ভগবানেরও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—সয়তান। তাছাড়া ভগবান একদল এঞ্জেলরূপী পারিষদ দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতেন। সে যুগে সাতদিনে এই জগৎটাও তিনি সৃষ্টি করে ছিলেন।—কিন্তু সে কখন?—যখন মুশা তাঁর কিতাব লিখেছিলেন। জান তো, মুশার পর আজ হাজার বছর পার হয়ে গিয়েছে—সমস্ত জগৎটায় একটা ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এত করেও তোমাদের ভগবান সম্বন্ধে মান্ধাতা আমলের ধারণাটাই কি অচল হয়ে থাকবে? এ কেমন ধারণা—যার পরিণতি ঘটে না? জগতে সব জিনিষেরই পরিণতি হচ্ছে—সবই বাড়ছে। কাজেই এতদিনের ক্রমোন্নতির ফলে তোমাদের ভগবানের সয়তানরূপ শত্রুটীরও নিপাত হওয়া উচিত ছিল। ভগবানের স্বরূপকে সঙ্কীর্ণ করবার জন্য আর কিছুকেই তাঁর পাশে দাঁড় করানো চলে না। তাছাড়া তাঁকে একজন মিস্ত্রি বা কারিগরের চেয়ে একটু উঁচু নজরে দেখাও প্রয়োজন। এই যে সত্যরূপী অনন্ত নাগ তোমাকে ভয়ে ব্যাকুল করে তুলেছে, তাঁকে ধরবার সাহস সঞ্চয় করা এতদিনে তোমার উচিত ছিল। সত্য এসে তোমাকে বলছে যে তুমিই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম হতে তোমাকে পৃথক করবার কিছুই নাই; ভগবান স্বর্গেও নাই, নরকেও নাই, তিনি আছেন তোমার মাঝে—আত্মারূপে। এই ভাবটীকে যদি ধারণা করতে পার, তবে মুক্তির পথ তোমার কাছে উন্মুক্ত।

আশঙ্কায় কেন তোমার বুদ্ধিকে দুর্ব্বল করছ—তোমার শক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করছ কেন? তোমার স্বভাব যা তাকেই ফুটিয়ে তোল। সত্যকে পদদলিত করে যেও না—বীরের মত বেরিয়ে এস। নির্ভীক হৃদয়ে উচ্চকণ্ঠে বারবার ঘোষণা কর—"অহং ব্রহ্মাস্মি - অহং ব্রহ্মাস্মি!"—এযে তোমার জন্মস্বত্ব।

মুশা যখন প্রথম ঝোপের মাঝে কথা শুনতে পেলেন, তখন তার যে অবস্থা হয়েছিল, সাধারণ লোকেরও কতকটা সেই অবস্থা হয়। মুশা ছিলেন তখন দাসসুলভ চিত্ত নিয়ে, তাই ভয়ে তিনি কেঁপে উঠেছিলেন। মানুষ যখন এই শুদ্ধ অহং-এর আহ্বান শুনতে পায়—এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ সত্য স্বরূপ ওঁকারকে যখন জানতে পায়, তখন তাদেরও এমনি দশাই হয়। সে গম্ভীর বাণী শুনতে পেয়ে তারা কেঁপে উঠে, সন্দেহে তাদের চিত্ত দুলতে থাকে, তাকে ধরবার সাহস তাদের থাকে না। এই দেববাণী মানুষের

কাছে যেন সাপের ফোঁসের মত। তুমিই ব্রহ্ম—পুণ্য হতে পুণ্যতম; জগৎ মিথ্যা; তুমিই সবার সব; অনন্ত শক্তিস্বরূপ তুমি—বাক্য তোমার মহিমা বর্ণন করতে পারে না—কায় তোমাকে পায় না—মন পায় না—তুমিই সেই শুদ্ধভাবজ্ঞেয় তত্ত্ব—"অহং ব্রহ্মাস্মি।"

এই যে লাল কাল হলদে ন্যাকড়ার ঝুলি, তোমার স্বচ্ছ স্ফটিকের পাশ হতে দূর করে দাও ওদের—আপন মহিমায় জেগে ওঠ তুমি—জান, "সোঽহং—অহং ব্রহ্মাস্মি।" এই সত্যকে মানুষ এড়িয়ে যেতে চায়—সাপকে তাদের বড় ভয়। আহা, একবার ধরই না সাপটাকে—দেখবে কি আশ্চর্য্য—সাপ যে তোমার হাতে রাজার রাজদণ্ড হয়ে রইল! এই সাপই তখন ক্ষুধায় তোমার আহার জোটাবে, পিপাসায় জল দিবে, সকল বাধাবিপত্তি দুঃখশোক পথ থেকে হটিয়ে দিবে।

বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে মুশা একবার এই দণ্ড দিয়ে একটা পাথরকে স্পর্শ করেছিলেন, আর সেই পাথরের কঠিন বুক ভেদ করে নির্ম্মল জলের ধারা বেরিয়ে এসেছিল। ইজ্রায়েলাইটরা বিপন্ন হয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথে তাদের পড়েছিল লোহিত সাগর। ভীষণ সমুদ্র গোরস্থানের মত হাঁ করে দাঁড়াল তাদের গ্রাস করবার জন্য। এই দণ্ড দিয়ে মুশা সমুদ্রকে স্পর্শ করলেন, আর অমনি জল দু'ভাগ হয়ে সরে দাঁড়াল—শুকনা জমীর উপর দিয়ে হেঁটে ইজ্রায়েলাইটরা সমুদ্র পার হয়ে গেল!

সত্যরূপী এই সাপের ফোঁসফোঁসানিতে তোমার ভয় লাগে বটে; কিন্তু কোনও রকমে একবার ওকে ধরে ফেল—তারপর আর কিছুতেই হাতের মুঠো ছেড়ো না। দেখে অবাক হবে, তুমি তখন এই বিশ্বের রাজাধিরাজ, সমস্ত ভূতের অধিপতি, নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা, আকাশের প্রশাসিতা—তুমিই তখন যা কিছু সব। এই দিব্য সত্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করে কর্ম্মে প্রয়োগ করতে মানুষ যেন কেমন একটা সঙ্কোচ অনুভব করে। ভয় কি বীর—ইতস্ততঃ করছ কেন? বীর্য্যের সঙ্গে এই সত্যকে হৃদয়ে গ্রহণ কর। বিপুল উদ্যমে একে বুকে তুলে নাও—তোমার সত্তায় এ সত্য মিশিয়ে যাক্ এ সত্যের মহিমা তোমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়ে উঠুক—সত্যই তাহলে তোমার বন্ধন ঘুচাবে!

"আমি ব্রহ্ম" এ কথা বলা পাপ নয়। বরং আত্মাকে অপহরণ করা সব চেয়ে ঘৃণ্য পাপ। নিজকে স্ত্রী বা পুরুষ সংজ্ঞা দেওয়া কিম্বা নিজকে তুচ্ছ কীটাণুকীট ভেবে হীন করাই হচ্ছে মিথ্যাচার—নাস্তিকতা। কৃপণের মত হয়ে থেকো না। কৃপণের ঘরে স্তুপাকার ধন সঞ্চিত থাকে, কিন্তু সে তার একটী কড়িও বের করতে চায় না। তোমার মাঝেও তেমনি এ গোটা জগৎটাই রয়েছে. সবই তোমার আপন। তবে একে লুকিয়ে রেখেছ কেন? একে বাইরে প্রকাশ করছ না কেন? এ সম্পদ ব্যবহারে লাগাও—তোমার আত্মনিহিত অমৃতরস আকণ্ঠ পান কর। তোমার মাঝে যে স্বভাবদত্ত রাজসম্পদ গোপন রয়েছে, তার দখল ছাড়ছ কেন?

এমনি করে পরম সত্য জানাকে ভারতবর্ষের লোকেরা নষ্ট হার ফিরে পাওয়ার সঙ্গে উপমা দিয়েছে। একটা লোকের গলায় খুব মূল্যবান একটা মুক্তাহার ছিল। কি রকম

করে যেন একবার সেটা তার পিঠের উপর পড়েছে, সে তা প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে হঠাৎ গলায় আর হারটা দেখতে না পেয়ে সে তার জন্য খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিল। কিন্তু খোঁজায় কোনও ফল হল না। তখন হারটা হারিয়ে গেছে বলে সে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। কেঁদেকেটে একজন বন্ধুর দেখা পেয়ে সে বলল, হারটা তাকে খুঁজে দিতে। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, "হারটা যদি তোমাকে বের করে দিতে পারি, তবে কি দিবে আমাকে?" লোকটা উত্তর করল, "তুমি যা চাইবে, আমি তাই দিব।" তখন বন্ধু তার গলায় হাত দিয়ে হারটা টেনে তুলে বলল, "এই তো তোমার হার। এ তো হারায় নি—এ তোমার গলাতেই ছিল, তুমি খেয়াল করনি।" তখন লোকটার যেন বিস্ময় হল, তেমনি আহ্লাদও হল। তোমার ব্রহ্মত্বও তেমনি বাইরে কোথাও লুকিয়ে নাই- তুমি ব্রহ্ম হয়েই আছ—তত্ত্বমসি। এ কি তোমার আশ্চর্য্য বিস্মৃতি, যা তোমার ব্রহ্মত্বকে ভুলিয়ে দিচ্ছে, তোমার স্বরূপকে আবৃত করছে!

রাজা ঘুমের ঘোরে নিজকে ভিক্ষুক ভাবতে পারেন। তিনি স্বপ্ন দেখছেন, তিনি ভিক্ষুক, কিন্তু তাতে তাঁর বাস্তবিক রাজ-স্বভাবের কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

ওগো, তোমরাও যে রাজার রাজা, দেহে দেহে আমারই যে বিকাশ তোমরা; তোমরা যে রাজ রাজেশ্বর -আনন্দের প্রস্রবণ তোমরা! অবিদ্যার মোহস্বপ্নে নিজকে আর শৃঙ্খলিত করে রেখো না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—সম্রাটের মহিমায় তোমার রাজদণ্ড পরিচালনা কর—তোমরা যে ব্রহ্ম, তা ছাড়া কিছু নও তোমরা। অন্তরের পূর্ণশক্তিতে সমস্ত দ্বিধা দুর্ব্বলতা সবলে দূর করে আত্মরসে আপনাকে একেবারে নিমজ্জিত করে দাও। তুমিই ব্রহ্ম—"সোঽহং।" এ অনুভূতিতে কি প্রশান্তি—কি আনন্দ! সকল দুঃখের অবসান এর মাঝে—সকল ভার খসে পড়ে এর পায়ে। আর্কিমেডিস বলেছিলেন, যদি একটা প্রতিষ্ঠা-বিন্দু পেতাম, তাহলে এ জগৎটাকে আমি নড়াতে পারতাম। কিন্তু বেচারী আর সে স্থির বিন্দুর সাক্ষাৎ পেল না। সে বিন্দু যে তোমার মাঝেই। সেই তো তোমার স্বরূপ। স্বরূপকে যখন জানবে—সমগ্র বিশ্বকে নড়াতে পারবে তখন! ওঁ *

*স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০২)



সহজ শিক্ষা

—:*:—

শিক্ষামন্দির হতে কৃত্রিমতাকে আগে তাড়াতে হবে। কৃত্রিমতাকে চিনব কি করে? যখনি দেখব, কোনও একটা প্রয়োজন বা সংস্কারের খাতিরে মানুষের জীবনের একটা দিক মাত্র পুষ্ট করা হচ্ছে, অখণ্ডভাবে মানুষের সমগ্র জীবনকে গ্রহণ করা হয়নি, তখনি বুঝব, আমরা এখানে কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। বিভিন্নমুখী কতকগুলি শক্তির সংঘাতে মানুষের জীবন; তার মাঝে সত্য ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার সমস্ত শক্তির মাঝেই সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে, যে কোনও একটা শক্তির উপাসনায় মেতে গেলে চলবে না। কিন্তু এদিকে আবার এও স্মরণ রাখতে হবে যে, কতকগুলি বিরোধী আদর্শকে একত্র জুড়ে দিলেই সামঞ্জস্য হয় না—তার জন্য বিরোধকে অতিক্রম করে উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়িয়ে শক্তির পরিচালনা করতে হয়। এইজন্যই দেখি, গোড়ায় বহু থাকলেও চরমে এক ভিন্ন বহুকে কেউ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

শিক্ষা আর জীবন ভিন্ন নয়—অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে না। যে পর্য্যন্ত চরম সত্যকে লাভ না করছি, সে পর্য্যন্ত শৈশব হতে যৌবনে, যৌবন হতে বার্দ্ধক্যে, জন্ম হতে জন্মান্তরে শিক্ষা আর জীবন পাশাপাশি চলবে—নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আপনার অন্তরের চিরন্তন সত্যটীকে এক সুরে বেঁধে। এই একের সুরটী যাতে সকলের মাঝেই বেজে ওঠে, এইটী আমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে। আমরা এমন চাই না যে মানুষের জীবনের যত কিছু বৈচিত্র্য, সব মিলে একাকার হয়ে যাক্; অর্থাৎ প্রলয়ের মাঝে আমরা সাম্য খুঁজি না—আমরা চাই জীবনের বৃহত্তর একটা সামঞ্জস্য। এইটুকু পেতে হলে কি যে ধরতে হবে আর কি ছাড়তে হবে, সেই তো সমস্যা। বিশেষ করে একটা কিছু হতে চাইলেই জীবনটা মার্কামারা হয়ে যায়, তার মাঝে কৃত্রিমতা এসে পড়েই—তাই চাওয়ার মাঝে বিপদ আছেই। এই সঙ্কটস্থল হতেই নূতন পথে যাত্রা করতে হবে। চাইবার কিছুই রাখব না—অথচ সমস্ত কামনাকে অতিক্রম করলেও নিজের স্বভাবকে কখনও অতিক্রম করব না—এমনিতর একটা চেষ্টা যদি হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগে, তবেই মানুষ কলে ছাঁটা আধখানা মানুষ না হয়ে একটা পুরা মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু কি করে তা হবে, তা বুঝতে গেলে তপস্যার প্রয়োজন। এতো শুধু বৈজ্ঞানিকের মত বাইরটাকে বিশ্লেষণ করে বোঝা নয়—এ যে জীবনের মর্ম্ম-সত্যটীকে আবিষ্কার করা। যা হোক একটা কিছুর সঙ্গে জীবনকে জড়িয়ে রাখলে বুঝবার এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে। সমস্ত সৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টিশক্তি কোন ধারা ধরে কাজ করছে, এইটুকু না ধরতে পারলে বোঝা যাবে না—আমাদের জীবনকেও কোন পথে পরিচালনা করলে আমরা ঠিক সহজ বস্তুটী পাব। আবার এটুকু বুঝতে গেলেও নিজকে একটু দূরে নিয়ে যেতে হবে—চেষ্টার যে বৈচিত্র্য জীবনে ফুটে উঠছে, তার সঙ্গে

নিজের অভিমানকে একীভূত না করে নির্ব্বিকার হয়ে তার সমগ্র স্বরূপটীর পরিচয় নিতে হবে। নিজ হতে এমনি দূরে সরে যেতে হলেই সংস্কারসুলভ বাসনা কামনাগুলিতে টান পড়বে, তখন আর বাইরের দিকে এতটা নজর রাখা সম্ভব হবে না। এই অন্তর্মুখীনতাই হল তপস্যা।

অন্তরে পৌঁছে একবার জীবনের মর্ম্মস্থানটীতে আসন নিতে পারলে সবই সহজ হয়ে আসবে—সমস্তটা জীবন যেন তখন বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে ভাসবে। তখন তার প্রত্যেকটী চেষ্টার তাৎপর্য্য বুঝে সহজের পথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা দুঃসাধ্য হবে না। এমনি করে সমগ্র বস্তুটীকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝতে না পারব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটা আদর্শের দিকে নিজকে চালাতে হলে নিজের উপর কেবল জবরদস্তিই করতে হয়; আর আদর্শও চিত্তের কাছে সুস্পষ্ট না হওয়াতে জবরদস্তিটাও কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। যারা ভিতরে না ঢুকে কেবল বাইরে থেকে আত্মশাসন করতে চায়, শাসনের পীড়া যে তাদের কাছে এত তীব্র লাগে, তার কারণই এই যে, শাসনের হেতুটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নয় অর্থাৎ তারা নিজের বুদ্ধিতে শাসন করছে না, তারা শাসন করছে পরের বুদ্ধিতে। তাই যারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ আর যারা এমনিতর অর্দ্ধ-ব্যবসায়ী—তারা উভয়েই তপস্যার মাঝে কৃচ্ছতাটাই দেখতে পায়; তার মাঝে যে আনন্দ আছে, ঔদার্য্য আছে, সৃজন নৈপুণ্য আছে, তা তাদের চোখে পড়ে না।

নিজের জীবনে এই ওস্তাদীটুকু করা চলে, যখন নিজের মাঝে ইচ্ছাশক্তি বিশেষভাবে জেগে উঠেছে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যেখানে এখনো নিয়ন্ত্ৰূপে ফুটে ওঠেনি, সেখানে কি করে ওস্তাদী চলবে? অথচ শিক্ষার কারবার বেশীর ভাগই এই আ ফোটা বা আধফোটা মনটী নিয়ে। একটা সংশয়ও এখানে জাগে। বুদ্ধিশুদ্ধি হলে পর জীবনটাকে সমুখে নিয়ে তাকে যখন বাগ মানাতে চাই, তখন দেখি, প্রতি পদে যুক্তিতর্কের ঠোকাঠুকি করে তবে আমাদের পথ চলতে হচ্ছে; এই জন্যই সেখানে কত পর্য্যবেক্ষণ, কত বিচার, বিভিন্ন মনোবৃত্তির কত সওয়াল জবাব। কচি মনে কি এতটা বুদ্ধির পাক আছে সেখানেও লড়াই সুরু হতে পারে? এ সমস্যার বাইরে থেকে মীমাংসা হতে পারে না। ফুটন্ত মনে কি আছে না আছে, তা দেখছি যুক্তিতে ধরা পড়ে না—তা বোঝা যায় হৃদয় দিয়ে, মমতা দিয়ে। ওই যে ফুলের কুঁড়িটীর মত কচি মনটী—ওর মাঝে যে চিরযুগের যে বৃদ্ধ রসিক পুরুষটী বসে রয়েছেন, তিনি যে কোন দিকে আমাদের ইঙ্গিত করছেন, তা কি আমরা বুঝতে পারি? মায়ের গর্ব্ব আছে, তিনি সন্তানের নাড়ীনক্ষত্র পর্য্যন্ত জানেন; কিন্তু ওই গম্ভীরবেদী পুরুষের ভাষা কি মায়ের কানে প্রবেশ করেছে? ওই পুরুষটার মর্ম্ম যে না বুঝেছে, সে কি করে বুঝবে কোন্ ভাষায় তিনি কথা কইছেন? আমরা তো জানি না যে, শিশু মন অন্তরের নিভৃত গুহায়ও সচেতন,—পূর্ণমাত্রায় সচেতন; শক্তি থাকলে সেখানেও স্পন্দন তোলা যায়।

এই শক্তি যারা পায়, তারা যে কি করে তার পরিচালনা করে, তার কোনও আইন কানুন বলে দিতে পারে না। হৃদয়ের এমন একটী গভীর অনুভূতির স্থান আছে, যেখান থেকে কর্ম্ম করা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ হয়ে উঠে, অথচ তার সঙ্কেতটী ঠিক দরদী না হলে কেউ বুঝতে

পারে না। হৃদয়ের এই সহজ সুরটী যখন বাইরের কর্ম্মে অভিব্যক্ত হয়ে উঠে, তখন সেই কর্ম্মের বহিঃপ্রকাশকেই সাধারণ মানুষ নানা আইন কানুনের জালে ধরতে চায়—তারা মনে করে, আইনটা পাকা হলেই কাজটা পাকা হবে। এমনি করেই নীতির সৃষ্টি হয়। নীতির প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু যদি অন্তরের রসের সঙ্গে তার যোগ না থাকে, প্রত্যেক সাধক যদি তার রসানুভূতি থেকে নীতিকে নূতন করে সৃষ্টি করতে না পারে, তবে সে যে চিরকাল পথের জঞ্জাল হয়েই থাকে। তাই বলি, আধফোটা হৃদয়ের গোপন ভাষা কি করে বুঝব, কি করেই বা পূর্ণ হৃদয়ের ছোঁয়াচ দিয়ে অপূর্ণকে ফুটিয়ে তুলব, তার কোনও একটা বাঁধা-ধরা নীতি আবিষ্কার করা শক্ত। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, বাইরের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্তরের মাঝে ডুবে যাও, মজে যাও- তারপর বিপুল পুলকে আপনার মর্ম্মস্থান হতে আপনাকে উৎসারিত করবার চেষ্টা কর—কাকে দিচ্ছ কি দিচ্ছ, কিছুরই খেয়াল রেখো না—কোনও সঙ্কল্পের সঙ্কীর্ণতায় নিজকে আড়ষ্ট করোনা--দেখবে তোমার হৃদয়ের সুরের কাঁপনে চারদিকের হাজার বীণার তারে কাঁপন তুলেছে—সকলে মিলে মিশে এক অপরূপ ঝঙ্কার উঠেছে—কচি প্রাণের প্রদীপে বিশ্বনাথের আরতি সুরু হয়ে গিয়েছে।

বাস্তবিক, সত্যকার কোন কাজ করতে গেলে প্ল্যান বর্জ্জন করে চলাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। আমরা এ করব, তা করব— এমনিতর মতলব নিয়ে থাকলে স্বভাব কিছুতেই ফুটতে চায় না যেন। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটাই আগাগোড়া প্ল্যানের ঠাস-বুননি মাত্র; ওতে প্রাণ জাগবে কি, বুদ্ধি আর মতলবের চাপে তার সবটুকু রস একেবারে নিঙ্‌ড়ে বেরিয়ে যায়। তাই দিনের পর দিন আমরা কেবল কতকগুলো টেঁসো মানুষেরই সৃষ্টি করে চলেছি, যাদের স্বভাবের কোনও একটা দিকই যথার্থরূপে ফোটেনা। অপরাবিদ্যার যতরকম ট্রেণিং-ই দাও না কেন, বিদ্যার বোঝা নামে আর দমে যত ভারী হয়েই উঠুক না কেন— মতলববাজীটুকু যে পর্যান্ত নাকি দূর না হচ্ছে, সে পর্য্যান্ত এই শিক্ষার ফলে কেবল বিদ্রোহেরই সৃষ্টি হতে থাকবে; অর্থাৎ আমাদের মতলবে আমরা এক রকম গড়ব, আর প্রকৃতি তাঁর মতলব অনুযায়ী সেটাকে ভাঙ্গবেন। এমনি ভাঙ্গা গড়া চল্‌ছে বটে, তার শেষ হবে কবে, তা কে জানে? তবে কিনা আমাদের মাঝেও যখন প্রকৃতি একটা শুভবুদ্ধির বীজ রেখে গিয়েছেন, তখন তাকে ধরে কেন এই যুগান্তরব্যাপী ভাঙ্গা-গড়ার বিরক্তি হতে আত্মরক্ষা করি না?

এই দেশের আগা-গোড়া ইতিহাসটী যখন মনে হয়, তখন দেখি, মানুষের মাঝে যে সহজ ভাবটী রয়েছে, সেইটীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই যেন ভগবান এখানে বিশেষ করে আয়োজন করেছেন। তাই দেখেছি, বাইরের জগতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভার বইতে এ দেশ চিরদিনই নারাজ। তার দরুণ তাকে সইতে হয়েছে অনেক, কিন্তু তবুও তো তার এই বদ্‌-স্বভাবটা গেল না। জগৎপিতার বিদ্যালয়ে সে যে চিরকাল এই পাঠই পেয়ে এসেছে যে, নিজকে তুমি তোমার সত্য স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত রাখ, তোমার যোগক্ষেমের ভার মহাশক্তিই বইবেন। এই সত্য এ দেশের জীবনের নিয়ামক, শিক্ষার ধারা। একে আবৃক্ত-

করে পলিটিক্স, আর সোশ্যিয়োলজি আর ইকনমিক্সের জৌলুষ যতই জাহির করি না কেন, এখানে তা টিকবে না। মানুষের বাইরটা সাজিয়ে গুছিয়ে তোলবার চেষ্টাকে শিক্ষা নাম দিয়ে, তার আড়ম্বরটা যতই জাঁকালো করে তোলা হচ্ছে, ততই আমাদের যেন তাক লেগে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগী মনটা অনবরত হাঁকছে—"ততঃ কিম্?" তার কণ্ঠকে তো কিছুতেই নিষ্পেষিত করতে পারছি না।

শিক্ষার মন্দিরে একটা গৃহস্থালী পাতবার সত্য সত্যই প্রয়োজন আছে। শিক্ষার কারখানা চাই না—তার মাঝে আছে কেবল কামনার লৌহচক্রের ঘর্ঘর রব। যে হৃদয় নিঃশব্দে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে চায়, সে তো সেখানে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না। মানুষের হৃদয়কে যদি জীবনের গূঢ়তম সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে তারপর তাকে সৃষ্টির অধিকার দেওয়া যায়, তাহলে সে মতলববাজীর কারখানা সৃষ্টি করবে না—সে গড়বে তপোবন—এ কথা জোর করেই বলা যায়। আর সরল ভাবে সহজ ভাবে যে আপনাকে দিতে পারবে, শিক্ষা দিবার অধিকার তারই সত্য। সে স্বয়ং প্রাণময়—তাই প্রাণ হতে প্রাণকে সে সঞ্চারিত করতে জানে। এর জন্যই শিক্ষার কারখানাঘরের স্থানে আমরা চাই একটী সরল গৃহস্থালী—যার প্রতি অণু-পরমাণুটীতে পর্য্যন্ত মানুষের হৃদপিণ্ডের স্পন্দনটী শোনা যায়। এই গৃহস্থালী আপনার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি হতেই গতি-বেগ সঞ্চয় করবে, তাই তার সৃষ্টি হবে আনন্দের সৃষ্টি। তার আনন্দের কাছে বহির্জগতের অভাবের তাড়না এত ছোট হয়ে যাবে যে, মানুষের প্রয়োজনের যথার্থ স্বরূপটী তখন আমরা দেখতে পাব। তখন আমরা বুঝব, বাইরের অভাব মানুষের কত অল্প, অথচ ভালবাসবার, আনন্দ করবার ক্ষমতা তার কত অসীম। সরল জীবনের সহজ কর্ত্তব্যগুলি অম্লানচিত্তে সমাপন করে মানুষ যদি আনন্দকে ঠাঁই দেবার মত প্রসার হৃদয়ে রাখতে পারে, তবে তার চেয়ে আর শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

এই গৃহস্থালীর বিরুদ্ধে তর্ক উঠবে জানি। বাইরের কোলাহলটা দিন দিন যেমন উদ্দাম হয়ে উঠছে আর তার হুজুগে আমাদের হালকা প্রাণও যেমন নেচে উঠেছে, তাতে সহজ কথা বলে তর্কের দায় হতে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। কিন্তু এতটা তর্ক না থেকে মানুষের মাঝে যদি সহৃদয়তা থাকত—সহজ কথাটা মানুষ যদি সরল ভাবে বুঝবার চেষ্টা করত!

প্রশ্ন হবে, সরল গৃহস্থালীর উপর যদি শিক্ষার বনিয়াদ গড়ে তুলতে চাও, তবে কি বাইরের জগৎটাকে একেবারে বর্জ্জন করে চলবে? এ কথার উত্তর দিতে হলে অনেক কথাই ভাবতে হবে। প্রথমতঃ, বাইরটাকে একেবারে বর্জ্জন করবার কথা তো হতেই পারে না। কালের প্রভাব একটা আছেই—তাকে লঙ্ঘন করে চলার সাধ্য কারু নাই। কিন্তু তা বলে কালের স্রোতে যে সকলকেই গা ভাসিয়ে দিতে হবে, এমন কথাটাও মানতে প্রস্তুত নই। এই যে যুগপ্রভাব বলে একটা প্রচণ্ড শক্তি দশের ইচ্ছার মাঝে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এটাকে আমাদের সমস্যারূপেই গ্রহণ করতে হবে। কালের এই প্রকাশই যে সত্যের সমগ্র প্রকাশ, তা কি করে মানব? সুতরাং এর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিদ্রোহিতাচরণ না করলেও

সন্ধি করবার পূর্ব্বে একবার অন্তরের মাঝে ডুবে গিয়ে দেখতে হবে, যে শাশ্বত সত্য আমাদের মাঝে নিহিত, এই সন্ধিতে তার কোনও অমর্য্যাদা হচ্ছে কি না। বাইরকে আমাদের মানা এই পর্য্যন্তই।

কেউ বলবেন, এতে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে অনেক। বাইরের জগতে যে বিচিত্র কর্ম্মের প্রেরণা চলছে, তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে থাকা কি নিজকে অর্দ্ধমৃত করে রাখা নয়? বাইরে যাঁরা মেতে রয়েছেন, তাঁরা এমন কথা বলতে পারেন বটে। কিন্তু কথা এই যে, সবাই সব জিনিষের দিকে হাত বাড়াতে পারে না—আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের খর্ব্ব করতেই হয়, কেননা তার শক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই বাইরের সমস্তটুকু সুবিধা পাওয়া যখন এখনো আমাদের দেশে সহজ হয়ে ওঠেনি, তখন ওই প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে উদ্বাহু হয়ে থেকে লাভ কি?—অবশ্য ও ফলটাকে প্রাপণীয় বলে ধরে নিয়েই এ কথা বলছি। কাজেই, যে চেষ্টায় সত্য কম অথচ চটক বেশী, তার মোহ হতে আত্ম রক্ষা করে, অন্তরের দিকে ফিরলেই আমাদের মঙ্গল।

তার পর আদৌই বাইরটাকে এত বড় বলে মান করব কিনা, সে-ও সন্দেহ। বর্ত্তমান বহির্ম্মুখী সভ্যতার চরম পরীক্ষা এখনও হয়নি—আর প্রাচীন ভারতের সরল প্রাণটা এখনও মরেনি। এ দুয়ের মাঝে কে যে টিঁকবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু দেখেছি, প্রাচীন ভারতের বিরুদ্ধে যারা রায় দেয় তারা তার প্রাণের স্বরূপটা মোটেই বুঝতে পারে না; অথচ এই প্রাচীনপন্থীদের মাঝে এমন পুরুষও মিলে, যাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি বর্ত্তমানের মর্ম্মস্থলটা পর্য্যন্ত বিদ্ধ করে দেখতে জানে। মানব কার কথা? যিনি দুটোই দেখেছেন তাঁর কথা, না একদেশদর্শী সমালোচকের কথা?

তবে কিনা শেষ পর্য্যন্ত কথাটা হচ্ছে আদর্শ নিয়ে। এই যে সরল জীবনে ব্রহ্মবিদের ছায়া ফুটিয়ে তুলবার শিক্ষা—এ কেবল মুষ্টিমেয় কয়জনার ভাগ্যেই এখন ঘটতে পারে। তবে কালে কি হবে, তা বলা যায় না। একদিন যখন এই শিক্ষারই জোয়ার বয়ে গিয়েছে এ দেশে, তখন তো মানুষের জীবন দুঃখে কাটেনি, ধন-কনক-সমৃদ্ধির অভাবও ঘটেনি। মানুষ আবার সেই সরল জীবনে ফিরে যাবে কিনা, তা স্পর্দ্ধা করে এখনো বলা যায় না। কিন্তু তবু একথাটা জোর করেই বলা যায় যে, বহির্জগতের মত্ততা মানবজীবনের অভিব্যক্তির নিম্নস্তর—মানুষ যতই উঁচুতে উঠবে, ততই সে তার বাইরের অলঙ্কারগুলি বর্জ্জন করে চলবেই। সার্ব্বভৌমভাবে এ না ঘটতে পারে, কেন না গাছের সবগুলি ফল যেমন একসঙ্গে পাকে না, তেমনি সব মানুষই একসঙ্গে অভিব্যক্তির চরমে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু দেশের প্রাণে যে সত্যের অভাব হয়নি, তারি প্রমাণস্বরূপ এমন কতকগুলি মহৎ জীবনের সৃষ্টি এ দেশে হবে, যাদের মাঝে নিখিল মানবের আদর্শটা ফুটে উঠবে।

এই ঘরছাড়া ফকীরদের জয়গানই আমরা করব। যে সরলতার মাঝে তাঁরা অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন, তা আমাদের চির-বরেণ্য হয়ে রইবে। তাঁরা যে কল্যাণকর শিক্ষা আমাদের দিবেন, তাই আমাদের চোখের সামনে চিরন্তন আদর্শরূপে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বর্ত্তমানের প্রভাব যদি কাটিয়ে না-ও উঠতে পারি, তবুও আমাদের বহুমুখী বহিঃশিক্ষার মাঝে সেই দিব্য শিক্ষার দিব্য জ্যোতিঃ পুণ্য আশীর্ব্বাদের মত ছড়িয়ে পড়বে —কম্পাসের কাঁটার মত আমাদের চিত্তটা তার দিকেই ফিরে রইবে!—এইটুকু যদি হয়, তাই যথেষ্ট।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

—*—

(অভিধেয় সাধনভক্তিতত্ত্ব—ভক্তের লক্ষণ)

ভক্তের লক্ষণ

ভক্তির মূল শ্রদ্ধার কথা বলা হইয়াছে। এখন অধিকারভেদে ভক্তের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

—সর্ব্বভূতে যিনি আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং আত্মরূপ ভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম।

এই হইল প্রকৃত দর্শন। সংসারীর চোখে আমরা বিকারগুলিই কেবল দেখিতে পাই—যে মূল বস্তু হইতে সকলের উদ্ভব, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। নিরন্তর ভক্তির অনুশীলনে দৃষ্টির যখন পরিপাক ঘটে, তখন ভক্তের চোখে এই জগতের রূপ বদলাইয়া যায়। আঁখি মুদিয়া এত দিন ধরিয়া যাঁহার সন্ধানে হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে ভক্ত আঁতি-পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছেন, আজ তিনি আসিয়া যখন হৃদয় আলো করিয়া দাঁড়াইলেন—তখন আপনা হইতেই দৃষ্টির দুয়ার খুলিয়া গেল, ভক্ত দেখিলেন, যাঁহাকে তিনি ভালবাসেন, তাঁহারই রূপে যে এ জগৎ আলো! তাঁহাকে তিনি যে প্রাণ উঘারিয়া ভালবাসেন—তাই জগৎকেও যে না ভালবাসিয়া পারেন না। এ তো কেবল চর্ম্মচক্ষে দেখা জগতের রূপ নয়—এ যে মর্ম্মচক্ষে ফুটিয়া-ওঠা চির-রসিকের রসবিভূতি।

ও গো তুমি আঁখি দিয়াছ রূপের পিপাসা মিটাইবার জন্য—কিন্তু এতদিন তো তাহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাই নাই। আজ যখন সেই আঁখিতে তোমার আলো আসিয়া পড়িল, তখনই দেখিলাম, হাঁ৷ সুন্দর তো তুমি বটে! এই যে রূপের পসরা এ জগৎ পোড়া আঁখিতে এর কতটুকু রূপ ধরিয়াছিল? তখন দেখিতাম আর নিমিষে সে দেখার শেষ হইয়া যাইত, চিত্তের হাহাকার তো দূর হইত না। কিন্তু আজ দেখি সে দেখার আর শেষ নাই—এ যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া দেখা—যেন প্রতি লোমকূপে আজ অযুত চক্ষু ফুটিয়া উঠিয়াছে—দেখিতে দেখিতে বিপুল পুলকহিল্লোলে সকল দেখা একাকার হইয়া গেল—ভুলিয়া গেলাম কে দেখে আর কাহাকে দেখে—অন্তরে বাহিরে তুমি—বাহিরেও বাহিরে তুমি কাচের স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া সমস্ত জগতে তোমার আলো ছড়াইয়া পড়িল—আমি দেখিলাম, ডুবিলাম, মজিলাম!

এই দিব্য দর্শনের অঞ্জন চোখে মাখিয়া সহজ মানুষ হইয়া যিনি জগতে বিচরণ করেন, তিনি দেখেন, কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত একরস—আবার পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সেই একরস। বিশ্লেষণে যে আনন্দের বিভূতি, সংশ্লেষণেও সেই আনন্দের সংহতি। অনুভূতির প্রকার এই,—আমি আমাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি ভালবাসি আমার প্রাণের

ঠাকুরকে, তেমনি ভালবাসি তাঁর এই আমি-দিয়া গড়া লীলার জগৎকে। এক তিনে এক, একে তিন। এই দর্শনের অধিকার যিনি পাইয়াছেন, তিনিই ভাগবতোত্তম।

কিন্তু এমন সর্ব্বসমঞ্জসা একরসা দৃষ্টি বহু ভাগ্যে মিলে। সাধনার স্তর আছে; নিম্ন স্তরে ভেদবুদ্ধি ক্রমেই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। মধ্যম অধিকারীর লক্ষণ এই—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

—যিনি ভগবানে প্রেম, তাঁহার অধীন ভক্তে মৈত্রী, তাঁহার প্রতি উদাসীন জনে কৃপা এবং তাঁহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ জনে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি মধ্যম ভাগবত।

এখানে দেখিতেছি, চিত্ত ব্যাবৃত্তির মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এখনও দর্শন পরিপক্ক হয় নাই, তাই ভেদবুদ্ধি দূর হয় নাই। ইষ্ট বস্তুতে অনুরাগ ও অনিষ্ট বস্তুতে বিরাগ—ইহাই হইল প্রাকৃত চিত্তের লক্ষণ; আর ইষ্টানিষ্টভেদহীন সামঞ্জস্য হইল বৃত্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণাম। মধ্যম অধিকারীতে এই দুয়েরই অসদ্ভাব। ভগবান তাঁহার ইষ্ট, সুতরাং তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে; কিন্তু তাই বলিয়া ভগবদ্দ্বেষীতে তাঁহার দ্বেষ নাই—চিত্তকে প্রেমানুকূল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য আত্মসংযমন দ্বারা দ্বেষ হইতে চিত্তকে তিনি নিগৃহীত রাখিয়াছেন। তাই ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি তাঁহার দ্বেষ না থাকিলেও তিনি তাহাকে এতদূর আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, যাহাতে অনিষ্টেও ইষ্ট দর্শন করা তাঁহার সম্ভব হয়। এই জন্যই দ্বেষীর প্রতি তাঁহার চিত্ত উদাসীন।

এই অনুরাগ ও ঔদাসীন্যের মাঝে আশ্রয়ানুকূলে নানা বৃত্তির স্ফুরণ হইতেছে। ভক্তের প্রতি মৈত্রী এবং অনভিজ্ঞের প্রতি কৃপা, উভয়েই সূচিত হইতেছে, ভক্ত ভগবানে যে কি মধু, তাহার কথঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছেন; তাই আত্মহৃদয়ের সমবেদনা দিয়া অপরের চিত্তকে বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার জন্মিয়াছে। কিন্তু তথাপি ভেদজ্ঞান এই স্তরে ঘুচে নাই।

অধম ভাগবত যিনি, তাঁহার চিত্ত আরও অব্যবস্থিত। তাঁহার লক্ষণ বলা হইতেছে—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

—যিনি লোকপরম্পরাগত শ্রদ্ধা দ্বারা প্রতিমাতে ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তে কিম্বা অপরে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে জানেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।

যে যাহার ধ্যান করে, সে তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অহর্নিশ শ্রীভগবানে যিনি চিত্ত সমাধান করিয়াছেন, ভগবানের গুণ ও শক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (৫, ১৮, ১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

—শ্রীভগবানে যাহার অকিঞ্চন ভক্তি রহিয়াছে, সমস্ত গুণ সহ দেবতারা তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। আর যাহার চিত্ত ভগবানে সমাহিত না থাকিয়া কেবল বাহিরে

ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এমন অভক্তের মাঝে মহৎ গুণ থাকিবে কি করিয়া ?

ভক্তে যে সমস্ত গুণের প্রকাশ হয়, তাহা বিস্তার করিয়া বলা যায় না। তবে দিগ্‌দর্শন স্বরূপ তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করা যায়। মহাজনেরা বলিতেছেন, ভক্ত

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

ভগবৎ প্রসাদাৎ যে চিত্তের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহাতে এই সমস্ত গুণ সহজেই বিকশিত হইবে। এই গুণের প্রত্যেকটী ভগবানের করুণার অভিব্যক্তি।

ভক্ত কৃপালু অর্থাৎ পরের দুঃখ তাঁহার সহ্য হয় না। যে ভালবাসিতে না জানে, এবং ভালবাসিয়া দুঃখ পাইতে না জানে, সে কখনও সমবেদনা কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারে না। সাধনায় প্রবৃত্ত হই, দুঃখের তাড়নায়; আপনার দুঃখ দূর করিব, এই থাকে তখনকার পণ। তার পর সাধনায় চিত্ত উদার হইতে থাকে, দুঃখের নিমিত্ত ধারণা তাহার উচ্ছেদ হইতে থাকে, অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাসে বুক কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু তবুও তো ব্যথার অবসান হয় না। তখন দেখি, একা আমার দুঃখ দূর হইয়া জগতের দুঃখ যে আমার বুকে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। ভক্ত তখন বুঝিতে পারেন, আনন্দ দিয়া ভগবান এ জগৎ গড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে অশ্রুনির্ঝর লুকাইয়া রহিয়াছে, ভালবাসিতে না জানিলে কে তাহা বুঝিতে পারে? ভক্ত ভালবাসেন, তাই তাঁহার ব্যথার অন্ত নাই, মমতার অন্ত নাই—তাই তিনি কৃপালু।

ভক্ত অকৃতদ্রোহ। জগৎকে যিনি ভগবানের বিকাশ বলিয়া জানেন এবং সেই ভগবানে যিনি আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি যে আপনার মতই সকলকে ভালবাসেন—তিনি আবার অনিষ্ট চিন্তা করিবেন কাহার ?

ভক্ত সত্যসার, অর্থাৎ সত্যই তাঁহার বল। ভক্ত-চিত্তের প্রতিষ্ঠা অবিনাশী পরম বস্তুতে। সুতরাং বিকারের বিক্ষোভে তাঁহার বীর্য্য কখনও উদ্বেলিত হয় না—তাই সত্যই তাঁহার শক্তি, সত্যেই তাঁহার অচল প্রতিষ্ঠা।

ভক্ত সম অর্থাৎ সুখে তাঁহার হর্ষ নাই, দুঃখেও তাঁহার বিষাদ নাই। সুখ-দুঃখ হর্ষ বিষাদ, এগুলি কামনা রাজ্যের কথা—ভেদবুদ্ধি যেখানে, ক্ষুদ্র দৃষ্টি যেখানে, সেখানেই সুখ দুঃখ থাকিতে পারে। কিন্তু ভক্ত আনন্দ সাগরের গভীর জলে সঞ্চরণ করেন, সুখ দুঃখের বীচিভঙ্গ তাঁহাকে বিচলিত করিবে কি করিয়া ?

ভক্ত নির্দ্দোষ অর্থাৎ অসূয়া প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিতে তাঁহার চিত্ত কখনও মলিন হয় না। অনিত্য বস্তুর সংসর্গ হেতু যাহার চিত্তে উপরাগ উপস্থিত হইতে পারে, দোষ তাহার পক্ষেই সম্ভব। ভক্তের স্ফটিকবৎ শুদ্ধ নির্ম্মল চিত্তে দোষের কালিমা স্পর্শ করিবে কি করিয়া ?

ভক্ত বদান্য অর্থাৎ দাতা। আমার বলিয়া অভিমান করিবার যাঁহার কিছু নাই; তিনি সঞ্চয় করিবেন কাহার জন্য ? তা ছাড়া ভক্ত যে আনন্দের অধিকার পাইয়াছেন, তাহা তো সঞ্চয় করিবার বস্তু নয়; এ বস্তু যে পায়, সেই যে বিলাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া

উঠে। এ তো একা কাহারও ধন নহে—এ ধন যে জগতের—এ ধন যে ভগবানের। ভগবান স্বয়ং এ আনন্দের পসরা অহর্নিশ বিলাইয়া চলিয়াছেন, তবে আর ভক্ত কৃপণতা করিবেন কেমনে?

ভক্ত মৃদু অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত অকঠিন। তত্ত্ববিচার করিয়া তিনি জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই, ভালবাসিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়াছেন। তাই এখানকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটটার জন্যও তাঁহার মমতার অন্ত নাই। তাঁহার চিত্ত কঠিন হইবে কি করিয়া?

ভক্ত শুচি অর্থাৎ সদাচার। চিত্ত যত ক্ষণ কলুষ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আচারে শৌচ সম্ভব হয় না। কিন্তু চিত্ত নির্ম্মল হইয়া গেলে আর কখনও বেতালে পা পড়ে না। তাই ভক্তের আচারও নির্দ্দোষ।

ভক্ত অকিঞ্চন। তাঁহার আর চাহিবার কি আছে? যাহা চাহিবার ছিল, তাহা তো পাইয়াছেনই। ইহাকে পাইবার জন্যই তাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য, পাইয়াও বৈরাগ্য। তাই তিনি পূর্ব্বাপর অকিঞ্চন।

ভক্ত সর্ব্বোপকারক। যে আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহা কর্ম্মে রূপ পাইতে চাহে,—যেমন ভগবানের আনন্দ এই জগতের কর্ম্মে রূপ পাইয়াছে। তাই সবার জন্য খাটিয়া সকলকে আনন্দের অধিকার দিয়াই ভক্ত তৃপ্ত। তাঁহার কৃত উপকার জীবের চরম উপকার।

ভক্ত শান্ত। বাসনা যাঁহার চিত্তে স্থান পায় নাই, তিনি বিক্ষুব্ধ হইবেন কিসে? আবার ভক্তের আনন্দও আলোকের স্নিগ্ধ প্রকাশের মত সমুজ্জ্বল, তাহার মাঝে চঞ্চল ভাব লেশ মাত্র নাই। তাই ভক্ত অন্তরে বাহিরে শান্ত, অচঞ্চল।

ভক্ত কৃষ্ণৈকশরণ। ভগবান্ ছাড়া তাঁহার আর কি ই বা আছে—আর কিছুই বা থাকিবে?

ভক্ত অকাম। যিনি শ্রীভগবানকেই একমাত্র শরণ বলিয়া জানিয়াছেন—আমার বলিয়া যে অভিমান, তাহার সবটুকু যিনি ওই বাঞ্ছিত চরণে বিলাইয়া দিয়াছেন, তিনি কামনা করিবেন কি? তাঁহার নিজের সুখের জন্য তো কিছুই আর চাহিবার নাই।

ভক্ত নিরীহ অর্থাৎ তাঁহার কোনও ঈহা বা দৃষ্টক্রিয়ার চেষ্টা নাই। ভক্তের মাঝে কর্তৃত্বের অভিমান নাই—নিজকে তিনি ভগবানের লীলার রঙ্গভূমি করিয়া দিয়াছেন। এই রঙ্গমঞ্চে সেই নটবরের নাট্যলীলাই ফুটিয়া উঠিবে—যাহা করিবার, তাহা তিনিই করাইবেন। ভক্তের অভিমান কোথায় যে তিনি কর্তৃত্বের জন্য চেষ্টিত হইবেন?

ভক্ত স্থির অর্থাৎ স্বধর্ম্মে তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। চিত্ত যদি বহির্ম্মুখী কিম্বা সঙ্কীর্ণ থাকে, বা কোনও বাসনা কামনার বীজ যদি অন্তরে গোপন থাকে, তবে সাধকের ইষ্টনিষ্ঠা জন্মিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত যখন আপনাকে সমর্পণ করেন, তখন তো আর কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া সমর্পণ করেন না। সুতরাং তাঁহার চিত্তে বিক্ষোভ জাগাইবার জন্য এমন কোনও নিমিত্ত অবশিষ্ট থাকে না, যাহাতে তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে?

ভক্ত বিজিত-ষড়-গুণ অর্থাৎ ক্ষুৎ-পিপাসা, শোক মোহ, জরা মৃত্যু—এই ছয়টা গুণ তিনি নির্জ্জিত করিয়াছেন। তিনি দৈহিক বিকারের বশীভূত নহেন, তাই ক্ষুৎপিপাসার পীড়ন তাঁহার স্বাভাবিকতা নষ্ট করিতে পারে না। তেমনি তিনি শোক-মোহরূপ চিত্তবিকারও জয় করিয়াছেন। এমন কি দেহাত্মাভিমানের

নিদর্শন স্বরূপ যে প্রাকৃত জরা-মৃত্যুর বিকার, তাহাও ভক্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভক্ত নিত্য-তৃপ্ত, নিত্য-চেতন, নিত্য স্বরূপ।

ভক্ত মিতভুক্। সাধনার ইহা স্বাভাবিক ফল। লীলার সহায়কল্পে তাঁহার দেহ ধারণ, তাই প্রাকৃত অশনা-পিপাসা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না।

ভক্ত অপ্রমত্ত। তিনি যন্ত্র, ভগবান্ যন্ত্রী—এর মাঝে স্বাতন্ত্র্যাভিমানের স্থান তো নাই কোথাও! কাজেই ভক্তের আচরণে প্রমাদ আসিবে কোথা হইতে? যে ছেলে বাপের হাত ধরিয়া আলের পথে হাঁটে, তার কখনও পা ফস্কায় না।

ভক্ত মানদ। অভিমান থাকিলেই ছোট বড়র হিসাব আসে। কিন্তু ভক্ত নিরভিমান, তাই কোনও বস্তুকে তিনি ছোট করিয়া দেখিতে জানেন না। তাঁহার কাছে সকলই যে ভগবানের লীলাবিভূতি—কাজেই সকলেই আনন্দের প্রস্রবণ, সকলেই বড়—সকলেই মানী।

অথচ ভক্ত স্বয়ং অমানী। তাঁহার মাঝে কি-ই বা তিনি আমার বলিয়া রাখিয়াছেন যে তাহা লইয়া তাঁহার মান-অভিমান জাগিবে। তিনি যে সকল অভিমান গলাইয়া জল হইয়া গিয়াছেন।

ভক্ত গম্ভীর অর্থাৎ নির্বিকার। কথায় বলে, "অগাধ জলসঞ্চারী বিকারী নৈব রোহিতঃ।" ভক্ত যেমন ভাবুক, তেমনি তত্ত্বদ্রষ্টা—তাই ভাবকে তিনি আয়ত্ত করিতে জানেন। তাঁহার আধার এত ক্ষুদ্র নয় যে, গণ্ডূষমাত্র ভাবেই ছলকিয়া পড়িবে।

ভক্ত করুণ অর্থাৎ দয়া করিয়া তিনি সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তেমনি তিনি মৈত্র অর্থাৎ অচঞ্চল। তিনি ভগবানের স্বভাব পাইয়াছেন, কাজেই তাঁহার ভাণ্ডারে তো সঞ্চয় করিবার কিছুই থাকে না। তাই তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া কেহ কোন দিন বঞ্চিত হয় না।

ভক্ত কবি অর্থাৎ সম্যকদর্শী। যেমন না ভালবাসিলে জানা যায় না, তেমন না জানিলেও ভালবাসা যায় না। ভক্ত এমন করিয়া ভগবানকে পাইয়াছেন, তাই তাহার ভালবাসার আলোকে জগৎ আলো হইয়া গিয়াছে। কোন তত্ত্ব আর তাঁহার অজ্ঞাত থাকিবে?

ভক্ত দক্ষ। জ্ঞান-প্রেমের স্ফূর্ত্তি যাহার মাঝে হইয়াছে, শক্তি তাঁহার মাঝে জাগিবেই। এই ভগবচ্ছক্তির প্রেরণাতেই ভক্ত কার্য্য-কুশল।

ভক্ত মৌনী অর্থাৎ মননশীল। কর্ম্মের মাঝেও তাঁহার মননের বিরাম নাই—যেমন
"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যেষা নবসঙ্গরসায়নম্॥"

পথের সঙ্কেত

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিত্তের বাঁধনগুলি আলগা করিয়া দেওয়ার কথাই হইতেছিল। এর জন্য বৈরাগ্যের অনুশীলন চাই, সংসারের প্রতি মমতাশূন্য হইতে হইবে, অথচ আনন্দের সঙ্গে তাহার কর্ত্তব্য সমাপন করিতে হইবে। ভালবাসার যে সুখ, এই আনন্দ হইতেই তাহা মিলিবে। একটা বস্তু ঠিক যা, তাহাকে তাই জানিয়া যদি তাহাকে আদর কর, সোহাগও কর, তবে তাহাতে বন্ধনের কারণ কিছু ঘটে না। একটী সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া কাহার না আদর করিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু ফুলটী যতই ভালবাসি না কেন, মনে মনে এটুকুও জানি, কাল এ শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে। চিরকাল সে আমাদের নয়নের তৃপ্তিকর হইয়া বাঁচিয়া থাকুক, এমন ছেলে-মানুষী আবদার আমরা করি না। এ ক্ষেত্রে ফুলটী যে আমার ভাল লাগিল, তাহাতে আমাকে কি দোষ স্পর্শ করিল? এ ভালবাসার মাঝে তো মোহ নাই; এর মাঝে আছে কেবল নির্ব্বাবিল আনন্দ।

সংসারকেও ঠিক এমনি করিয়া ভাল-বাসিতে হইবে। আনন্দময়ীর সন্তান আমরা, নিরানন্দে মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া থাকিব কিসের জন্য? জগতে যে কোনও কার্য্যভারই আসুক না কেন, তার জন্য ভাবনা কেন? আমার মনমত করিয়া সব জিনিষই গড়িয়া তুলিবার মিথ্যা প্রয়াস কেন? ছেলেবেলায় যখন খেলা ধুলা করিয়াছি, তখন তাহার মাঝে কত মান-অভিমানের অভিনয় হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তবু এ যে খেলা, মনেপ্রাণে এইটুকু বুঝিতাম বলিয়াই বুকের মাঝে কোথায়ও কিছু বিঁধিয়া থাকিত না - হার জিৎ দুয়ের মাঝেই আনন্দ থাকিত। এখন না হয় বড় হইয়া তার চেয়ে একটা বড় রকমের খেলা পাতিয়া বসিয়াছি—সুতরাং ইহার মাঝে আনন্দ ছাড়া কি আছে? সংসারকে এই ভাবে গ্রহণ করিলে তাহার কর্ত্তব্য সাধনে যেমন ত্রুটী ঘটিবে না, তেমনি তোমার স্বভাবেরও কোন বিচ্যুতি হইবে না।

চিত্তের এই যে নিরাসক্ত সদানন্দময় ভাব, এই হইল আপনাকে বিস্তার করিবার উপায়। 'আপনার যথার্থ রূপটীর কোনও আভাস না পাইলে আসক্তি ছাড়া সহজ কথা নয়। আসক্তির সঙ্গে সঙ্গেই থাকে কর্ত্তার অভিমান। ওটা আমার, কাজেই ওর উপর পূর্ণমাত্রায় আমার শক্তি খাটে—এই হইল আসক্তির রূপ। কিন্তু যে জানে, কর্ত্তা সে নয়—সে নিমিত্ত মাত্র, তার তো কোথাও আসক্তি থাকিবে না। কিন্তু এই সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সঙ্গে যাহার মমতার যোগ রহিল না, সে আশ্রয় পাইবে কোথায়? আমার সংসার বলিয়া যখন তাহার কিছুই রহিল না, তখন জগৎ-সংসারই তাহার সংসার। ভগবান কিছু মূলধন দিয়া তাহাকে পাঠাইয়াছেন, এটুকু যেখানে হউক একখানে খাটাইয়া চরমে তাঁহার কাছে হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তো হইল।

এমনি করিয়া সব ছাড়িয়া চল। আজ-কার চিন্তা আর কালকার চিন্তা, এই দুয়ের

মাঝে আবার মমতার যোগ ঘটাও কেন? যা আজ গেল, তা তো ফুরাইয়াই গেল, তবে আবার কালকার কারবারের তাহার জের টানিয়া আনা কেন? অবশ্য বড় বড় কারবার করিতে গেলে অনেক সময় জের টানিয়া আনিতে হয় বটে। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব যখন পর্যন্ত ঘাড়ে পড়ে নাই, .. পর্যন্ত এমনি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় [illegible] রাখ না কেন? ছোট হইতে এমনি দিনের ভাবনা দিন মিটাইয়া রাখিতে শিখিলে, শেষে দেখিবে, বড় হইয়া বড় বড় কারবারেও এই ছোট-বেলার অভ্যাসটাই পাকা হইয়া রহিয়াছে—তখনও অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের গোলকধাঁধার মাঝে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে না। বুদ্ধি যদি স্থির হয়, এই সংসার অভিনয়ের মাঝে তোমার স্থানটী কোথায়, তাহা যদি ঠিক বুঝিতে পার, তাহা হইলে এই নিশ্চিন্ততা নিশ্চয়ই আসিবে, সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিবে, সংসারের এই হট্টগোলের চেয়ে তুমি কত বড়।

আপনাকে বড় বলিয়া জানিতে হইলে, দুইটী চিত্তবৃত্তিতে আঘাত দিতে হইবে—একটী অভিমান আর একটী মমতা। এ দুটী যখন ছোট হইয়া থাকে, তখনই এরা পায়ের বেড়ী, আবার এদেরই সত্ত্বটুকু ধরিয়া আপনাকে বড় করিয়া তোলা যায়। প্রথম অভিমানের কথাই বলি।

ছোট হইয়া কেহ থাকিতে চায় না—জগতে সবাই ভাবে, আমি বড়। কথাটা এক হিসাবে ঠিক। কারণ আমাদের মাঝে যিনি শুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, জগতে তো এমন কিছু নাই, যে তাঁহাকে ছোট করিতে পারে। তাই তাঁহার প্রেরণায় আমাদের সর্ব্বদাই নিজেকে বড় বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু এই বড়, গণ্ডীর মাঝেই বড়। আসলে আমাদের শক্তির একটা সীমা রহিয়াছে—জগতের সবটাই আমাদের আয়ত্তের মাঝে নাই। অথচ যেটুকু আছে, কেবল সেইটুকু ধরিয়াই নিজেকে যে সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া মনে করিতেছি—এর নামই অভিমান। বায়বীয় পদার্থের একটা গুণ আছে, তাহাকে যে আধারের মাঝেই রাখা যাক না কেন, আধার বড় হইলেও সে কোন জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না—সবটা আবার জুড়িয়া আপনাকে ছড়াইয়া রাখে। আমাদের অভিমানও তেমনি। ছোট আধার পাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া রাখিবার কোনও উপায় নাই, যেটুকু আশ্রয় তাহাকে দিবে, তাহার সবটুকুর দখল লইয়া সে জাঁকিয়া বসিবে। তাই দেখা যায়, অভিমানের বেলায় কেউ খাটো নয়। যার শক্তির দৌড় এক কাণাকড়া, তারও অভিমানের বড়াই হয়ত, যার মূল্য এক কাহন, তারও তেমনি। আপন কোটে সবাই রাজা—এই হইল জগতের মজা।

রাজা তো সবাই—কিন্তু কেবল ওইটুকুর রাজা তুমি, এই কথাটাই তো মিথ্যা। জগতে আছে কেবল একচ্ছত্র রাজত্ব। যদি সে অভিমান নিজের মাঝে জাগাইতে পার, তবে সত্যের সন্ধান পাইবে; কিম্বা যদি একেবারে সকল স্বত্বস্বামিত্ব ছাড়িয়া দিয়া ফকীর হইতে পার, তবেও সত্য মিলিবে। আসল কথাটা এই, নিজেকে আধখানার মাঝে আটকাইতে গেলে একটা বিপত্তি ঘটিছে। যদি হিসাব করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তোমার সত্যকার অধিকার কোথাও খাটিতেছে না; অথচ তোমার সর্দ্দারীতে যে কাজ না চলিতেছে, এমনও নয়। এমনতর জায়গায় তোমার শক্তির পরিমাণটাকে

ভুল বোঝা তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ধর, দশজন লোকের উপর তোমার কর্তৃত্ব আছে। তুমি মনে কর, এদের উপর তোমার জোর খাটে—তোমার হুকুম মানিয়া চলিতে এরা বাধ্য। কার্য্যতঃ অনেক সময় তাই দেখা যায় এবং আমাদের অভিমান তাহাতে আরও প্রশ্রয় পায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি এই দশটা মনের একটা মনও বাঁকিয়া বসে, তখন তোমার এমন কোনও সাধ্য আছে কি যে তাহাকে আবার তোমার পথে লওয়াও?—বাস্তবিক সে ক্ষমতা তোমার নাই, অথচ এই দশটা মনের উপর তোমার প্রভুত্ব কম খাটিতেছে না। এটা একটা রহস্য না কি?

পরের মনের কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজের মনের কথা ধর। একথা সহজেই মনে হয়, পরের উপর কর্তৃত্ব করি না হয় পরের মনের সঙ্গে যোগসাজস আছে বলিয়া, তাই ঠেকাঠেকায় কোনও রকম করিয়া কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু আমার নিজের মন তো আমার অধীন। আমার মনের উপর আমার প্রভুত্ব খাটিবে না কেন? খাটে নিশ্চয়; পরের উপর যতখানি জোর খাটে, তোমার নিজের উপর তার চেয়ে বেশী জোরই খাটে। দশজনে দল বাঁধিয়া কাজ করিতেছে—তুমি যেন তার পাণ্ডা। সবার হুকুম তামিল করিত, দৈবাৎ তাহারা যেন বাঁকিয়া বসে, সে ক্ষেত্রে প্রাণের জোরে তুমি একাই দশজনের কাজের ভার মাথায় তুলিয়া লইতে পার বটে। চিত্ত যত শুদ্ধ হইবে, ততই এই কাজটা আরও সহজ হইবে—দেখিবে, নিজের উপর আশ্চর্য্য রকম জোর খাটিতেছে। বাজীকর যেমন ইচ্ছামত তাহার শরীরটাকে দোমড়াইয়া বাঁকাইয়া খেলাইতে পারে, তোমার মনটাকেও তুমি তেমনি করিয়া লীলায়িত করিয়া তুলিতে পার। আত্ম-শক্তির এই প্রকাশও যেমন সত্য, তেমনি তোমার মনটাও যে সম্পূর্ণ তোমার হাতে নাই, এ কথাটাও নিছক সত্য। অন্যদিক হইতে যাহারা প্রথম প্রথম সংসারকে মনটা ফিরায়, তখন তাহাদের মাঝে একটা নূতন শক্তি জাগে; সঙ্গে সঙ্গে একটা মত্ততাও আসে, নিজের উপর শ্রদ্ধা দিনে দিনে অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কিন্তু এইটুকু হইল অসন্তোষের কারসাজি। তোমার মাঝে কি সম্ভব, প্রকৃতি একবার তাহার একটু সন্ধান দিলেন মাত্র; কিন্তু এখনও চাবিটা তোমার হাতে পড়ে নাই। একটুকু উঠিয়াছ, মুহূর্ত্তের মধ্যে তার তাল সামলাইয়া পড়িলেও আটক নাই। হয়ও তাই। এমন করিয়া বার বার উঠিতে-পড়িতে চিত্তের ঝাঁঝটা যখন কমিয়া আসে, তখনই শুদ্ধ চিত্ত শক্তি জাগে। তখন বোঝা যায়—আমার উপর আমার কর্তৃত্বই বা কতটুকু? আমিও তো তাহার হাতেরই খেলার পুত্তলী মাত্র। এমনি করিয়া মনের অভিমানের উপর ঘা পড়ে।

তারপর ধর দেহের অভিমান। নড়িতে চড়িতে পারি, দশটা কাজও হাসিল করিতে পারি—কাজেই দেহের মালিক আমি, এমন অভিমান সবারই আসে। বিশেষতঃ যার মন যত স্থূল, তার দেহের গুমোর তত বেশী। তবে টের পাওয়া যায় না বটে প্রাণের জোর। শিরায় শিরায় তপ্ত রক্তের আগুন—তার কাছে সবাকে যেন সরা বলিয়া মনে হয়। অথচ এই দেহের ভিতর যত কারবার চলিতেছে সম্পূর্ণ তোমার অজ্ঞাতে, কি করিয়া একটা শস্যকণা একটা মানুষের রক্তে পরিণত হয়, তার কোনও খবরই তুমি রাখ না। অথচ এই দেহের দম্ভ তোমার কত। আবার এও দেখিয়াছি, এই দেহের উপর যার অভিমান যত, এর একটুকু কল বিগড়াইলে সেই তত বেসামাল হইয়া পড়ে। অভিমানের সাজা এমনি করিয়াই আমাদের ঘাড়ের উপর চাপিতেছে; কিন্তু তবুও আমাদের চৈতন্য হয় কি?

এই তো দেখিলে, জগৎ জুড়িয়া অভিমানের রূপ। এখানে আপনা হইতেই এই প্রশ্ন জাগে, যে শক্তির বাস্তব সত্তা নাই, তার আস্ফালন আমাদের মাঝে আসে কোথা হইতে? এ জিজ্ঞাসা যদি কাহারও মাঝে জাগে, তবে সেই অভিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিমান আমাদেরই রূপ—কিন্তু সেটা বিকৃত রূপ। বাস্তবের কর্ত্তা যিনি,

তিনি আমাদের মাঝে গুহাহিত হইয়া বসিয়াছেন; তিনি যেমন এই দেহভাণ্ডের কর্ত্তা, তেমনি যুগপৎ এই ব্রহ্মাণ্ডেরও কর্ত্তা। লীলার সূত্রে এই দেহভাণ্ডটী ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গেই গাঁথা রহিয়াছে। প্রকৃত কর্ত্তা যিনি, তাঁর কর্ত্তৃত্বে কোনও চাঞ্চল্য নাই, কেননা জগতের রূপও তিনি, রসও তিনি, শক্তিও তিনি। কাজেই তার শক্তিকে বলিতে পারা যায়, সত্তার শক্তি, প্রকাশের শক্তি, আনন্দের শক্তি। কিন্তু এই তিনটীতেই আবার এক অখণ্ড বস্তু। এই বস্তুই তোমার আমার ভিতর দিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া দেখা দিতেছেন এবং সেই খণ্ডে খণ্ডে অজ্ঞান ও বিবোধের সৃষ্টি হইতেছে। এই অজ্ঞান ও বিবোধকে আমরা বিকার বলিয়া জানিতে পারি না, কেননা আমরা যে এই দিয়াই গড়া। কিন্তু তিনি ইহাকে বিকার বলিয়াই জানেন অর্থাৎ তিনি আমাদের অজ্ঞানেরও জ্ঞাতা—আমাদের বিবোধেরও সামঞ্জস্য। আমরা ইহা জানিতে পারি না বলিয়া এই অজ্ঞানের ক্রিয়া ও বিবোধের ক্রিয়া আমাদের ব্যবহারে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে; ফলে আমরা অভিমানী।

অভিমানকে দূর করিতে হইলে অন্তর্দর্শী হইতে হইবে। যিনি ভিতরে বসিয়া সব চালাইতেছেন অথচ নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মাঝে আত্মসমর্পণ করা চাই। প্রথমে বিচার কর। বস্তুবিচার করিতে করিতে আপনিই দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে; দেখিবে জগতে এমন একটিও স্থান নাই, যেখানে তুমি তোমার দখল-স্বত্ব প্রমাণ করিতে পার। সব জায়গাতেই দেখিবে, তুমি মালিক নও—তুমি বেদখল করিতে আসিয়াছ মাত্র। যে কর্ত্তা, সে আগে হইতেই ওখানটীতে চুপ করিয়া বসিয়া আছে—তোমার আস্ফালন সে দেখে, কিন্তু কিছু বলে না। এমন ব্যক্তির সঙ্গে তুমি আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কি?

তবে তোমার ঠাঁই হইবে কোথায়? জগৎ জুড়িয়া কোথাও যদি তোমার স্বত্ব সাব্যস্ত না হয়, তবে তোমার এই অহংটীকে লইয়া কি করিবে? প্রথমতঃ এর মোহ দূর করিতে হইবে। পরের বস্তুর উপর যে এর দুর্জ্জয় লোভ রহিয়াছে, সেটুকুই এ আগে ছাড়িয়া দিক দেখি। বাইরে যখন এর ঠাঁই থাকিবে না, তখন কাজেই তাহাকে আবার সেই মূল কর্ত্তাটীর কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে; কেননা তার তো আশ্রয় একটা চাই, ছোট হইলেও যে বিধাতা তাহার পক্ষে মরণের ব্যবস্থা করেন নাই। আত্মসমর্পণ করিয়া এই আশ্রয়টুকু তাহাকে মাগিয়া লইতে হইবে, বলিতে হইবে, "সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া দেখিলাম, সবই তোমার, তোমার চরণ ছাড়া আমার আর দাঁড়াইবার ঠাঁই বাকি নাই। কাজেই বুঝিলাম, আমাকে দিয়া তোমারই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমাকে তুমি গড়িয়াছ। তোমার শক্তি আমাতে ছিল বলিয়াই আমার মাঝে স্পর্দ্ধা জাগিয়াছিল। আজ সে স্পর্দ্ধা ধূলায় লুটাইয়া দিয়া তোমার শক্তি তোমাকেই ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি—আপনাকেও তোমার পায়ে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। কর্ত্তৃত্বের অধিকার আর চাই না—এবার দাও শুধু সেবার অধিকার, আনন্দের অধিকার।"

তিনি দিবেন,—আপনাকে সঁপিয়া দিতে পারিলে তিনি দিবেন। কাহাকেও তিনি ছোট করিয়া রাখিতে চান না, আবার মিথ্যার বড় করিয়াও রাখিতে চান না। সত্য সত্য বড় হওয়া যায় তাঁরই আশ্রয়ে। তখন আবার নূতন করিয়া রাজত্ব আরম্ভ হয়, কিন্তু এ বিদ্রোহীর রাজত্ব নয়—এ অনুগত আত্মজের রাজত্ব। (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ

সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব সম্প্রতি পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

আগামী ২৬শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কক্সবাজার

সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের ১২শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ, আর্য্যদর্পণের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত উৎসবে যোগ দান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য সাদরে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিতেছি।

উত্তরবঙ্গে বন্যা

উত্তরবঙ্গে যে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ নরনারীর কাতর আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নবভাবে উদ্বুদ্ধ দেশবাসী অসীম উৎসাহে ইহার প্রতীকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন -ভাইএর দুঃখে ভাইএর প্রাণে মমতা জাগিয়াছে, বাঙ্গলার দুর্দ্দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আজ সাড়া দিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, মঙ্গলময়ের বিধানে অতি নিষ্ঠুর আঘাতেরও প্রয়োজন আছে—নতুবা শক্তি প্রীতি জাগিত কি?

গ্রন্থ-পরিচয়

দীক্ষাতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত দুর্গা-দাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন প্রণীত। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত ও ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ মাত্র। পুস্তকখানি কালোপযোগী হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী, তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের শাস্ত্রমূলক সুযুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভ-গুলি পাঠ করিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই আনন্দিত এবং উপকৃত হইবেন। ভাষার মাধুর্য্যে এবং প্রাঞ্জলতায় বক্তব্য বিষয় সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তালফ্যাসানের যুক্তিতর্কে যাঁহাদের মতিগতি গঠিত, রাজা বাহাদুরের সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকাটীতে তাঁহাদের জন্য সুন্দর মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুরাণতত্ত্ব—(দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত। মূল্য ।/০ আনা মাত্র। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে ত্রিশূল পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধুনা-প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে কতটুকু আসল, কতটুকুই বা নকল, শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতীজী তাহাই সুযুক্তিসহ-কারে আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা গোঁড়ামীতে অন্ধ, এই নির্ভীক আলোচনাতে তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। দুই এক স্থানে ভিন্ন মত পোষণ করিলেও মোটের উপর এই পুস্তক খানা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

দিক্‌ভুল। "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত সমাজচিত্র। মূল্য ।/০ আনা। একটি ব্রাহ্মণযুবকের অধঃপতনের কাহিনী। ভাষা ভাল শ্লেষও তীব্র। কিন্তু চিত্রে কালি বেশী পড়িয়াছে বলিয়া স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়াছে।

স্বাস্থ্য সমাচার (ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৯) —আলোচ্য খণ্ডে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় লিখিত "গুপ্ত প্রকাশ" বা চরিত্র গঠনের উপায় একটা চমৎকার প্রবন্ধ। রমেশবাবুর এই লেখাটীর মত সুন্দর ও কালোপযোগী লেখা আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে দেশের কিশোর ও যুবকদের যে কি দুর্গতি হইতেছে, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। দেশের কাজ নিয়া তো সবাই ব্যস্ত - কিন্তু ঘুণে ধরা বাঁশ দিয়া কি কোনও কাজ হয়? আজ কত বৎসর ধরিয়া ছেলেদের নৈতিক দুর্গতির যে মর্ম্মন্তুদ আত্মকাহিনী শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতে আর যে যাহাই বলুক না কেন, দেশের সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করিতে আমাদের কিন্তু মোটেই ভরসা হয় না। হিতসাধন-মণ্ডলী রমেশবাবুর এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বালক ও যুবকদের মধ্যে বিতরণ করিলে দেশের মহোপকার উপকার হইত।

আমরা রাজনীতি লইয়া মাতামাতি করিতেছি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের ঘরের কত অভাব মিটাইতে বাকী। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কুমার বসু তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন — "কোনট আগে?" অতি চমৎকার প্রাণস্পর্শী কবিতা —সহজ ভাব নির্দ্দোষ ছন্দ। স্থানাভাববশতঃ আমরা সবটুকু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না —একটু নমুনা দিই

"ওরে, স্বরাট্‌শূন্য স্বরাজকামী,
দুঃখ যে তোর চারিধার।

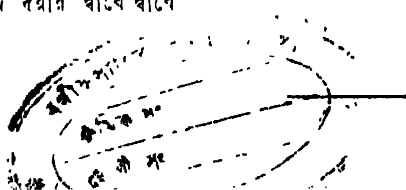
ঘুচবে কি সব, পাস্ যদি তুই
রাষ্ট্রনীতির অধিকার?
শাসক সাথে দ্বন্দ্ব তোদের
নিজেদের নেই সহযোগ;
জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহে
ঢুকছে তোদের নানা রোগ।
শান্তি নিলয় পল্লী ছেড়ে
কাল্ল বাসা সহর মাঝে,
পিষ্‌তে কলম, চাট্‌তে ধুলা,
ধোঁয়া খেকে সকাল সাঝে।

তারপর পল্লীর দুর্গতি শিশুর দুর্গতি
দেখাইয়া শিক্ষার কথা কবি বলিতেছেন

হাতে খড়ি হলে বাছার
তোলেন সুরে বিহ্বলয়,
'বিদ্যাভূষণ্' হবেন তিনি
সঙ্গীদের পরিচয়ে।
রামায়ণ আর মহাভারত
বেদ বেদাঙ্গ বহুল পড়ে —
'বটতলা' আর 'বসুমতী',
'বঙ্গবাসী'র গুদামঘরে;
স্বাস্থ্যনীতি, স্বদেশ প্রীতি
দেশের [illegible] -
বিদ্যালয়ের কাজীর সব
যত্নে রাখেন শিকেয় তুলে
ধর্ম্মনীতি বিবর্জ্জিত
যে শিক্ষা লোক তৈরী করে —
কেরাণী পাল, উকীল, দালাল
শাসকদলের সুখের তরে,
গরীব পিতার মুদ্রা চোষে,
ছেলের শিরের রক্ত যে
(সেই) কর্ম্মনাশা শিক্ষাদাতার
মুণ্ডুর বাসা পুড়িয়ে দে।
চিনিয়ে জগৎ, স্বরূপ দেখ্‌তে
কৌশলে যে রাখ্‌ছে বাকী,
মনুষ্যত্ব হরণ করে
গড়্‌ছে খাঁচার তোতাপাখী;
যাচ্ছে বয়াল দ্বারে দ্বারে
কলম পেষা কাজের তরে,
শুষ্ক মুখে বি, এ, এম, এ,
বিফল হয়ে ঘুরে মরে,
যাহার ফন্দী স্বাধীন চিত্ত
বন্দীশালে বন্ধ করা,
ভাবিস্ কিরে এমনও তর
পূর্ণ হবে না পাপের ভরা?
ভাঙ্‌তে হবে কঠিন হাতে
এমন কারা-আগার গড়্;
স্বস্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা,
'নৈব ভিক্ষা' প্রাণের বর।

তারপরে আছে নারীর দুর্দ্দশা—ব্যাধির
অত্যাচার। অবশেষে কবি বলিতেছেন—

চাই না স্বরাজ, স্বদেশী সাজ,
দেশের যদি জীবন গেল;
চাই সুশিক্ষা স্বাস্থ্য শিক্ষা;
সেই দিকেতেই দৃষ্টি ফেল।
চাই উদার মাঠ, গগন ললাট,
পল্লীর জল বাতাস আলো।
নইলে, খাঁটি দাওয়াই-এর জড়,
চাই গ্রামকে বাঁচান ভালো;
চাই চাষার ধান, রমণীর মান,
শান্তিনিবাস শিশুর হাসি;
চাই দু'বেলা দু'মুঠো চাল,
চাই না সোণারূপার রাশি।
চাই নিরোগী সবল দেহ,
চাই উঁচু মন, সরল প্রাণ;
তারপরে চাই চরকা মাটাই,
তাঁতের মোটা বস্ত্র দান।
'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—
তাইতে আগে বাঁচ্‌তে চাই;
জীবনযুদ্ধে শক্তিহীনের
হয় না ত জয় কোথাও ভাই।
নিজের গর্ত্ত বুজিয়ে নেবে,
পরের ফুটো খুঁজবি শেষে;
রোগের খাজনাখানা দেবি—
আসবে স্বরাজ আপনি বেশে!"



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ { ৮ম সংখ্যা

অশ্বিনৌ

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২২।১]

অবোধ্যগ্নির্জ্ম উদেতি সূর্য্যো
ব্যুষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চ্চিষা।
আযুক্ষাতামশ্বিনা যাতবে রথং
প্রাসাবীদ্‌ দেবঃ সবিতা জগৎ পৃথক্‌॥

যদ্‌ যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং
ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্‌।
অস্মাকম্‌ ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতম্‌
বয়ম্‌ ধনা শূর সাতা ভজেমহি॥

আ ন উর্জং বহতমশ্বিনা যুবং
মধুমত্যা নঃ কশয়া মিমিক্ষতম্‌।
প্রাযুস্তারিষ্টং নীরপাংসি মৃক্ষতম্‌
সেধতং দ্বেষো ভবতং সচা ভুবা॥

ধ্রুবং হি গর্ভং জগতীষু ধত্থো
ধ্রুবং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ।
ধ্রুবমগ্নিং চ ব্রুষণা বপশ্চ
বনস্পতিভিরশ্বিনা বৈরয়েথাম্॥

যজ্ঞভূমে জাগে অগ্নি, হেমদ্যুতি জাগায় সবিতা—
উষার তরুণ ভাতি ধরণীরে করেছে নন্দিতা;
হে অশ্বিন্, জাগো জাগো,—নিয়োজিত কর দিব্য রথ—
সবিতৃ-শাসনে হের, অবারিত বিশ্ব-কর্ম্মপথ!

সুধাবর্ষী তোমাদের দীপ্ত রথ করি নিয়োজিত,
তারি পুণ্যে মর্ত্ত্য-বীর্য্য মধুধারে, কর আপ্যায়িত;
ব্রহ্মজ্যোতিঃ-পুলকিত কর আজি আমাদের দেশ—
অকুণ্ঠিত শৌর্য্যবলে ঋদ্ধি মোরা লভিব বিশেষ!

শক্তি আন চিত্তে বহি; হে দেবতা, তীব্র কশাঘাত
মধুময় হোক্ আজি দৈন্যে মোর করিয়া আঘাত।
দাও হব্য, আয়ু দাও—কর্ম্ম মোর কর নিরমল—
শত্রুজয়ী তোমরা যে চির-সাথী নিত্য অচঞ্চল।

ব্যাপিয়াছ সর্ব্ব ঠাঁই, জগতীর করি গর্ভাধান
বিশ্বভুবনের মাঝে আপনারে করিয়াছ দান।
হে অশ্বিন্, পূরায়েছ নিখিলের প্রাণের কামনা—
বনস্পতি, অগ্নি, জলে তোমাদের জাগালে প্রেরণা!

উদ্যোগপর্ব

—:*:—

সত্যস্বরূপ আমাদের মাঝেই রহিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে চাহিয়াও পাই না। —কেন? আয়োজন সম্পূর্ণ না হইলে তো তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। চেষ্টার একটা সংহতি চাই—এলোমেলো ভাবে এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া বেড়াইলেই কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু চেষ্টাকে সংহত করিবে কিসে? যাহা চাই, তাহার একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা মনের মাঝে পাওয়া চাই। সম্পূর্ণ বস্তুটী মনের মাঝে আঁচিতে পারিলে তবে তাহার জন্য চেষ্টা করা চলে।

মনে আঁচা আর পাওয়া এক কথা নয়—বিশেষতঃ অন্তর্বিজ্ঞানের পক্ষে। এখানে সমস্ত ব্যাপারই সূক্ষ্ম, তাই সত্য আর মিথ্যার মাঝে গোলমালটাও হয় বেশী। তার জন্যই মনকে সজাগ রাখা চাই। যাহা পাইলাম বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাকে কঠিন পরীক্ষা করিয়া বাজাইয়া লইতে হইবে। পরীক্ষার ক্ষেত্র বাহিরেই রহিয়াছে। সূক্ষ্ম দ্বারা স্থূল শাসিত। মূলে পাওয়া যদি ঠিক হয়, তবে তাহাকে লইয়া স্থূলে কোনও গোলে পড়িতে হইবে না।

এমনি করিয়া অবিরাম পরীক্ষা দ্বারা ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। কিন্তু এ হইল সাধনজীবনের কথা। তাহার গোড়াতেও তো একটা পুঁজি চাই। সে পুঁজি কে যে কোথা হইতে জুটাইয়া দেয়, তাহা আমরা জানি না, কেননা আমরা শুধু ইহজন্মের কতকটা খবর জানি,—আগের সঞ্চয় কি ছিল না ছিল, তাহার কোনও খোঁজ তো বলিতে পারি না।

পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ বিদ্যা আপনিই স্ফুরিত হয়। যতটুকু পাঠ যে শেষ করিয়া আসিয়াছে, তাহার পর হইতেই তার এই জন্মের পাঠ সুরু হয়। সুতরাং প্রথম রাস্তা ধরাইয়া দিবার জন্য একজন আমাদের মাঝেই আছেন। তাঁহার হিসাবে ভুল হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের কাছে এই হিসাবটা স্পষ্ট নয়। তার মাঝে কিছু হাত আমাদেরও আছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। আমাদের হিসাব জড়াইয়া লইয়াই তাঁহার বড় হিসাব।

কিন্তু তাঁর হিসাবটা তো আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ সেটুকু বুঝিবার দায়িত্ব আমাদেরই। এইখানেই আমাদের নিজের দিকে তাকাইতে হয়। যিনি চালাইবার, তিনি তো চালাইতেছেনই, এমন কথা বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। কি তাঁর অভিপ্রায়, সেটুকু গোড়াতেই স্পষ্ট করিয়া লওয়া চাই। এ দায়িত্ব সকলেরই। কিন্তু সকলে যদি সে কথাটা আজ না বুঝি, তবে একদিন বুঝিয়া লইতেই হইবে—ফাঁকি দিয়া এড়াইবার কোনও পথ নাই। যে সাধক, তাহার সাধনার সুরু এই বোঝা পড়াতে। আমরা সাধকের কথাই বলিতেছি; অসাধকের কূটতর্ক—সে পৃথক্ কথা।

যার সময় হইয়াছে, সে পথ খুঁজিবেই। কিন্তু খোঁজা যে জীবনের আদিতেই সুরু হয়, তা তো নয়। কারু কারু তা হয়, আবার

কাহারও খোঁজ নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে। হয়ত আঁধারেই অর্দ্ধেকটা জীবন কাটিয়াছে—এর মাঝে কোথা হইতে একদিন কি একটা কথায় একটু চমক লাগিল, আর অমনি কিসের ধাক্কায় যেন সব ওলট-পালট হইয়া গেল। এমন অতর্কিত বিপ্লাট সকলের জীবনেই হয়ত আসে। ইহাতেই বুঝি পারি—সূত্র আমাদের হাতে নয়; যিনি নাচাইবার, তিনিই আড়াল হইতে সূত্র ধরিয়া আছেন।

তবে তাঁর বন্দোবস্ত বড় সুন্দর। এই যে অতর্কিতে চমক লাগা—এর নিমিত্তটা কিন্তু জগৎ জুড়িয়া ছড়ানো রহিয়াছে। চাই আর না চাই, ডাক কিন্তু অবিরাম আসিতেছেই। যাঁহারা পথ পাইয়াছেন, তাঁহাদের মাঝে ভগবান কি এক ব্যাকুলতা ঢালিয়া দিয়াছেন—অন্ধকে পথ দেখাইবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহের সীমা নাই। এই জন্যই জগতে সাধু শাস্ত্রের এত আকিঞ্চন। ডাক আসিতেছেই,—হঠাৎ একদিন কার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে গিয়া—আকুল করিবে তার প্রাণ।" তখন আর রহিয়া-সহিয়া কিছু হইবার যো নাই। ডাক আসিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, মূকও বাচাল হয়।

কিন্তু তারও একটা ধারা আছে। প্রাণে যখন সাড়া পড়িল, তখন বুঝিলাম, চিত্তের বাঁকে যে আবর্জ্জনা জমিয়াছিল, এইবার তাহা ভাসিয়া গেল, এইবার পূর্ব্বজন্মের স্রোতের সঙ্গে ইহজন্মের স্রোত মিলিয়া গেল—মানুষ হইল একটা অখণ্ড অপরূপ সত্তা। কিন্তু এই প্রবাহের গতিরও তো একটা ইতিহাস আছে। সেইটাই হইল সাধনশাস্ত্র। সেইটা ভাল করিয়া বোঝা চাই।

যে না বোঝে, তার যে কাজ চলে না, তা নয়। কিন্তু বুঝিলে কাজটা আরও সহজ হয়। যেখানে পৌঁছাইবার সেখানে পৌঁছাইব নিশ্চয়ই—এমন বিশ্বাস প্রাণে আছে, অথচ তার উপর যদি পথটা জানা থাকে, তবে যাত্রার আনন্দ যেন আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠে। আর, জানার সুযোগেরও তো কোনও অভাব নাই জগতে। জানিয়া-শুনিয়া ধীরভাবে পথ চলাই ভাল—কেন আবেগের বশে ধৈর্য্য হারানো?

তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। সাধনা অবশ্য অবিরামই চলিতেছে—অজ্ঞানের, মোহের আবরণেও তাঁহারই দিকে চলা ছাড়া গতি নাই। কিন্তু তবুও তো মাঝে মাঝে এক একটা ছেদ আসে—যা স্পষ্ট ছিল, তা অস্পষ্টের ঘোরে আড়াল হইয়া যায়। এই হইল সংস্কারের কাজ। পথ পাইলেও সংস্কার সহজে ছাড়ে না। তার মায়া হইতে বাঁচিতে হইলে তার অন্ধি সন্ধিগুলি ভাল করিয়া জানা চাই। এই জন্যই পথ জানিয়া পথ চলা সকল রকমেই ভাল।

তার পর আয়োজনের কথা। প্রথমেই চাই শুদ্ধি। শুদ্ধির কথা বলিতে গেলেই আধারের কথা আসে। আধারটাই আমাদের যথার্থ রূপ নয়, অথচ আধার ভিন্ন রূপও প্রকাশ পায় না। যেমন আলো: বায়ু স্তরের অবলম্বন তার চাই—নতুবা সে আঁধার। এই জন্যই যখন স্বরূপ-সিদ্ধির কথা আসে, তখন আধারের কথাটা তাহা হইতে বাদ দিলে চলে না। প্রকৃতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহি বটে, কিন্তু তাহার দেনা না মিটাইয়া দিলে সে ছাড়িবে কেন? কিন্তু এ দিকে আমরা বড় নজর দিতে চাই না—কি করিয়া বন্ধন এড়ানো যায়, তাহার চিন্তাতেই আকুল হইয়া পড়ি। ফলও যে সব সময় ভাল হয়, তাহা

বাঁধতে পারি না। অবশ্য কৃপা সিদ্ধির কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধনার অভিমান নিয়া যাহাকে চলিতে হয়, তাহাকে একটু হুঁসিয়ার হইতেই হইবে—চলিতে গেলে কোথায় বাঁধিবে, তাহা চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইবে। চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই বাঁধন কাটে না।

আধারের কথা ভাবি নাই, তাহার শুদ্ধির জন্য যত্ন করি নাই, অথচ স্বরূপের সন্ধান করিতেছি—এ কথাটার মাঝে ফাঁকি এক জায়গায় আছেই। যেমন কাজটা করিব, তেমনি তার ফলটাও পাইব। ফাঁকি দিয়া যদি কার্য্যোদ্ধারের ফিকিরে থাকি, তবে শেষের ফাঁকিটা পড়িবে আমাদের ঘাড়েই। এর নজীরের অভাব নাই। আমরা তত্ত্ব-কথার অনেক বুলিই ঝাড়িতে জানি, কিন্তু কাজের বেলায় সব ঘুলাইয়া যায় কেন? গোটা জগৎ-বস্তুটা মন্থন করিয়া আসিয়া ঘরের কোণের একটা সামান্য কথার ধাক্কা সামলাইতে পারি না কেন?

এইখানেই বুঝি পাণ্ডিত্য আর জিজ্ঞাসা এক বস্তু নয়। সত্যের অধিকার বড় বড় বুলিতে মিলে না। কথাটা একটা বাইরের বস্তু। তা আমারই প্রেরণায় সৃষ্ট, আমারই অঙ্গীভূত বটে, কিন্তু কথাতেই তো আমার সবটুকু শেষ হইয়া গেল না। যদি বল, আমি সত্যস্বরূপ,—তবে যে মিথ্যা তোমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার মীমাংসাটা মিলিবে কোথায়? আবার এ কথাও জানি, শুধু কথাতেই মীমাংসা হইবে না। মীমাংসা প্রাণের বস্তু। আমি বুঝিতে পারিলেই হইল; যেখানে নিজে, বুঝি-আর না-বুঝি, কিন্তু পরকে বুঝাইবার আগ্রহটাই বেশী—সেখানে আছে শুধু ফাঁকা বুলি—সত্য সেখানে নাই, প্রাণের অনুভূতিও নাই।

তাই মীমাংসা খুঁজিতে হইলে কেবল কথা কাটাকাটি করিলে তো হইবে না। প্রাণে-প্রাণে বোঝা চাই—নিজের বাহিরে ভিতরে সামঞ্জস্য ঘটানো চাই। অনুভূতি যদি জীবন্ত হয়, তবে সত্য-মিথ্যার বিরোধ মিটিয়া যায়—তখন দেখি, আমার সবটুকুই তো সত্য। সত্য অর্থে একটা কিছুর মাঝে গণ্ডী কাটা নয়। সত্য অর্থেই পূর্ণ। সুতরাং তার মাঝে আর এখান সেখান, এটুকু-সেটুকু নাই। রসের সান্দ্রতায় সত্তা তখন পূর্ণ—বাহিরে ছলকিয়া পড়িবে আর কি? এ অবস্থা, যদি মুখে ফুটিয়া না বলিতে পারি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যে তৃপ্তি তখন সাধকের বুক ভরিয়া রহিয়াছে, তাহা বিশ্ব-জগতেরই অন্তরাত্মায় অনুপ্রবিষ্ট। সে রসই সকলকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া তাহাই ধর্ম্ম। তাহা আবার বাক্যের ছটায় বুঝাইবার বিষয় কি?

আমি সত্যস্বরূপ—এ কথা সাধকেও বলিতে পারে, অসাধকেও পারে। কিন্তু বলার মাঝে তাৎপর্য্যের ভেদ হইবে—আধারের বিশুদ্ধিতে। অশুদ্ধ আধারে সত্যানুভূতির আস্ফালন শুধু ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। খাঁটী সুরটা বাজিয়া উঠিবে সাধকের মুখে। সাধকের ভাষায় প্রাণ আছে, তাহা অপরের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তা ছাড়া তাহার আছে অন্তরের ভাষা। মুখে না ফুটিলেও হৃদয়ে তা ফুটে। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই শব্দহীন ভাষার কানাকানি পড়িয়া যায়। এমন কত যুগ-যুগান্তরের কত সাধকের অশরীরী বাণী আমাদের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, হৃদয়দুয়ারে আঘাত করিতেছে। কিন্তু উপযুক্ত বিশুদ্ধ আধার না হইলে তাহার স্ফুরণ হয় কই?

তুমি-আমি যদি সত্যের সাধনায় ব্রতী হই,

তবে আমাদিগকে আগে তাকাইতে হইবে আধার-শুদ্ধির দিকে। একেবারে আধার ডিঙ্গাইয়া নিরাধার স্বরূপ সত্তার কথা নিয়া নাচনামো করিলে চলিবে না। আধার আমাদিগকে বাঁধিয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তির চেষ্টাও তাহাকে ছাড়িয়া হয় কই? আধারকে হীন বলিয়া, বন্ধন বলিয়া গালি দিলে চলিবে না। জগতের সকলই সত্যসৃষ্টি। ভালমন্দের ভেদ আসে পরিপ্রেক্ষার ভূমি হইতে। অশুদ্ধ আধার আমাদিগকে বাঁধিয়াছে বটে, কিন্তু আধারটা খসাইতে পারিলেই অশুদ্ধি তো দূর হইবে না। অমন করিয়া খসানোও যায় না - মিছামিছি মনকে ফাঁকি দেওয়া চলে বটে। আধারটা বজায় রাখিয়া তাহাকেই ক্রমে শুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, এই হইল সাধনার ক্রম। বড় বড় সাধনার কথা এখন থাকুক —আগে এই কাজটা তো হউক।

দেহও একটা আধার, চিত্তও একটা আধার। যেমন চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন, তেমনি দেহশুদ্ধিরও প্রয়োজন। দেহশুদ্ধির প্রয়োজনটা যে কত বড়, তাহা আমরা তলাইয়া দেখি না। অথচ এই গোড়ার কাজটা আগে না করিয়াই বড় সাধনার দিকে হাত বাড়াইতে গিয়া দেখি, কত অতর্কিত বাধা। সে বাধা কি সকলই অন্তরের বাধা? জড়ের বাধা কি নাই? তলাইয়া দেখিলে দেখিতাম, জড়কে অবজ্ঞা করিবার দর্প দর্পহারী মধুসূদন তিলে তিলে চূর্ণ করিতেছেন! নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ প্রভৃতি কত জড়ের উপসর্গ আসিয়া সাধককে বেড়িয়া ধরিয়াছে— এইগুলিই হইল ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার ফল।

তারতম্য শুধু জড়তার কথাই বা বলি কেন? চিত্ত যে চঞ্চল, অসমাহিত, তা কি শুধু চিত্তেরই অপরাধ? জড়ের দাবী চিত্তকেও কি মিটাইতে হয় না? উপনিষদের একটী সূত্র° আছে—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।" কথাটার তাৎপর্য্য যে কতখানি ব্যাপক, তাহা কি আমরা তলাইয়া দেখিয়াছি? জড়ের শক্তিও সেই মহাশক্তিরই অংশ। তাহাকেও অনুকূল করিয়া লইতে হইবে—নতুবা তাহার বেগ শুধু দর্প দিয়া সামলাইতে পারিব না। হিন্দু এই কথা বুঝিত, তাই তার সাধনার মূলে ছিল দেহশুদ্ধি বা ব্রহ্মচর্য্য।

স্বরূপ আমাদের কত আবরণে বিরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের একটী একটী করিয়া ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। রূপকথায় আছে—সাতমহল পার হইয়া গেলে তবে নাকি ঘুমন্ত রাজকুমারীর দেখা মিলে। আমাদের জীবনেও তাই। তবে সাতমহলের পরে যিনি, তিনি ঘুমন্ত নন, চিরজাগ্রৎ —এই যা পার্থক্য। গোড়ার মহলটাই হইল এই দেহটা— এই তো স্থূলতম রূপ। এর পর আর কি ঘনীভূত অবস্থা জগতের হইতে পারে, তাহার হিসাব ভগবান আমাদের ঘটে দেন নাই। কাজেই এই স্থূলের সঙ্গে পরিচয়ই আমাদের আদিম পরিচয়—ইহার অনুভূতি, ইহার ক্রিয়া বিকারই প্রাণে প্রথম স্পন্দন তুলিয়াছে। তাই দেহাত্মবোধ জীবের সহজ বোধ। অন্য যত বুলিই কপচাই না কেন, এটার মায়া কাটাইয়া উঠা সব চেয়ে শক্ত। রূপের জগতে দেহটাই হইল অবলম্বন। তাই কামদেহটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেও এই খোলসটা পড়িয়া থাকে—ভূতশক্তি এমনি একটা নিরেট বস্তু।

এই ভূতের সঙ্গে লড়াইটাই হইল আগের কথা। ইহার আইনকানুন দিয়াই তো এক্ষে

বস্তু জগৎটার পত্তন হইয়াছে। কামনা নৃত্যশীল—আগুনের শিখার মত লক্ লক্ করিয়া উঠে, আবার কোথায় মিলাইয়া যায়। কিন্তু আগুন গেলেও ছাইটা থাকেই। ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া যদি বিচার করি, তবে দেখি, মনের তাগিদের চেয়েও দেহের তাগিদটাই যেন প্রাকৃত জগতে বড়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব যে মানুষ, সে তার অত বড় মনটা লইয়া আগুনের মত উপরের পানে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল বটে; কিন্তু সে আগুন তো নির্ম্মূল নয়—তার মূল যে এই মাটীতে। এই মাটীর টানে সে অধ্যাত্মরাজ্যের এত বড় জীব হইয়াও বহিরিন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব তুচ্ছতম কীটের সঙ্গে এক বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে। তর্কের জোরে এই বাঁধনটা অস্বীকার করা চলিবে কি?

জীবনের মূল অংশটা বিশ্লেষণ করিলে দেখি—তার মাঝে আছে, জিহ্বোপস্থের তাড়না। নীতিশাস্ত্র একে অশ্লীল কুরুচি বলিয়া চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইতেছে—মানুষের দেহের উপর, মনের উপর, সমাজের উপর হাজার রকমের আবরু সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতি ঠাকুরাণীর তাহাতে আসলে কোন গোল হইতেছে কি? অত বড় সৃষ্টি-রহস্যের চাবিই যে ওই দুটা। যদি সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া স্রষ্টার সামিল হইবার সাধ হয়, তবে ওই চাবি দুইটা হাত করিতে হইবে। ওদের পাশ কাটাইয়া যাইবার কোনও পথ নাই।

এইখানেই তবে সুরু। জিহ্বোপস্থ সংযত হইলেই তবে প্রকৃতির সকলের নীচের ক্লাস হইতে প্রমোশান পাওয়া গেল। এই জন্যই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা। সংসারের ধর্ম্মপালন করিয়াই সত্য লাভ কর, আর বনে-জঙ্গলে গিয়াই ভগবানকে ডাক—ওই জায়গায় সামলাইবার শিক্ষাই হইল প্রথম শিক্ষা। সংসারীর সাধনাতেও তাই, সন্ন্যাসীর সাধনাতেও তাই। সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, গোড়ায় মিথ্যা রাখিলে চলিবে না।

হাজার হাজার পথ আর মত রহিয়াছে। তার কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটার কি তত্ত্ব—এ বিচার করিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যদি নিজের পথ বাছিয়া লইবার জন্য এত তত্ত্বতালাসী, তবে জিজ্ঞাসা করি, আগে গোড়া সামলাইয়াছ কি? সাংখ্য বেদান্ত, যোগ জ্ঞান, মাথায় থাকুক—আগে নিজকে জিজ্ঞাসা কর, আমার দেহ শুদ্ধ হইয়াছে কি? জিহ্বোপস্থ সংযত হইয়াছে কি? সাতমহলা পুরীর এই যে প্রথম মহলা। এ পার হইলে তবে বড় বড় কথা। তার আগে যত আস্ফালনই কর না কেন, কেবল নাচন-কুঁদনই সার হইবে। অশুদ্ধ দেহ লইয়া তত্ত্ব-বিচার করিবে কি—একটি সঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারও যে অধিকার জন্মিবে না ধারণা করা তো দূরের কথা।

আচার দিয়া দেহ শুদ্ধ কর, আর মন শুদ্ধ কর বিচার দিয়া। আয়োজনের গোড়ার পর্ব্বটাই হইল শুদ্ধি-পর্ব্ব। কি দিয়া মানুষ সত্যবস্তুকে পায়? তর্ক দিয়া নয়, মেধা দিয়া নয়, পাণ্ডিত্য দিয়া নয়, "প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"—প্রজ্ঞান দিয়া তাঁহাকে পায়। সে প্রজ্ঞানের অধিকার জন্মায় কার? যে "সমনস্কঃ সদা শুচিঃ" মনটী যার আছে, দেহটী যার সর্ব্বদা শুচি। দেহ শুচি না হইলে মন তো জাগিবে না কিছুতেই। উপনিষদ্ তা প্রমাণ দিতেছেন—অন্নের যা শ্রেষ্ঠ ভাগ, তাই হয় মন; আর যা তার মধ্যম ভাগ, তাই হয় দেহের আধার শক্তি। কিন্তু আমরা অন্নগ্রহণ

করি দেহের প্রয়োজনে, মনের প্রয়োজনে তো নয়। এই খানেই তো উলটা বিচার। সূক্ষ্মই হইল শক্তি, স্থূল তার বাহন মাত্র। কিন্তু বাহনটা যদি বেচালে চলে, তবে সওয়ারের তাতে স্বস্তি বাড়ে না। স্থূলকেই মূল খলিয়া যদি ভুল বুঝি, তবে সূক্ষ্মের শক্তি ফুটিবে কি করিয়া? অশুচি অন্ন অশুচিভাবে গ্রহণ করিয়া দেহকে অশুচি করিব, আর মন তাহাতে জাগিবে, বুদ্ধি স্ফূর্তিযুক্ত হইবে? এ একেবারে মিথ্যা কথা। আবার বলি—বেদের শাসন স্মরণ কর—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।"

মনটা স্থির হয় না, কেন একথা সবার মুখে। কিন্তু দেহের ধাতু স্থির না হইলে মন স্থির হইবে কি করিয়া? মনের পথ পরে খুঁজিও—সে তো মনের মাঝেই মিলিবে। একটা আধার যদি শুদ্ধ করিতে পার, তবে দেখিবে, পর পর সব জিনিষই সাজানো রহিয়াছে—একটির যোগ্যতা আর একটির অধিকারে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিতেছে। সাধনা তো বাস্তবিক কঠিন কিছু নয়। বরং অসাধনটাই একটা জঞ্জাল; কেননা সে তো সহজ পথ ধরিয়া চলা নয়—সে হইল আপনার মতলবে চলা। আর সাধনা হইল ভগবদিচ্ছায় চলা। ভগবানের সৃষ্টির গতি ঊর্দ্ধমুখে। সাধনায় আমরা সেই পথেই চলিতেছি—যে জানে সে-ও, যে না জানে সে-ও। সুতরাং এই তো জীবের স্বভাবমার্গ। তবে এ পথে এত বিভীষিকা কেন?

বাস্তবিক কোনও বিভীষিকা আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। ভগবানের রাজ্য আইনে বাঁধা—তাই বেদ তাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ।" এই ঋতকে, এই সত্যকে যে লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে তাহার আইনসঙ্গত দণ্ড তো গ্রহণ করিতেই হইবে। আমাদের কাছে এইটাই হইল বিভীষিকা। প্রথম মানের ছাত্র হইয়া পঞ্চম মানের পাঠ লইতে গেলে সে পাঠ যদি দুরূহ হয়, তবে সে তো বে-আইনী কিছুই হইল না। তার জন্য পাঠ্য পুঁথিকে গাল দিলেই কি সুবুদ্ধির পরিচয় হইল?

ঠিক পথে চলিলে ঠকিতে হয় না কোথাও। প্রশ্ন হইবে, ঠিক পথ দেখাইয়া দিবে কে? তাহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। পথ দেখাইবার মানুষ ভিতরেই বসিয়া আছেন—ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করিলে তিনি বাহিরেও দেখা দিবেন। তবে উদ্যোগপর্ব্বের কাজটা আমাদেরই করিতে হইবে। সে-ও তো আমাদের হাতছাড়া কিছু নয়। এই দেহটা তো পালাইয়া যাইতেছে না, তাহাকে লইয়াই কাজের পত্তন। আগাগোড়া নির্ম্মল হওয়া চাই। প্রথম মহলটাতেই যদি আবর্জ্জনা জমাইয়া রাখ, তবে তার বায়ু দূষিত হইয়া যে সবখানেই ব্যাধির বীজ সংক্রামিত করিয়া দিবে।

তাই বলি, উদ্যোগপর্ব্বের এই দুইটী কথা—"সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।" ইহাদের ভুলিয়া সাধনই কর আর সদ্‌গুরুই খোঁজ—সব বৃথা হইবে। ভগবান্ বে-আইনী সহিতে পারেন না।

পথের সঙ্কেত

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংসারে আমি কত ছোট। কিন্তু এইটুকু বুঝি না বলিয়াই বড়র অভিমান লইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি। যদি আপনাকে বড় বলিয়া বড়াই না করিয়া, যিনি যথার্থই বড় তাঁহাকে মনে-প্রাণে বুঝিতে পারি এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া আপনাকে ছোট করিয়া দেখিতে শিখি তবেই অভিমানের বিকৃত রূপটা খসিয়া গিয়া আমাদের যথার্থ স্বরূপটা ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু অভিমান তো সহজে ছাড়িতে চায় না। এর জন্যও রীতিমত লড়াই চাই। এ লড়াইও বড় কঠিন, কেননা যাহার সঙ্গে লড়িব, তাহার মাঝে সত্যের ভাণ এত বেশী যে মিথ্যা হইতে তাহাকে চিনিয়া লওয়া সহজ নয়। অপরকে যদি প্রবঞ্চনা করি, তাহা হইলে নিজেও সেটা বুঝিতে পারি, কিন্তু নিজকে নিজে প্রবঞ্চিত করিলে সে ফাঁকি ধরিয়া দিবে কে? অভিমানবশে এমনি করিয়া অহরহঃ আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছি। একেবারে গোড়ার অভিমান যে দেহাভিমান—তাহার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কেননা দেহের মূঢ়তা বড় সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু এই যে মনের মূঢ়তায় সর্ব্বদা নিজকে জাঁকাইয়া ফিরিতেছি, পরের কাছে নিজকে বড় করিবার চেষ্টায় তৃপ্ত না হইয়া নিজের কাছেও অজ্ঞাতসারে নিজকে বড় করিয়া রাখিতেছি—এর তো একটা প্রতীকার চাই।

অভিমানের একটা প্রধান বিকার, সে সর্ব্বদাই ভাবে, "আমাদ্বারা যেমনটী হইল, এমন আর জগতের কোথাও হয় নাই।" একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রতি বৎসরেই কত ছেলে কত পরীক্ষায় পাশ করিতেছে; ইহাদের মাঝে একটী-না-একটী ছেলে প্রথম হইবেই। কিন্তু যে ছেলেটী প্রথম হয়, তার মনে, এ ব্যাপারটা একটা অভূতপূর্ব্ব কিছু বলিয়া মনে হয়—যেন প্রথম হওয়াটা তারই একটা অত্যাশ্চর্য্য গুণ। এই ভাবিয়া সে নিজেও যেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করে, তেমনি বন্ধুবান্ধবের বাহবাতে সে উত্তেজনায় আরও ইন্ধন পড়ে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ ব্যাপারে কৃতিত্ব তো কাহারও নয়! প্রকৃতিতে যখন সকলের মাঝে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াই থাকে, তখন যে কোনও ব্যাপারেই একটু-না-একটু উনিশ-বিশ হইবেই এবং তাহার ফলে একজন-না-একজন যেমন সকলের আগে থাকিবে, তেমনি একজন পিছাইয়া থাকিবেই। বলিতে গেলে এ তো নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনা; অথচ ইহাকে ধরিয়া অভিমানের সৃষ্টি হয় কি করিয়া? প্রতিবারের প্রতিযোগিতাতেই একজন-না-একজন প্রথম হইবেই—না হইয়া উপায় নাই; তবে আর এর মাঝে বিস্ময়ের বা অভিমানের কি আছে?

এমনি অনেক সাধারণ এবং তুচ্ছ ব্যাপারকে অভিমানের আস্ফালনে আমরা অসাধারণ এবং গুরুতর করিয়া তুলি। এর প্রতীকার হই

তেছে, জগতের মাঝে আমাদের স্থানটী কোথায় তাহা সমগ্র জগতের দিক হইতে বিচার করা। এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব মহাশক্তির প্রেরণায় কত কোটী গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি প্রলয় নিমিষে নিমিষে সংঘটিত হইতেছে—সেই শক্তিই আমার মাঝে ক্রিয়াশীল হইয়া আমাকে হাসাইয়া-কাঁদাইয়া-নাচাইয়া ফিরিতেছে। স্বভাবের নিয়মে যেমন ফুল ফোটে, বাতাস ছোটে, নদী বয়, তেমনি করিয়া আমার দেহ, মন, প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, বুদ্ধি স্ফুরিত হইতেছে। ইহার সবখানিই তো সেই মহতেরই লীলা। নিজকে এমনিভাবে একটা বৃহত্তর সত্তার অঙ্গীভূত করিয়া দেখিতে অভ্যাস করিলে, অভিমানে আঘাত পড়িবে; তখন এই জগদ্ব্যাপারে যে ক্ষুদ্র স্থানটী তুমি অধিকার করিয়া বসিয়াছ, সেইটীর প্রতি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে —নিজের সীমা লঙ্ঘন করিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিবার প্রবৃত্তি আর হইবে না।

অথচ এ যে কেবল নিজকে খাটো করিয়া দেওয়া—তাও তা নয়। প্রথম প্রথম যখন উদ্ধত চিত্তকে নিজের ক্ষুদ্রত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া নামাইয়া আনিবে, তখন অবশ্য একটা বেদনা বোধ হইবে। এই বেদনাতে ক্রমে একটা হীনতার আভাসও আসিয়া জুটিবে। মত্ত চিত্তকে কঠিন আঘাত করিয়া শাসন করিতে হইলে তাহাকে হীন বলিয়া তিরস্কৃত করাও প্রয়োজন, নতুবা তাহার বড়াই কমে না। কিন্তু এ হইল অভিমান দমনের প্রথম অবস্থা। যতক্ষণ চিত্তে লড়াই চলিতেছে, ততক্ষণই এই তিক্ততা—হীনতা। কিন্তু যখন অভিমান ছাড়িয়া ঠিক নিজের যথার্থ মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে, তখন দেখিবে, নিজকে নত করিয়া দিয়া তুমি বাঁচিয়াছ আর তো তোমাকে অনবরত সতর্ক হইয়া নিজকে উঁচু করিয়া ধরিয়া ফিরিতে হয় না—পরের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উদ্যত-শস্ত্র হইয়া থাকিতে হয় না—এতদিন পরে তুমি যেন স্বস্তি পাইলে। আবার এই স্বস্তবোধ হইতেই আসিবে আনন্দ। যে বড়র ছোট টুকরাটী তুমি, তাহার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটী যতই স্পষ্ট করিয়া দেখিতে শিখিবে, ততই লীলার অনুভূতি তোমার মাঝে জাগিবে। দেখিবে, ছোটবড় কত ব্যাপার কলের মত তোমার ভিতর দিয়া হইয়া যাইতেছে—তাহার ফলাফলের দরুণ তোমার কোনও চিত্তবিকার ঘটিতেছে না, অথচ আনন্দের সরসতা তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটী উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

সকলেই চায় জীবনটাকে উপভোগ করিতে, কথাটি ভাবে ও ভাষায় উভয়ত্রই বিজাতীয় হইলেও। কিন্তু এই উপভোগের উপকরণ যদি বাহির হইতে জুটাইয়া আনিতে হয়, তবেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ যেন ভোজ খাওয়ার মত। পনের দিন আগে হইতে পঞ্চাশজন লোক কলরব করিয়া কেবল আয়োজনই করিতেছে। তারপর যে দিন খাওয়ার দিন আসিল, সে দিন আধঘণ্টার মাঝেই এত বড় ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। অথচ সেই আধঘণ্টাতে যে পরিমাণ ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা, সে পরিমাণ ভোগ হইল কিনা কে বলিতে পারে? এই তো হইল সংসারের স্ফূর্ত্তি। সারাটা জীবন অভিমানকে উদ্ধত রাখিয়া এমনি নিমন্ত্রণের ভাগুই আমরা খুঁজিয়া ফিরিতেছি। এর জন্য কলরবও কত! কিন্তু সত্যকার ভোগ কতটুকু?

আসল ভোগ হয় বাহিরে না, ভিতরে। জিহ্বাকে বাহিরের রস আস্বাদন করিতে দিলে, সে কেবল বাহ-বিচার করিবে, বলিবে

—এটা তিক্ত, ওটা মিষ্টি। তখন তিক্তকে মিষ্ট করিবার জন্য কুইনাইনের বড়ীতেও চিনির পোঁচ দিতে হয়। কিন্তু যদি আদতেই এই রসনাকে সরস করিয়া তোলা যায়, ওর মাঝেই যদি রস সঞ্চিত থাকে তবে যে সব জিনিষই মিষ্ট লাগে। তাই বলি, অন্তররূপিণী দিতে পারিলেই সব গলদ ঘুচিয়া যায়, কিন্তু কথাটা আমরা বুঝি না কেন?

ভিতরের আনন্দকে জাগাও। সে তো কেবল কলরব করিলে হবে না—বাহিরে তাহার জন্য আয়োজন উদ্যোগ করিলেও হবে না। এ একেবারে আপনার অন্তরের নিভৃত কোণটীতে স্থির অচঞ্চল হইয়া থাকিতে হইবে। বাহিরে যা কিছু আসিবে যাইবে, তা কেবল কৌতুকভরা আনন্দ-দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া যাও—কাহারও উপর কোনো মতামত প্রকাশ করিতে যাইও না। বেশ পারা যায়, যদি নিজে কর্তা সাজিবার সখটা ছাড়িতে পার। কর্তৃত্বের সীমা তোমার সঙ্কীর্ণ। যাহা হইবার তাহা তুমি হুকুম করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে, তবে আর তাহার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা হয় কেন?

এমন করিয়া আপন ইচ্ছাটাকে একেবারে তলাইয়া দাও। মনে করিও না যে ইহাতে তোমার চিত্ত জড় হইয়া যাইবে। নিজে কর্তা না সাজিয়াও খাটা যায়। তুমি চুপ করিয়া থাকিলেও এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া জগতে চলিতেছে, যাহাকে ঠেকাইয়া রাখা তোমার সাধ্যায়ত্ত নয়। সুতরাং কাজ একদিক দিয়া হইবেই। শক্তিস্ফুরণের দুইটা ধারা। একটা ব্যাপক সমস্ত জগৎ জুড়িয়া নিঃশব্দে তাহা প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে; এমন কি যেটুকু তোমার কর্তৃত্বাধীনে বলিয়া তুমি অভিমান করিতেছ, তাহাও তাহারই হাতে। অথচ এই বিশ্বব্যাপিনী ক্রিয়াশক্তির পাশেই তোমার অভিমানের রাজত্ব। তুমি এইটুকু লইয়া অন্ধ হইয়া রহিয়াছ—তাই ইহার বাহিরে তোমার দৃষ্টি পড়িতেছে না। কিন্তু যদি তোমার গণ্ডীটুকু ভাঙ্গিয়া দিতে পার, তবে কি হইবে?

এখানে যদি বল, আমার ইচ্ছা, আমার কর্তৃত্ব যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে কর্মেই বা আমার প্রবৃত্তি আসিবে কোথা হইতে?—আমি তখন জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইব না কি? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। অনেকক্ষেত্রে দেখাও যায়, ইচ্ছার বালাই যখন রহিল না—মানুষ তখন উদাসীন হইয়া গিয়াছে—চিত্ত আর তাহার কিছুতেই জাগিতে চাহিতেছে না। এটা অভিমান বিসর্জনের স্বাভাবিক ফল না নিশ্চয়। অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, অভিমানকে তুমি তাড়াইতে পার নাই। সে তোমার কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া একটু দূরে সরিয়া বসিয়াছে মাত্র। এখনও তোমার প্রাণের খুঁটিটা ধরিয়া সে বসিয়া আছে—এখনও তুমি তাহারই মোহে অন্ধ হইয়া রহিয়াছ। কেমন করিয়া তাহা বলিতেছি।

বাসনা বা ইচ্ছাকে নিরোধ করিবার অভিমানের আস্ফালন আমাদের বলিয়া তুমি মনে করিয়াছ। এক্ষেত্রে নিরোধশক্তিকে তোমার আত্মকর্তৃত্ব দিয়াই পরিচালনা করিতে হইবে; অর্থাৎ তোমার ইচ্ছাকে তুমিই নিরোধ করিতেছ—এই ভাবটি তোমার মাঝে থাকিবেই। তাহা হইলে এর মাঝেই তো অভিমানের বীজ রহিয়া গেল। প্রথম অবস্থায় এটুকু অভিমান প্রয়োজন হয়, নতুবা আত্মশাসন চলে না, সত্ত্বশক্তি জাগে না—প্রথমে নিজের জোরেই নিজকে জব্দ রাখিতে হয়। কিন্তু এমনি করিয়া নিরোধশক্তি

পরিচালনা করার মাঝে যদি একগুঁয়েমি থাকিয়া যায়, তবেই বিপদ। নিজকে যতই শাসনে রাখিবে, ততই অপূর্ব্ব রসে অন্তর রসিয়া উঠিবে—এই যদি না হয়, তা হইলে সকলই বৃথা। অনেক সময় কিসের জন্য সাধনা তাহা ভুলিয়া গিয়া সাধনা লইয়াই আমরা মত্ত হইয়া পড়ি; ইহাতেই যত গোল ঘ । যখন নিরোধ করিতে হইবে, তখন নিরোধই করিয়া যাই, নিরোধের পরিণামে যে কি পাইলাম, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন দেখি না—এই হইল জড়ত্বের নিশানা।

তোমাকে ভালমন্দ দুইটাই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। এখন বাসনা নিরোধ করিতেছ সাময়িক প্রয়োজনে; কিন্তু নিরোধই তো তোমার উদ্দেশ্য নয়। তোমার উদ্দেশ্য গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়া—নিজকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া নয়। তোমার ক্ষুদ্র বাসনাকে নিরোধ করিতেছ—সে কি আঁধারে ডুবিয়া যাইবার জন্য? যতদূর অভিমানকে নিরুদ্ধ করিবে, ততদূর আপনাকে অন্তরের মাঝে সচেতন করিয়া তুলিবে—এই দুইটী কাজই এক সঙ্গে হওয়া চাই। যারা বাসনার সঙ্গে একেবারে মর্ম্মান্তিক ভাবে আপনাকে জড়াইয়া নিয়াছে, বাসনার উচ্ছেদে তাহারা নিষ্ক্রিয়, জড় হইয়া যায়, কেননা কর্তৃত্বাভিমানের আশ্রয় ছাড়া আর কোনও দাঁড়াইবার ঠাঁই তাহারা জানে না। কিন্তু বাসনাকে যাহারা বাহিরের বলিয়া জানিয়াই তাহাকে আঘাত করে, তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া ঢলিয়া পড়ে না। তাহাদের ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্ব তখন দূর হইয়া যায় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরাজের কর্তৃত্বের স্ফুরণ তাহাদের মাঝে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

এই জন্যই অভিমান ভাঙ্গা। যেমনি আপনার ইচ্ছাকে সংযত করিবে, অমনি, যদি আধার শুদ্ধ হয় তবে দেখিবে, আর কাহার ইচ্ছা তোমার কর্ম্মে রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার যো কি আছে এ জগতে? বিশ্বময় যে অপরূপ ছাঁদে নৃত্য চলিয়াছে, তোমার অন্তরের স্পন্দন যে তারই তালে তালে। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ-নৃত্যকে নিশ্চল করিবার সাধ্য কি তোমার? তবে তা-ও পার, যদি নিজের পায়ে শিকলি পরাইতে পার; কিন্তু এ তো সেই অভিমানেরই খেলা।

তাই বলি, গোড়াতে যাহাই কর না কেন, চরমে তোমাকে সব অভিমান ছাড়িতে হইবে—এমন কি নিজকে বাঁধিবার অভিমানটুকু পর্য্যন্ত। আমিত্বের সিংহাসন শূন্য করিয়াছ—সে তো তোমার অন্তরের সেই মহারাজাধিরাজের জন্য। সে সিংহাসন তো কোনও দিন শূন্য থাকে না; তবে অভিমানে অন্ধ হইলে রাজাকে সেখানে দেখিবে না বটে।

তুমি যে দীনাতিদীন, এ কথাও যেমন সত্য, তেমনি তুমি যে রাজরাজেশ্বরের সন্তান এ কথাও সত্য। দৈন্য আর বীর্য্যে যখন সামঞ্জস্য হইবে, তখনই তোমার মাঝে সত্যের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে। দৈন্য দিয়া মিথ্যাকে আঘাত কর, তার অন্তঃসারহীন স্পর্দ্ধা মাটীতে লুটাইয়া পড়ুক—তুমি কি, তাই চিনিয়া লও। তারপর তোমার সত্যে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অন্তরের মধুধারা যে আপনা হইতে উৎসারিত হইয়া পড়িবে—বুঝিবে, ক্ষুদ্র হইলেও তুমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—প্রলয়-বহ্নির প্রচণ্ড শক্তি মুহূর্ত্তে তোমার ভিতর হইতেই সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে। এই তোমার আর একরূপ।

অভিমানের বড়াই চাই না—চাই বীর্য্য। বীর্য্য সত্যস্বরূপ—বড় হইয়া দেখা দিবার

জন্য তাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয় না। অন্তর তোমার অগ্নিময় হইয়া উঠুক, সমস্ত অশিবকে পরাভূত করিবার মহাবীর্য্য তোমার চিত্তে জাগুক—অভিমানের আস্ফালন স্তব্ধ হইয়া যাইবে অথচ তাহার অন্তর্নিহিত জ্বালাময় সত্য জীবনকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে। যদি জান, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আধারের মাঝে কাহার মহিমা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তবে এই বিশ্বে এমন কোন্ শক্তি আছে যে তোমার পথ আগুলিয়া রহিবে? অনন্ত বীর্য্যের, অনন্ত আনন্দের, অনন্ত প্রাণের স্ফুলিঙ্গ তুমি—কোথায় তোমার অবসাদ, কোথায় নিরানন্দ, কোথায় জড়তা? শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মজ্যোতিঃতে আলোকিত এই তোমার তনু মন—কোন কলঙ্ক ইহাকে স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা করিবে?

ছোট থাকিয়াও এমনি করিয়া তুমি বড় হইতে পার—চিত্তে এমন শক্তি সঞ্চয় করিতে পার, যাহার কাছে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাও তুচ্ছ হইয়া যায়। প্রথমে তোমাকে জগতের সত্যসিদ্ধদিগের গোষ্ঠীভুক্ত হইতে হইবে। অভিমানকে যদি কোনও দিক দিয়া প্রশ্রয় দিবার কোনও সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এই —বাহিরে তুমি বড় নও, তুমি বড় অন্তরে। এই কথাটা তোমার জীবনে নিগূঢ়ভাবে সত্য বলিয়াই তোমার ভিতরে অভিমান জাগিয়াছিল। কিন্তু সেই অভিমানকে তুমি বহির্ম্মুখে প্রসারিত করিয়াছিলে তাই সে মিথ্যার সাজ্ পরিতে হইয়াছে। বাহিরকে খাটো করিয়া অন্তরকে প্রসারিত কর— দেখিবে, অভিমান এইবার সত্য আশ্রয় পাইয়াছে। আর তার মাঝে দ্বন্দ্ব নাই, ছলনা নাই, আত্মপ্রবঞ্চনা নাই—সৌরকররেখার মত সূক্ষ্ম হইয়াও তুমি দিগন্তব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ।

এইখানে মিথ্যা অভিমানের সমাধি আর সত্য স্বরূপের উদ্বোধন। (ক্রমশঃ)

সিদ্ধি ও সিদ্ধাই

প্রশ্ন হল, কেউ যদি অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চয় করে' পরলোকের সঙ্গে খবরাখবর চালাতে পারে, তবে সেটা কি কোনও ক্ষতির কারণ হবে? আর তা যদি সম্ভব হয়, তবে সে সাধনার নির্দ্দিষ্ট কোনও পথ আছে কি?

এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ জবাব দিতে হলে আগে আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখ্‌তে হবে, এ সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে বেদান্তের কি রকম সম্পর্ক দাঁড়ায়।

বেদান্তমতে পথ দুটী—এক হচ্ছে প্রবৃত্তি-মার্গ বা কর্ম্মপথ, আর একটী হচ্ছে নিবৃত্তি-মার্গ বা জ্ঞানপথ। খ্রীষ্টান শাস্ত্রে যাকে বলেছে কর্ম্মানুগা মুক্তি, বেদান্তের কর্ম্মপথ অনেকটা তাই; আর খৃষ্টানেরা যাকে বলে শ্রদ্ধানুগা মুক্তি, বেদান্তের জ্ঞানপথ কতকটা তার অনুরূপ (অবশ্য মুক্তি কথাটা এখানে খৃষ্টান শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুযায়ীই ব্যবহার

করা হয়েছে)। এই দুই পথে পার্থক্য কোথায়?

হিন্দুরা কর্ম্মপথকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে দেখি, এ পথে চলে, মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত কতকগুলি শক্তি অর্জ্জন করতে পারে, পৃথিবীতে তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। কর্ম্মপথের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকের আপন আপন সম্পত্তির পুঁজিটুকু বাড়ানো। উন্নতির বিশেষ একটা পর্য্যায়ে মানুষের পক্ষে এটা স্বাভাবিক বটে; ব্যক্তিগত অধিকারের সীমা সকলেই বাড়াতে চায়, কিন্তু শুধু তাই করে তো মানুষ বাঞ্ছিত অমৃতের সন্ধান পাবে না—প্রাণময় হতে পারবে না। এদিক দিয়ে সাধক পরীক্ষা চলতে পারে বটে, কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন এগুলির কাছ থেকে আমাদের হটে যেতেই হবে—এই বাসনার অর্থ, বাঞ্ছা, সর্ব্বগ্রাসী অবিদ্যাকে ছেড়ে জ্ঞানের পথ গ্রহণ করতেই হবে।

কর্ম্মমার্গ তিনটী। এ পথে আছে কেবল সাংসারিকতা। আবার মোটামুটি, ধরতে গেলে সংসারও তিনটী। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ সংসার অর্থাৎ এই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, দ্বিতীয়তঃ মানসিক সংসার বা সূক্ষ্ম জগৎ, তৃতীয়তঃ অবিজ্ঞাত সংসার বা কারণ জগৎ। এই কয়টী হল সংসারের প্রধান বিভাগ; এই বিভাগগুলি অন্ততঃ কতকটা পরস্পর নিরপেক্ষ।

যখন আমরা স্বপ্নরাজ্যে বা সূক্ষ্ম জগতে যাই, তখন এই স্থূল জড় জগৎটাকে পেছনে রেখে যাই। তেমনি ঘটে অবিজ্ঞাত সংসারের বেলাতেও। সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে অবিজ্ঞাত সংসারের কতকটা নমুনা দেওয়া চলে। সেখানে গেলে তুমি এমন একটা ঠাঁই পাবে যেখানে "তুমি-আমি"র কোন সম্পর্ক নাই।

খ্রীষ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, হিন্দুর স্বর্গ—সমস্তই মানসিক-সংসারের অন্তর্গত। এই মানসিক জগতের অনেকগুলি স্তর আছে, তারই এক স্তরে প্রেতের বাস। এ সমস্ত খুঁটিনাটি কথা তোলবার এখন কোনও প্রয়োজন নাই। কর্ম্মের পথে কেবল সাংসারিকতা। আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্য বাড়াবার জন্য যে কর্ম্মই করি না কেন তাই হচ্ছে সাংসারিকতা।

একজন বড় বৈজ্ঞানিক বাষ্প কিম্বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধে নূতন একটা কিছু আবিষ্কার করলেন—এতে তাঁর ব্যক্তিগত শক্তির প্রসার ঘটল, ভূতগ্রামের উপর তাঁর কতকটা কর্তৃত্ব খাটল। তার এই কার্য্যের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ—তার জন্য আমরা তাঁকে সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব, পূজা করব, কিন্তু মুক্তির সন্ধানে তাঁর কাছে তো আমরা ছুটি না। তাঁর আবিষ্কারের দরুণ যা পাওনা, তা দিতে আমরা রাজী,—কিন্তু অমৃত ও আনন্দ পাব বলে, সব পাব বলে তাঁর কাছে তো আমরা যাই না। এ বিষয়ে তাকে অজ্ঞ বলতেই হবে।

আবার ধর, বাস্তবপন্থী হিসাবে সুপণ্ডিত একজন দার্শনিক রয়েছেন মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি আমাদের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে মনের আভ্যন্তরীণ সন্ধান পেতে পারব, চিত্ত বুদ্ধি ও বেদনার ক্রিয়া বুঝতে পারি—এজন্য তাঁর কাছে নিশ্চয়ই আমরা কৃতজ্ঞ। তবুও হৃদয়ে শান্তি পেতে চাইলে মিল, স্পেন্সারের কাছে ছুটলেও তো তা মিলবে না। [illegible] গভীর মাঝে

সবাই ওস্তাদ, কিন্তু যে বস্তুটীর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেটী তো কেউ দিতে পারবে না।

অধ্যাত্মবিদ্যার ব্যবসা করে এমন লোক ভারতবর্ষে অনেক আছে—পরলোকের খবর তারা দিতে পারে। পরলোক সম্বন্ধে তারা অনেক তত্ত্বই জানে,—সে শুধু স্থূলবিষয় নিয়ে নয়, সূক্ষ্মবিষয় নিয়েও; কিন্তু সংসারী ভাব পালাবে কোথায়—এখন এই স্থূলজগৎ নিয়েই কারবার কর, আর সূক্ষ্ম মনোজগৎ নিয়েই কারবার কর। কিন্তু সত্য বা পরমার্থ এই তিনটী জগতেই অগোচর, অথচ এই তিনেরও অতীত। যাঁরা স্বর্গ জগতের খবর দেন, তাঁদেরও অন্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দের মত মান দিতে রাজী আছি। কিন্তু শান্তি সুখের জন্য তো তাঁদের কাছে মাথা নত করতে পারি না, কেননা সে জিনিষ দেবার মালিক তাঁরা নন।

এমনও হতে পারে যে একজন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের দিব্যজ্ঞান জন্মেছে; ভৌতিক জগৎ নিয়ে যার কারবার, তারও তত্ত্বজ্ঞান থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তখন তার ভৌতিকবিদ্যার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের সম্বন্ধ দাঁড়াবে কি রকম?—এই যেমন রামের বেদান্তজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর গণিতবিদ্যার যে রকম সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। রাম গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু যে বেদান্তের প্রচার তিনি এখন করছেন, তার সঙ্গে গণিতের তো কোনও সম্বন্ধই নাই। জুটতে যেন আমরা খোঁজ পাব না দেখে।

অবতারে রামের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তিনি ভৌতিক বিদ্যা জানতেন। তাঁর দুচোখ বেঁধে একখানা গণিতের বই হাতে দেওয়া হয়েছিল; বইখানা পূর্ব্বে কখনও তিনি দেখেন নাই। কিন্তু তবুও চোখ বাঁধা অবস্থায় তিনি তা পড়ে যেতে লাগলেন। অঙ্কশাস্ত্রে অনেক সঙ্কেতের ব্যবহার আছে; সে গণিতের বইখানাতে এমন সব সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও কথা ছিল, যা সে ভদ্রলোকটীর জানবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তিনি একখানা সাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে, তার উপর বইয়ে যা লিখা ছিল সব নকল করে যেতে লাগলেন। সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি তিনি উচ্চারণ করে পড়তে পারলেন না বটে, কিন্তু কাগজের উপর সেগুলো ঠিক ঠিক লিখে দিলেন। এমনি অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল। অপরে কি ভাবছে তা তিনি বলতে পারতেন, তাঁর কাছ থেকে দূরে বসে কেউ কিছু লিখলে, তিনি তাও পড়তে পারতেন। এই তো দেখ একজন অদ্ভুতশক্তিধর পুরুষ, কিন্তু তা বলে তিনি সাধু মহাপুরুষ তো মোটেই নন। ইনিও খুব দস্তুর সংসারী—সাধু নন বা জ্ঞানী নন।

ভৌতিকবিদ্যাকে অনেক সময় বিজ্ঞান বলা হয়। তা বিজ্ঞান হিসাবে একে আমরা মানতে পারি। কিন্তু যা নাকি তোমাকে সত্যের অধিকার দেয়, অমৃত আনন্দের অধিকার দেয়, তোমাকে সমস্ত মোহের বিকার হতে মুক্ত করে, তার সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেললে তো হবে না।

ভারতবর্ষের আর একটী লোকের কথা জানি, ছয়মাস ধরে যে মরার মত পড়ে ছিল। প্রাণের বিনাশ না করবার উপায় হচ্ছে খেচরী মুদ্রা, হঠযোগের পুস্তকে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এই লোকটীও সেই যোগ অভ্যাস করেছিল। তার মাঝে জীবনের কোনও চিহ্ন ছিল না, নাড়ীতে রক্তচলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছয়মাস পরে আবার সে বেঁচে

উঠ্‌ল। এই তো ধর একজন শক্তিধর পুরুষ। তার এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতায় দ্বিতীয় খৃষ্টের মত সে মান পেতে পারে। সে খৃষ্টের মত তিনদিন মাত্র কবরে থাকেনি—ছয়মাস মরে থেকে আবার বেঁচে উঠেছিল। কিন্তু তবুও বলব সে মুক্ত নয়, সুখী নয়। যে সমস্ত কুকার্য্য সে করেছিল, তা উল্লেখ করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট, যে রাজার দরবারে সে এত সমস্ত শক্তি দেখিয়েছিল, অবশেষে সে রাজা তাকে রাজ্য হতেই দূর করে দিয়েছিলেন।

আর একটি লোক ছিল, সে জলের উপর হাঁটতে পারত। একজন সাচ্চা সাধু হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ শক্তি অর্জ্জন করতে কতদিন লাগল? লোকটা বললে সতের বৎসর। সাধু বললেন—এই সতের বৎসরের সাধনায় যা তুমি পেয়েছ, তার দাম হচ্ছে দু' পয়সা! মাঝিকে দুটো পয়সা দিলেই সে আমাদের নদী পার করে দেয়।

সমস্ত ব্যক্তিগত শক্তিই সীমাবদ্ধ, স্থূল জগতের ধনজন যেমন করে তোমাকে বাঁধে, এও তেমন করে তোমাকে বাঁধে। শিকল শিকলই—এখন সে লোহারই হোক্ আর সোনারই হোক্। সোনার হলেও বাঁধতে তো সে কসুর করে না।

এই সমস্ত সিদ্ধাই থাকলেই যদি মানুষ বড় সাধু হন, তাহলে কুকুরও তো বড় সাধু। কেননা কুকুর ঘ্রাণেই বুঝতে পারে শিকার কোথায় আছে। কুকুরের যে ঘ্রাণশক্তি আছে, মানুষের তা নাই; কাজেই কুকুরও সিদ্ধপুরুষ।

এক ফকির ছিল, সে যাকে-তাকে রাজা বানাতে পারত। কি করে সে এ শক্তি পেল? সে বলল, এর জন্য কতদিন সে উপোষ করে রয়েছে, তারপর কতদিন পর্য্যন্ত শুধু গোবর খেয়ে রয়েছে; এমনতর কত অসাধ্য সাধন করে তবে সে এই শক্তি লাভ করেছে। শুনে আর একজন হেসে বলল, "বাবা, তুমি অপরকে রাজা বানিয়ে রাজভোগ দাও—কিন্তু তোমার ভাগে পড়ে শুধু গোবর।" যারা সিদ্ধাই পেয়েছে, ভারতবাসীর কাছে তাদের মান এইটুকু। তারা জানে, আমাদের সকল অভাব মিটাতে পারে একমাত্র আত্মজ্ঞান।

একটা লোক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ৫০০৲ টাকায় তার ঘরদোর সব বিক্রী করে ফেলেছে; মাতাল অবস্থাতেই সে ৫০০৲ টাকায় বাড়ী-বিক্রীর দলিলখানা লিখে দিয়েছে। ব্যাপার দেখে তার স্ত্রী তাকে খানিকটা সিরকা খাইয়ে দিল, অমনি তার নেশা ছুটে গেল। তখন সে বুঝ্‌তে পারল, অত বড় বাড়ীখানা অমন জলের দামে বিক্রী করাটা তার পক্ষে কি বোকামিই হয়েছে। তখন সে ভাবল, যে লোকটা তার বাড়ী কিনেছে, তার নামে সে মোকদ্দমা করবে; অজুহাত সে মাতাল অবস্থায় যা কিছু করেছে, তা আইনতঃ সিদ্ধ হতে পারে না। এ জগতেও অনেকের এমন অবস্থা ঘটে। কারু মাঝে ধর্ম্মের একটা মাদকতা আসে, তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে তারা সব বিলিয়ে দেয়, টাকা কড়ি, বাড়ী ঘর, বাপ মা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র সব তারা ভগবানের নামে ছেড়ে আসে। কিছু দিন নূতন ভাবের উন্মাদনায় বেশ দিন কাটে; কিন্তু তার পরেই সাংসারিক নানা খুঁটিনাটীতে এসে তাদের চেপে ধরে—অভাব অনাটনের বোধ ক্রমেই তীব্র হয়ে দেখা দেয়।

এইসাব সিরকা খেয়ে মাতলামী ছুটতে থাকে, আর তখন ভগবানের উপর উল্টো দাবী চলে। তখন এই দেহও আমার দেহ, বাড়ীও আমার বাড়ী ; ক্রমে ভগবানকে যা দেওয়া হয়েছিল, তা তো মানুষ ফিরে নেয়-ই—উপ-রন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরটুকু ধরে টান দিতেও কসুর করে না। এমন করে কোনও রকমে দিন চলে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক করে তুলতে না পারছ, চিরদিনের জন্য ভগবানকে সব বিলিয়ে দিতে না পারছ, সাংসারিক সমস্ত বিপদ-আপদ হতে চরিত্রের দুর্ভেদ্য কবচ দিয়ে আপনাকে রক্ষা করতে না পারছ, ততদিন পর্য্যন্ত সুখ-শান্তির আশা বৃথা। এ সংসারের জন্য ভয়েরই বা কি আছে, ভবসারই বা কি আছে—তোমাকে তো এ সব ছাড়িয়ে উঠতে হবে।

এক রাজার দরবারে এক হঠযোগী এসে উপস্থিত—এসেই সে সমাধিস্থ হয়ে পড়ল। তার আর জীবনের কোনও চিহ্ন নাই দেখে লোকে ঝড়-বাদল থেকে বাঁচাবার জন্য তার উপর একখানা কুঁড়ে বেঁধে দিল। এক-রাত্রে খুব ঝড় হওয়ায় যোগীর মাথার উপর তার কুঁড়েখানা ভেঙ্গে পড়ল। কি করে যেন তার যোগ ভঙ্গ হল, সে হুঁস্ পেয়েই বলে উঠল, "এক ঘোড়েকো বখ্‌শিস্ হুকুম হোয় মহারাজ।" ভারতবাসীরা তাই জানে যে, এমনি চরিত্রের লোক যতক্ষণ সমাধিতে থাকে, ততক্ষণ তারা থাকে ভাল—কিন্তু বাহ্যজগতে ফিরে এসে তারা সাধারণ লোকের মতই কাঙ্গালী হয়ে পড়ে।

ছোরা গিলা, তলোয়ার গিলা, চামড়াতে ছুঁচ ফুটানো ইত্যাদি অনেক রকম বুজরুকীই ভারতবর্ষে হামেশা দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মনটাকে ঘণ্টা তিন-চারেক নিষ্ক্রিয় রাখতে জানলেই যে দিব্যজ্ঞানের সমাধি আয়ত্ত হল, তা বলা চলে না। ভারতবর্ষে অমন হাজার হাজার মানুষ এই সমস্ত বাহ্য সমাধির অভ্যাস রাখে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দৈত্য প্রমিথিউসের (Prometheus) মত তারা স্বর্গ থেকে আগুন চুরী করে আনে মাত্র। এ কেবল আমাদের চোখের সামনে একটা পরদা টেনে দেওয়া মাত্র—তাও চিরকালের জন্য নয়, কিছুকালের জন্য।

ধর একটা পুকুর ; তার উপর সবুজ রঙের একটা ময়লার সর পড়েছে। সবটা একটু কেটে দাও, দেখবে নীচে দিব্যি টলটলে জল। আবার হাতখানা টেনে নাও, অমনি সবুজ সরে এসে জলটা ঢেকে ফেলবে—অমন যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল, তাও আড়াল হয়ে পড়বে। আমাদের মন সায়রের উপরও যে ময়লার সর পড়েছে, সেটাকে কেটে দেওয়া যেমন যুক্তিযুক্ত, তেমনি সম্ভবপর। দুচার মিনিটের জন্য যদি সবুজ সরটা সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে চিত্ত সমাধান হবে বটে, কিন্তু তাতে চিরদিনের জন্য যোগ আরাম হবে না তো। কিন্তু যদি বার বার করে সবটাকে কেটে দাও, একটু একটু করে ময়লাগুলো পুকুর থেকে তুলে দূরে ফেলে দাও, তাহলে ক্রমেই সবটা পাৎলা হয়ে আসবে—অবশেষে সমস্তটা পুকুরই টলটলে হয়ে উঠবে। বেদান্ত ঠিক এইটা করে দিতে চান।

বেদান্ত বলেন, মুহূর্ত্তের জন্য যদি তুমি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পার, তবেই তোমার কত আশ্চর্য্য রকম বিভূতি লাভ হয়। আর এই সমস্তটা জগৎ তোমার মুঠার মাঝে আসুক, এ কি তুমি চাও না?

কিন্তু এ সবই তোমার হবে, যদি ত্যাগের চরম শিখরে আরোহণ করতে পার।

রাজার একজন আমলার সঙ্গে যদি ভাব কর, তবে শুধু তাকেই হাত করতে পারবে; তাকে ধরে রাজার সঙ্গে কি অন্যান্য আমলার সঙ্গে ভাব হবে কি না, তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু রাজাকে যদি কোনও রকমে হাত করতে পার, তবে সব আমলারা যেচে এসে তোমার সঙ্গে দোস্তি করবে।

ভারতবর্ষে এমন লোক আছে, যারা কেবল শক্তি খোঁজে—সিদ্ধাই খোঁজে, তা তারা পায়ও। আবার এমনও অনেক আছেন, যাঁরা এ সমস্ত কিছুই চান না, তাঁরা এগুলি এড়িয়ে যেতে চান। তাঁরা চান, ত্যাগপথের পথিক হতে! যে জিনিষটী জানা সব চেয়ে দরকারী, সেই জিনিষটী তাঁরা চান। ত্যাগ ছাড়া এ জগতের কোনও শক্তিই আয়ত্ত হয় না বটে, কিন্তু সিদ্ধাই খুঁজতে গেলে ত্যাগ সম্পূর্ণ না হলেও চলে। ত্যাগ যদি সম্পূর্ণ হয়, তবে অধিকারও সম্পূর্ণ হবে—সমস্ত জগতই তোমার হবে। যাঁরা ত্যাগের পথে চলেন, তাঁরা খোঁজেন রাজাকে; রাজাকে যদি নিজের মাঝে তাঁরা পান, তা হলেই হল—আমলারা তখন আপনা হতেই তাঁদের চাকর হবে। এটাই হচ্ছে সহজ ও স্বাভাবিক পথ। সিদ্ধাই এসে তোমাকে খুঁজবে। তুমি তাকে খুঁজতে যাবে কেন?

সূক্ষ্মশক্তি অর্জ্জন করা কি উচিত? যদি শুধু তার জন্যই সাধনা কর, তবে এও একরকম সাংসারিকতাই হবে। বেদান্ত বলছেন, মরার সঙ্গে কথা চালাবে—এ আর একটা বেশী কথা কি? কিন্তু জ্যান্ত মানুষের সঙ্গেও যদি ঠিক তেমনি করে কথা চালাতে পারতে, তবে সে আরও ভাল হত না কি? আসল প্রশ্ন হচ্ছে, মরারাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসে, না আমাদের আত্মাই এই সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করেন? এ বিষয়ে বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে সূক্ষ্মলোককে যদি স্থূল জগতের ভূমি হতে দাঁড়িয়ে দেখ, তবে বলবে যে মরা মানুষই তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসে। সত্যের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, এই যে স্থূল জড়জগতের লোকে বলে, অমুক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এও মিথ্যা কথা। সত্যের দিক থেকে এমন কথাও ভুল কেননা তোমার আত্মদর্শন হলে [illegible] সম্মুখে, তোমার ঊর্দ্ধে, তোমার পশ্চাতে, সে ছাড়া যে আর কেউ নাই। এই আপাতদৃশ্যমান বৈচিত্র্যের মাঝে ভূমাই তো নানা রূপে দেখা দিচ্ছে। [illegible] শক্তি, মন্ত্র সব ভূমি—এই হচ্ছে বেদান্তের সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক মরামানুষ এসেছে—এ কথা বলা ভুল; এ যে আমরাই রূপান্তরে, অন্য ভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছি।

সিদ্ধাইর সম্বন্ধে যেন একটা বিষাক্ত সাপ। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় সাপটা যেন একেবারে জমে গিয়েছে, গুটিসুটি হয়ে সেটা একটা বালের মত হয়ে রয়েছে—ইচ্ছা করলে তাকে ধরতেও পার। ধরে যেন তাকে বাড়ীতে এনে আগুনের পাশে রাখলে। আগুন তাতে যখন তার জড়তা নষ্ট হয়ে গেল, তখন সে কুণ্ডলী খুলে তোমাকে কামড়ে দিল। সাপের যে বিষ এতক্ষণ ছিল না, তা আবার এল, কেননা তার বিষ তো একেবারে চলে যায়নি। অনেকের চিত্তসমাধান ঠিক এমনিতর। তারা যখন একাগ্র হয়, তখন তাদের মনের সাপটি

কেবল কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে মাত্র। বিষদাঁত তখন কিছু কালের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকে। এই ছোট্ট মনটা তখন ঘুমিয়ে থাকে বা তার সমাধি ঘটে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে সাপটা মরেছে, কিন্তু বাস্তবিক তখনও তার মরণ হয়নি। কিন্তু এই সাপটা কেউটে জাত। তা এক রকম বাগ মানানো যায়। একটা বাঁশী নিয়ে আমরা যদি তার সামনে বাজাই, যদি সাপের মন্ত্র আওড়াই, তবে ক্রমে সে মন্ত্রে নির্বীর্য্য হয়ে পড়বে। তখন, ওস্তাদ হলে আমরা সাপটাকে ধরে তার বিষদাঁতগুলো ভেঙে দিতে পারি। সাপের বিষদাঁত যখন গেল, তখন তার বিষও গেল। বৈদান্তিক মন বশ করেন এমন করে।

যারা সিদ্ধাই খোঁজে, তারা মনটাকে শীতজাড়ই সাপের মত করে রাখে। ফলে তারা একটু আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ তো স্থায়ী হয় না। তার ফলে সংসারে, ছেলেপুলে আত্মীয়-স্বজন শত্রু-মিত্র সবাই এসে কামনা বাসনার উত্তাপ আবার তার মনের সাপটাকে চাঙ্গা করে তোলে। তাপ পেয়ে সাপ যখন ফণা ধরে ওঠে তখন আবার মনের মাঝে কামনার তাণ্ডব সুরু হয়ে যায়—আবার মনের নষ্টামি বুদ্ধি জেগে ওঠে। সাপের বিষদাঁত তো ভেঙে দেওয়া হয়নি, তাই তার বিষও মরেনি। এমনি করে চরিত্রগঠনও কখনো হয় না—আত্মশক্তিও জাগে না।

এই সব সিদ্ধাই নিয়ে অনেকে ব্যবসা জুড়ে দেয়। মনকে সমাহিত করবার, সে তো ভালই, কিন্তু সাপের বিষ আগে কাটাও; তার বিষদাঁতগুলো ভেঙে ফেল, বাসনা কামনার ঊর্দ্ধে ওঠ। আগে চরিত্রগঠন কর। এ সব গুণ চেষ্টা করে অর্জ্জন করতে হয়—এদের ভুল থাকলে চলে না। তোমার মাঝে যা কিছু দুর্ব্বলতা সব যখন দূর হয়ে যাবে, তুমি যখন দাঁতভাঙ্গা সাপের মত নির্ব্বিষ হবে, তখনো তুমি শীতে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে পার বটে। কিন্তু আড়ষ্টভাবে থাকবার কোনও প্রয়োজন হয় না তখন, কেননা তোমার দাঁতে যে আর তখন বিষ নাই। তখনি জানবে তোমার যথার্থ চরিত্র গঠিত হয়েছে। কর্ম্মকোলাহলের মাঝে থেকেও তোমার তখন ক্ষতি হবে না—কেননা তখন তুমি সকল কোলাহলের অতীত।

অধ্যাত্মশক্তি অর্জ্জন করতে হলে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে হয় কি?—হাঁ নিশ্চয়। কেউ যদি ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়, তবে তাকে একটা বিশেষ রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, যদি কেউ ডাক্তার হতে চায়, তবে তাকে মেডিকেল কলেজে যেতে হয়। তেমনি অতীন্দ্রিয় বিভূতির সন্ধান পেতে হলে একটা বিশিষ্ট শিক্ষার ধারা অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সে কথা এখানে তোলবার কোন প্রয়োজন নাই। ছায়ার পেছনে—মায়ার পেছনে দৌড়াবার পরামর্শ রাম তোমাদের কাকেও দেবেন না। সাধুরা যেখানে থাকেন, সেখানে ভূত তিষ্ঠাতে পারে না।

হিমালয়ের যে গুহাতে রাম থাকতেন, লোকে বলত তার মধ্যে ভূতের আড্ডা আছে। আশ-পাশের গ্রামের লোকেরা বলত, ওই গুহাতে রাত কাটাতে গিয়ে কত-বার কত সন্ন্যাসী মারা পড়েছে। কেউ কেউ নাকি গুহা দেখতে গিয়ে ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা গিয়েছে। রাম যখন বললেন, তিনি ঐ গুহাতে থাকবেন, তখন সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিন্তু ঐখানেই রাম মাসের পর মাস কাটিয়ে

এলেন, অথচ একদিনের জন্য একটী ভূতও রামের কাছে এল না। বোধ হয় তারা সব পালিয়ে গিয়েছিল। গুহার ভিতরে ছিল সাপ আর বিছা, বাইরে ছিল বাঘ। তারা আশপাশ ছেড়ে কোথাও যেত না বটে—কিন্তু কোনও দিন কেউ রামের কোনও অনিষ্ট করেনি।

বেদান্ত প্রমাণ করেছেন, যাঁরা জীবন্মুক্ত, মৃত্যুর পর তাঁদের প্রেতদেহে অবস্থান করতে হয় না। যারা নিজের মায়ায় নিজেই মুগ্ধ, তারাই মৃত্যুর পর প্রেতদেহ আশ্রয় করে। বদ্ধজীবই এই সময় ভূত-প্রেতের ছায়া-মূর্ত্তিতে বাঁধা থাকে।

ডাক্তার জন্সনের মত গল্পবাজ আর দুটী ছিল না। লোকে বলত, তার সঙ্গে যুক্তিতে কেউ আঁটতে পারত না। বন্দুক ছুঁড়তে বারুদে যদি তাঁর আগুন না ধরত, তবে তার কুঁদো দিয়েই তিনি গুঁতোতে সুরু করতেন। সব তর্কেই শেষ কথাটী তাঁর বলা চাই ই চাই। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, বার্কি তাঁকে তর্ক করে হারিয়ে দিয়েছেন। জন্সনের মত চরিত্রের লোকের কাছে এ তো স্বপ্ন নয়—এ যেন একটা বিভীষিকা। স্বপ্ন দেখেই তিনি বিছানা হতে লাফিয়ে উঠেছেন—আর কিছুতেই তাঁর ঘুম আসতে চায় না—মন এমনি উচাটন হয়ে গেল। কিন্তু মনের যে দৈবী-সম্পদ রয়েছে, তার গুণে মন কখনও তো বেশীক্ষণ অশান্ত থাকতে পারে না। যেমন করেই হউক তাকে ঠাণ্ডা হতেই হবে, মনকে একটা কিছু দিয়ে বোঝাতেই হবে। ভাবতে ভাবতে জন্সনের মনে হল, বার্কি যে সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন, সে তো তাঁরই মনে ছিল—আসল বার্কি তো তার কোন খোঁজ পেতে পারে না। তা হলে এ যে তিনিই বার্কি হয়ে নিজেই নিজকে তর্কে হারিয়েছেন।

তুমিই তো ভাই তোমার কাছে ভূত প্রেত, শত্রু-মিত্র, গাছ-পালা, বন বাদাড় হয়ে দেখা দিচ্ছ। স্বপ্নে দেখলে একটা পাহাড় আর একটা নদী। তারা যদি তোমার বাইরে থাকত, তবে তো নদীর জলে তোমার বিছানা পত্র সব ভেসে যেত, আর পাহাড়ের চাপে ঘরশুদ্ধ সব গুঁড়িয়ে যেত। বিশাল পর্ব্বত আর উত্তাল নদী-সবই তোমার মাঝে। তুমিই বহিদৃশ্যে নিজকে ছড়িয়ে দিয়েছ—দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একদিকে তুমি হয়েছ বিষয়, আর এক দিকে হয়েছ বিষয়ী। বাস্তবিক পক্ষে তুমিই তো একাধারে বিষয় ও বিষয়ী। আত্মা এবং অনাত্মা উভয়ই তুমি। তুমি আপনারই গুল, আবার তুমিই দেওয়ানা বুল্‌বুল্। তুমিই মধু, তুমিই মধুকর। সবই তো তুমি। ভূত-প্রেত, দেবতা গন্ধর্ব্ব, পাপী পুণ্যবান সবই তুমি। এই সত্য জান—এ সত্য অনুভব কর—তবেই তুমি মুক্ত। এই হচ্ছে ত্যাগের পথ। তোমার কেন্দ্রকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করো না—তাতে পতন হবে তোমার। আত্মাকে শ্রদ্ধা কর-আত্মাতে সমাহিত থাক—কিছুই তোমাকে টলাতে পারবে না! ওঁ *

---

*স্বামী রামতীর্থ (স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০২)

বেদান্ত-সার

—:❀:—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—কর্ম্মবিচার]

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি

বাসনা হইতে কর্ম্মের উদ্ভব। আবার কর্ম্ম-ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হইতেই বাসনার পরিপুষ্টি। এমনি করিয়া কর্ম্মের বীজ যে পর্য্যন্ত ধ্বংস না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত সংসার চক্রে আমাদিগকে আবর্ত্তিত হইতে হইবে। অথচ কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই—স্থূলতঃ নিশ্চেষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম চেষ্টার বিরাম কখনও হইবে না। এই অবস্থায় পথ খুঁজিতে হইলে কর্ম্মের ভিতর দিয়াই খুঁজিতে হয়। সে পথ কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা। কর্ম্ম করা আমাদের আয়ত্ত—আমরা তাহাই করিব; কিন্তু কর্ম্মের ফল তো আমাদের আয়ত্ত নয়, সুতরাং তাহার জন্য চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিব না। ফলদাতা ভগবান, তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সকল কর্ম্মে সকল মননে জয়যুক্ত হউক—এমনি ভাব লইয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাতে সঞ্চিত কর্ম্ম নিঃশেষ হইয়া যায়, পরন্তু বাসনার ইন্ধন না থাকাতে আর নূতন করিয়া কর্ম্ম সৃষ্টি হয় না। ইহাতে চিত্তের গ্লানি দূর হইয়া যায়—ভাল মন্দ, সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টি আসে চিত্ত অনায়াস, ভাবমুক্ত, নির্ম্মল অথচ তেজস্বী হইয়া উঠে। এইরূপ শুদ্ধচিত্তই তত্ত্বস্ফুরণের অনুকূল ভূমি।

মোক্ষ আমাদের স্বরূপ অবস্থা। সুতরাং বিকার-কলুষিত দৃষ্টি দিয়া তাহার উপলব্ধি না হইলেও, তাহার নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অধিকার আমাদের নাই। যাহা স্বরূপ, তাহা নিত্য বর্ত্তমান, অতএব তাহা কোনও সাধন দ্বারা সাধ্য হইতে পারে না। এই জন্য মোক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ অপর কিছু দিয়া তাহা সিদ্ধ করার অর্থ প্রদীপ দিয়া প্রদীপকে প্রকাশ করা। সুতরাং আমাদের সমস্ত সাধনা নামতঃ মোক্ষাভিমুখী হইলেও কার্য্যতঃ তাহা প্রতিবন্ধক দূরীকরণেই সার্থক হইয়াছে। ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি লইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা মোহকে নষ্ট করিয়া প্রজ্ঞাকে তমোমুক্ত করে বলিয়া তাহাকে সাক্ষাৎভাবে মোক্ষসাধন না বলিলেও পরম্পরা ক্রমে মোক্ষসাধন বলা যাইতে পারে।

অবশ্য এতখানি সূক্ষ্মবিচার তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেই সুসঙ্গত। সাধারণতঃ আমরা মোক্ষকে প্রাপ্তব্য বলিয়াই মনে করি। অন্ততঃ-পক্ষে আমাদের মলিন চিত্তের নিকট মোক্ষ একটা আদর্শরূপে উপস্থিত হয়। এই আদর্শ ধরিয়া যদি আমরা সাধনা করি, তবে সাধনার চরম ফল সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বার্থবোধের অভাব থাকিলেও অবান্তর ফল সম্বন্ধে কোন ব্যত্যয় উপস্থিত হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বৈতবুদ্ধি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত যেমন সাধনা করিব, তেমন তাহার ফলও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব। এই দিক হইতে বিচার করিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। এখানে সূক্ষ্মবিচারে সিদ্ধিকে কর্ম্মের ফল বলা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু স্থূল-ব্যবহারের পক্ষে এবং সাধনায় আমাদের

আগ্রহ উদ্বোধনের পক্ষে এমন সংজ্ঞা বিশেষ দোষাবহ নহে।

কি করিয়া কর্ম্ম হইতে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥
—(১৮, ৪৫।৪৯)

তাৎপর্য্য এই, মানুষ যদি স্বকর্ম্ম নিষ্ঠ হয়, তবে সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কথাটা খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার মাঝে প্রথম সঙ্কট এই যে, কি আমার কর্ম্ম এবং কি ই বা অকর্ম্ম এই বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা নহে। গীতাতেও ভগবান অন্যত্র এই কথাই বলিয়াছেন। এই জন্যই আমাদের কর্ম্মে ব্যভিচার হয় এবং তাহার ফল পূর্ণ [illegible] আমরা চাহিতে পারি না। সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কাহারও স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তদনুযায়ী সাধনে সে প্রবৃত্ত হয়, তবে সিদ্ধিলাভ তাহার পক্ষে আয়াসসাধ্য হইবে না। প্রাকৃত বিবর্ত্তনের একটা ধারা আছে। সিদ্ধান্ত ভব হইতেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট সহজ ও স্বাভাবিক পথ। এই পথ ধরিয়া মানুষ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে পারে। হিন্দুর বর্ণাশ্রম এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; কর্ম্মযোগের মূলসূত্রও এইখানে।

কিন্তু এ ছাড়াও একটা কথা আছে। স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেও কর্ম্ম বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। যদি ইহার সঙ্গে অন্তর উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে সমস্ত অনুষ্ঠানই বৃথা হইবে। তাই কর্ম্মজ সংসিদ্ধি লাভের জন্য গীতায় ভগবান কর্ম্মসন্ন্যাসের উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মসন্ন্যাস মানে কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা নয়—তাহা অশিবও বটে, অসম্ভবও বটে। তাই নিরগ্নি এবং অক্রিয়কেই ভগবান সন্ন্যাসী বলেন নাই। এই কর্ম্ম সন্ন্যাসের ভাবের দিক দিয়া একটা তাৎপর্য্য আছে সেই তাৎপর্য্যই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

জগৎ জুড়িয়া যে বিকার আমরা দেখিতেছি, তাহারই নাম কর্ম্ম। এই বিকার শুধু বিষয়ের বিকার নহে, বিষয়ীর বিকারও বটে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা কর্ম্ম করি মানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রেরণায় বিষয় জগতে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত করি। তাই এই বিষয়ের বিক্ষোভকেই আমরা কর্ম্ম বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহার মাঝে বিষয়ীরও যে বিক্ষোভ রহিয়াছে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে কখন? বিষয়ীর স্বরূপ যখন আমরা বুঝিতে পারি, তখন সেই স্বরূপ হইতে ভিন্ন বিকারগুলিও স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু স্বরূপোপলব্ধিরও স্তর আছে। বিষয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ এক একটা উপাধি হইতে আমাদের এক এক রকম স্বাতন্ত্র্যাভিমান জন্মিয়া যায়। এই উপাধিগুলি আবার স্থূল বিষয়াবলম্বন হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। সাধনায় আমরা যত অগ্রসর হইতে থাকি, তত এই সূক্ষ্ম স্তরগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, এবং সূক্ষ্মভূমি হইতে স্থূলের বিকারগুলি আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। এই দৃষ্টি যাহার যত প্রসারিত, কর্ম্মের প্রভাব হইতে সে তত মুক্ত।

দেহ দিয়া আমরা একটা কাজ করিলাম। কর্ম্মে বিষয় জগতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল,

তাহা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। কিন্তু যে কর্ম্ম করিল, সেই বিষয়ী কোথায়? হয়ত সে দেহের সঙ্গে নিজকে জড়াইয়া রাখিয়াছে—অর্থাৎ সে দেহাত্মাভিমানী। এইবার কর্ম্ম বিক্ষোভ তাহার অভিমানের আশ্রয়রূপ দেহকে যতদূর বিচলিত করিবে, কর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে সে ততদূর মাত্র সচেতন হইবে। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ক্রিয়া তখনও হইতেছে নিশ্চয়ই কিন্তু সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ মূঢ়। এখানে কর্ম্মের যে দৃষ্টপ্রভাব দেহকে বিকৃত করিল, তাহার একটা প্রতিবিধান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যে অদৃষ্ট কর্ম্মশক্তি দেহাতীত উপাধিগুলিকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, তাহার উপর তাহার কোনও শক্তি খাটিবে না—সে ক্ষেত্রে সে বাত্যাবিতাড়িত কর্ণধারহীন তরণীর মত প্রকৃতির স্রোতে ভাসিয়া চলিবে।

যেমন দেহের বেলায়, তেমনি অন্যান্য সূক্ষ্মতর উপাধির বেলাতেও সর্ব্বত্রই অভিমানের আশ্রয়ভূমি হইতে তাহার নিম্ন দিকই আমাদের স্বাধীন কর্তৃত্ব খাটে—কিন্তু তাহার উপরের দিকে আমরা কর্ম্মাধীন। কর্ম্মের প্রতি এই অধীনতাই আসক্তির মোহময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। বাসনার ছলনায় আমরা অকর্ম্মকেও কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লই—অমৃতভ্রমে বিষ ভোজন করি; কিন্তু কি দিয়া যে কি হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। বাসনার রূপও কত বিচিত্র! যখন অভিমান যে উপাধির সঙ্গে যুক্ত হয়, বাসনা তখন তাহাকে লইয়া অভিনব জগৎ গড়িয়া তোলে। কখনও বাসনা দেহের পশুচিত বুভুক্ষাতে ফুটিয়া উঠিতেছে, কখনও বা মনের তৃপ্তিতে—কখনও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে—কখনও বা বুদ্ধির অহং-বিলাসে—এই সমস্তই কর্ম্মের প্রভাব, এই প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্যই সাধনা।

এই যদি কর্ম্মের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে আমরা কি সত্য লাভ করিতে পারি? বিচারে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি, বিষয়ের বিক্ষোভ আমরা নিমিত্ত স্বরূপ হইলেও তাহা আমাদের অন্তরঙ্গ নহে। সুতরাং বিষয়ের বিক্ষোভ নিরুদ্ধ করিতে পারিলেও কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তন হইতে আমরা নিস্তার পাইব না। কর্ম্মের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি অন্তরেই লাভ, বাহিরে নয়। কিন্তু এই অন্তর কথাটিও আবার কতটুকু বুঝিব, তাদাত্ম্যাভিমান তাহা নিরূপণ করিয়া দিবে। দেহরূপ স্থূলতম উপাধি দ্বারা যে আবিষ্ট, তাহার নিকট দেহ বাহ্য স্থূল জগৎই বিষয়মাত্র। অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে সে বিমূঢ়। আবার অন্তর জগতে যে যত দূর জাগ্রৎ, তাহার পক্ষে বিষয়ও ততদূর পর্য্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট। অর্থাৎ মানসভূমি হইতে যেমন দেহেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আমাদের নিকট বিষয়রূপে প্রতিভাত হইতে পারে, তেমন বোধিভূমি হইতে মানস জগৎ পর্য্যন্ত বিষয়ের অন্তর্ভূত অধ্যাত্মদৃষ্টির নিকট সংস্কৃতা অন্তঃকরণই বিষয়। এমনি করিয়া বিষয়ের বহিঃপ্রবোধের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মপ্রবাহ হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারি। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির ইহাই তাৎপর্য্য। কর্ম্মসন্ন্যাস এমন করিয়াই সম্ভব নতুবা অপ্রবুদ্ধচিত্তের কর্ম্মবিরতিকেই সন্ন্যাস বলে না।

এমনি করিয়া কর্ম্মপ্রবাহ হইতে যিনি মুক্তি পাইয়াছেন, ভগবান তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন—তিনি বিগতস্পৃহ, জিতাত্মা এবং সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি। এই লক্ষণ কয়টিকে আমাদের সাধন জীবনের আদর্শের সঙ্গে আমরা

মিলাইয়া লইতে পারি। কর্ম্ম করিয়াও আমরা কর্ম্মের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি—যদি কর্ম্মফলে আমাদের স্পৃহা না থাকে। ইহার চেয়েও গভীর কথা, আমরা যদি আত্মজয়ী বা সংযমী হইতে পারি, তবে ভোগসুখের বিষয়ের স্পৃহা আপনিই দূর হইয়া যাইবে। সংযমের যেমন বিশিষ্ট ফল আছে, তেমনি তাহার একটা ব্যাপক ফলও আছে। আমাদের চরিত্রের যাহা বিশিষ্ট দুর্ব্বলতা, তাহাকে আমাদের অধিকৃত তো করিতেই হইবে, তাহা ছাড়াও সমষ্টিভাবে সমস্তটা চিত্তের উপর একটা আত্ম সমাহিতভাব রাখা চাই। ইহাই জিতাত্মার লক্ষণ। এই পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিলে আমাদের বুদ্ধি নিরাসক্ত হইবে। বুদ্ধি হইতে কামনার বীজকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, তাহার সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্ভবপর নয়। অন্তর্জগতের যে অংশটুকু লইয়া আমাদের বাহিরের কারবার, তাহার সীমা হইল বুদ্ধি। এই বুদ্ধিতে যদি কামনার কলঙ্ক না থাকে, তবেই নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভবপর। কর্ম্মের পরিচালনা করিতে হইলে একটা বিশিষ্ট বোধ একটা বিশিষ্ট ইচ্ছার প্রয়োজন হইবেই; নতুবা কর্ম্ম সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই বিশিষ্ট ইচ্ছার সঙ্গে যদি বুদ্ধি বা অন্তর্জগতের কেন্দ্রটুকু পর্য্যন্ত অনুরঞ্জিত না হয়, তবে আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। যে বিশিষ্ট ইচ্ছা আমাদের মাঝে থাকিবে, তাহা লীলার সহায়ক মাত্র—বুদ্ধি কখনও তাহাকে পরমার্থরূপে গ্রহণ করিবে না।

এই প্রকার কর্ম্মফলে স্পৃহাহীন, আত্মসমাহিত, এবং লৌকিকদৃষ্টিতে সঙ্কল্পযুক্ত হইয়াও বৌদ্ধজগতে যিনি অনাসক্ত—তিনিই কর্ম্মসন্ন্যাসী। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত।

শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্যের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে সাধনার একটা ধারার উল্লেখ রহিয়াছে। আচার্য্য বলিতেছেন—"নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ধর্ম্মোৎপত্তিঃ, ধর্ম্মোৎপত্তেঃ পাপহানিঃ, ততশ্চিত্তশুদ্ধিঃ, ততঃ সংসারযাথাত্ম্যবোধঃ (অর্থাৎ সংসারটা যথার্থ কি, তাহার জ্ঞান), ততো বৈরাগ্যং, ততো মুমুক্ষুত্বং, ততস্তদুপায়পর্য্যেষণং (এইখানেই সাধকের পক্ষে সাধুশাস্ত্রের প্রয়োজন), ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ (এই পর্য্যন্ত ব্যবহারিক জগতের সীমা—ইহার পর আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলে না। এটা সকল সাধকের পক্ষেই প্রয়োজন—একবার গুহাহিত সকলকেই হইতে হইবে। সে অবস্থায় কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করিতে হইবে, তাহা ক্রমে বলা হইতেছে—) ততো যোগাভ্যাসঃ (এখানে যোগের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে), ততশ্চিত্তস্য প্রত্যক্‌প্রবণতা (অর্থাৎ অন্তর্মুখী দৃষ্টি), ততস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থপরিজ্ঞানং, ততঃ অবিদ্যোচ্ছেদঃ, ততঃ স্বাত্মন্যবস্থানম্ (এই অবস্থার পর আবার ব্যবহারিক জগতে ফিরিয়া আসা চলে যিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি জীবন্মুক্ত)।

কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ইহাতেই সুস্পষ্ট হইবে—ইহার আর বিবৃতি অনাবশ্যক। (২০)

শিক্ষায় নবচেতনা

—:※:—

মানুষের প্রতিভা এক একটা কাজ সহজ করবার যে সমস্ত সঙ্কেত আবিষ্কার করছে, তাতে সমাজের উপকার ও উন্নতি হচ্ছে যথেষ্টই। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিভার কারসাজি যখন অন্ধ আচারের বন্ধনে মানুষের প্রাণকে আড়ষ্ট করে তুলেছে দেখতে পাই, তখনি আমাদের মাঝে কলকৌশলের বিরুদ্ধে সহজবুদ্ধির একটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহ আজ জগতের নানা জায়গায় নানা দিক দিয়ে ফুটে উঠেছে। শিক্ষাসম্বন্ধেও এই বিদ্রোহের আভাস আমরা পাচ্ছি—কিন্তু এখানে এখন পর্য্যন্ত চরম তত্ত্বটা যে কি, তা তলিয়ে দেখবার জন্য কোনও ব্যাপক ও আন্তরিক চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার আশ্চর্য্য। আমাদের গবর্ণমেণ্ট দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটা সচিব পোষণ করছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর শিক্ষাবাহিনীর "অগ্রগমনের" জন্য দেশের টাকা দিয়ে তার রাস্তা মুড়ে দিচ্ছেন, ঘরে ঘরে আমাদের ছেলেদের অভিভাবকের মুখে শিক্ষার রকমারি বুলি—কিন্তু এ সত্ত্বেও শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্র কি সচেতন? যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শিক্ষার গোড়ায় কি?—তবে শতকরা নিরানব্বই জনের উত্তর হবে—লিখন, পঠন আর গণন। লিখতে শিখা, পড়তে শিখা, আর আঁক কষতে শিখা এ সবই খুব উঁচু দরের শিল্প, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এর মাঝেই যে সমস্তটা শিক্ষা-তত্ত্বের পর্য্যবসান, এ ধারণা আমাদের কি করে যে মজ্জাগত হল, তাই আশ্চর্য্য!—এই জায়গাতেই আমরা দেখি মানুষের আদিম প্রতিভার দোলাঙ্ক।

মানুষের ভাষাকে যিনি অক্ষরের রেখায় বেঁধেছিলেন, তাঁর মত বড় ওস্তাদ কেউ নাই, তা লক্ষবার স্বীকার করব। কিন্তু এই রেখাপাতের মোহই যে একদিন মানুষকে এমন আবিষ্ট করে ধরবে যে তার পায়ে মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশটুকু বিসর্জ্জন দিবে, লক্ষ্যের চেয়ে উপায়টাই তার কাছে বড় হবে,—এ কথা কে মনে করেছিল? অবশ্য রেখাপরিচয়েই যে শিক্ষার সমস্তটা সময় ব্যয়িত হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ওই পরিচয়ের সূত্রপাতেই শিক্ষার তাৎপর্য্য হতে আমাদের দৃষ্টি যে মোচড় খেয়ে বেঁকে যায়, সারাটা জীবন ধরে আর সে ভুলটা শোধ্‌রাবার আমাদের সময় হয় না। শব্দকে যেমন আমরা রেখায় বন্দী করেছি, তেমনি ভাবকে বেঁধেছি ভাষায়। ভাব হতে ভাষা—ভাষা হতে রেখা—এই হল আমাদের শিক্ষা শিল্পের বিবর্ত্তন। কিন্তু এমনি করে যে আমরা ক্রমে বাইরে ছুটে আসি, আর আমাদের ভিতরে ঢুকবার ফুরসৎ হয় কই? ভাবের সঙ্গে যোগ না ঘটিয়ে ভাষাকে যে বড় আসন দিল, সে ও দিল শুধু খোলসটা; আবার শব্দ ও ভাষার সঙ্গে পরিচয় না ঘটিয়ে যে চোখের সামনে রেখার মায়া মেলে ধরল, সে তো আমাদের আরও বাইরে টেনে আন্‌ল। বলতে গেলে এই বহির্মুখীনতা আমাদের শিক্ষার একেবারে হাড়ে হাড়ে ঢুকে গিয়েছে।

ঠিক লেখাপড়াটাই যে শিক্ষা নয়, একথা একবার আমরা শুনি যখন আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার দৈন্যের কথা ওঠে। এক দল বলেন, "দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হওয়া প্রয়োজন"—অর্থাৎ মেয়েদের লেখা-পড়া শিখা প্রয়োজন, লিখ্‌তে পড়তে পারলেই শিক্ষার খেদ মিটে গেল। আবার ঠিক তেমনি সুরে আর একদল জবাব দেন, "লেখা-পড়া শিখাটাই কি শিক্ষা? আমাদের দেশের মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে যে সমস্ত সদ্‌গুণের শিক্ষা পায়, সে-ই তো হল আসল শিক্ষা" ইত্যাদি। কিন্তু একথা আমরা মনে মনে বেশ জানি, শুধু পড়ার শিক্ষাটাকেই আমরা কোনও দিন আসল শিক্ষা বলে ভাবতে শিখিনি। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটা খুঁত আমাদের সমাজে রয়েছেই; কিন্তু নিজের দইকে আমরা টক বল্‌ব না বলেই কোমর বেঁধে তর্ক জুড়ে দিই—হঠাৎ শিক্ষার আধ্যাত্মিকতায় মসগুল হয়ে পড়ি। আসলে আমরা সংস্কারের দাস, তাই অমন মিথ্যা তর্ক ফেঁদে বসি। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে—লেখাপড়ার চল নাই বলে আমাদের সমাজের মেয়েরা অশিক্ষিতা, এমন কথা যিনি বলছেন, তিনিও সংস্কারান্ধ।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই শিক্ষার অধিকার আছে—কিন্তু সে শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নাই। মানুষী প্রতিভা দিয়ে আমরা সমাজ গড়ছি,—তাকে ভাল বলতেই হবে, কেননা বন ভেঙ্গে যদি কেউ বাগান করে, তাকে কেউ মন্দ বলে না। কিন্তু সব সময়েই যে বনের চেয়ে বাগান শ্রেষ্ঠ হয়, এ কথা মানা চলে না। অসামাজিক মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় হীন হবে, এ কথা স্বীকার করতে পারি—কিন্তু সামাজিক মানুষের চেয়ে সে যে সব দিকেই হীন হবে, এ কথা তো তাল ঠুকে বলতে পারি না। এতে মনে হয়, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটাই পূর্ণাঙ্গ নয়··· এখনও এখানে পরীক্ষাই চলছে, সত্যের আবিষ্কার এখনও শেষ হয়নি। সুতরাং সমাজের খুঁত ধরবার অধিকার মানুষের আছে—কেননা এ সৃষ্টি মানুষের প্রতিভার সৃষ্টি, আর সকলের প্রতিভার গতিও এক-মুখী নয়। সমাজ গড়ে যেমন আমরা শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছি, তেমনি এই নিজে-হাতে গড়া সমাজও অনেক বিষয়ে আমাদের সহজ শিক্ষার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনুষ্য-সমাজের এই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েও মানুষকে নিরর্থক শক্তির অপ-ব্যয় করতে হয়। এইখানে আবার দেখি আদিম প্রতিভার দৌরাত্ম্য।

জীবনযাত্রা সহজ করতে মানুষ যে নিয়ম গড়ে, সেই নিয়মে আবার সে নিজেই বাঁধা পড়ে। তাই কোন পথে যে সে দাঁড়াবে, এ তার ঠিক থাকে না। কিন্তু মানুষের নিয়ম তো জড়ের নিয়ম নয় যে তার আর কোনও দিন নড়চড় হবে না। মানুষ প্রাণবন্ত, তাই তার নিয়মের বন্ধন হতে মুক্তি পাবার সঙ্কেত তার মাঝেই আছে। এই জন্য নিয়মের চাপে মানুষ কখনো মরে না। সমাজের নিয়ম সুবিধার দোহাই দিয়ে মানুষকে বাঁধে, কতকটা তার ভালর জন্য, কতকটা মন্দের জন্যও। কিন্তু এই ভালমন্দের দ্বন্দ্ব হতে বাঁচবার পথও মানুষের আয়ত্ত। যদি এ কথাটা অবস্থার বিপাকে সে ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে—নইলে সমাজপতির কর্ত্তব্যে ত্রুটী হবে।

এই দ্বন্দ্ব হতে বাঁচবার পথ হচ্ছে অন্তরে। শিক্ষাকে সেই অন্তর পথের পথিক করতে

হবে। ভিতরের দিকে না তাকিয়ে যদি কেবল বাইরের হিসাবমতই একটা কিছু করতে যাই, তবে সে হিসাব কোনও দিনই মিলাতে পারব না—ঠিক যে জিনিষটা চাই, সে জিনিষটা আমরা পাব না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির এই একটা বিশেষত্ব আছে যে কোনও অবস্থাতেই তার হিসাবের কোন গরমিল হয় না। বাইরে যেখানে বিরোধ, অন্তরে সেখানে সামঞ্জস্য। এই না হলে সংসারের এত হট্টগোলে কি মানুষ বাঁচত? এই সূত্রটী যদি শিক্ষা ব্যাপারেও প্রয়োগ করি, তবেই শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা সম্ভব। দেশ ভেদে আচার ভিন্ন, সমাজ ভিন্ন, আদর্শ ভিন্ন—সঙ্গতিও ভিন্ন। এ জায়গায় পরের জিনিষের দিকে নজর দিলেই কি নিজের পেট ভরবে, না সবখানেই পরস্বটা আমরা আত্মসাৎ করতে পারব? অথচ জীবনের মাঝে কোন খুঁত রাখলে আমাদের চলবে না—পরের সঙ্গে অ-বনিবনাও হলেও চলবে না। এ জায়গায় আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে, অন্তরের মাঝে প্রশান্তি অর্জ্জন করা, বাইরের স্বাতন্ত্র্যকে প্রয়োজন মত অব্যাহত রেখে অন্তরে অন্তরেই সামঞ্জস্য ঘটানো।

এই দিক দিয়ে যদি আমরা শিক্ষাকে দেখি, তাহলে আমাদের এমন তর্কই আস্বে না যে, আমরা যে পদ্ধতিকে অনুসরণ করছি, সেটা গ্রীসের, না জাপানের, না হনলুলুর। তা ছাড়া ঘোড়াকে দিয়ে গাধার কাজ আর গাধাকে দিয়ে উটের কাজ করাবার মত বেয়াকুবিও আমাদের জন্মাবে না। অথচ এমন মূর্খতার পরিচয় আমরা অহরহঃই দিচ্ছি। শিক্ষা বলতে যে একটা মামুলী গৎ আমরা কোন মান্ধাতার আমলে শিখেছিলাম, আজ পর্য্যন্ত তারস্বরে সেইটারই ঐক্যতানবাদন আমাদের আসরে চলছে। তার ফল যে কি হচ্ছে, তা দেখ্বার অবসর এখন পর্য্যন্তও আমাদের হয়নি। আমরা নিজেদের কসরতেই নিজেরা খুসী। আমরা ভাবি আমাদের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র সবই তো পাকা বনিয়াদের উপর—তার মাঝে আর খুঁত কোথায়?

কিন্তু প্রকৃতিকে ঠকানো তো এত সহজ নয়। ধুলা দিয়ে থাকলে আমাদের নিজেদের চোখেই দিয়েছি। তাই আমাদের ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য তিল তিল করে জমতে জমতে তাল হয়ে যখন এক দিন পিঠে পড়ে, তখন আমরা চারদিক অন্ধকার দেখি। প্রকৃতিরও সৃষ্টি আছে, মানুষেরও আছে; তার একটা হচ্ছে খাঁটী কলা, আর একটা হচ্ছে খাঁটী কল। শিখেছি আমরা প্রকৃতির কাছ থেকেই, কিন্তু তার মত রসের যোগানটী অটুট রাখতে পারিনি। তাই গোড়াতে যেটা থাকে প্রাণবন্ত বস্তু, কালে সেটা আমাদের কাছে দাঁড়ায় অভ্যস্ত আচারের রোমন্থনে। এমনি করে অন্তরের জিনিষকে কেবল বাইরে টেনে এনে মানুষ যে ব্যবসা সুরু করে দিয়েছে, তাতে তার মূলধন খুইয়ে দুদিনেই সে দেউলিয়া হয়ে যাবে যে!

শিক্ষার সুরু করেছি বহির্ম্মুখীনতায়। প্রথম হতেই ব্যাপারটা কি তা তলিয়ে দেখিনি, কোথায় তার প্রাণ, খোঁজ করিনি—চোখ বুজে যুগ যুগান্তরেরই বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছি। এই অন্ধতার একটা সাজা আছেই। শিক্ষার অভিনয়ে আমাদের অভিমানের তৃপ্তি হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ না করার ফলে যে কৃত্রিমতায় আমাদের সমাজ ছেয়ে গিয়েছে, তার দুর্ব্বিপাক হতে পরিত্রাণ কোথায়? যে শিক্ষা দেয়, সে জানেনা সে কি দিল; আবার যে শিক্ষা

নেয়, সে-ও জানে না, সে কি পেল। অথচ শিক্ষার নামে এই মূঢ়তাকে সমাজ নির্ব্বিবাদে মঞ্জুর করছে; যথাসাধ্য একে দিয়েই তার বড় বড় কাজগুলো হাঁসিল করবার প্রত্যাশা করছে। কিন্তু সব জায়গায় কি তার আশা সফল হচ্ছে? আর তা যদি নাই হয়ে থাকে, তবে সে [illegible] কার?—ব্যবস্থার না ব্যবস্থাপকের?

এতখানি পুঞ্জীকৃত মিথ্যার চেয়ে এতটুকু সত্যও শ্রেয়ঃ। অন্ততঃ একটা জায়গাতেও যদি আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাই, তবে সেই তীর্থের পুণ্যে সমস্তটা দেশই একদিন পুণ্যময় হবে। এইটুকুর জন্যই প্রাণপাত করতে হবে আমাদের। দেশজোড়া ভুলকে আঘাত করতে পারে, এমন একটী সত্যনিষ্ঠ প্রাণেরও মূল্য অসীম। আমরা সংখ্যাবাহুল্য চাই না—আমরা চাই সত্য। সে সত্য পাবার অধিকার সকলের হয় না। কিন্তু যার মাঝে পাবার যোগ্যতা আছে, আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টাতে তার মাঝেই সত্য মুকুলিত হয়ে উঠবে। আমাদের মাঝে কণা কণা তপস্যার সঞ্চয় তারই শুদ্ধ আধারে মূর্ত্তি ধরে উঠবে। যে তপস্বী আমাদের মোহ ভাঙবে, আমাদের [illegible] দূর করবে—তাকে আমরাই আমাদের মাঝ থেকে জন্ম দেব—এই আকুলতাটুকু আমাদের থাকা চাই।

কি যে দুর্গতি আমাদের, তা যদি বুঝে থাকি, তবে এমনি করে আকুল হয়ে চাওয়ার আমাদের বিরাম হবে না কোনও দিন। দেহের জন্য যেমন অন্ন চাই, হৃদয়ের জন্য তেমনি চাই শিক্ষা। অন্নচিন্তা আমাদের চমৎকারা হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু শিক্ষা-চিন্তা তো কোনও দিন চমৎকারা হয় না।—এ কি এতই তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করবার জিনিষ? ফোটাতে হবে প্রাণটি; কিন্তু তার উপর সংস্কারান্ধতার পাথর চাপা দিলে সে ফুটবে কি করে? আর যত দিন বাইরের দিকেই তাকিয়ে থাকব, পরের মুখের পানেই হাঁ করে রইব, তত দিন পর্য্যন্ত তো সংস্কার ছুটবে না। এমনি করে পুরুষানুক্রমে কেবল ভুলের বোঝা, সংস্কারের বোঝাই বয়ে মরব, আর জীবনে যদি বিপ্লব এসে দেখা দেয়, তবে তার জন্য দায়ী করব পরকে! পিতা হতে পুত্রে এই অভিনয়েরই তো পুনরাবৃত্তি চলছে—এর কি প্রতিকার হয় না? আগে গোড়া পাকা না হলে ইমারত দাঁড়াবে কিসের উপর?

এই জন্যই বলি, আজ নূতন করে সব কথা ভেবে দেখবার দিন এসেছে। সংস্কারের পথে শিক্ষাকে চালানো আর চলবে না—জীবনের মূল সুরটীর সঙ্গে তার যোগ রাখতে হবে। সংস্কারের মোহ যে টুটবে, তার প্রমাণ দেখছি—চারদিককার অস্পষ্ট বিদ্রোহের ভাবে। একটা নূতন ভাবের চমক এসে লেগেছে। সবার কাছে তা সুস্পষ্ট না হলেও যারা সংস্কারমুক্ত চিত্তে নূতনকে বরণ করতে পেরেছে, তারা জানে, এই নবীনেরই জয় হবে একদিন—কেননা এ যে সেই চির-পুরাতন চিরন্তন আনন্দনিকেতনই আজ আবার নূতন বেশে আমাদের মাঝে দেখা দিতে এসেছে।

অভিনবকে গ্রহণ করবার জন্য আমাদের চাই সার্ব্বজনীন তপস্যা। তপস্বীর মত অন্তর্মুখী হতে না পারলে তো আদর্শকে চিনতে পারব না। জীবনের গোড়ার কথাই হচ্ছে শিক্ষা। আমাদের আচার আর সংস্কার গতানুগতিকের দাস হলেও রসিক শিল্পীর যে রসসাধনা আমাদের জীবনে চলছে, তা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অভিনব। শিক্ষাতে

এই ব্যক্তিগত অভিনবত্ব অব্যাহত রেখে জীবনের আদিম রসের উৎসটী অভিব্যক্ত করতে হবে। শিল্পী না হলে কেউ তা পাবে না। আবার সেই শিল্পী জন্মাবে সঙ্ঘবদ্ধ সমাজজীবনের মধ্য থেকেই। তার জন্যই সমাজকে তপস্যা করতে হবে। কৃচ্ছ্র সাধনের তপস্যা তার পক্ষে সাধ্য না হলেও ভাবের তপস্যা তাকে করতেই হবে। কেননা ভাবের সঙ্গে যোগ না রেখে সে যেমন অভ্যস্ত সংস্কারে জীবনকে পঙ্গু করেছে, শিক্ষাকেও যেমন মানুষের আত্মার সম্পদ না করে তার বহির্বাসনে পরিণত করেছে, তেমনি এ প্রমাদ দূর করবার জন্য যে তীব্র প্রচেষ্টা, তার দায়িত্ব সমবেতভাবে সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে। সমাজের মাঝে চেতনা না জাগলে অভিনবের স্ফুরণ সার্থক হবে না।

বিপ্লব ঘটাবেন যিনি, তিনি শক্তিধর পুরুষ। তাঁর আবির্ভাবে যুগ যুগান্তের আঁধার ঘোর এক নিমিষে কেটে যাবে। কিন্তু আমরা তাঁকে চাইতে জানলে তবে না তাঁকে পাব? শক্তি যেমন একটী বিশিষ্ট আধারে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, তেমনি তার তরঙ্গ চারিদিকের ব্যষ্টি আধারেও একটু-না-একটু ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার দায়িত্ব সকলেরই। যারা শক্তিধর নয়, তারাও শক্তির আবাহন করতে পারে—তাদের আবাহন তো বৃথা যাবে না। সঙ্ঘেই শক্তির আবির্ভাব হবে।

সঙ্ঘের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সচেতন হবার সুযোগ প্রকৃতি দিয়েছেন। প্রকৃতির কাছে প্রত্যেকটী মানব-জীবনের স্বতন্ত্র একটা মর্য্যাদা আছে—সেইটী বুঝাবার জন্য প্রত্যেকটী সন্তানের জন্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রকৃতি অতি সহজভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ সে শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করেছে—পিতার দায়িত্ব, মাতার দায়িত্বকে তার অবাধ সুখ, প্রয়োজন সে খর্ব্ব করেছে। তার ফলে গোড়া হতেই মানব সন্তানের জীবন সহজ আনন্দে বিকশিত হতে পারেনি। এই শিশুই আবার কৃত্রিম শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে যখন পিতৃত্বের, মাতৃত্বের, আচার্য্যত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন গতানুগতিক সংস্কারের অনুবর্ত্তন ছাড়া নূতন কোনও সম্পদ সে দান করতে পারেনি। এমনি করে সমাজ কৃত্রিম হয়েছে। তার সংস্কার করতে হলে বাইরের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করলে তো হবে না—তাকে একেবারে আমূল সংস্কার করা চাই। সমাজ পরিশুদ্ধ না হলে শিক্ষাও কখনো সার্থক হবে না—কেননা যে দায়িত্ব প্রকৃতি সমানভাবে সকলকে বেঁটে দিয়েছেন, দুচার জন ব্যক্তির ঘাড়ে সে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করলে প্রকৃতি তাতে ঠকবেন না।

শিক্ষা, জীবন আর সমাজ—তিনটীর এমনি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যে তাদের একটাতে ত্রুটী থাকলে আর একটা কিছুতেই ফুটবে না। এই জন্যই শিক্ষা ও জীবনের অভিব্যক্তিকে সমান্তরালভাবে দেখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই; এবং তাদের আশ্রয়রূপী সমাজের দিকে না তাকিয়েও উপায় নাই। আধার বিশুদ্ধ হলে সত্য আপনি তাতে ফুটে উঠে। শিক্ষার আধার সমাজ; এই সমাজে চেতনা জাগলে তবে শিক্ষার ধারা বদলাবে। অন্তর্মুখী দৃষ্টি না পেলে সমাজে চেতনা আসবে কোথা থেকে? শক্তিধর পুরুষ ছাড়া সমাজের দৃষ্টি অন্তরের দিকে ফিরাবে কে? অথচ শুধু একজনের শক্তিপ্রয়োগেই কার্য্যসিদ্ধি হবে না—শক্তির মূলে সঙ্ঘের ভিত্তি থাকা

চাই। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আকুল প্রাণে সত্যাধিষ্ঠাতা সেই শক্তিধর পুরুষেরই প্রতীক্ষা করব, যিনি নূতন ভাবের অঞ্জন চোখে মাখিয়ে অভিনবের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিবেন।

এই প্রতীক্ষা সকলকেই করতে হবে। শিক্ষায়, সমাজে, জীবনে নূতন চেতনা আনতে হবে। সংস্কারের পথে আর কল্যাণ নাই —নূতন ভাবে আবার সকলকে ভাবিত করে নিতে হবে। দেশের তরুণ তপস্বীরা এই ব্রত বরণ করে নিক্—আপন আপন জীবনকে মহিমময় করে সত্যের পথ, শক্তির পথ, আনন্দের পথ তারা উদার করে দিক্! সিদ্ধি একদিন আসবেই।

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

চিত্ত যখন স্থির হইয়া আসে, তখন যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাতেই আনন্দ। শুধু দেখার আনন্দই—করার আনন্দ পরের কথা। ফুলটী সুন্দর, পাতাটী সুন্দর, আকাশ-আলো সবই সুন্দর -মানুষের মুখও সুন্দর। কিন্তু কিসে সুন্দর? বর্ণ-সুষমায়, না রূপরেখায়, না অন্য কিছুতে? ও সকলে সুন্দর নয়—সুন্দর চিত্তের স্থৈর্য্যে। বর্ণ আর রেখার ভঙ্গী চিত্তকে সচেতন করিয়া তোলে মাত্র—কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের ডালি গ্রহণ করিবার যদি কেহ না থাকিত, তবে সৌন্দর্য্য আসিত কোথা হইতে? শুধু চোখে লাগিলেই হয় না—মনে লাগা চাই। মনে লাগে কখন? মন যখন ছটফট্ করে, তখন নয়—তখন ইন্দ্রিয়মোহন বস্তুও বিরস লাগে। চিত্তে রস জাগে চিত্তের প্রশান্তিতে। শুধু এটা-ওটা ভাল লাগা নয় —ভরা চিত্তের কাছে সবই যেন ভরা, সবই যেন ভাল।

যেমন বাইরে, তেমনি ভিতরে। কিন্তু এ কথাটা সব সময় বুঝিতে পারি না; তাই আমার কর্ম্ম আমাকেই তাড়া করিয়া ফিরে। আর তার জন্যই সংসারে যত অশান্তি। কিন্তু যদি দেখিতাম, প্রভাতের আলোতে ফুলের মত একটী একটী করিয়া আমার জীবনের দল মেলিতেছে—তার মাঝে বর্ণসুষমা আছে, সৌরভসম্ভার আছে, আবার কীটের দংশনও আছে, শিশিরের অশ্রুবিন্দুও আছে—তবে সুখ হইত দুঃখের মাঝেও বাস্তবিকই সুখ হইত। দুঃখের মাঝেও যে সুখ, তাহাই হইল আনন্দ। আনন্দই ভগবান। যেমন করিয়া প্রশান্ত দৃষ্টি মেলিয়া ফুলটী দেখি, তেমনি করিয়া নিজকে দেখিতে শিখিলে তবে ভগবানের সঙ্গে যোগ হয়।

যেমন আমাদের কাছে একটা ফুল, তেমনি ভগবানের কাছে এই জগৎ। বরং তাঁর কাছে এ জগৎ আরও নিবিড়; তাঁর দেখা আর হওয়া দুই-ই যুগপৎ। তাই তাঁর মাঝে আনন্দের যুগলধারা। আমরা দেখি, কিন্তু হইবার আনন্দ সবটুকু পাই না। ফুলটী দেখিলাম—তার সুষমার একটুখানি লইয়া আমার আমিকে নূতন করিয়া গড়িলাম। আনন্দ এই অচঞ্চল দৃষ্টিতে, আর নূতনের

সৃষ্টিতে। কিন্তু সৃষ্টি তো আমাদের মাঝে সম্পূর্ণ হইল না। তাই দৃষ্টিও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নয়। ভগবানের কাছে দৃষ্টি আর সৃষ্টি দুইই সম্পূর্ণ। তাই তিনি শুধু আনন্দ পান না—তিনি আনন্দস্বরূপ।

আমরা যতই তাঁর দিকে আগাইয়া যাইব, ততই আমাদের দৃষ্টিশক্তিও বাড়িবে—সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিশক্তিও বাড়িবে। আবার কথাটা যদি ঘুরাইয়া বলা যায়, তবে বলিতে পারি, দৃষ্টিকে ক্রমশঃ বাড়াইয়াই আমরা ভগবানের নাগাল পাইতে পারি। তার জন্য উদ্ভট কোনও কিছুর আয়োজন করিতে হইবে না। সকল দেখাকেই একটু বড় করিয়া দেখিতে শিখিলেই হইবে—বাহিরের দেখাকেও, অন্তরের দেখাকেও। বাইরে যা দেখি, তার কিছু কিছু দৃষ্টির আবছায়াতে পড়িয়া অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টকে যদি স্পষ্টের ভূমিকা করিয়া লইতে শেখা যায়—তবেই বাহ্যদৃষ্টির ভিতর দিয়া আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে—দেখা সার্থক হইবে। তখন কোনও একটা বস্তুকে শুধু সেইটুকু বলিয়া জানা চলিবে না—তার আশে-পাশে থাকিবে আরও কিছু; সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া—সে সুন্দর, সে অপরূপ। এমনি করিয়া সমস্ত জগৎটাকে বেড়িয়া রহিয়াছে আকাশের জমাট নীলের একটা ভূমিকা। এই বিরাট নীলটুকু যদি না থাকিত, তবে বর্ণের খেলা খুলিত কি?

আবার তেমনি দেখি ভিতরটাকে। সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা—সবই আছে। কিন্তু তার চারিদিকের ভূমিকাটা কোথায়? সেইটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সেইখান হতে দৃষ্টি ফেলিয়া সৃষ্টির পটে রঙ ফলান হইবে। এখানে কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য কিছুই নাই —দৃষ্টি স্থির হইলেই সৃষ্টি আপনা হইতে হইবে।

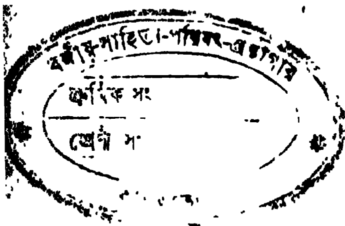
সংসারে বড় জ্বালা?—তা তো নিশ্চয়ই। দৃষ্টি যে সংসারের বাইরে পড়ে নাই—তাই ভূতের সৃষ্টিতে বেগার খাটিয়া মরিতেছি, জ্বালা হইবে না কেন? আপন সৃষ্টি যদি হইত—তবে এ সংসারের বিষও আনন্দের অমৃত হইয়া উঠিত। সুখ, দুঃখ, আঘাত, বেদনা—এই সবই হইল আনন্দ সৃষ্টির উপাদান। আনাড়ী রাঁধুনী হয় আলুনী রাঁধে, না হয় লবণে পোড়ায়। ব্যঞ্জনে যে তার হইল না, সে কি লবণের অপরাধ? শুধু লবণ খাইতে গেলে বিস্বাদ, কিন্তু তা ছাড়া ব্যঞ্জন মজে কই?

দৃষ্টিকে কেবলি বড় করিতে হইবে। কিছুর কাছেই মাথা হেঁট করিলে চলিবে না। বিশ্বজগৎটাই আমাদের মধ্যে। কথাটা চমকাইয়া উঠিবার মত কিছু নয়। সত্য সত্য যদি বড় হওয়া যায়, তবে এ প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কূপমণ্ডুক হইয়া বিশ্বজগৎটা আমার মাঝে বলাটা আস্পর্দ্ধা বটে। কিন্তু যার যার জগৎ তার-তার কাছে। এই-টুকু আমার জগৎ, ওই-টুকু তোমার জগৎ। যার যতটুকু, তার বাইরে তার দৃষ্টি চলে না—কাজেই বিশ্বজগৎ বলিতে সে ততটুকুই বুঝিবে। কিন্তু সেই ততটুকুই বা তার আয়ত্ত কই? অথচ এটুকু তো আমরা পারিতাম। বড় জগতের কথা এখন থাক্, আমার জগৎটার ধাক্কা আমি সামলাইতে পারি না কি?

পারি নিশ্চয়ই কিন্তু মতলবী বুদ্ধি দিয়া পারি না। আমার খুসী বলিয়া একটা কিছু থাকিলে আপন মুঠায় কিছুই আসিবে না। তবে সামলানো কি করিয়া? নিজকে

রঙ্গভূমি করিয়া দিয়া। যা হইবার হউক, আমি আপত্তি করিব না—আমি তার বাহিরে থাকিয়া দেখিব মাত্র। কতটুকু দেখিতে হইবে, কোন্ খানেও বা আমার জগতের সীমা, কিছুরই হিসাব রাখিব না। অতীত আর ভবিষ্যতের সীমা আমার কাছে নাই। আমার কাছে আছে শুধু এক কাল—সে হচ্ছে বর্ত্তমান। যত আরজী আমার কাছে পেশ হয়, সব শুধু এখনকার। অতীতের নালিশও আমি শুনি না, ভবিষ্যতের বন্দোবস্তও করি না। তা ছাড়া বর্ত্তমানকে প্রত্যাখ্যান করিতেও আমি জানি না—আমার কাছে যত আরজী আসে—সবই মঞ্জুর।

এই ভাব নিয়া টিকিতে পারিলে দৃষ্টি আপনিই খুলিবে—সেই সঙ্গে সঙ্গে একটীর পর একটী করিয়া সৃষ্টির পরদা খুলিয়া যাইবে। তখন সব জাগিবে শক্তি জাগিবে—ভগবান্ আপনি আসরে নামিয়া আসিবেন। সব দিক বজায় রাখিয়াও এ সাধনা চলে। এমনি করিয়া সব দিক বজায় রাখিয়া এত বড় সৃষ্টিটা চলিতেছে, আর আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকুই চলে না? চলে নিশ্চয়ই। সঙ্কেত জান না—প্রাণে প্রাণ মিশাইতে পার না—তাই বলি চলে না।



সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

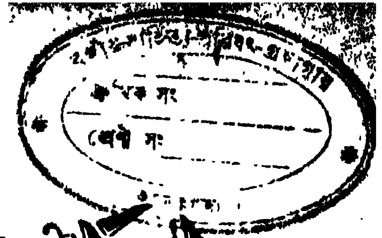
সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব সম্প্রতি বঙ্গদেশ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে সম্ভবতঃ তিনি ঢাকায় থাকিবেন।

ভক্তসম্মিলনী

আগামী পৌষমাসের ১১ই, ১২ই, ১৩ই তারিখে ঢাকা-ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আমরা আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের শাখা আশ্রমগুলির পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক ও ভক্তগণকে, সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আবাহন করিতেছি। কাহাকেও পৃথক্ পত্র পাঠাইতে পারিব না। ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের জয়দেবপুর ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে কালনী গ্রামে সারস্বত আশ্রম। আপন আপন বিছানা সঙ্গে আনিবেন। অত্র মঠাধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ঐ সময়ে ঢাকা সারস্বত আশ্রমে অবস্থিত করিবেন।

বন্যার্ত্ত সেবাসংবাদ

উত্তরবঙ্গে বন্যার্ত্তসেবাকল্পে অত্রত্য সারস্বত মঠাশ্রিত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ একজন ডাক্তার, ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী সেবক লইয়া বন্যাপীড়িত স্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সম্প্রতি বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির নির্দ্দেশানুযায়ী তালোড়া ও চম্পাপুর কেন্দ্রে দুঃস্থ নারায়ণগণের সেবাকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন।



ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } পৌষ ৯ম সংখ্যা

জিজ্ঞাসা

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২২।৮]

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্
অস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্বস্বিৎ
কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসা বিজানন্
দেবানামেনা নিহিতা পদানি।
বৎসে বস্কয়েঽধি সপ্ততন্তূন্
বিতত্নিরে কবয় ওতবা উ ॥

অচিকিত্বা চিকিতুষশ্চিদত্র
কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মেন বিদ্বান্।
রি যস্তস্তম্ভ ষড়িমা রজাংসি
অজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্ ॥

ইহ ব্রবীতু যঃ ঈমঙ্গ বেদ
অস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য
বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ ॥

কে দেখেছে বিশ্বমাঝে প্রথমে কে জন্মিল কখন
অস্থিযুক্তে কোথা কবে অস্থিহীনা করিল ধারণ?
ভূমি হতে জাগে প্রাণ, বহে রক্ত,—আত্মা ছিল কোথা?
যে জেনেছে তত্ত্ব তার, তাহারে কে জিজ্ঞাসিল কথা?

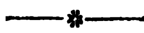
বুঝি নাই, পুঁছি তাই মন্দমেধা, মনে যাহা আছে—
গুপ্ত বুঝি রহিয়াছে এ রহস্য দেবতারো কাছে।
আছে এক বৎসতর, বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম তার,
তারে বাঁধিবারে কবি সপ্ততন্তু করেছে বিস্তার।

বিদ্বান্ তো নহি আমি—নাহি জানি, তাই তো শুধাই:
জেনেছেন কবি তাই, তাঁর কাছে জানিবারে চাই।
এই ছয় ভূমি যার বীর্য্যসারে রয়েছে স্তম্ভিত,
নহে কি সে এক সেই—নহে কি সে জনম-রহিত?

আছে এক দিব্য পাখী—ঠাঁই যার অতি সঙ্গোপন;
জান যদি কেহ তবে বল মোরে তার বিবরণ।
শীর্ষদেশে রয়েছে সে, গবী তার নিত্য ক্ষরে ক্ষীর,
জ্যোতির্ম্ময়রূপে পুনঃ মর্ত্ত্যে নামি পান করে নীর।

———*———

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ



উপনিষদ্ বলিতেছেন, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ই "পুরুষং সিনীতঃ"—পুরুষকে বন্ধন করে—তবে কিনা তাহারা "নানার্থ" অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজন ভিন্ন। যখন প্রয়োজনের বেলায় দেখিতেছি উভয়ের মাঝে ভেদ—অথচ ক্রিয়ার বেলায় উভয়েরই মাঝে সাম্য রহিয়াছে, তখন স্বভাবতঃই মনে হয়, এই দুটিই একটা স্বরূপের দ্বৈত প্রকাশ। মূল কথাটা হইতেছে রস; শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ের মাঝে যখন নির্ব্বাচন করিব, তখন অন্তরের রসানুভূতি হইবে আমাদের সহায়। এই রসই আনন্দের দিকে আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছে—ইহাই মূল, আর সমস্তই উপলক্ষ্য মাত্র। যদি এই রসকে অখণ্ডরূপে অনুভব করিতে পারি, তবে দেখিব, বন্ধন কোথাও নাই—প্রেয়েরও বন্ধন নাই, শ্রেয়েরও বন্ধন নাই। তবে শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ের ভেদ কোথায় আছে? না আমার রসানুভূতি এখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে নাই, কোনও কিছুকে গ্রহণ না করিয়াও সবটুকুকে গ্রহণ করার সঙ্কেতটা যাহার এখনও আয়ত্ত হয় নাই। রসের আকর্ষণে অর্থের বিচার আসে এখানেই—এখানেই অখণ্ড রসকেও নানা প্রয়োজনে আমরা খণ্ড খণ্ড করি।

কিন্তু সবটুকুকে যে দেখে, সে দেখে আগাগোড়া একটা সৌন্দর্য্যের বিনুনী; তার মাঝে স্তরভেদ আছে, কিন্তু সে ভেদ তো দ্রষ্টার প্রয়োজনের ভেদ নয়। এ ভেদ যে অভেদেরই প্রকাশের একটা ভঙ্গী। তাই দ্রষ্টার কাছে সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র অখণ্ড—কেননা সৌন্দর্য্যের মাঝে যে দেশ কাল আর নিমিত্তের ঢেউ, তার নাশেই তো তাঁর অনুভূতি অবরুদ্ধ হইয়া রহে নাই—অপূর্ব অনুভূতিও যে তাঁহার কাছে সংস্তম। এই লোকাতীত ভূমি হইতে রসের আর বিচার হইতে পারে না। কিন্তু রূপে নামিয়া আসিলেই রসের চারিদিকে একটা বন্ধনী পড়িয়া গেল—রূপ রসকে আবরিত করিয়া তাহার দাবীটাই আগে অন্তরের কাছে পৌঁছাইয়া দিল। অন্তর তো রসিকরাজ, রসের অর্ঘ্য সে ফিরাইয়া দিবে কি করিয়া? তাই রসের সঙ্গে রূপকে গ্রহণ করিতেও তাহার বাধিল না। এমনি করিয়া রূপের মাপে রসের মাঝেও স্তর দেখা গেল—রসের লীলা রূপে বিচিত্র হইয়া উঠিল—যে অনুভূতি ছিল কালের অতীত বলিয়া অখণ্ড, তাহার মাঝে রূপের স্পর্শে গতিবেগ দেখা দিল, কালের বেষ্টনী পড়িল। আবার অমূর্ত্ত আকাশকে সংহত করিবার জন্য দেশের সৃষ্টি হইল।

এই মূর্ত্তি জগতের মানুষ আমরা; কিন্তু অমূর্ত্ত আমাদের পিছনেই রহিয়াছে। তাই দুয়েরই আকর্ষণ আমরা অনুভব করি। এই হইল জগতের চক্রাকার গতি। গতির বেগ আমাদের মাঝেও সঞ্চারিত হইয়াছে, স্থির থাকিবার আর উপায় নাই—অদৃষ্টের নিগূঢ় আকর্ষণে চলিতেই হইবে। কিন্তু গতির নিয়ামক হইবে কে? চক্রাধীশ তো রহিয়াছেন; তাঁহারই ছায়া আমাদের হৃদয়েও পড়িয়াছে। বিবেক-বুদ্ধি সেখানে চির জাগ্রৎ হইয়া রহিয়াছে—ধীর চিত্তে তাহারই আদেশ

শুনিতে হইবে। চক্রের আবর্ত্তন একবার পৃথিবীর আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণ করে; আবার বিদ্রোহী হইয়া আকাশের দিকে মাথা তোলে। এই দ্বৈত হইতে সহজে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। তাই শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ দুই-ই আমাদের কাছে আসিবে। তাহার মাঝে মীমাংসা করিতে হবে ধৈর্য্য দিয়া—বিবেক দিয়া—বিচার দিয়া। আবর্ত্তন যে দিন থামিয়া যাইবে, সে দিন আর চক্রের চক্রত্বও থাকিবে না—তাহার গতি তখন স্থিতিতে সমাধি লাভ করিবে -স্থিতি অনন্ত নিরাধার গতিতে ব্যাপ্ত হইবে। এই অবস্থা কাম্য বলিয়াই বিচার দিয়া, বিবেক দিয়া, ধৈর্য্যকে আমাদের মাঝে বাঁধিয়া রাখিতে চাই। এই জন্যই শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ সম্বন্ধে এত সতর্কতা; সেখানে অধীর হইলে চলিবে না—"তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরাঃ।

প্রেয়কে বরণ করে কাহারা?—যাহারা মন্দ অর্থাৎ রজঃ ও তমোদ্বারা অভিভূত—সত্যের আগুণ যাহাদের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠে নাই। কিসের জন্য তাহারা প্রেয়কে বরণ করে?—উপনিষদ বলিতেছেন—"যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।" অপ্রাপ্তের লক্ষণ যোগ আর লব্ধের রক্ষণ হইল ক্ষেম—এক কথায় এই নিত্যদৃষ্ট সংসার যাত্রাই আমাদের যোগক্ষেম। ইহু[illegible] গরজেই প্রেয়কে বরণ করা। প্রেয়ঃ [illegible] রস রূপ; বস্তুজগতে যে বহির্মুখ [illegible] নের লীলা রস, তাহাই প্রেয়ঃ। এই প্রেয়কে জীবন হইতে বিসর্জ্জন দিয়া কি আমাদিগকে সংসার বিমুখ হইতে হইবে? -হাঁ নিশ্চয়ই; যদি শ্রেয়ঃ চাও, তবে প্রেয়কে বর্জ্জন করিতে হইবে বই কি। কিন্তু, এই তো মুস্কিলের কথা। বিবেকীর এ কথার উত্তরেই মানুষ প্রশ্ন করিয়া বসিবে, সবাই যদি সংসারবিমুখ হই, তবে সংসার চলিবে কি করিয়া?—তাইত, ভগবানের এত বড় দায়টা তোমরা বহন করিতেছ যখন, তখন ইহাকে ছাড়িয়া গেলে ভগবানের কাছে জবাব দিবে কি! ভগবানও তো তখন এত বড় সংসারটা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িবেন।—কিন্তু এ তো তর্ক নয়—এ যে নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা।

সংসার বিমুখতার পরিণাম লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইতে হইবে না—এর ভাল মন্দ লইয়া কথা কাটাকাটি করিলেও কোনও ফল হইবে না। ফলটী যখন পাকে, তখন আপনা হইতেই তাহা বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে। আর সূর্য্য যে তাপ দেন, তাহা ফলকে কাঁচা রাখিবার জন্য নয়, তাহাকে পুষ্ট করিয়া পাকাইয়া মাটীতে খসাইবার জন্যই। এইজন্য বিবেকী চিরদিনই বলিবেন প্রেয়কে বর্জ্জন কর, শ্রেয়কে বরণ কর। এ যে ভগবানের আদেশ - এই বাণী বুকে লইয়াই যে প্রতি মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তে জগতের পরিপাক হইতেছে। কিন্তু ভয় নাই—এ কথা কাণে ঢুকিবামাত্রই তো আর কেহ সংসার [illegible] হইয়া যাইতেছে না। সুতরাং [illegible] এই [illegible] শ্রেয়োবাদীর বিচলিত হইবার তো কোন কারণ নাই। অথচ এই কথা বার বার তাহাকে শুনিতেই হইবে -শ্রেয়োবাদী যে অগ্নিময় সত্য তাহার হৃদয়ে পাইয়াছে, তাহা সে প্রচার করিবেই। এ আদর্শের কথা নয়, ভাল-মন্দ বিচারের কথা নয়—এ স্বভাবের কথা। শুনিতে শুনিতে একদিন চিত্তে রঙ ধরিয়া যাইবে, তখন আর ত্যাগের কথায় চিত্ত চমকিয়া উঠিবে না। সেই দিনের সার্থকতার জন্য, আজ ব্যর্থ হইলেও বার বার ওই কথাই শুনিতে হইবে।

প্রেয়ঃ লইয়া যায় নিজের দিকে। বাহিরের যে পাওয়া, তাহাই হইল নিজ। এই পাওয়ার মাঝে একটা মাদকতা আছে, লোলুপতা আছে। ভিতরের পাওয়ার সঙ্গে, শ্রেয়ের পাওয়ার সঙ্গে এইখানেই ইহার তফাৎ। শ্রেয়ের প্রাপ্তিতে আছে প্রসাদ, স্থৈর্য্য, বীর্য্য। জগতের দুইটা বিভাগ—একটা বিচিত্র, আর একটা একরস। প্রেয়ঃ আনিয়া দেয়, বৈচিত্র্যের সম্মোহন, আর শ্রেয়ঃ আনে এক-রসের প্রজ্ঞা। প্রেয়কে বর্জ্জন করিতে চাই এই জন্যই যে, সে রসের মাঝে মজিয়া আর তো কোন কূলকিনারা পাই না, স্বস্তিও পাই না; চারিদিক হইতে বৈচিত্র্যের পীড়নে যেন শ্বাসরোধ করিয়া আনে—একটু স্থির হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বলিতে পারি না যে, "এই পাইয়াছি—আমার হাতের মুঠার মাঝেই সবটুকু পাইয়াছি।" বৈচিত্র্যের পাওয়ার পথে কেবল ছুটিয়াই চলিলাম—শেষ আর পাইলাম না। আধার ক্ষুদ্র অথচ আকাঙ্ক্ষার আর অন্ত নাই। এইটুকু দেহ, এইটুকু ইন্দ্রিয়, এইটুকু মন—এ দিয়া বৈচিত্র্যের অন্ত রহস্য জানিব কি করিয়া? গণ্ডূষ দিয়া সমুদ্রজলের পরিমাণ? তাই তো হাহাকারের আর সীমা থাকে না। আধারের সঙ্কোচে আর আধেয়ের অনন্ত প্রসারে সন্ধি হইবে কি করিয়া? তাই প্রেয়ের পথে কেবল পাওয়ার লোলুপতাতেই পথ চলা। উপনিষদ্ ইহার সার্থক নাম দিয়াছেন—"সৃঙ্কা বিত্তময়ী যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।"

রসানুভূতির দিক দিয়া যাহাকে বলা হইয়াছে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, চেতনার দীপ্তির দিক হইতে তাহাকেই বলা হইতেছে বিদ্যা ও অবিদ্যা। আনন্দের সঙ্কীর্ণতায় যেমন সুখের উৎপত্তি, তেমনি জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতায় বুদ্ধির সৃষ্টি। সুখ আর বুদ্ধি, এই দুইটীরই আপেক্ষিক সত্তা—তাই দুয়েরই কারবার বাহিরের জগৎ লইয়া। অবলম্বন না হইলে ইহারা দাঁড়াইতে পারে না—তাই আমাদের জীবনে এত উপকরণের বাহুল্য। কিন্তু এ তো পরাধীনতা—এ তো স্বারাজ্য নয়। অথচ স্বারাজ্য-লিপ্সাতেই সৃষ্টির ঊর্দ্ধগতির তাৎপর্য্য ও সার্থকতা। তাই স্বারাজ্যের জন্য আমাদের সুখকে—প্রেয়কে যেমন পদদলিত করিতে হইয়াছে, তেমনি বুদ্ধিকে—অবিদ্যাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।

বিদ্যা আর শ্রেয়ঃ, অবিদ্যা আর প্রেয়ঃ—এই দুইটীতে ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। একই সত্তার উপর প্রকাশ আর আনন্দ দাঁড়াইয়া। কিন্তু আনন্দের অভিব্যক্তিকে আমরা বেশী আত্মীয় বলিয়া মনে করি, তাই তাহার জন্যই ছুটাছুটী বেশী। এর একটা হেতুও আছে। প্রকাশ যখন খণ্ডে অভিব্যক্ত হইল, তখন আমরা পাইলাম রূপ; আমাদের বাস্তব-জগতের এইটাই হইল মূল ভিত্তি। কিন্তু বাস্তবের বাস্তবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে শুধু রূপে নয় গতিতে, বিপরিণামে। রূপ যেন ইহার আধার। শুধু রূপ—সে যেন নীরূপেরই সামিল; খণ্ড বোধের তৃপ্তি তাহাতে হয় না। কালের অভিঘাত তাহাতে অনুভব করা যায় না, তাই শ্রান্তিতে, অবসাদে সমস্তই ঢাকিয়া যায়। খণ্ড বোধকে সজাগ করিতে হইলে, খণ্ডে খণ্ডে একটা বিরোধ চাই—সংঘর্ষ চাই—রূপের বিপরিণাম চাই। নৃত্যশীল রূপের চঞ্চল চরণের আঘাতে কাল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ুক - বুদ্ধির তারে অমনি আমাদের ঘা পড়িবে, আধারের অনুরূপ আধেয় পাইয়া বুদ্ধি যেন সাড়া দিয়া উঠিবে। খণ্ড-বোধ আপনাকে জীবন্তভাবে

পায়, এই গতিতে—এই চঞ্চলতায়। এ যেন তাহার বোধ-স্বরূপকে ছাড়াইয়াও আর একটা কিছু; তাহার সঙ্গে নিজকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তবে যেন সে নিজকে পাইল। কালের ভঙ্গিমায়; এই গতির লীলা ইহাই সুখ। আনন্দ হইতে লীলা—ইহাই বুঝিবার মজিবার জিনিষ। তাই ইহাকেই আমরা চাই আগে। বাস্তবের বাস্তবতার গতিই হইল মাপকাঠি। সুখের জন্য ছুটাছুটী—ইহাই জীবনের স্বাদবর্ণগন্ধ আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু আধারকে তো পাওয়া চাই। আধেয়ের দিকে চাহিলে বাহির দিকেই নজরটা পড়িবে। অথচ আধারে প্রতিষ্ঠিত হইলে আধেয়ের জন্য কোনও ভাবনা নাই। এই সম্পর্কেই শ্রেয়ের সঙ্গে বিদ্যার সম্বন্ধটা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। তেমনি করিয়া বুঝিতে হইবে প্রেয়ঃকে আর অবিদ্যাকে। অবিদ্যাকে চিনিনা—চিনিলে সে থাকিত না। কিন্তু প্রেয়কে যেমন চাই, তেমনি পাই। এইবার যদি শ্রেয়ের দিকে হাত বাড়াই, তবে প্রথমে কি করিতে হইবে? জীবনের যে দিকটা স্পষ্ট, সেই দিকটাতেই অদল-বদল করিতে হইবে। প্রেয়ের আবদারটাই সর্ব্বদা কাণে আসিতেছে—অতএব উহাকেই আগে নিরোধ করিতে হইবে। কিন্তু এ তো বহিরঙ্গ সাধন; ইহার প্রেরণা জোটাইবে কে? এইখানে বিদ্যা আর অবিদ্যার বিবেক করিতে হইবে। সাধ্যসাধন এখানে নাই অথচ অনুভব আছে: তাই ইহাকে বলি সাধনার অন্তরঙ্গ দিক। বর্জ্জনমূলা বহিরঙ্গ-সাধনা ইহাকেই দিনে দিনে স্পষ্ট করিয়া তুলিবে। কিন্তু আসল কথা এই—অন্তরঙ্গের অনুভব থাকা চাই; বিশেষ অনুভব না থাকুক, সামান্যতঃ অনুভব চাই-ই চাই। সাধন সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে অপরোক্ষানুভূতি আপনি আসিয়া পড়িবে।

বিদ্যার সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধনা নাই, অথচ শ্রেয়ের সাধনসম্পর্কে তাহার আন্তরিক অপেক্ষা আছে—এই রহস্যটুকু সাধকের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। বিদ্যার সম্পর্কে প্রথমে ধরিতে হইবে অবিদ্যাকে—তাহার সঙ্গেই লড়াইটা চলিবে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে তো অবিদ্যাকে চিনি না—বুঝি না। তাই প্রেয়ের উপরই প্রথম আঘাতটা পড়িবে—কেননা অবিদ্যার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অবিদ্যা যদি কারণ হয়, প্রেয়ঃ তাহার কার্য্য। অবিদ্যাকে দূর করিতে হইলে, তাহার যে সমস্ত কার্য্য প্রেয়ের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে দূর করিতে হইবে। প্রেয়ের আকর্ষণ মানুষকে কি করিয়া ফেলে, উপনিষদ্ তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রেয়ের প্রথম আকর্ষণ—কামলোলুপতা। এ শুধু যোগক্ষেমের দায়ে প্রেয়কে বরণ করা নয়—প্রেয়ের মাঝে যে রসটুকু আছে, সেইটুকু নিঙরাইয়া উপভোগ করিবার লালসা। উপকরণের চর্চ্চায় এ বিপদ আছেই। প্রথমে যোগক্ষেমের গরজে সংসার—তারপরই বিড়ম্বনা। দেখিয়া শুনিয়া বিবেকী বলেন, যোগক্ষেমের দায়টুকুও কাঁধে লইও না। সংসারী শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিবে। কিন্তু "তেষাং সততযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—কথাটা কি ফাঁকি? সতত যোগের পরীক্ষা কি হইয়া গিয়াছে?

প্রেয়ের দ্বিতীয় দান পাণ্ডিত্য। এইটুকু হইল বুদ্ধির নকল তৃপ্তি। সাধনসম্পদ নাই, অথচ পাণ্ডিত্য আছে—পাণ্ডিত্যের অভিমান আছে—এত বড় দুর্দ্দৈব বুঝি আর নাই। বুদ্ধির বিশুদ্ধি হইলে তবে না সত্যের পথ,

মিলিত। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ধোঁয়ায় বুদ্ধি আবিল হইয়া গেলে পথ খুঁজিবে কে? পণ্ডিতদের পথ বাৎলাইয়া দিলেও ফল নাই, কেননা তারা যে "স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।" সত্য যদি চাই, তবে পাণ্ডিত্যকে খাটো করিতে হইবে। শিশুর মত সরল হইয়া, নবনীর মত কোমল হইয়া এমন এক জনকে খুঁজিতে হইবে, যে নাকি দুটা কথা আমাকেই বলিতে পারে আমার বক্তৃতা শোনার অপেক্ষা রাখে না। "অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি"—যে খোঁজে, সে জানে, কথাটা মিথ্যা নয়। অপরে বলিয়া না দিলে এ পথে আর উপায় নাই। স্বাধীন বুদ্ধির দেমাক্ চুলায় যাক্।

প্রেয়ের তৃতীয় কাজ—ছুটাছুটি। "দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" রসানুভূতিকে প্রেয়ের পথে চালাইলে যে ছুটাছুটি, বুদ্ধিতে চালাইলেও তাই। ইহাকেই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, অব্যবসায়ীর বুদ্ধি—"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।" এ কামলোলুপতার ফলও বটে, পাণ্ডিত্যের ফলও বটে। পাণ্ডিত্যে বিপদ্ উভয়তঃ। একে নিজেই "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ"—তার উপর অপরের পরিচালনা। তার ফলে উভয়েরই পতন। উপদেষ্টার বাহুল্য হইলে তাই ঘটে। "গুরু মিলে লাখে লাখ—চেলা না মিলে এক।"

প্রেয় উপাসকের আর কয়েকটা লক্ষণ—বুদ্ধির অপরিণতি, প্রমাদ, বিত্তমোহ আর পরলোকে অবিশ্বাস। বুদ্ধির অপরিণতি শ্রদ্ধার অভাবে। আস্তিক্যবুদ্ধি থাকা চাই—তবে না জগৎকেও চিনিব—নিজকেও চিনিব। শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিলেই ভগবানের লীলার প্রত্যক্ষ হয় না। বড়র ছায়া হৃদয়ে পড়িলে তবে ছোটকে বুঝিবার শক্তি জন্মে। বড়র বুদ্ধির অনুযায়ী যাহার বুদ্ধি গড়িয়া উঠে নাই, সংসারী চালে সে পাকা হইলেও অধ্যাত্মজগতে সে বালকমাত্র। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্"- অধ্যাত্মতত্ত্ব তাহার কাছে প্রতিভাত হইবে না।

প্রমাদ আছে আচারে আর প্রমাদ আছে বিচারে। এর প্রতিকার হইবে অন্তর্মুখীনতায়। আচার ঠিক হইলে বিচার আপনিই ঠিক হইয়া আসিবে। যখন হুঁসিয়ারী জন্মিবে তখনই ভগবানকে পাইবে। বুদ্ধির স্থৈর্য্য না হইলে কিছুই হইবে না।

বিত্তমোহের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাকী রহিল পরলোকে অবিশ্বাস। এইটাই বড় নিদারুণ কথা। পরলোকের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের কথা বলিতেছি না—পণ্ডিতের মারপ্যাচ তো আছেই। তা ছাড়াও জীবের স্বভাবটাই যে মারাত্মক - "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্—শেষাঃ স্থিরত্বম্ ইচ্ছন্তি"—এই কথা ভাবিয়া যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর আমরা কি দিনান্তেও একবার এই কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি? প্রেয়ঃ আছে শুধু ইহকে লইয়া—পরলোকের কথা ভাবিবে কখন? ইহার উপর আবার সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। বিজাতীয় সভ্যতার প্রভাবে প্রেয়ের তাগিদটাই দিন দিন বড় হইয়া দেখা দিতেছে—ইহার শেষ কি মহতী বিনষ্টিতে?

এতগুলি হইল প্রেয়ের কারসাজি। এদের ঠেকাইয়া তবে শ্রেয়ের সন্ধান। এই সাধনায় অবিদ্যা দূর হইয়া যাইবে—বিদ্যার বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে। ওঁ শান্তিঃ।

আত্মবোধ

—*—

বৈদান্তিকের চিত্তৈকাগ্র্যের গোড়ার কথাই হচ্ছে এই যে, তাঁর আত্মাকে তিনি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, সবিতার সবিতা রূপে উপলব্ধি করবেন। দেহকে ছাড়িয়ে, মনকে ছাড়িয়ে এই অবস্থায় নিজকে নিয়ে এসো - মায়ার সম্মোহন ভেঙ্গে আপনাকে জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, সবিতার সবিতা বলে জান, দেখবে সমগ্র বিশ্ব তোমার কাছে এক বিশাল চিত্রপটের মত ভেসে উঠেছে, কিম্বা মেঘের খেলার মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তখন যা তোমার কাছে আসবে—তা আসবে নত হয়ে।

যদি অসুবিধা না হয়, তবে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সূর্য্য চক্রবাল রেখার নীচে থাকতে থাকতেই পূব দিকে মুখ করে দাঁড়িও। তারপর সূর্য্যের জ্যোতির্ময় পরিবেশের দিকে যদি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাক, তবে তার উজ্জ্বল প্রশান্ত দৃশ্যে মনকে সচেতন করিয়া তুলবে - মনটা একটু উঁচুতে উঠে যাবে। মন এমনি করে একটু চাঙা হয়ে উঠলে বা একটু উন্নততরের দিকে এগিয়ে গেলে ক্রমে তাকে যত খুশী উপরে টেনে তোলা যায়—একেবারে নিম্নভূমি হ'তে পর্ব্বতের তুঙ্গ-শৃঙ্গে তাকে উন্নীত করা যায়।

ভারতবর্ষে এক রকম খেলা আছে। ছেলেরা পেট মোটা দুদিক সরু একটা "গুলি" মাটীতে রেখে তার একটা মাথায় একটা "দাণ্ডা" দিয়ে আঘাত করে আর গুলিটা একটু উপর পানে লাফিয়ে উঠে। অমনি দাণ্ডা দিয়ে তাকে কসে এমন এক ঘা দেওয়া হয় যে, সে বোঁ বোঁ করে বহুদূর গিয়ে ছিটকে পড়ে। এই খেলার মাঝে দুটী কসরত আছে—প্রথমতঃ গুলিটা তোলা, তার পর সেটাকে দূরে ছিটকে ফেলা। তেমনি চিত্তকে যদি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করতে চাও, তবে প্রথম তাকে একটু তুলে ধরতে হবে, তারপর অধ্যাত্ম রাজ্যের দূর-দূরান্তরে তাকে পাঠাতে হবে।

চারিদিকে একটা প্রশান্তির আবহাওয়া, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতিতে অনেক সময় মনের প্রাথমিক স্ফূর্ত্তির পক্ষে খুব সাহায্য করে। একবার যদি মনের গতি ফিরে গেল, তখন তাকে উল্টামুখো ঠেলে তুলতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এমনি করতে করতে অবশেষে দেহবোধ আর থাকে না—জীবের জীবত্ব লোপ হয়ে সে তখন শিব হয়ে যায়। মনের মাঝে প্রাথমিক বেগ সঞ্চারের পক্ষে দেশ আর কালের আনুকূল্য খুবই কাজ করে বটে। ভোর বেলায় পাখীর গানে, গন্ধে উদাস হাওয়ার ছোঁয়ায়, পূব আকাশের রঙীন মায়ায় মনকে খুব উঁচু সুরে বেঁধে দেয়।

কেমন করে এই মনকে আমরা ভাবের অমরাবতীতে নিয়ে যাব?—কি করে এ ভগবানের সিংহাসনতলে গিয়ে পৌঁছাবে? যখন ভাবে বিভোল ঢুলুঢুলু চোখের উপর সন্ধ্যা-সকালের কোমল রঙের ছোঁয়াচ লাগবে, তখন আমরা জপ করব—ওঁ-ওঁ; ভাবের ভাষায় প্রাণের সুরে এই মন্ত্র গাইব তখন।

ওঁকারকে ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভেবে থাকে। যে অধ্যাত্ম যোগের যেমন স্তরে

রয়েছে, সে তারই অনুরূপ ব্যাখ্যা করবে, তাতে আর দোষ কি? যাঁরা জানেন, উঁহার আত্মাই জ্যোতিঃ, সবিতার সবিতা—তাঁরা ওকার জগতে জগতের জ্যোতির সূর্য্যের দিকে তেমনি তাকিয়ে থাকেন—যেমন নাকি মেয়েরা আয়নার দিকে তাকায়। এমন বিলাসী মেয়ে আছে, যারা অষ্টপ্রহর সঙ্গে আয়না পরে। বাস্তবিক মেয়েদের কাছে আয়নার চেয়ে সোহাগের বস্তু বুঝি আর নাই। আয়নাতে যখন মেয়েরা মুখ দেখে, তখন আসলে মুখটাকে তারা দেখে বাইরে, কিন্তু মনে মনে জানে আসল মুখ তাদের সঙ্গেই আছে। বাইরের জিনিষটাও যে তারা নিজে—এ কথা তারা বেশ জানে। বেদান্তীও তেমনি করে সূর্য্যের দিকে তাকান। তিনি জানেন, বেশ বুঝতে পারেন যে আসল সূর্য্য রয়েছে তারই মাঝে—বাইরের এই জড় জগতের সূর্য্য শুধু তারই প্রতিফলন, প্রতিচ্ছায়া।

সূর্য্যের সঙ্গে চন্দ্রের যেমন সম্পর্ক, বৈদান্তিক বলেন, তার সঙ্গে সূর্য্যেরও তেমনি সম্পর্ক। এখানে মনে হয়, চন্দ্র বুঝি নিজেই আলোক দেয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে চন্দ্রের সমস্ত আলোই তো সূর্য্যের কাছেই ধার করা। তেমনি, বৈদান্তিকও জানেন এবং অনুভব করেন যে, এই যে সূর্য্যের উজ্জ্বল মহিমা—এ তাঁরই, "সূর্য্য আমার কাছ থেকেই তার এই দীপ্তি পেয়েছে—তার এই মহিমা, তার এই গৌরব আমারই।"

আসলে পৃথিবী ঘোরে, অথচ আমরা মনে করি সূর্য্য ঘুরছে। কিন্তু যখন জ্যোতিষ পড়ি, তখন আর আমরা ভুল করি না—তখন বুঝতে পারি, ব্যাপারটা [illegible] ভুল [illegible] আরোপিত হয় মাত্র। তেমনি বৈদান্তিক দীপ্যমান সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেন—এই যে তার জ্যোতির্ম্ময় মহিমা, এই যে শক্তির প্রকাশ—এ তো ভুল করে সূর্য্যের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এ যে আমার—আমার—আমার!

জড় জগতের এই সূর্য্য জ্ঞানের একটী জ্যোতিস্মৎ প্রতীক মাত্র। আবার সূর্য্যকে শক্তির প্রতীকও বলা চলে। সূর্য্যই তো গ্রহমণ্ডলকে আবর্ত্তিত করছে। সূর্য্য জীবনেরও প্রতীক। সমস্ত প্রাণের উৎস হচ্ছে সূর্য্য। সূর্য্য সৌন্দর্য্যের প্রতীক তার উজ্জ্বল রূপে পৃথিবীকে সে আকৃষ্ট করছে, সব বস্তুকে রূপ দিচ্ছে। সূর্য্যে তাহলে আছে—জ্যোতিঃ, জ্ঞান প্রাণ, শক্তি, সত্তা, সৌন্দর্য্য, আকর্ষণ। বেদান্তী জানেন, এই সমস্ত গুণই তাঁর। শুধু "আমার" বলে জানা নয় বেদান্তী জানেন, এ তিনিই। এই শক্তি, জ্যোতিঃ, প্রাণ, ইত্যাদি ধর্ম্ম আমার বাইরে দেখছি যেমন এক জন সুন্দরী তার মুখখানি তার বাইরে আয়নার মাঝে দেখতে পায়। বাস্তবিক পক্ষে আমিই জ্যোতিঃ, আমিই জ্ঞান, আমিই প্রাণ, আমিই আকর্ষণ, আমিই সব।

এই তত্ত্ব ধারণা করে মায়ার সম্মোহন ভেঙ্গে নিজের স্বরূপ ফিরে পেতে হলে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রণবজপে খুব ফল পাওয়া যায়। প্রণব জপ করবার সময় বেদান্তী এই ভাবনা করবেন—"আমি জ্যোতির জ্যোতিঃ—আমিই সূর্য্য। প্রকৃত সূর্য্য আমিই—জড়জগতের সূর্য্য আমারই প্রতীক মাত্র। আমাকেই কেন্দ্র করে গ্রহমণ্ডলী আবর্ত্তিত হচ্ছে। আমার মহিমাতেই জ্যোতিষ্কে গতির [illegible] কার্য্যের প্রেরণা

আমি অনন্ত—বর্ত্তমানে, ভূতে, ভবিষ্যতে আমি একরূপ। সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র বিশ্ব আমার সম্মুখেই বিকাশিত হচ্ছে। এত পৃথিবীর আবর্ত্তন আমাকেই কেন্দ্র করে আমার সামনে ঘুরে ঘুরেই সে তার যা কিছু আমার কাছে মেলে ধরছে। বিশ্বে যা কিছু হচ্ছে—সবই আমার জন্য। আমার জন্যই সূর্য্য তার কিরণ ঢাল্‌ছে—আমার জন্যই চন্দ্র তার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিচ্ছে।

"আমার আদেশে, আমার সাক্ষাতেই জগতের সকল ব্যাপার ঘটছে। এই সূর্য্য আছে বলে যেমন গাছ বাড়ছে, জীবজন্তু নড়ছে, মানুষ ভাবছে—তেমনি আমার স্পর্শেই জাগছে সবাই। আত্মা যিনি—শিব যিনি, তাঁর স্পর্শে, আমার স্পর্শেই এ জগত চল্‌ছে। স্বর্গে আর মর্ত্ত্যে যা কিছু আছে—যত জীব, যত বিদেহী—যত দেবতা, সব আছে আমি আছি বলে। আমিই যে সাবিত্রীর সবিতা—আমাতেই তো সব!

"জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ আমি। আমরা স্বপ্নে যা কিছু দেখি, তা প্রদীপের আলো দিয়েও নয়, চন্দ্রসূর্য্যের আলো দিয়েও নয়। তবুও তো আমরা দেখি—আর একথাও ঠিক যে আলো ছাড়া কিছু দেখার যো নাই। তবে আমরা দেখি কোন্ আলো দিয়ে? সে আমার সত্তাস্বরূপের আলো—আত্মার আলো সে। আমার আলোতেই স্বপ্নের প্রত্যেকটী বস্তু উজ্জল হয়ে ওঠে। স্বপ্নে যার এক টুকরা যারা দেখি—সে আমার আলোতেই দেখি। হীরকের তীব্র জ্যোতিঃও আমারই জ্যোতিঃ সমুদ্রের একটী তরঙ্গ মাত্র। স্বপ্নে যদি চাঁদ দেখি, তবে তাকেও জানব, আমারই মহিমার একটা ভঙ্গিমা। যদি সূর্য্যকে দেখি, তবে জানব, তার জ্যোতিঃও আমারই বিচ্ছুরিত-সমুদ্রের একটী হিল্লোল মাত্র। তেমনি ঘটে জাগ্রতে;—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র—সমস্তই আমারই জ্যোতিঃসমুদ্রের অগণিত বীচিভঙ্গ। আমি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ—আমি জগজ্জ্যোতিঃ! অপার পারাবারের মত উদার আমার সত্তা—তার মাঝে চন্দ্রসূর্য্যের, দেবমানবের লহরীলীলা চল্‌ছে। আমিই সূর্য্যকে সমুদ্র শয়ন থেকে জাগিয়েছি—আমারি প্রেরণায় চন্দ্রের এই বিচিত্র আবর্ত্তন!

"আমি রাজার রাজা। আমিই জগতের সকল রাজশক্তে রাজা হয়ে বসেছি। আমিই কুসুমিত কাননে প্রফুল্ল কুসুম হয়ে ফুটেছি। অপ্সরীর মনমাতানো হাসিতে আমিই মধুময় হয়ে দেখা দিয়েছি। বীরের বীর্য্যশালী বাহুতে অদম্য শক্তির সঞ্চার করেছি আমি। বিশ্বপ্রাণ আমাতে স্পন্দিত, বিশ্বগতি আমা হতে সঞ্চারিত, বিশ্বসত্তা আমারি বলে নিয়ন্ত্রিত। এই যে কালচক্রের আবর্ত্তন—এতো আমারই ইচ্ছার বিলাস। আমারি অকুণ্ঠিত শাসনে বিধৃত এ জগৎ—আমিই প্রকাশ সর্ব্ব ঠাঁই। বিশ্বপ্রাণীর বুভুক্ষার তৃপ্তি করাচ্ছি আমি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট হতে মহত্তম সৃষ্টির অন্নভাগের আমিই তো বিধাতা। আমিই সূর্য্যকে পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তিত করেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বেও আমি সৎস্বরূপে বর্ত্তমান।

"সংসার-বাসনা আর কুভাবনা মিথ্যা দেহমনের সৃষ্টি আঁধারের বস্তু তারা। কিন্তু আমার প্রকাশে অটুট থাকবার মত অন্ধকার আছে কাদের? আমিই চরম সূক্ষ্মতম আকাশ—আমাতেই বিশ্বজগৎ ভাস্‌ছে স্থূল আকাশ ধৃত রয়েছে। জ্যোতিঃর জ্যোতীরূপে আমি প্রতি বস্তুতে, প্রতি অণুতে পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত অনুপ্রবিষ্ট রয়েছি। আমিই পরম,

আমিই অধম। উচ্চ-নীচের ভেদ নাই আমার কাছে। যেখানে মানুষের দৃষ্টি পড়ছে—সেইখানেই আমি ফুটে উঠছি। আমিই দর্শক আমিই অভিনেতা। খৃষ্টে আমি আত্মপ্রকাশ করেছি—মহম্মদে আমি ফুটে উঠেছি। জগতের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ আমি অখ্যাত, নিন্দিত, পতিতের চরমও আমি। আমি সব সব আমি। তোমার কামনায়, আমি তাই। কি অপরূপ মাধুর্য্য আমার!—বিদ্যুতের ঝিলিকে আমি, ঝড়ের গর্জ্জনে আমি, পাতার মর্ম্মরে আমি, পবনের নিশ্বাসে আমি, সাগরের তরঙ্গবিক্ষোভে আমি। বন্ধু আমি, শত্রুও আমি—শত্রু মিত্রের ভেদ নাই আমার কাছে।

"দূর হ যত কুবাসনা কুভাবনা—জগতের ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল ঐশ্বর্য্য আর প্রতিপত্তির কাঙ্গাল তোরা। এ দেহের যে কোনও বিকার হউক না কেন, আমার তো কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই তাতে। সব দেহই যে আমার দেহ। আমিই ফ্রাঙ্কলিন—আমিই নিউটন—আমিই মনীষী কেল্‌ভিন্। শৌর্য্যাবতার রাম আমি—মাধুর্য্যের ডালি কৃষ্ণ আমি। কাণ্টের বুদ্ধিকে দীপ্ত করেছি—বুদ্ধের হৃদয় গলিয়ে দিয়েছি—শঙ্করের জ্ঞানকে উজ্জ্বল করেছি আমি। জগতের সকল সেক্সপীয়রের সকল প্লেটোকে আলোর সন্ধান দিয়েছি আমি। আমিই উৎস—আমিই মূল—আমার দুয়ারেই ভিখারী তারা। আমিই তাদের পূর্ণতা—আমিই তাদের দীপ্তি।

"সংসার বাসনায় বাঁধা পড়েই মানুষ তার সত্য-স্বরূপ হতে বিচ্যুত হয়। তাই বলি—দূর হোক এই প্রকৃতির মোহিনী মায়া—এই গোলাপের মায়াকানন। তোরা সকলই যে আমার মাঝে; আমাকে ধারণ করতে পারে, এমন আধার কোথায়? এই বিশ্বজগৎ আমার মাঝে—আমাতেই সব। আমার আবার আশ্রয় কোথায়? আমার আবার সঙ্কোচ কোথায়? এই সংসার?—সংসার আমারি মাঝে। বিশ্বজগৎ?—বিশ্বজগৎ আমারি মাঝে। আমিই আবার সবারি সব। আমি সবার চিত্ত—আমি সবার ভাবে। প্রেমিকের হিয়ার ধকধকাতে আমি—গরবিণী প্রিয়ার হাসিমাখা আঁখিপাতে আমি। আমিই সবার নাড়ীতে স্পন্দমান। আমি তোমাতে—এই যে তোমাতেই আমি! না—তুমি আমিই বা কোথায়? কোথায় বা ভেদ?—অহমেব ব্রহ্ম।.........

"অপরূপ অরূপে যে ব্যাপ্ত সর্ব্বভূতে,
আমি রস তার। বহ্নিমাঝে দীপিয়াছি—
চন্দ্রসূর্য্য আলোকে জ্যোতির মালিকা—
নাচিয়াছি ঝঞ্ঝাসাথে—পড়েছি ঢলিয়া
তটিনীর তরঙ্গিত নূপুর শিঞ্জনে!
আমি নর, আমি নারী—যৌবন স্বপন;
সদ্য ফোটা শিশু আমি;—জরাজীর্ণ দেহে
জীবনের গুরুভার বহি দণ্ড ধরি!
ব্যাপ্ত আমি বিশ্ব জুড়ি,—ভ্রমর গুঞ্জনে—
বিহগের কাকলিতে—শার্দ্দূল-গর্জ্জনে—
ওষধিতে—শষ্পদলে—মেঘপুঞ্জমাঝে
বিদ্যুতের দীপ্ত হাসি—অশনিনির্ঘোষে!
আমি কাল অন্তহীন আমি পারাবার;—
বিশ্ব চাহে মোর মাঝে আদি অন্ত তার!...*

---

*স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা জানুয়ারী, ১৯০২)

পথের সঙ্কেত

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

অভিমানের কথা বলিয়াছি—এর পর মমতার কথা। বাহ্যবস্তু প্রতি আসক্তির কথা এখানে তুলিব না—মমতাকে আমরা সঙ্কীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করিব। হৃদয়ের যে পিপাসা আকুল হইয়া ফিরিতেছে অন্তরিন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য—তাহাকেই বলি মমতা। রসের পিপাসাকে আমরা ভাল করিয়া চিনি না, তাহাকে বুঝিবার বা নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাও করি না। কিন্তু তার দাবী যে কত বড় তাহা তখনই বুঝি, যখন পরিণত জীবনে কর্ত্তব্যের মাঝে দ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ত্তব্যের মাঝে অমিনা অভিমানের লীলাটাই প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু মমতার অন্তঃসলিল স্রোত যে কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রকে কতখানি সরস রাখিয়াছে কিম্বা প্রতিকূলতায় কঠিন কর্ত্তব্যের আকর্ষণকেও বিমুখ করিয়া দিতেছে, তাহা বুঝিতে পারি কই?

প্রথম যৌবনের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথাই ধরা যাক্। সেইখানেই মমতার প্রথম উন্মেষ। যৌবন কি না চায়?—সে চায় রূপ, সে সে চায় শক্তি, সে চায় খ্যাতি। ইহার জন্য যে চেষ্টা, তাহা বাহিরেই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু রসের পিপাসী যে যৌবন, হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে কে তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে? যৌবন বলিতে [illegible] বাহিরের বিক্ষোভটাই বড় করিয়া দেখি; কিন্তু মনে হয়, বাহিরটা ব্যাপক হইলেও গভীরতায় যৌবনের অন্তরটাই বড়। বাহিরে যৌবন যাহা চায়, তাহার জন্য সে লড়াই করিতে প্রস্তুত—সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এই সমস্তটা জগৎ। তাই দশের চোখের সম্মুখে তার বীর্য্যের পরীক্ষা হয়—দশের বিচারে যৌবনের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু অন্তরের মাঝে লুকাইয়া আছে যে আকুল চাওয়া—তাহার তৃপ্তি তো সারা জগৎ খুঁজিয়াও মিলে না। আর অন্তরের পিপাসা তো অন্তঃপুরিকার মত—দশের চোখের সম্মুখে সে যে লজ্জায় নুইয়া পড়ে, তাই সে চলে দিগ্বিজয়ী বীরের মত নয়—মরমে আকুলা অভিসারিকারই মত।

এই অন্তঃপুরিকার পরিচয়ই যদি না জানিতে পারিলাম তবে যৌবনকে বুঝিব কি দিয়া? এ জানার ভার অপরের উপর ন্যস্ত করিলে চলিবে না—সে ভার নিতে হইবে নিজের। তবে হাঁ, এমন কোনও মর্ম্মসহচর দরদীর সন্ধান যদি পাইয়া থাক, মহৎ হইয়াও যিনি তোমার অপরিস্ফুট যৌবনলীলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তোমার নিঃসঙ্কোচ আত্মসমর্পণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানেন, তবে তাঁহার কাছে তোমার অন্তরের গোপন রহস্যটুকুও নিবেদন করিয়া দিতে পার—তাঁহার কাছে রসনিবেদন বৃথা হইবে না। কিন্তু এমন গুরু পাইবে কোথায়? যৌবনের গুরু তো আছে অনেক, কিন্তু সাহস করিয়া তোমার অন্তঃপুরেও প্রবেশাধিকার দিতে পার—এমন গুরু বেশী আছে কি? সে যে নাই, তাহা বেশ জানি। তাই দেখি, যৌবনের বাহির্ম্মুখতা দিকে দিকে দুর্ব্বার

হইয়া উঠিতেছে—কিন্তু তাহার অন্তরের মর্ম্মন্তুদ রোদন কাহারও কাণে পৌঁছাইতেছে না। সে দোষ দিব কার?—দোষ শিক্ষারই। বাহিরটাকে সে পরিশীলিত করিয়া তুলিল; কিন্তু অন্তরে যে কিসের আগুন ধোঁয়াইয়া উঠিতেছে, তাহার তো কোন খোঁজ লইল না।

অপরে যদি তোমার ভার না লইল, তবে নিজেই তোমাকে তাহা লইতে হইবে। অপরের কাছে তোমার মনের কথা অব্যক্ত রহিল—তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু নিজের কাছে নিজকে কখনও গোপন রাখিও না। বাহিরের চেয়ে অন্তরের দরদ বেশী—নিজকে সেখানে চিনিয়া উঠাও কঠিন। তোমার যে মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহার ভালমন্দের বিচার তুমি একা করিবে না তো; সে জায়গায় নিজকে ভুল বুঝিলেও দশের বিচারে সে ভুল বেশী দিন টিকিবে না। অভিমান যে কাজের পত্তন করে, তাহা সংসারের হাটে;—সেখানে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকা যায় না। কিন্তু বিপদ তোমার অন্তরকে লইয়া। সেই তো বাহিরের কর্ম্মে রসের জোগান দিতেছে—কিন্তু তাহাকে ঠিক ঠিক চিনিতে পারিল কয় জন? এক অন্তর্য্যামীই তোমার অন্তরের কথা জানেন—তুমিও সব সময় তাঁহাকে বুঝিতে পার না। কিন্তু তবুও একটা ভরসা আছে যে, অন্তর্য্যামী তোমারই অন্তরে বসিয়া তোমাকে নিয়মিত করিতেছেন—সুতরাং তাঁহার সহিত সখ্য করিয়া তাঁহার সঙ্কেতটী শিখিয়া লইতে পার না কি? অভিমানে তিনি তোমাকে বাহিরে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন—তাই জগতের মাঝে তুমি পাইলে রূপ। কিন্তু মমতার ডুরিতে যে তিনি তোমাকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন—সেখানে তুমি বস। এই রসের মর্ম্মবেত্তা তোমাকে হইতে হইবে—নতুবা জীবনের রহস্য আঁধারই হইয়া থাকিবে।

যৌবনের প্রথম উন্মেষে জাগে একটা অতৃপ্তি, একটা মাদকতা। চোখের সামনে যতটুকু জগৎ—সে জগতের যতটুকু জানা শোনা—তা লইয়া আর হৃদয় তৃপ্ত থাকিতে চায় না। সাধ যায়, নিজকে আরও দূরে ছড়াইয়া দিতে; যাহাকে দেখি নাই, জানি নাই তাহার জন্যই যেন মন তখন ঝুরিয়া মরে। এই যে আকুলতা, ইহার সুনির্দিষ্ট কোনও একটা রূপ নাই—কোনও বিশিষ্ট রূপের মাঝেও এ অবসান পাইতে চায় না। তাই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সুলভ হইলেও তাহা দিয়াই শুধু যৌবনের পিপাসা মিটে না—কেননা বিষয়ের একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ আছে; কিন্তু যৌবনোন্মাদ তো সুনিশ্চিতের পিপাসী নয়। এই জন্যই যৌবনে আকর্ষণও যত তীব্র, বৈরাগ্যও ততখানি তীব্র। যৌবনের মাঝে এই যে একটা দ্বৈত রহিয়াছে—ইহাকে আমরা তলাইয়া দেখিতে শিখিয়াছি কি? ইহার অনিশ্চিত আকুলতাকে কোন বৃহত্তর সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছি কি? আকুলতাকে আমরা লালসা মনে করিয়া তাহারই ইন্ধন সংগ্রহ করিয়াছি, যৌবন ফুটিতে না ফুটিতেই ভোগের সঞ্চয়ে তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়াছি। তাই আমাদের সমাজে দেখা দেয়, যৌবনের সুষমা নয়—যৌবনের বিকার।

কিন্তু এই বিকারের আড়ালেও সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সেইটুকুই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যৌবনের যথার্থ মর্য্যাদা লাভ করিতে হইলে চাই সুনির্ম্মল কৈশোর। যে বয়ঃসন্ধিতে মানুষের সমস্ত দেহ-মন কি এক

অজানা সম্পদের প্রতীক্ষায় কানায় কানায় পূরিয়া উঠে, রসের অভিষেক না মিলিলেও তাহার আভাসে-ইঙ্গিতে চিত্ত উছলিয়া উঠে—যৌবনের সেই যৌবরাজ্যের সময়টীকে দেবপূজার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র রাখিতে হইবে। সঙ্কট যৌবনের তত নয়, যত সঙ্কট এই কৈশোরের। যৌবন যদি কোথাও ঠেকিয়া যায়, তবে তাহার বাঁচিবার পথ সে নিজের মাঝেই খুঁজিয়া পাইবে। কিন্তু কৈশোরের যে আত্মমর্য্যাদা জাগে নাই, তাহাকে হাতে ধরিয়া পথ দেখাইয়া না দিলে সে বাঁচে কি করিয়া? স্বভাবকে লঙ্ঘন করিয়া যে কৃত্রিম সমাজ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি, সন্তর্পণ সেবা ভিন্ন স্বভাবের রস সেখানে কিছু ফুটিয়া উঠে কি? তাই যৌবনকে আমরা আত্মশাসনে আত্মরক্ষা করিতে বলিতে পারি, কিন্তু কৈশোরকে বাঁচাইব কি করিয়া? সেখানে তো মর্ম্মী মানুষ না হইলে চলিবে না।

অকৃত কৈশোর যদি না পাইয়া থাক, তাহা হইলে যৌবনের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না। লোকে তার মাঝে যে বিভীষিকার কথা বলে, সেগুলিই তোমার চোখে পড়িবে, কিন্তু যে অমৃত তাহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান তো পাইবে না। নির্ম্মল কৈশোর হইতে নির্ম্মল যৌবন ফুটিয়া উঠিলে তবে না রসের পরিপাক হইত—রসের সন্ধান আপনিই মিলিত। অশুদ্ধ কৈশোরের পরপারে যে যৌবন, রসের পথ তাহার কণ্টকিত। সত্যের সঙ্কেত বুঝিতে হইলে আগে অসত্যের সঙ্গে তাহাকে লড়িতে হইবে—রসাস্বাদনের অবসর তাহার হইবে কোথায়? আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে যৌবনের পক্ষে আজ শুধু এই লড়াইয়ের পথটাই খোলা রহিয়াছে—রসের দুয়ার তাহার কাছে রুদ্ধ। যদি আর উপায় না থাকে, তবে অগত্যা এই যুদ্ধ-কণ্টকিত পথেই যৌবনকে চলিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের কথা আমরা এখন বলিব না—যৌবনে যে রস রহিয়াছে তাহারই স্বরূপটী আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

রসই সত্য—জীবনেরও সত্য, যৌবনেরও সত্য। এই রসের বিশিষ্ট প্রকাশকেই আমরা নাম দিয়াছি মমতা। বলিয়াছি যৌবনের আকুলতার কথা। এই আকুলতা জাগে মমতা হইতে। মমতার দুইটি রূপ—একরূপ তার আকর্ষণ আর একরূপ বিসর্জ্জন। মানুষ সংস্কারে অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাই তাহার সমস্ত হৃদয়াবেগের মাঝে সে আকর্ষণের শক্তিকেই প্রবল বলিয়া অনুভব করে; কিন্তু মূলে আত্মবিসর্জ্জন না থাকিলে আকর্ষণ দাঁড়াইত কোথায়? যৌবনের সত্তাকে পাইতে হইলে মমতার মাঝে এই আকর্ষণ আর বিসর্জ্জনের রহস্যটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আকর্ষণের আকুলতার চেয়ে যে গভীরতর সত্য বিসর্জ্জনের ব্যাকুলতা—এ কথা যদি অনুভব করিতে পারিতাম, তবে জীবনের মাঝে নূতন তাৎপর্য্য দেখিতে পাইতাম। সেই কথাই এখন বলিতেছি।

আমরা ভাবি, যৌবন কেবল গ্রাস করিতেই জানে—তার যে মমতা, সে কেবল আপনার বেষ্টনীর মাঝে আর সকলকে টানিয়া আনিবার আকুলতা মাত্র। জীবনের প্রথম হইতেই ভোগোপকরণ দিয়া চিত্তবৃত্তিকে আমরা যেমন উত্তেজিত করিয়া তুলি, তাহাতে যৌবনে যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাই জাগিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই বুভুক্ষার আগুন বুকে লইয়া কি কেহ

শান্তি পাইয়াছে? ভোগের উত্তেজনায় ক্ষণেকের জন্য মানুষ দিগ্‌বিদিকশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহা কিছু পাইয়াছে রাক্ষসের মত দু'হাতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া কবলিত করিয়াছে—কিন্তু ভোগের চরম মুহূর্ত্তে কি পাইয়াছে?—শান্তি না শ্রান্তি? চিত্ত-প্রসাদ না চিত্তের অবসাদ? পাইয়া তো চিত্তে তৃপ্তি আসে নাই। এতখানি ভোগের উদ্দামতার পরও অতৃপ্ত চিত্ত "না তিরপিত ভেল" বলিয়া কাঁদিয়াছে-ই শুধু। ভোগের শ্রান্তিতে মানুষের ক্ষণেকের জন্য বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, ক্ষণেকের জন্য মনে হইয়াছে—"না, এ পথে তো শান্তি নাই, ত্যাগের নিম্নগ পথেই চলিতে হইবে, নিজকে অক্ষত রাখিয়া কিছু পাই কি না তাহাই খুঁজিতে হবে।" কিন্তু ভোগ-সংস্কারের প্রাবল্যে এই বিরক্তি স্থায়ী হয় নাই, বিস্মৃতিতে চিত্ত আবার আঁধার হইয়া গিয়াছে। কি যে শ্রান্তি, কি যে অতৃপ্তি, তাহার কথা ভুলিয়া গিয়া মানুষ আবার ভোগের পথেই উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে—আবার অঞ্জলি পূরিয়া বিষপান করিয়াছে—আবার যাতনায় ছটফট করিয়াছে। সমাজের যবনিকার অন্তরালে এই তো যৌবনের অন্তঃপুরীর লীলা। কিন্তু এই কি সবটুকু সত্য?

আমরা তাহা মানি না। ভোগকে সংযত কর, দেখিবে আকর্ষণের পাশবিক উন্মাদনার স্থানে আত্মবিসর্জ্জনের সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইটুকুই তত্ত্ব—আর সমস্তই বিকার। তোমার প্রাণে যে যৌবনের পিপাসা—তাহা গ্রাস করিতে চায় না—তাহা চায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে; নির্ম্মল কৈশোরের দান যে নির্ম্মল যৌবন, সে তোমাকে বুঝাইতে পারিবে—এই আত্মবিসর্জ্জনে, এই আত্মপ্রসারণে কত সুখ, কত তৃপ্তি। কলুষিত যৌবন যে মমতার বিকারে বিশ্বের সকল ভোগসম্ভার আপনার সঙ্কীর্ণ কবলে পূরিবার জন্য স্পর্দ্ধিত উত্তেজিত হইয়া উঠে, সুনির্ম্মল যৌবনে সেই মমতাই বিশ্বের সর্ব্বভূতে আত্মবিসর্জ্জনের আনন্দ আনিয়া দেয়, স্বার্থপরের মত ভালমন্দের বিচার না করিয়া সকলের মাঝে প্রেমের সৌন্দর্য্যের আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে শিখায়।

এর তত্ত্ব এই। সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনের মাঝে তুমি বসিয়াছ বলিয়া তোমার আত্মা তো সঙ্কীর্ণধর্ম্মী নন। আত্মা বিভু, উদারশক্তিস্বরূপ; তাঁহার স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তির কাছে কোনও গুণের বন্ধন নাই—নিমিত্তের বন্ধন নাই। প্রাকৃত জগতে তোমার যে বন্ধন, তাহার উপরেও এই আত্মার জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আত্মার স্ফূর্ত্তিরূপ ধর্ম্মে তাহারাও অনুপ্রাণিত। এই জন্য যুগপৎ ভাবে দেখিতে গেলে তোমার দেহ মনের বন্ধন নিতান্ত সঙ্কুচিত বলিয়া মনে হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখি, আত্মার ঔদার্য্য প্রভাবে এই দেহের মাঝেও মনের মাঝেও প্রসারণ ধর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়াছে। তবে এই দেহ-মনের দুই দিকেই সীমা আছে বটে—তাহাদের গতি চক্রাকারে আবর্ত্তিত। তাই এক এক আবর্ত্তনের মাঝে তাহাদের একটা সম্পূর্ণ পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায়—একটা আদি অন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু আদি অন্তের এই আবর্ত্তন আপেক্ষিক মাত্র—ইহার প্রেরক যিনি, তিনি আদি অন্তহীন, নির্ব্বিকার।

কিন্তু স্থূল জগতে আমরা এই আদিম প্রেরকের প্রেরণাকে অস্বীকার করিয়া চলি—যাহা স্থূল-প্রমাণগ্রাহ্য তাহাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহারই অনুশাসন

মানিয়া চলি। তাই দেহের পরিণতি ঘটিল আমরা তাহার আবদারে রাখিয়া চলি, মনের পরিণতিতে তাহার দাবীকে বড় বলিয়া মনে করি। এক জন্মাবর্ত্তনে যে দেহমনের পরিণতি, তাহাই আমাদের লৌকিক যৌবন। দৃষ্টি যাহার শুধু এক জন্মের মাঝেই আবদ্ধ রহিল, সে এই লৌকিক যৌবনেরই পূজা করিবে—কিন্তু যে আত্মার প্রেরণায় দেহমনে এই যৌবনের উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল, তাহার প্রতি উদাসীন থাকিবে। তাই আত্মপ্রত্যয়হীন ইহসর্ব্বস্ব যৌবনের কাছে ভোগোপকরণ সঞ্চয়ই চরম পুরুষার্থ।

কিন্তু দৃষ্টি যাহার অন্তর, সেই এই যৌবন লীলার যথার্থ মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পারে। সে দেখে, অরুণ যৌবনের অধিকারী সে—চিরযৌবনরসে অভিষিক্ত আনন্দস্বরূপ আত্মস্বরূপ সে—তাহারই জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত বলিয়াই না দেহমনের স্ফূর্ত্তি, লৌকিক যৌবনের এই লীলাবিলাস। আত্মার আলো যাহার উপর পড়িয়াছে, তাহার মাঝেই পুষ্টি ধর্ম্মের, ব্যাপ্তি-ধর্ম্মের, রসধর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়াছে। মর্ত্ত্যজীবনের আদিম ক্ষণে এই দেহের উপর সে আলো আসিয়া পড়িল—সুষমার পর সুষমা ঢালিয়া, কত বিচিত্র আনন্দে, কত বিচিত্র বর্ণে প্রকৃতি যৌবনের মাঝে এই দেহকে পরিপূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিলেন। যৌবনে দেহের পরিণতির সমাপ্তি হইল, কিন্তু মন তখন জাগিল মাত্র। যৌবনের সীমান্তে মনের যখন প্রথম বিকাশ, তখন আত্মার আলো আবার তাহার উপর পড়িল, প্রকৃতি আবার দেহের মতই কত বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া মনকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন—যৌবনের অনতিস্ফুট মন বার্দ্ধক্যে পরিণতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

এই তো জীবনযৌবনের ইতিহাস। ইহার মাঝে প্রেরয়িতা কে?—প্রেরয়িতা সেই আত্মা। একটী জন্মাবর্ত্তনের মাঝে যখন যে বস্তুটী তাঁহার আলোর পরিধির মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে—সেইটীই আনন্দে, সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বৈচিত্র্য তটস্থ হইয়া দেখিতে হইবে—ইহার মাঝেই আপনাকে আবদ্ধ না রাখিয়া মূল উৎসে দৃষ্টি প্রেরণ করিতে হইবে। সেখানেই ত দৃষ্টি জন্মজন্মান্তরের লোক-লোকান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, এক সীমাহীন জ্যোতিঃসমুদ্রে অগণিত বীচিভঙ্গের মত কত জগৎ উঠিবে পড়িবে। তখন তার মাঝে দেখিবে, এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই ত যৌবনের লীলা—চিরকিশোরের কৈশোর্য্য যে জগৎ ছাইয়া রহিয়াছে! (ক্রমশঃ)

যোগসূত্রবৃত্তি

— ❋ —

সমাধিপাদ

মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র—"অথ যোগানুশাসনম্।" অথ শব্দে শাস্ত্রের অধিকারও বুঝায়, মঙ্গলও বুঝায়। যোগ এই শাস্ত্রের ব্যুৎপাদ্য বা অভিধেয়। অথ শব্দে বুঝা গেল, এই শাস্ত্র শেষ না হওয়া পর্যান্ত যোগেরই অধিকার চলিবে। সূত্রের অনুশাসন শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাতে থাকে ব্যুৎপাদ্য বিষয়ের লক্ষণ, স্বরূপ, ভেদ, উপায় বা সাধন, এবং ফল। এই শাস্ত্রে যোগ ও তাহার সাধনপ্রণালী দেখান হইবে। এই সাধনে সিদ্ধ হইলে যোগ হইতে কৈবল্য-রূপ ফল উৎপন্ন হয়। (১)

কিন্তু যোগ কি?—যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বেরই পরিণাম। প্রকৃতির অন্যথাভাব-বিকারকে **পরিণাম** বলে, যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট বা কাষ্ঠের পরিণাম ভস্ম। বৃত্তিসমূহ চিত্তের অঙ্গাঙ্গভাব পরিণাম, অর্থাৎ মূল চিত্তকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত ছোট-খাট বিকার সর্ব্বদাই আমাদের মাঝে হইতেছে, তাহারাই **বৃত্তি**। বৃত্তির স্বভাব বাহিরের দিকে ছড়াইয়া পড়া। কিন্তু তাহাদের এই বহির্মুখ পরিণামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তর্মুখে বিপরীত পরিণাম ঘটাইতে পারিলে, তাহারা যে কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, আবার তাহাতেই লয় পাইবে। ইহাকেই বলে বৃত্তির **নিরোধ**। এই প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধই **যোগ**।

চিত্তের পাঁচটী **ভূমি** বা অবস্থাবিশেষ রহিয়াছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। নিরোধ সমস্ত প্রাণীর সমস্ত চিত্ত-ভূমিরই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তথাপি কদাচিৎ কোনও এক ভূমিতে তাহার আবির্ভাব দেখা যায়। ভূমিগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

চিত্তে রজোগুণ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহার প্রেরণায় চিত্ত অস্থির হইয়া বাহিরের দিকে ছড়াইয়া পড়ে—সুখ-দুঃখাদি নানা বিচিত্র বিকারে জড়াইয়া পড়ে—বিষয়ের সান্নিধ্য বা ব্যবধানেরও কোন অপেক্ষা রাখে না। এই যে দৈত্যদানবের মত চিত্তের অবস্থা, ইহাই **ক্ষিপ্ত** ভূমি। আবার তমোগুণের প্রাবল্যে চিত্ত যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ভেদ বুঝিতে পারে না, রাগদ্বেষ প্রভৃতির পরবশ হইয়া স্বভাববিরুদ্ধ কাজেই লাগিয়া যায়, তখন চিত্তের এই পৈশাচিক অবস্থাকে **মূঢ়** ভূমি বলা হয়। আবার সত্ত্বগুণের উদয়ে চিত্ত যখন দুঃখসাধন ছাড়িয়া সুখসাধনেরই সন্ধান করিয়া বেড়ায়, তখন তাহার দৈবী অবস্থা বা **বিক্ষিপ্ত** ভূমি। ফল কথা, রজোগুণে প্রবৃত্তি জাগে, তমোগুণে জাগে পরের অনিষ্টচিন্তা; আর সত্ত্বগুণে চিত্ত সুখময় হয়। কিন্তু এই তিনটী ভূমিতেই চাঞ্চল্য দূর হয় নাই। সুতরাং ইহারা সমাধির উপযোগী নয়।

কিন্তু একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় শুধু

সত্ত্বগুণের সাময়িক উদ্রেক নয়—পরন্তু সত্ত্বের উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে; তাই পর পর এই দুইটী অবস্থাই সমাধির উপযোগী। একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভূমির মধ্যে চিত্তের যে একাগ্রতারূপ পরিণাম, তাহাও যোগ। একাগ্রে বহির্বৃত্তি অর্থাৎ চিত্তের বহির্মুখপরিণাম নিরুদ্ধ হইল। তার পর নিরুদ্ধ ভূমিতে সমস্ত বৃত্তিই একেবারে সংস্কার সহিতে লয় হইয়া গেল। সুতরাং এই দুই ভূমিতেই যোগ সম্ভব।

*চিত্তের ভূমিগুলিকে সত্ত্বাদিগুণের ক্রমানুসারে সাজান হয় নাই এই জন্য যে, সমাধির পক্ষে যে ভূমি হেয় এবং অনুপযোগী, তাহাদের কথাই আগে বলা উচিত। এই হিসাবে রজঃ ও তমঃ, এই দুইটীই হেয়। তাহাদের মাঝে রজঃ আবার প্রবৃত্তিমূল। প্রবৃত্তি না দেখাইলে তো নিবৃত্তি দেখান যায় না, তাই রজোগুণের কথাই আগে বলা হইল। সত্ত্বগুণের কথা শেষে বলা এই জন্য যে, এই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষেই পরবর্ত্তী দুইটী ভূমি যোগের উপযোগী হইয়া থাকে। (২)

যখন চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন দ্রষ্টা বা পুরুষ চিন্মাত্ররূপ স্বরূপে অবস্থান করেন। এই সময় পুরুষের বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার সম্যক্‌জ্ঞান হয়। তখন চৈতন্য আর বিষয়ে সংক্রামিত না হওয়ায় পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধির আর নিত্য নূতন পরিণাম হয় না। আত্মা তখন স্বরূপে অবস্থান করেন। এই হইল চিত্তনিরোধের অবস্থা। (৩)

কিন্তু ব্যুত্থানদশায় অর্থাৎ অবিবেকের দশায় পুরুষ চিত্তবৃত্তির সঙ্গে একরূপ হইয়া যায়। তখন সুখ, দুঃখ বা মোহাত্মক যে বৃত্তিই যখন আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্যবহারজগতে অবিবেকীরা পুরুষকে তদাকারকারিতই দেখিতে পায়।

নিরোধ ও ব্যুত্থানরূপ এই দুইটী অবস্থা একত্র মিলাইয়া দেখিলে চিত্তের আমরা এইরূপ লক্ষণ পাই যাহা একাগ্রতারূপ পরিণামের ফলে চিৎশক্তি হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইলে পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যাহা বিষয়াকারে পরিণত হইলে পুরুষকেও তদাকারকারিত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই চিত্ত। তরঙ্গবিক্ষোভে জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকেও যেন চলন্ত বলিয়া মনে হয়, এই জলতরঙ্গের সঙ্গে চিত্তের তুলনা করা যাইতে পারে। (৪)

বৃত্তি চিত্তের পরিণামবিশেষ, তা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৃত্তিগুলি ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট দুই-ই হইতে পারে। সমস্ত বৃত্তির পাঁচটি স্তর নয়—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। (৫ ৬)

অবিসংবাদি জ্ঞানই প্রমাণ। প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। বিষয়মাত্রেই সামান্য ও বিশেষাত্মক। ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া বাহ্যবস্তু চিত্তকে উপরক্ত বা অনুরঞ্জিত করিলে চিত্তের যে বৃত্তিদ্বারা সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। বিশেষণ করিয়া বলিতে গেলে প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ চিত্তের একটী পরিণামবিশেষ; এই পরিণাম বাহ্যবস্তুদ্বারা চিত্তের উপরাগ—ইন্দ্রিয় তাহার করণ। এই উপরাগের ফলে বস্তুর যে সামান্য সত্তা তাহাকে আমরা বিশেষিত করিয়া লই—ইহাই প্রত্যক্ষ।

ব্যাপ্তিবলে যে যাহার বোধক, সে তাহার লিঙ্গ। যাহা বোধ্য, তাহাকে বলে লিঙ্গী। লিঙ্গের সঙ্গে লিঙ্গীর সম্বন্ধ আছে, এইটুকু জানিয়া লিঙ্গ হইতে লিঙ্গীর যে সামান্যাত্মক

জ্ঞান, তাহাকে অনুমান বলে। আপ্ত-বচনের নাম আগম। (৭)

প্রমাণবৃত্তির পর বিপর্য্যয়বৃত্তি। যাহা বাস্তবিক যাহা নয়, সেই অবাস্তবরূপেই যদি তাহার জ্ঞান জন্মায়, তবে তাহাকে বলে বিপর্য্যয়। বিপর্য্যয় অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান। অর্থাৎ বিষয়ের যাহা সত্য রূপ, মিথ্যাজ্ঞান সেই রূপে প্রতিষ্ঠিত নয়—বিষয়ের পারমার্থিক রূপকে সে প্রতিভাসিত করিতে পারে না। শুক্তিতে রজতজ্ঞান বিপর্য্যয়ের উদাহরণ। সংশয়কেও তেমনি বিপর্য্যয় বলিতে হইবে। যেমন—এটা কি একটা খুঁটী না মানুষ?—এই সংশয়ে আমাদের জ্ঞান তো বস্তুর যথার্থ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল না। (৮)

তারপর বিকল্পবৃত্তি। শব্দজ্ঞানের অনুপাতী অথচ বস্তুশূন্য ব্যবহারিক জ্ঞানকে বলে বিকল্প। বিকল্পবৃত্তি শুধু শব্দজ্ঞানকে ধরিয়া অথচ বস্তুর যথার্থ রূপের কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যবহারানুকূলে চিত্তের পরিণাম ঘটাইয়া থাকে। যেমন যদি কেহ বলে "পুরুষের চৈতন্য" তাহা হইলে শুধু শব্দজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া চিত্তে একটা বৃত্তির উদয় হইতে পারে, কিন্তু এই শব্দপ্রতিপাদ্য বস্তুর কোনও পারমার্থিক সত্তা তো এখানে নাই। "দেবদত্তের কম্বল" বলিলে যেমন দেবদত্তে ও কম্বলে ভেদ বুঝা যায়, পুরুষ ও চৈতন্যে বাস্তবিক তেমন ভেদ না থাকিলেও (কেননা চৈতন্যই তো পুরুষ), একটা ভেদের আরোপ করিয়াই এখানে "পুরুষের চৈতন্য" এই কথার অর্থবোধ হইতেছে। এই মিথ্যা জ্ঞানকে বিকল্প বলে। (৯)

তারপর নিদ্রা। অভাবপ্রত্যয় যে বৃত্তির আলম্বন, তাহাকে নিদ্রা বলে। নিদ্রাতে তমোগুণ সর্ব্বদা উদ্রিক্ত থাকায়, সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়াই বৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে। নিদ্রা যে চিত্তেরই বৃত্তি, অর্থাৎ তখনও যে আমাদের জ্ঞানের অভাব হয় না; তাহার প্রমাণ—ঘুম হইতে উঠিয়া আমরা যখন বলি, "বেশ ঘুমাইয়াছিলাম"—তখন অনুভব না থাকিলে এ স্মৃতি আসে কোথা হইতে? সুতরাং নিদ্রাও চিত্ত-বৃত্তি। (১০)

তারপর সর্ব্বশেষে স্মৃতি। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষকে বলে স্মৃতি। অর্থাৎ প্রমাণ রূপে যে বিষয় অনুভূত হইয়াছে, সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিতে যদি তাহা উপারূঢ় থাকে, তবে তাহাই স্মৃতি। স্বপ্নও এক প্রকার স্মৃতি। জাগ্রদবস্থার প্রমাণ, বিপর্য্যয় ও বিকল্প যখন অনুভূতির প্রাবল্যহেতু প্রত্যক্ষের মত বোধ হয়—তখনই স্বপ্ন। নিদ্রা হইতে ইহার পার্থক্য এই যে নিদ্রায় কোনও বিষয়জ্ঞান থাকে না, কিন্তু স্বপ্নে থাকে। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও নিদ্রা—ইহার যে কোনটীকে নিমিত্ত করিয়া স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। (১১)

এই তো গেল চিত্তবৃত্তি। এখন ইহাদের নিরোধ হয় কি করিয়া?—না অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্রেকবশতঃ চিত্ত প্রকাশমুখী, প্রবৃত্তিমুখী, কিম্বা বিপরীতকার্য্যে নিয়মিতও হইতে পারে। এই সমস্ত বৃত্তিকে প্রতিহত করাই হইল নিরোধ। চিত্তবৃত্তির বাহিরের দিকে একটা অভিনিবেশ রহিয়াছে, এই অভিনিবেশকে নিবর্ত্তিত করিয়া বৃত্তিসমূহকে অন্তর্মুখী করিতে পারিলে, তাহারা নিজের কারণে অর্থাৎ চিত্তে লয় হইয়া চিৎশক্তিরূপে অবস্থান করে মাত্র। ইহাই হইল নিরোধের স্বরূপ। নিরোধ দুই উপায়ে হইতে পারে। চিত্ত বিষয়সুখ খোঁজে। কিন্তু বিষয়ে যে অশেষ দোষ রহিয়াছে, ইহা দেখাইয়া দিলে সে আর বিষয়ের দিকে মুগ্ধ

ফিরাইবে না। তারপর এই অন্তর্মুখী চিত্তকে যদি ধ্যানের অবিরল শান্তিপ্রবাহে ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ক্রমে তাহাতে তাহার দৃঢ়তর স্থৈর্য্য উৎপন্ন হইবে। বৈরাগ্য ও অভ্যাসের বলে এইরূপেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। (১২)

অভ্যাস কাহাকে বলে? স্থিতিতে যে যত্ন, তাহাই অভ্যাস। বৃত্তিরহিত চিত্তের যে পরিণামবশে স্বরূপে নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে **স্থিতি**। উৎসাহসহকারে স্থিতিতে পুনঃ পুনঃ চিত্তকে নিবিষ্ট করার নাম **অভ্যাস**। অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, বহুকাল যদি অনবরত আগ্রহসহকারে ইহার সাধনা করা যায়, তাহা হইলে ইহা দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ অটুট হইয়া থাকে। (১৩, ১৪)

তার পর **বৈরাগ্যের** কথা। বৈরাগ্য দুই প্রকার—বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য। প্রথমটী বিষয়ে বৈরাগ্য, দ্বিতীয়টী গুণে বৈরাগ্য। বিষয় আবার দুই প্রকার—দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক। ইহলোকে আমরা যে সমস্ত বিষয় দেখিতে পাই, তাহা দৃষ্ট; আর পারলৌকিক যে বিষয় তাহা আনুশ্রাবিক, কেননা তাহার কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না—জানি বেদ হইতে। গুরুমুখ হইতে শুনিতে হয় বলিয়া বেদের নাম অনুশ্রব। দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক—এই দুইটী বিষয়েরই পরিণাম যিনি বিরস বলিয়া জানেন এবং জানিয়া তাহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন—তাঁহার যে বৈরাগ্য, তাহাই **বশীকারসংজ্ঞা**। "বিষয় আমারই দাস—আমি বিষয়ের দাস নই"—বিষয়ের প্রতি বৈরাগী এই প্রকার মনোভাবই পোষণ করিয়া থাকেন। বশীকারসংজ্ঞা হইতে পরবৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ। গুণের ক্রিয়া ও পুরুষের স্বরূপে যে পার্থক্য—তাহা জানিলে গুণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই **পরবৈরাগ্য**। (১৫,১৬)

এই পর্য্যন্ত যোগের লক্ষণ এবং স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইল। এখন যোগের ভেদ বলা হইবে। সমাধি প্রধানতঃ দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। যাহাকে ভাবনা করা যায়, তাহার স্বরূপ যখন সম্পূর্ণরূপে জানা যায়—সে জানায় যখন সংশয় বা বিপর্য্যয়ের লেশ থাকে না, তখন যে সমাধি, তাহা **সম্প্রজ্ঞাত**। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারিপ্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ এবং সাস্মিত। সমাধি ভাবনা-বিশেষ। সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া একমাত্র ভাব্যকে পুনঃ পুনঃ চিত্তে বিশেষরূপে নিবিষ্ট করার নাম **ভাবনা**। ভাব্য বা সমাধির বিষয় আবার দুই প্রকার ঈশ্বর এবং তত্ত্ব। জড় এবং অজড় ভেদে তত্ত্বও দুই প্রকার। জড়-তত্ত্ব চব্বিশটী—পুরুষ অজড় তত্ত্ব। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভেদ এই বিষয় ভেদ লইয়া।

যখন স্থূল মহাভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন **সবিতর্ক** সমাধি। ইহাতে পূর্ব্বাপর-জ্ঞান ও শব্দার্থজ্ঞানের বিকল্প অটুট থাকে; তাই ইহাকে সবিতর্ক বলে। কিন্তু এই বিষয়েই যখন পূর্ব্বাপরজ্ঞানশূন্য ও শব্দার্থজ্ঞানের বিকল্পশূন্য ভাবনা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন **নির্ব্বিতর্ক** সমাধি। তন্মাত্র ও অন্তঃকরণরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ে যখন ভাবনা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন **সবিচার** সমাধি। কিন্তু এই ভাবনা দেশধর্ম্ম ও কাল-ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট। আবার এই আলম্বনেই ভাবনা যখন দেশ ও কালের ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া কেবলমাত্র ধর্ম্মীর অবস্থাসকরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন **নির্ব্বি-**

চার সমাধি। এই পর্য্যন্ত যে সমাধি, তাহাকে গ্রাহ্যসমাপত্তি বলে।

তারপর সানন্দ সমাধি। ইহাতে অন্তঃকরণসত্ত্বে ভাবনা প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তখনও তাহার মাঝে রজঃ ও তমোগুণের একটু লেশ থাকিয়া যায়। চিৎশক্তি এখানে গুণীভূত বা অপ্রধান থাকে অথচ সত্ত্বগুণের ভাবনা হেতু সত্ত্বের সুখ ও প্রকাশ ধর্ম্মের উদ্রেক হয়। এইজন্য এই সমাধিকে সানন্দ সমাধি বলে। যাঁহারা এই পর্য্যন্ত উঠিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, ইহার পরেও প্রকৃতিপুরুষরূপ তত্ত্বের প্রতি আর অভিনিবেশ করেন না, তাহাদের দেহাভিমান নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য এই সমাধিকে বিদেহলয়ও বলে। এই পর্য্যন্ত হইল গ্রহণসমাপত্তি।

তারপর সাস্মিত সমাধি। এই সমাধিতে ভাবনার আলম্বন বিশুদ্ধ সত্ত্বমাত্র—রজঃ ও তমোগুণের লেশমাত্র তাহাতে থাকে না। আবার এই ভাবনাতে আলম্বন যে সত্ত্ব, তাহা থাকে গুণীভূত বা অপ্রধান রূপে, আর চিৎশক্তি তখন জাগিয়া উঠে। ফলে কেবল সত্তামাত্র বোধের অবশেষ লইয়া সমাধি হয় বলিয়া ইহার নাম সাস্মিত সমাধি। অহঙ্কার আর অস্মিতা ঠিক এক বস্তু নয়। অন্তঃকরণ যে "আমি" এই রূপ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বিষয়জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে বলে অহঙ্কার। আবার বিপরীত পরিণামবশে অন্তর্মুখী চিত্ত যখন প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখন যে সত্তামাত্র জাগিয়া থাকে, তাহার নাম অস্মিতা। সাস্মিত সমাধিতেই যিনি পরিতুষ্ট, ইহার পর আর পরমাত্মরূপ পুরুষতত্ত্বের যিনি সাক্ষাৎ পান না, তাঁহার চিত্ত নিজ কারণে লয় হইয়া যায় বলিয়া এই সমাধিকে প্রকৃতিলয়ও বলে। কিন্তু পরমপুরুষকে জানিয়া তাঁহাতে যাঁহারা ভাবনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহারা প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জানিতে পারেন—তাঁহাদের বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়। ইহাকে বলে গ্রহীতৃসমাপত্তি।

এই পর্য্যন্ত গেল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভেদ। ইহার মধ্যে সবিতর্ক সমাধিতেও চারিটী অবস্থা শক্তিরূপে অবস্থান করে, তারপর ক্রমে এক একটী অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিলে পর পর অবস্থার উপলব্ধি হয়। এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চারিটী অবস্থা। (১৭)

তার পর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। বিরামপ্রত্যয়ের অভ্যাসে সমস্ত সংস্কার শেষ হইয়া গেলে যে সমাধি হয়, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বা পৃথক্। এই সমাধিতে জ্ঞেয় কোনও বিষয় থাকে না বলিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধি বলে। বিতর্ক প্রভৃতি সকলপ্রকার চিন্তা ত্যাগকেই বিরাম বলে। প্রত্যয় অর্থে জ্ঞান বৃত্তি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ব্বে বিরাম-প্রত্যয়কে পুনঃ পুনঃ চিত্তে নিবিষ্ট করিতে হইবে, অর্থাৎ চিত্তে যে কোনও বৃত্তি উদিত হইবে, তাহাকেই "নেতি নেতি বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে। এইরূপে চিত্ত যখন নিরালম্বন হইয়া অভাবগ্রস্তের মত হইবে, তখনই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

এখন সংক্ষেপে সমস্ত কথার পুনরালোচনা করা যাউক। চিত্তের চারি প্রকার পরিণাম—ব্যুত্থান, সমাধিপ্রারম্ভ, নিরোধ ও একাগ্রতা। ক্ষিপ্ত ও মূঢ়ভূমিতে যে চিত্ত পরিণাম, তাহাকে বলে ব্যুত্থান। বিক্ষিপ্তভূমিতে সত্ত্বের

উদ্রেক-হেতু যে চিত্ত-পরিণাম, তাহা **সমাধি প্রারম্ভ**। একাগ্রতা ও নিরোধ এই দুইটী হইল শেষ ভূমি। চিত্তের প্রত্যেক পরিণামেই কিছু কিছু সংস্কার থাকিয়া যায়। যদি চিত্তে পর পর এই পরিণামগুলি আসিতে থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক পরিণামের সংস্কারগুলিও পর পর নষ্ট হইয়া যায়। এই রূপে ব্যুত্থান পরিণামের সংস্কার নষ্ট হয় সমাধি প্রারম্ভ পরিণামের সংস্কারে; আবার সে সংস্কার নষ্ট হয় একাগ্রতার সংস্কারে; একাগ্রতার সংস্কার নষ্ট হয় নিরোধ সংস্কারে। আবার নিরোধ সংস্কারে, একাগ্রতার সংস্কার তো নষ্ট হয়ই—সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বরূপটীও নষ্ট হইয়া যায়,—যেমন সোনাতে সীসা বাখিয়া আগুনের তাপে গলাইলে সোনার ময়লা তো কাটিয়া যায়ই—সীসাটুকুও পুড়িয়া উড়িয়া যায়। (১৮)

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

(শ্রীমন্মহাপ্রভুসূদিত অভিধেয় সাধনভক্তিতত্ত্ব)

ভক্তিপরিকর—কুসঙ্গবর্জ্জন

সাধু কাহারা? কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩, ২৫, ২০

—যাঁহারা নিজের দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না, অথচ পরের দুঃখ দেখিলে করুণায় গলিয়া যান, সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ-যাঁহারা, যাঁহাদের করুণা কোমল চিত্ত অলক্ষ্যে বিশ্বের দুঃখতাপের উপর আশিষ বর্ষণ করিতেছে—তাঁহারাই সাধু। সাধু যেমন কাহারও শত্রু নন, তেমনি এ জগতে সাধুরও কেহ শত্রু নাই। অপরের কাছে যাহা দুঃখ বলিয়া, বিপদ্ বলিয়া চিত্তের ক্ষোভকর, সাধুর অবিচল প্রশান্তিতে তাহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। এই সাধুকে চিনে কে?—যে যার আপন, সেই তাহাকে চিনে;—সাধুই সাধুকে চিনেন, সাধুই সাধুর ভূষণ।

যদি ভগবানকে পাইতে চাও, তবে সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে—মহতের কাছে আপন অভিমান লুটাইয়া দিতে হইবে। ঋষভদেব তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫, ৫, ২

—মহাজনেরা বলেন, মহতের সেবাই মুক্তির দ্বার। মহৎ কাহারা?—যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, চিত্তক্ষোভহীন, সর্ব্বভূতের সুহৃদ এবং সাধু।

যেমন সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, তেমনি অসাধুর সঙ্গও বর্জ্জন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষ করিয়া ভক্তি-সাধককে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—"তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গঃ।" নারী সঙ্গীর সঙ্গ পর্য্যন্ত নরকের দ্বারস্বরূপ। নারী, এখানে উপলক্ষণ মাত্র। ভগবানের কাছে নারী পুরুষের ভেদ নাই। ভক্তিকাম পুরুষ যেমন নারীসঙ্গ এমন কি নারী-সঙ্গীর সঙ্গ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবে, ভক্তিকামা নারীও তেমন পুরুষসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া চলিবে।

ফল কথা, কামকে দূর করিয়া তবে প্রেমের ঠাকুরের জন্য হৃদয় পাতিয়া দিতে হইবে। কাম সম্বন্ধে ভক্তি-সাধককে এতদূর সতর্ক থাকিতে হইবে যে, কামুকের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। অসতের কথা বলিতে গিয়া মহাজনেরা বলিতেছেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩, ৩১, ৩৩—৩৫) কপিলদেব মাতাকে বলিতেছেন—

সত্যং, শৌচং দয়া মৌনং,
বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি
যৎসঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু
খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু
যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো
বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো
যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

—কামের ক্রীড়ামৃগ যাহারা, তাহাদের মত মূঢ় কে? তাহারা শুধু জানে দেহের ক্ষণিক সুখ; সেই সুখের বিকারে আত্মার বিমলজ্যোতিঃকে তাহারা আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই দেহ ছাড়া আর কোন্ বস্তুকে তাহারা বড় বলিয়া জানে? কিন্তু দেহের ক্ষয়ে কামের তর্পণ করিয়াও তাহারা শান্তি পাইয়াছে কি? জগতে অসাধু বলিতে বাস্তবিক ইহারাই অসাধু। আর সমস্ত রিপুর কবল হইতে উদ্ধার সহজ; কিন্তু কামান্ধের মোহ ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে শান্তির পথে আনিবে কে? আপনার জালে ইহারা আপনি জড়াইয়া রহিয়াছে তাই ইহারা সাধুদিগের শোচ্য, ইহাদের মূঢ়তার কথা ভাবিয়া মহতের হৃদয় করুণায় গলিয়া যায়—কিন্তু মহৎকৃপার ধারাবর্ষণেও বুঝি কামানলের শান্তি হয় না। তাই ইহারা চিরদিন শোচ্যই রহিয়া গেল।

কামান্ধ ব্যক্তি, অসত্যপরায়ণ, অশুচি, নিষ্ঠুর, অসংযত, আত্মরমাত্ত, নির্লজ্জ, শ্রীহীন, যশোহীন, ক্ষমাহীন, অশান্ত, অদান্ত, ভগবানের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত। যে তাহার সঙ্গ করিবে, সেই তাহার মত হইবে। কামের সেবায় আর কামসেবীর সেবায় মানুষের যে মোহ, যে চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয়, এমন বুঝি আর কিছুতেই হয় না। এমন নিদারুণ বন্ধনও বুঝি আর কোথাও নাই।

অতএব ভক্তসাধকের পক্ষে কামসেবা

এমন কি কামসেবীর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত বিষবৎ পরিবর্জ্জনীয়।

যেমন কামাসক্তকে বর্জ্জন করিবে, তেমনি অভক্তকেও বর্জ্জন করিবে।

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসঙ্গমবৈশসম্॥

—বরং জ্বলন্ত অগ্নিবেষ্টিত লৌহপঞ্জরে বাস করিবে, তবু ভগবচ্চিন্তাবিমুখ ব্যক্তির সঙ্গে একত্র বাস করিবে না।

অভক্তের সঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক, ভক্তসঙ্গও তেমনি ভগবদ্ভক্তির জন্মমূল। রাজা মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০, ৫১, ৩৫)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

—হে অচ্যুত, সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে, জীবের যখন ভববন্ধন মোচনের সময় উপস্থিত হয়, তখনই সজ্জনের সঙ্গে তাহার সমাগম হইয়া থাকে। আর যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই জগদ্বল্লভ তোমাতে তাহার রতি হইয়া থাকে এবং রতি হইতেই তাহার মুক্তি হয়।

কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন—(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩, ২৫, ২৫)।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

—শ্রীভগবান বলিতেছেন, সাধুদিগের সম্মিলনে যে সমস্ত কথা হয়, তাহাতে আমারই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সে কথা যেমন শ্রুতিসুখকর, তেমনি হৃদয়কেও রসাপ্লুত করিয়া থাকে। এই সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমে আমার প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষ হয় এবং শ্রদ্ধা হইতে রতি জন্মিয়া থাকে। অবিদ্যাবন্ধন ইহাতেই টুটিয়া যায়, কেননা জগতে আমিই একমাত্র মুক্তিপথ।

শরণাগতি

ভক্ত ভগবানের শরণাগত। শরণাগতি আসে কখন? অহং যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তো আমাদের দীনতা আসে না। সংসারে আঘাতের পর আঘাত আসিতেছে—বিদ্যুৎ-তপ্ত শেলের মত এক একটা আঘাত বুক ফুঁড়িয়া দিতেছে, কিন্তু তবুও "আমি"র কর্ত্তামি তো ঘুচে না। এত আঘাত পাইয়াও সে মনে করে—আবার সে উঠিবে, যেমন করিয়াই হউক আঘাতের বদলে প্রত্যেকটী আঘাত ফিরাইয়া দিবে। বুঝিলাম, এর মাঝে বীরত্বের বড়াই আছে, কিন্তু সে বড়াই কাহার কাছে? কাহার বীর্য্যে তোমার এই দুঃসহ তেজ? একবার কি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছ, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া যে মহাশক্তির উন্মত্ত লীলা, তাহার পাশে তোমার এই অভিমানের আস্ফালন, তোমার এই বীর্য্যের বড়াই কত মিথ্যা, কত তুচ্ছ? এই যে আঘাত পাইয়াও এখনও টিকিয়া আছ, এ কার শক্তিতে? নিদারুণ আঘাতে যে-শক্তি তোমাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছে, সেই শক্তিই যে আবার ধূলি হইতে তোমাকে তুলিয়া লইয়া তাহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকটিত করিতেছে—এ কি বুঝিতে পারিতেছ না? মূঢ়, চাহিয়া দেখ, তোমার স্বতন্ত্র

সত্তা কোথাও নাই এ জগতে; তোমার সমস্ত অভিমানকে গ্রাস করিয়া জাগিতেছেন যে মহাপুরুষ, হৃদয় আনত করিয়া তাঁহাকেই মম স্মার কর, আপনার সমস্ত কৃতকর্ম্মে তাঁহারই লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ কর।

অভিমানকে আঘাত করা শরণাগতির প্রথম সোপান। তোমার হৃদয় জুড়িয়া এখন বসিয়া আছ তুমিই। তোমার এই তুমিকে যত সঙ্কুচিত করিবে, ততই ভগবান তাহার ঠাঁই জুড়িয়া লইবেন। এমনি করিয়া দীনাতিদীন হইতে হইতে নিজকে যে দিন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে, সে দিন দেখিবে— ওই যে তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়, এতটুকু অভিমানের দাপটে যাহার সীমা কাঁপিয়া উঠিত— আজ সেখানে বিশ্বরূপের বিশ্বজোড়া ঠাঁই হইয়া গিয়াছে! কোথায় তোমার সঙ্কোচ, কোথায় তোমার অপ্রেমের গণ্ডী-বাঁধা অভিমানের ক্ষুদ্র জগৎ? আজ যে বিশ্বেশ্বর সেখানে আসিয়াছেন বিশ্বকে লইয়া— অনন্ত প্রেমে সমস্ত বিরোধের অবসান যে সেখানে।

এই তো শরণাগতির স্বরূপ—আমার বলিয়া যাহা কিছু ছিল, সব ভাসাইয়া দিয়া ভগবানকে জড়াইয়া ধরা। তার জন্য শুদ্ধি চাই —কায়ে, চিত্তে, সঙ্গে। কামনা বর্জ্জন কর —অসাধুর সঙ্গ, অভক্তের সঙ্গ বর্জ্জন কর —মহতের সেবা কর—নিত্য-রসের আস্বাদন একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। বুঝিতে পারিবে, এই বিষয়ের আকর্ষণ ছাড়াও আর একটা মহত্তর আকর্ষণ আছে; সে অতি নিগূঢ়, মর্ম্মের চক্রে চক্রে সে সঞ্চরণ করে—একবার তাহার প্রবাহে পড়িলে আর আপনাকে ঠেকাইয়া রাখিবার উপায় থাকে না—সে তোমাকে কূলের বাহির, কূলেরও বাহির করিয়া ছাড়ে। বিষয়ের আকর্ষণও মোহাচ্ছন্নের মত টানিয়া নেয় বটে; কিন্তু দেখিয়াছ তো তাহার মাঝে পদে পদে কত বাধা—কত কণ্টকের পীড়ন। কিন্তু এই যে মর্ম্ম উপাড়িয়া কাহার তীব্র আকর্ষণ —ইহার মাঝে ব্যাঘাত নাই কোথাও— এর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সবটুকুই আবেশ রসে পুলকিত!—যে তাহাতে মজে, সে আর উঠে না।

এই যে তার মনমজানো কুলমজানো বাঁশীর সুরের ডাক, এ যে তোমার সব ভাসাইয়া নেয়!—কোথায় থাকে তোমার লোকের বন্ধন, আর কোথায় থাকে তোমার সমাজের বন্ধন। "হে প্রভো; ধর্ম্মাধর্ম্ম দিয়া তুমিই এ সংসারের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছিলে—তুমিই কর্ম্মভার দিয়াছিলে—তোমার প্রীত্যর্থে তাহা বহন করিতেছিলাম। তোমার পানে চাহিয়া —হৃদয়ের সকল কামনা তোমার পানে আগাইয়া দিয়া যথাসাধ্য তোমার সে ভার বহন করিয়াছি। কিন্তু আজ যে হৃদয় আমার আকুল, বিবশ হইয়া পড়িয়াছে—নয়নআসারে সংসারের পথ যে আর দেখিতে পাই না, অবশ ইন্দ্রিয়গ্রাম যে আমার কর্তৃত্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া তোমাতেই আপনা সঁপিয়া দিয়াছে—তোমার সংসারের ভার আর কি করিয়া বহন করিব?—

"তবে দিলাম—কুল, মান, লাজ, ভয়, সব ভাসাইয়া দিলাম। ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম, তাও জানি না—জানি শুধু আমার হিয়ার গোপন থাকিয়া আমায় তুমি ডাকিলে—কতকাল ধরিয়া ডাকিয়াছ—আজ তাহার সাড়া আসিয়া আমার মর্ম্মে লাগিল— বহু যুগের পুঞ্জিত বেদনা আজ প্রেমে পীড়িয়া তুলিল; অবশ ইন্দ্রিয়—বিবশ চিত্ত; তোমার

আশ্রয়ে না দাঁড়াইয়া আজ আমি দাঁড়াইব কোথায়?"

আপনাকে ভুলিয়া শরণ যাচিও—অমৃত-প্রলেপে হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে।

আকুল তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়—অথচ কি করিয়া তাহার শান্তি হয়, তাহার কোনও সন্ধি খুঁজিয়া পাইতেছ না? কত সাধনপথ তোমার সম্মুখে। বস্তুত, তাহার মাঝে কোন-টীকে যে তুমি বাছিয়া লইবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছ না? কেন অমন বিপুল তৃষা লইয়া অপথে-বিপথে ঘুরিয়া মর?—একবার শোন ওই পার্থসারথির চিরজাগ্রৎ অভয়-বাণী—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—"ওরে, সব ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুই একমাত্র আমার শরণ নে—আমি সমস্ত পাপ হইতে তোকে মুক্ত করিব—তোর দুঃখ কিসের?"

সকল ধর্ম্মের এই তো প্রথম কথা—আর এই তো চরম কথা। এই আহ্বান শুনিবার যদি অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে ধর্ম্মের প্রথম সোপানে পা দিয়াছ। আর এই আহ্বানে যদি আপনাকে গলাইয়া দিয়া থাক, তবে ধর্ম্মের চরম সোপানে উঠিয়াছ। এই তো সমস্ত বিদ্যার—সমস্ত উপনিষদের সার; এ জানিলে আর তোমার কর্ম্মের বন্ধন কোথায়?

সব ছাড়িয়া মানুষ মজে কি সাধে! যে যাহাতে মজিয়াছে, সেই তো তার মর্ম্ম জানে; সে জানে, সমস্ত জগৎ ছানিয়াও অমনটি আর কেহ কোথাও মিলাইতে পারিবে না। ভক্ত-শিরোমণি অক্রূর কি বলিয়াছিলেন, একবার শোন—

কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়াৎ
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোভিকামান্
আত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥

—"ওগো, যে তোমার মর্ম্ম জানে, সে কি তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহারও চরণে শরণ মাগে? সে কি জানে না, তুমি যে তার চিরযুগের সুহৃৎ? আর তুমিও কি জান না, তোমার অনুগতজনের প্রেম কেমনে তোমায় বেড়িয়া আছে? তোমার সেবা কতটুকুই বা আমরা করিতে পারি? কিন্তু সেই তুচ্ছ সেবাও তো তোমার কাছে হতমান নয়। তুমি যে অনুগতের সেবা স্বীকার করিয়াছ, এই আশ্বাস যে হৃদয়ে পায়—সে জানে, চিরদিনের মত তাহার সকল ভয় ঘুচিয়া গেল—আর তাহাকে নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে না—কেননা তোমার স্বীকৃতি তো মিথ্যা হইবার নহে।

"আবার এ-ও ভাবি, তোমার কাছে আমাদের সেবার মূল্য কতটুকু? সেবা করিয়া, অনুরাগ দিয়া তোমায় আমরা কি-আর বাড়াইব?—আর, বিমুখ হইয়া, কুটিল পথে চলিয়া তোমার কিই বা অপচয় করিব? কিন্তু তোমার গুণের তো আর অবধি পাই না; ওইটুকু অনুরাগের ঋণ অঙ্গে তুলিয়া লইয়া তুমি যে অনুগতের সকল কামনা পূরাইয়া দাও! আর শুধু বিষয় দিয়াই, আকাঙ্ক্ষা পূরিয়াই কি তুমি খুসী?—প্রেমে গলিয়া তুমি যে অনুগতের দায়ে আপনাকে পর্য্যন্ত বিলাইয়া দাও!"—

জ্ঞানের সফলতা কোথায়? শ্রীভগবানের

প্রতিমার জ্ঞানেই জ্ঞান সার্থক। এমন জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সে কি ভগবান্ ছাড়া আর কিছু চাহিতে পারে?—ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব তাই বলিয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ৩, ২, ২৩,)—

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

—দুষ্ট পূতনা স্তনে কালকূট বিষ মাখাইয়া প্রাণনাশকামনায় তোমাকে তাহা পান করাইয়াছিল। সে তাহার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিল; কিন্তু তবুও তোমার মুখে স্তন দিয়া সে যে ছদ্মভাবেও তোমার ধাত্রীর কাজ করিয়াছিল, তার পুরস্কারস্বরূপ পরমাগতি হইতে তো তাহাকে বঞ্চিত করিলে না!—এমন করুণার আধার যে, তাহাকে ছাড়িয়া আমি আর কাহার শরণ লইব?

শরণাগতি, অকিঞ্চনতা ও আত্মসমর্পণ—এই তিনের মাঝে প্রারম্ভের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহাজনেরা একটু ভেদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে বিপুর তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া আর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে শ্রীভগবানকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানে—সে শরণাগত। আবার ভগবানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ হেতু, ভগবান ভিন্ন আর সমস্ত বস্তুতে যাহার নিঃস্পৃহা জন্মে—সে অকিঞ্চন। আর যে শ্রীভগবানকে দেহ মন সব সঁপিয়া দেয়—সে আত্মসমর্পণ-কারী। কিন্তু বিশ্লেষণ এই রূপ লক্ষণের ভেদ থাকিলেও, সকলেরই তাৎপর্য্য একই অর্থে পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহারা সকলে ভগবানেই তদ্গতচিত্ত।

মহাজনেরা শরণাগতির ছয়টী অঙ্গের কথা বলিয়াছেন—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

প্রথম হইল আনুকূল্যের সঙ্কল্প। চিত্তে তখন আনুগত্যের উন্মেষ হয় মাত্র। সব দিক হইতে আঘাত পাইয়া চিত্ত যখন আপন গুহায় ফিরিয়া আসে, নিজকে দিয়া নিজকে ঠেকাইবার যখন আর কোনও পথ দেখিতে পায় না, তখনই ভগবানের কথা মনে পড়ে। ক্রমে চিত্তের বহিরাশ্রয়ী প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া আন্তরিকী নিষ্ঠাতেই অভিনিবেশ জন্মে। ভগবানেরই অনুগত হইতে হইবে, আর কাহারও নয়—চিত্তে তখন এই প্রকার সঙ্কল্পের উদয় হয়।

কিন্তু কেবল সঙ্কল্পেই তো চেষ্টার বিরাম হয় না, কেননা চিত্ত অন্তরাবৃত্ত হইলেও পূর্ব্বসঞ্চিত বিপরীত সংস্কারসমূহ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। তাই সঙ্কল্পকে সফল করিবার জন্য তাহার বিরোধী সংস্কার সমূহের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এই হইল প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন।

প্রতিকূল সংস্কার চিত্ত হইতে যতই দূর হইয়া যাইবে, ততই বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিবে। যতদিন পর্য্যন্ত ঠিক প্রাণের দরদ দিয়া ভগবানকে না চাই, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার উপর বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না—ক্ষণেকের বিশ্বাস প্রবলতর সাংসারিক সংস্কারের কাছে পরাভূত হইয়া যায়। বিপত্তির সকল মাঝেই তখন মানুষ আত্মশক্তিতে যতখানি নির্ভর করিতে পারে, ভগবানে ততখানি পারে না। কিন্তু ভগবানের অনুগত হইবার সঙ্কল্প যখন এত দৃঢ় হয় যে, সমস্ত আঘাতেই বাঁচিবার জন্য নিজের দিকে না তাকাইয়া কেবল তাঁহার কথাই স্মরণে জাগে, তখনই তিনিই যে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, এই বিশ্বাস

প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বাস জন্মিলে তদনুযায়ী কার্য্যও হয়—অর্থাৎ তুমিই আমাকে রক্ষা করিবে—তাই তোমার কাছেই আমার সব সঁপিয়া দিলাম—চিত্তে এই প্রকার ভাব উপস্থিত হয়।

আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, আমরা কত দীন। তার পূর্ব্বে যে নিজের কাছেও আমরা নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া চলি—সকল বাক্যে, সকল কর্ম্মে এই কথাটি প্রমাণ করিতে চাই যে, আমার মত বড় আর কেহ নাই। কিন্তু এই বড়াই ভাঙ্গিয়া যায়, যখন অকূলে ভাসিয়া নিজের মাঝে আর কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পাই না। তখন যদি আর কেহ আসিয়া দয়া করিয়া আশ্রয় দেয়, তবে তাহার সম্মুখে নিজের অভিমানের মুখোস খসিয়া পড়ে—কার্পণ্যে দীনতায় আত্মসমর্পণ আরও পূর্ণ হইয়া উঠে।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

—"আমি তোমারই"—মুখে এই কথা বলিয়া এবং মনেও এই কথা জানিয়া, ভগবানের আশ্রয়ে এই দেহটাকে যিনি ফেলিয়া দিতে পারেন—তিনিই শরণাগত, তিনিই সুখী।

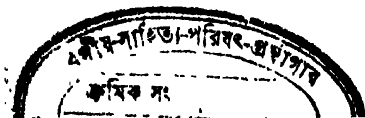
আবার ভগবানও এই শরণাগতকেই বুকে তুলিয়া লন।—তাই ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১, ২৯, ৩২)

মর্ত্ত্যো যদি ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

—মানুষ যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতেই আত্মনিবেদন করে, তখনই আমি বিশেষ করিয়া তাহার কল্যাণ করিতে পারি। যে এমনি ভাবে আমাতে আত্মনিবেদন করিয়াছে, সে অমৃত লাভ করিয়া আমার আত্মভাব পাইবার যোগ্য হয়।

অভিমানত্যাগেই কর্ম্মত্যাগ। বাহিরে কর্ম্ম করিতেছি কি না তাহার বিচার দিয়া কর্ম্মত্যাগের মাত্রা নির্দ্ধারিত হইবে না—অন্তরের দিকে তাকাইয়া দেখিতে হইবে, কর্ম্মফলের কোনও অংশের উপর লোভাতুর দৃষ্টি পড়িয়াছে কি না। অভিমান কি অল্পে যায়? যেমন অভিমান না গেলে আত্ম নিবেদন সহজ হইবে না, তেমনি আত্ম নিবেদন না করিলেও তো অভিমান দূর হইবে না। অতএব কেবল আপনাকে ত্যাগ করিতে হইবে—কেবল "দিলাম—তোমার পায়ে আমার সবই সঁপিয়া দিলাম"—দিবা নিশি এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে। জপিতে জপিতে আমির আস্ফালন থামিয়া যাইবে—অশান্তি, উদ্বেগ, কর্ম্মফলের ভাবনা দূর হইয়া যাইবে—দুঃখের তীব্রতম আঘাতও হাসিমুখে বুক পাতিয়া লইতে আর বাধিবে না।

"আমি তো নাই কোথায়ও—জগতে যা কিছু দেখি—সবই যে তোমাতেই পূর্ণ; জীবন মরণ স্মরণ মনন—সবই যে তোমারি অমৃত জ্যোতিঃর মাঝে; এই যে ইন্দ্রিয়ের প্রতি অনুভূতি তোমারি স্পর্শে বিকল হইয়া যাইতেছে—সব দিক হইতে যে আমায় ছুঁইয়া রহিয়াছ—তুমি—কেবল তুমিই—কেবল তুমিই।"—এমনি করিয়া আপনাকে ছড়াইয়া দাও—আত্মনিবেদন সার্থক হইবে, অমৃতের সন্ধান মিলিবে।



মনের মানুষ

—*—

চাই মানুষ—মানব মানুষ, প্রাণের মানুষ—জন্ম জন্ম ধরিয়া যার ভুবীতে মন প্রাণ বাঁধা রহিয়াছে, এমন মানুষ। সাধা-সাধনের কথা খুব ফলাইয়া বলিতে শিখিয়াছ বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত মানুষের সাক্ষাৎ না পাইলে, সে পর্য্যন্ত সাধ্যের অবধি নির্ণয় হইল কি—সাধনার ধারা মিলিল কি? এ রহস্য সকলে বোঝে না—কেননা সকলে তেমন করিয়া চায় না—চাহিতে জানেও না। কিন্তু যে বোঝে, যে খোঁজে,—সে জানে, সকল বাঁধন কাটিয়া উধাও হইয়া যাইবার জন্য যতই না কেন আকুলি বিকুলি—ঠিক মানুষটীকে না ধরিতে পারিলে সকলি মিছা।

এর উপরও তর্ক চলে, তা জানি। কিন্তু আগে যে তর্ক চলিত, তা শুনি নাই। 'মানুষ নইলেও চলে, এমন কথা এ দেশ কখনও বলে নাই। বলিবেই বা কি করিয়া? এমন আঁতিপাঁতি করিয়া রসের বস্তুকে আর কেহ কি খুঁজিয়া দেখিয়াছে—রসের তৃষ্ণায় এমন করিয়া জ্বলুনি আর কেহ কি জ্বলিয়াছে? সব ঠাঁই খুজিয়া অবশেষে যে বস্তু পাইল, জগতের কাছে তাহার নিশানা আনিয়া দিল—এই দেশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সে বলিল, অত দূরদূরান্তরে যাঁহাকে খুঁজিতেছ, সে যে তোমার অতি নিকটে—সে যে তোমার সম্মুখে—তোমার মাঝে—নরের মাঝেই যে নারায়ণ! তাঁহাকে পাওয়া যায়, দেখা যায়—যেমন করিয়া আপনার জনকে পাও, দেখ—তেমনি করিয়া—তেমনি জীবন্ত বিগ্রহে।

মানুষ পাইয়া মানুষ তাহার আদি অন্ত খুঁজিতে লাগিল, দেখিল তার আদিও নাই—অন্তও নাই। অবিচ্ছেদ প্রবাহে জগৎ গাঁথা—জগন্মূল যিনি—তিনিই মানুষেরও মূল। তিনি সবার জন্যই সবার মাঝে সব সময়েই আছেন—তাই মানুষের জন্যও মানুষের মাঝেই আছেন। সকল সাধন মথিয়া সিদ্ধান্ত হইল—ভগবানই গুরু—গুরুই ভগবান।

এ কথা প্রথমে কে বলিয়াছিল, তাহা জানি না। কেবল জানি, সত্য কথার, প্রাণের কথার প্রথম আর শেষ বলাবলি নাই। আজ যে খুঁজিতে আরম্ভ করিল, তার সাধনার সুরু এখান হইতেই হইল বটে, কিন্তু সাধ্যে যখন সে পৌঁছাইবে, তখন দেখিবে, তার আগেও একজন সেখানে বসিয়া আছে। এমনি করিয়া পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে—কবে কোথা হইতে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু এ কথা সকলেই জানুক যে পথে আর সকলে গিয়া পাইয়াছে—আমারও সেই পথই পথ।

কিন্তু এমন কথায় আজকাল আর সকলের মন প্রবোধ মানে না। যাহার আদি-অন্ত নাই, দুই চারি শত বছরের ইতিহাসের মাপকাঠি পুঁজি করিয়া মানুষ আজ তাহাকেও মাপিতে বসিয়াছে। যে রস নিজে না মজিলে, নিজে না ভজিলে পাওয়া যায় না—পরের মুখে ঝাল খাইয়া মানুষ তাহারই বিচার করিয়া গুমোরে ফাটিয়া মরিতেছে। না মজিয়া বিচার করা—এ তো এ দেশের পথ

নয়; এ পথ বিদেশী। বিদেশের কষ্টিপাথরে দেশের সোণার যাচাই হয় না।

"দেখেছি রূপসাগরে
মনের মানুষ কাঁচা সোণা;—
তারে ধরি ধরি মনে করি
ধর্‌তে গেলাম আর পেলাম না—

*   *   *

সে মানুষ চেয়ে চেয়ে
বেড়ালাম পাগল হয়ে—
মরমে জ্বলছে আগুন
আর নিভে না—

এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ
ছেড়ে যেতে আর দিব না।—"

এই তো এ দেশের প্রাণের সাধা সুর। শুধু বাউলের গানেই নয়—বেদের মাঝেও খুঁজিলে পাইবে, সেই একই কথা—

"গান্ধার দেশ হইতে একজনকে চোখ বাঁধিয়া জনহীন স্থানে কে ছাড়িয়া গেল। সে বেচারী একবার যায় পূবে, একবার যায় পশ্চিমে, একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, তারপর পথ না পাইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল 'ওগো, চোখ বাঁধিয়া আমাকে আনিয়া চোখ-বাঁধা অবস্থাতেই ছাড়িয়া গেল।' তখন একজন আসিয়া তার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিল, 'এই যে এই দিকে গান্ধার দেশ—এই দিক ধরিয়া চলিয়া যাও।' তারপর সে যদি পণ্ডিত হয়, মেধাবী হয়, তাহা হইলে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশেই গিয়া পৌঁছিবে। এমনি করিয়া মানুষ মিলে যার, সেই জানে।"

পরের অধীন না হইতে পারিলে যথার্থ স্বাধীন হওয়া যায় না।' স্বাধীন হইতে কে না চায়? সুমালোচকেরাই বলিবেন, এ দেশের শাস্ত্রে 'মুক্তি' কথার ছড়াছড়ি। কিন্তু সে মুক্তি তো লড়াই করিয়া ঘুষি বাগাইয়া তোমায় রাইট্ আদায় করা নয়। এ মুক্তি পরাধীনের মুক্তি। বিরোধ নাই কারু সঙ্গে যে লড়িয়া মুক্তি পাইতে হইবে। একের প্রেমে সকলকে বাঁধিয়া তবে না মুক্তি। কিন্তু অধীন না হইতে জানিলে প্রেমের মন্ত্র পাইবে কোথায়? একজনে মজিতে পারিলে, তবে সকলে মজিতে পারা যায়; আর সকলে মজিতে পারিলেই তবে মায়ার বন্ধন কাটে। তাই এ দেশের রসিকেরা অমন উল্টা কথা বলিলেন যে, পরাধীনতাতেই মুক্তি।

"প্রণিপাতেন—পরিপ্রশ্নেন—সেবয়া"—এই না পাওয়ার পথ। প্রণিপাত করিব কাহাকে?—মানুষকে। মানুষকেই পরিপ্রশ্ন করিব—সেবাও করিব মানুষের। সন্ধান করিয়া দেখ—সেবা ছাড়া কেউ কোথাও কিছু পাইয়াছে কি? সেবা করিতে হইবে দেহ ও মন এই উভয় দিয়া। সে সেবা যদি মানুষে না পৌঁছায়, তবে তোমার অনুরাগ নিবেদন তো পূর্ণাঙ্গ হইবে না। সম্পূর্ণ সেবায় সমর্পণ সার্থক হইবে; কিন্তু মানুষ ছাড়া সম্পূর্ণ সেবা গ্রহণ করিবে কে?

যত দর্পই কর না কেন, মানুষের সেবা না করিয়া তোমার গতি নাই। হৃদয়ে তোমার সঞ্চিত যে মধু, সে আর কাহার জন্য তুলিয়া রাখিবে? একরূপে না একরূপে মানুষকেই তো তাহা বাঁটিয়া দিতেছ; মানুষের ভিতর দিয়াই সে নিবেদন ভগবানে পৌঁছাইতেছে। কিন্তু এ তো সংসার-লীলায় তোমার পরোক্ষ নিবেদন। সাক্ষাৎ নারায়ণকেও যে দিতে

হইবে, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? হৃদয় খুঁজিয়া দেখিও, পবোক্ষ নিবেদনে তৃপ্তি পাও নাই—যতটুকু দিবাব, তাব সবটুকু দিতে পাব নাই। তোমাব সমর্পণের শ্রেষ্ঠ ভাগ অপেক্ষা করিতেছে কাহাব জন্য?—সেই পুরুষোত্তমেব জন্য। একাধাবে যিনি পুরুষ অথচ সংসাবেব যিনি উত্তম—তিনিই তোমাব প্রাণেব মানুষ, মনের মানুষ। তাঁহাকে দিলেই তোমাব দেওয়া সার্থক।

এ হইল আত্মাভিমানের যুগ—তাই সহজ মানুষেব সম্বন্ধে সংশয় আসে বটে। নিজেরা-নিজেরা মাবামাবি কাটাকাটি করিয়া গায়ের জোরে সাম্যনীতি বাহাল করিয়াছ, তাহাবই জয়গানে আজ তোমবা মুগ্ধ। কিন্তু এই যে সাম্য, যে সাম্যেব আছিলায় অতি ক্ষুদ্রাশয়েবও স্পর্দ্ধাব সীমা থাকে না—এ সাম্য মানবকে কোন্ বৃহৎ সত্যের ভূমিতে মিলিত করিয়াছে? মানুষের মর্য্যাদা এই সাম্যনীতিতে অপমানিত হইয়াছে মাত্র। সকলকে টানিয়া উপবে তুলিতে পারিলে না—কিন্তু সাম্যের দোহাই দিয়া মহত্তেব আদর্শকেও নীচে নামাইয়া আনিলে—তাবই এত গর্ব্ব?

বিদেশেব এই উৎকট সাম্যনীতি আজ বুঝি এদেশকেও পাইয়া বসিয়াছে। শ্রদ্ধায় নত থাকিয়া, মানুষেব মাঝে বিশ্বের ঠাকুবকে প্রত্যক্ষ করিয়া যে দেশ এতদিন আপনাকে ধন্য মনে করিয়া আসিয়াছে, সে আজ বিদেশী মদে মাতাল হইয়া বলিতে শিখিয়াছে—"সকল মানুষই সমান সুতবাং মাথা নোয়া-ইব কাহার কাছে?" অথচ এ মাথা কি নোয় না? দেখিতেছি, এমন ঠাঁইয়েও মাথা নোয়, যেখানে মানুষেব মর্য্যাদাজ্ঞান থাকিলে, মাথা কিছুতেই নুইত না। তবুও কেন বল, "আমাব সাধন আমাব কাছে—মাথা নোয়া-ইব কাহাব পায়?"

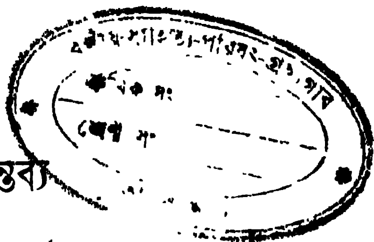
বল এই জন্য যে, পূর্ব্বপুরুষেব যে সাধন-পুণ্যটুকু সঞ্চিত ছিল, আজ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছ। যে নিজকে সাধিল না, সে কি করিয়া জানিবে, মানুষেব মর্য্যাদা কোথায়? কেবল জীববিজ্ঞানেব ফর্ম্মুলা দিয়া মানুষেব মূল্য কষিয়া দেখিলেই তাহাব সবটুকুব সন্ধান পাইবে কি? নিজকে সাধিয়া এ দেশ একদিন সকল সীমার পারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই সে ফিরিয়া আসিয়া মানুষেবই যজনা, মানুষেরই ভজনা শিখাইয়া-ছিল। সে দিন সে পুরুষ আব পুরুষো-ত্তমে ভেদ দেখিতে পায় নাই, তাই মানুষেব সম্বন্ধে মহত্তম যে সত্য, তাহা প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও সে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। আব আজ সেই দেশেরই মানুষ নিজে ছোট হইয়া সত্য মানুষেবও মর্য্যাদাজ্ঞান হাবাইয়াছে। তাই সহজ মানুষ আব তাব চোখে পড়ে না—তাব ঝুঁটা সাম্যনীতিতে আব নাম ফলানো ভ্রাতৃ-ভাবে আজ মুড়ি-মিছ্‌রীব একদর হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন করিয়া তো কিছুতেই দিন চলিবে না। মানুষ হইয়া মানুষকে দূরে বাখিবে কি বলিয়া? তুমি পণ্ডিত—ইন্দ্রিয়ের বাজ্য ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয়েব দিকে চলিতে চাও, রূপ ছাড়িয়া অরূপেব পানে তোমাব পিপাসা; কিন্তু রূপ কি করিয়া হইল, কোন্ বসে বসিয়া সেই মানুষ এই মানুষ হইল, তাহাব কিছু তত্ত্ব করিতে পারিলে কি? সত্য চাও বটে; কিন্তু একটী আধাবকেও ডিঙ্গাইয়া গেলে চলিবে কি? এই যে নব-রূপে আধাব—এ যে তোমাকে বেড়িয়া রহিয়াছে—ইহার মধ্যে বসের বিলাস কতটুকু, তা

কি ভুলিয়া যাইতে পার কিছুতেই? তা যদি ভুলালে চলিত, তবে ভগবান রূপের জগতে রসের পসরা সাজাইয়া বসিতেন না।

মানুষের মাঝে যে রস-ব্যাকুলতা, তারও তৃপ্তি চাই। সেই তৃপ্তি দিবার জন্যই ভগবানও নামিয়া আসিয়াছেন মানুষের মাঝে। মানুষ বুঝি তোমার ইহলোকের খেলার সখই মিটায়—চিন্ময় জগতের রসধারা বুঝি তাহাকে ধরিয়া এই মর্ত্ত্যের কুটীরে নামিয়া আসে না? মানুষ লইয়া যদি সংসারের খেলা পাতিলে, তবে তাহাকে লইয়াই এই সংসারেরও ওপারে যাইতে হইবে—কেননা মানুষ ছাড়া আর মানুষের সাথী হইবে কে?

তাই বলি, মানুষ হও—মানুষকেই ভজ—মানুষেই মজ। সেই তো সহজ পথ—রসের পথ।



সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ—বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ অত্রত্য সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

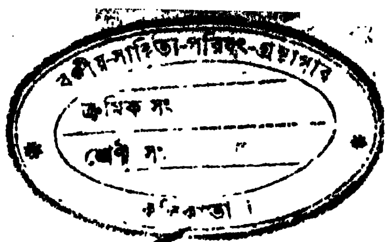
মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বঙ্গদেশ পরিভ্রমণান্তর পুনরায় পুরীধামে গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পুরীধামেই অবস্থিত করিবেন।

ভাওয়াল সারস্বত আশ্রম—বিগত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ তারিখে অত্রত্য সারস্বতমঠের শাখা "ভাওয়াল সারস্বত-আশ্রমে" ভক্তসম্মিলনার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে ও যথাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আশ্রমাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব উক্ত আশ্রমে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীমৎ পরমহংসদেবের বহু শিষ্য ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার উক্ত সারস্বত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উৎসব ক্রিয়া ও তদুপলক্ষে সার্ব্বভৌম মহোৎসবও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

"ভাওয়াল সারস্বত-আশ্রমের" প্রচার ও সাহায্যার্থ ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন ব্রহ্মদেশে শ্রীমৎ সারদানন্দ, পশ্চিম বঙ্গে ও আসামে ব্রহ্মচারী রমেশ, ঢাকা বিভাগে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন।

ভ্রম সংশোধন—২৭৫ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তিতে 'শব্দশূন্য' এই কথাটীর পরিবর্ত্তে 'বস্তুশূন্য' এই কথাটী বসিবে।

গ্রাহকগণের প্রতি—প্রেস-সংক্রান্ত নানা গোলমালে এই মাসের পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল—এ জন্য আমরা দুঃখিত। আগামী মাসের পত্রিকা প্রকাশেও কিঞ্চিৎ গৌণ হইতে পারে। অতঃপর যাহাতে প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাঝেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে আমরা সচেষ্ট থাকিব।



ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৫শ বর্ষ | মাঘ | ১০ম সংখ্যা

সুপর্ণাঃ।

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২২।৮]

অবঃ পরেণ পিতরং যো অস্য
অনুবেদ পর এনাবরেণ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্রবোচত্
দেবং মনঃ কুতো অধিপ্রজাতম্॥

যে অর্ব্বাঞ্চস্তাঁ উপরা চ আহু-
যে পরাঞ্চস্তাঁ উ অর্ব্বা চ আহুঃ।
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি
ধুরা ন যুক্তা রজসো বহন্তি॥

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগম্
অনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ
স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ॥

জেনেছেন যিনি, এই লোকপাল লোটে তাঁরি পায়—
তুচ্ছ এর মায়া টুটি শ্রেষ্ঠ তিনি জ্ঞান-মহিমায়।
স্পর্দ্ধাভরে কোন্ কবি দিব্য সত্য করেছে প্রকাশ—
কোথা হতে জাগে বিশ্বে বল এই মনের বিলাস!

নিম্নে যারা, উপরের পানে তারা দুবাহু বাড়ায়—
উর্দ্ধে যারা, নেমে আসে তারা নাকি এই আঙিনায়;
ইন্দ্র আর সোম হতে যে লীলার হয়েছে বিস্তার,
বেগে যুক্ত অশ্ব হেন নিত্য তাহা বহে বিশ্বভার।

দেখিয়াছি দুটী পাখী—সখা তারা—বাঁধা এক ডোরে,
ভালবেসে গলাগলি দুজনায় এক্-ই তরুপরে,
পিপ্পলের স্বাদু রস তার মাঝে পিয়ে একজন—
বন্ধু তার নাহি খায়—চেয়ে থাকে মেলিয়া নয়ন।

চলেছে পাখীর ঝাঁক—কত শত—নাহিক বিরাম—
অমৃতের ভাগ তারা পাবে গিয়া কোন্ দেব-ধাম;
ভুবনের গোপ্তা, ধীর, অবিচল, বিশ্বরাজ যিনি—
মন্দ-মেধা মোরে ঠাঁই সেথা আজ দিয়াছেন তিনি।

পথের সঙ্কেত

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তুমি তরুণ, যৌবনের পরিপূর্ণতার মাঝে বাজার মত আসিয়া আজ দাঁড়াইয়াছ। প্রকৃতির দুলাল তুমি, তাঁর সকল স্নেহের সকল দানের অধিকার পাইয়াছ—তুমি আজ সার্থক, তাই শ্রদ্ধা দিয়া প্রীতি দিয়া তোমাকে আমরা অভিনন্দিত করি। তোমার মাঝে আমরা দেখি, সেই চিরসুন্দরের লীলামাধুরী, সেই তাঁর উচ্ছল রসবিলাস—যার স্পর্শে এই শ্যামা ধরিত্রীর অঙ্গে চির যৌবন মুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে। হে তরুণ, তুমিও একবার তোমার দিকে চাহিয়া দেখ,—দেখ, তোমার মাঝে কোন্ সৌন্দর্য্য কোন্ মাধুর্য্য কোন্ রস কিসলয়িত হইয়া উঠিল।

উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ আছে তোমার মাঝে—তা জানি। কিন্তু এই উচ্ছ্বাসের প্রেরণা আসিয়াছে রস হইতে, সে রস তো পরম শান্ত, অক্ষয় আনন্দের নিকেতন। তাঁহার আনন্দ দেহের মাঝে কূল ছাপাইয়া চলিয়াছে, তাই দেহ আজ অমন আকুল আবেগে শিহরিয়া উঠিল। মনের সীমানায় সে আনন্দ-স্রোত বাঁধা পড়িল না, তাই না আজ তোমার "চিত চঞ্চল, উদ্দাম ধায় মন।" এই যে দেহ-মন জুড়িয়া তোমার আকুলি-বিকুলি, ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে বলি না; এই তো তোমার গৌরব—এই তো তোমার সার্থকতা। কিন্তু ইহাকে বুঝিতে বলি; আঁধার গুহার মাঝে যে লুকানো মাণিকের দীপ্তিতে এই আলোর শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর—রসের আদিম উৎসধারায় অবগাহন করিতে শিখ।

"শান্ত উপাসীত"—যৌবন-সাধনার এই হইল বীজমন্ত্র। যে উচ্ছ্বাসে আবেগে তনু মন ডগমগ, তাহাকে বহিয়া যাইতে দাও—নিরঙ্কুশ ভাবে; কিন্তু উদার আত্মদৃষ্টি দিয়া তাহাকে সম্পৃক্ত করিয়া রাখ। তুমি সুন্দর—শুধু আজই নয়—তুমি চির সুন্দর; কৈশোরের কোরক ভেদ করিয়া যৌবন ফুটিল যখন, তখন এই বার্ত্তাই সে বহন করিয়া আনিল। যে দূত এই আনন্দ-নিবেদন লইয়া তোমার দুয়ারে আসিল, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিও না—মত্ততা দিয়া অপমানিতও করিও না। আনন্দ গম্ভীর—শ্রদ্ধার আসনে তাহার প্রতিষ্ঠা—সুখ দুঃখের অভিঘাতে তাহা মুখর হইয়া উঠে না। আত্মরসে বিভাবিত হইয়া গম্ভীরবেদী হইয়া তোমাকে যৌবনের দান গ্রহণ করিতে হইবে। দেহ মনের আধার ক্ষুদ্র—এই আনন্দের বানে তাহাদের কূল ভাঙ্গিয়া পড়িবে—কিন্তু তবুও, হে তরুণ, তোমার পথ ওই শান্ত উপাসনায়।

কারণ, এই তো তোমার শেষ নয়। এই তো বোধনের প্রথম ক্ষণ মাত্র। এর পর আরও কত নব নব আনন্দের নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের পথে তোমাকে চলিতে হইবে;—আজই আবেশে অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িলে চলিবে কেন? যে উচ্ছ্বাস দুর্নির্ব্বার বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাকেও তোমার নিবারণ

করিতে হইবে—এই শান্ত উপাসনার মন্ত্রে। তুমি ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে; যতই ঊর্দ্ধে উঠিবে, দৃষ্টি ততই দিগন্তে প্রসারিত হইয়া পড়িবে—শুধু সেই আত্মপ্রসারণের বন্ধনহীন বেষ্টনীতেই সকল বিকার সসীম হইয়া রহিবে—যেমন করিয়া নীলাকাশের শান্ত মহিমার আবেষ্টনে এই সমুদ্রমেখলা ধরিত্রীর আশ্রয় মিলিয়াছে। শান্তি চাই—সুনির্ম্মল শান্তি চাই: বিক্ষোভ যত মুখরই হউক না কেন, নির্ব্বাক শান্তিতে তাহাকে পরাজিত করিতে হইবে।

তোমার মাঝে যে রসের সঞ্চয়, তার অংশীদার অনেক। রসই সকলের জীবন, সুতরাং রসের ভাগ হইতে তো কাহাকেও বঞ্চিত করিলে চলিবে না। কিন্তু যাহাই কর না কেন, দৃষ্টিকে কখনও আবিল বা অবরুদ্ধ করিও না। পথ দুইটী—এক সত্যের পথ আর এক সংস্কারের পথ। অভ্যাসে সংস্কার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও সত্যকে তো সে নির্জ্জিত করিতে পারে নাই। এখনও কাণ পাতিয়া শুনিলে সংসারের তুমুল কোলাহলের অন্তরালেও সত্যের মর্ম্মভেদী গম্ভীর আহ্বান শুনিতে পাইবে। সে আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে তোমাকে যুঝিতে হইবে অনেক। কিন্তু তবুও তাহাই তোমায় শুনিতে হইবে—কেননা তোমার গতি সেই সত্যেরই অভিমুখে। সেখানে যাইতে হইলে লড়িতে হইবে। কিন্তু যৌবন কি লড়াইকে ভয় করে? প্রকৃতি যাহাকে শৌর্য্যবীর্য্যে সাজাইয়া দিয়াছেন, সে যদি যুঝিতে না পারিবে, তবে পারিবে কে? যৌবন যেমন আনন্দের কাল, মত্ততার কাল, তেমনি এ যুদ্ধেরও কাল। বিপ্লবের সঙ্গে যুঝিয়া এই সময় যতটুকু আধিপত্য অর্জ্জন করিতে পারিবে, পরজীবনে এবং পরজন্মে ততটুকুই তোমার সত্যের পথের পাথেয় হইবে।

এই ভাবিয়া, এই বুঝিয়া তোমাকে আঘাত সহিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সংস্কারকে পীড়ন করিলে সুখের ব্যাঘাত উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু যৌবন কি সুখেরই কাঙ্গালী? সুখের আবেশের চেয়ে নব নব অনুভূতির দুঃসহ তীব্রতাই যৌবন ভালবাসে বেশী, কেননা আত্মপ্রসারণ তাহার ধর্ম্ম। নূতন নূতন সঙ্কটের মাঝ দিয়া আত্মাকে বিজয়ের পথে উত্তীর্ণ করিয়া যৌবন আপনাকে ধন্য মনে করে। এইজন্য যোদ্ধৃত্ব যৌবনের পক্ষে সহজ ধর্ম্ম।

এই যুদ্ধ তোমাকে সত্যের জন্য করিতে হইবে। বলিয়াছি রসের স্বরূপ কি। নিষ্কলুষ যৌবনে এই রসের অনুপ্রাণনা ফুলের মত ফুটিয়া উঠে। কিন্তু পঙ্কিলতাও জগতে কম নয়। আজন্ম শিক্ষা, সমাজ, বংশধারা—সব তাহাদের সংস্কার লইয়া তোমার রসের পথ, সত্যের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু মরমী হইলে বুঝিতে পারিবে, সত্যকে কেহ আবরিত করিতে পারে না—এক আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া। সত্যের পথ শান্তির পথ। বিরোধের মাঝেও সামঞ্জস্য যেখানে—সত্য সেখানে, শান্তি সেখানে। কোনটা তোমার মাঝে সত্যের আহ্বান, আর কোন্‌টা সংস্কারের তাড়না, তাহার পরখ হইবে শান্তির কষ্টিপাথরে। উচ্ছ্বাস যতই তীব্র হউক, আনন্দের উত্তেজনা যতই প্রমত্ত হউক—যদি সহিতে না পারিলে, যদি টলিয়া পড়িলে, আপনাকে হারাইয়া ফেলিলে, তবে তাহা সব মিথ্যা। এই খানেই পরখ করিতে হইবে, কি তুমি চাও।

কেবল যে দুঃখেরই কাঁটা আছে, তা নয়;

সুখেরও কাঁটা আছে—কিন্তু মাতাল বলিয়া তাহার পীড়া আমরা বুঝিতে পারি না। সংস্কার যে সুখ আনিয়া দেয়—তাহা এমনি অম্লমধুর। সে সুখ পাইয়া আপনাকে কতটুকু বিস্তার করিতে পারিলে, কতটুক শান্তি পাইলে, একবারে মনের নিরালায় বসিয়া পরখ করিয়া দেখিও—সাচ্চা ঝুঁটা সব ধরা পড়িয়া যাইবে। কত সংস্কারের ভিতর দিয়া সুখ তোমাকে প্রলুব্ধ করিবে—কিন্তু হে বীর, তোমার দুর্গদ্বারের চাবী কাহারও হাতে দিও না। ভিতরে যে গম্ভীরবেদী পুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার গাম্ভীর্য্যকে ক্ষুব্ধ করিবার স্পর্দ্ধা যে করিবে, নির্ম্মম হইয়া তাহাকে দণ্ড দিও। ইহাতে আহত হৃদয় আর্ত্তনাদে বিদীর্ণ হইয়া যাক ভ্রূক্ষেপ করিও না। তোমার প্রহরীর আসন যতক্ষণ তুমি পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ কোনও শঙ্কা নাই—তোমার প্রভুর প্রশান্তিতে কেহই বিক্ষোভ ঘটাইতে পারিবে না।

প্রবল স্রোতের মুখে বাঁধ দিলে বাধা পাইয়া স্রোত একবার গর্জ্জিয়া উঠে—কিন্তু তারপরেই আবার গভীর হইয়া সে তলাইয়া যায়। তোমার মাঝে যে যৌবনের আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, প্রশান্তি দিয়া তাহাকেও বাঁধিয়া ফেল, বহিঃস্রোত অন্তরাবর্ত্তিত হইয়া গভীর হইতে গভীরে নিলীন হইয়া যাইবে—এইটুকু দেহ-মনের সীমার মাঝে সংরুদ্ধ আনন্দের বেগ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিবে—কিন্তু টলিবে না—ভাঙ্গিবে না। এই সত্য—"শান্তি সত্য—শিব সত্য—সত্য সেই চিরন্তন এক।" তাই আবার বলি, হে তরুণ, "শান্ত উপাসীত।"

যৌবনে যে রসের স্ফূর্ত্তি, একটী ঠাঁইয়ে তাহার বিশেষ পরিচয় মিলে—ভালবাসাতে। যখন ভালবাসিতে শিখিলে, তখনই বুঝিলাম, প্রাকৃত বিবর্ত্তন তোমার পুষ্টির চরম পরিণতি ঘটিয়াছে এইবার তোমার অন্তর্জ্জগতের লীলা সুরু হইল। যতক্ষণ তুমি শিশু, যতক্ষণ তুমি কিশোর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মমতার বীজ তোমার মাঝে থাকিলেও তাহার শক্তি সুপ্ত—আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় তখনও তোমার হয় নাই। কিন্তু যৌবনের স্পর্শে যে মমতা জাগে, তাহা অঙ্কুরমূল যেমন রসানুবিদ্ধ হইয়া থাকে, তেমনি বাহিরেও তাহা একটা আলম্বন চায়। আপনাকে আর তখন আপনার মাঝে গুটাইয়া রাখিয়া তৃপ্তি নাই—আপনার মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য তখন দর্পণের প্রয়োজন হয়। যাহাকে ভালবাস, সেই তোমার দর্পণ আপনাকেই তাহার মাঝে ফিরিয়া পাও—তাই ভালবাস।

কিন্তু আজন্মসঞ্চিত সংস্কার এই কথাটা তোমায় বুঝিতে দেয় না। মধু তোমার মাঝেই। কিন্তু তুমি খুঁজিতেছ বাহিরে। কিসে তোমার তৃপ্তি?—পাইয়া কি? আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু পাওয়া তোমার উপলক্ষমাত্র। রসের সিন্ধু তোমার মাঝে আজ উথলিয়া উঠিয়াছে—যদি তাহার মাঝে সমাহিত হও, তবে আর বাহিরের নিমিত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। বাহিরে দেখিতেছ—আজ আকাশ প্লাবিয়া জোৎস্নার বান ডাকিয়া যাইতেছে, অন্তরে তাই অধীর সিন্ধু অনুরাগে উতলা হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এ যে

চন্দা ঝলকে যহি ঘট মাহী
অন্ধা আঁখন সুঝৈ নাহী।

তোমার মাঝেই যে জ্যোৎস্না ঝলকিয়া উঠিয়াছে—অন্ধ আঁখি কি তাহা বুঝিবে না? খোঁজ—খোঁজ—অফুরন্ত রসের ফোয়ারা যে

তোমারই মাঝে! তুমি একজনকে ভালবাসিয়াই কি তৃপ্তি পাইবে? যে রসিক তোমার অন্তরাসনে—তিনি কি এতই কৃপণ? একজনকে দিয়াই কি তাঁহার সঞ্চয় উজাড় হইয়া যাইবে? অনুরাগের আভাস নয়—যদি সত্যকার অনুরাগ জাগিয়া থাকে, তবে দিয়াই কি তাহার কূল পাইবে? সে যে "জনম মরণতে অমীকী ধারা"—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সে অমিয়ধারা—রসের তো আর বিরাম নাই—পাত্রাপাত্রের বিচার নাই।

এমনই রস—এমনই মমতা তোমার মাঝে জাগাইতে হইবে। শুধু সঙ্কীর্ণ আধারের মাঝে নিজকে সঁপিয়া দেওয়ার অভিনয় নয়—দিতে হইবে সত্যি-সত্যি—যিনি অগম, গভীর ও পরম, তাঁহাকেই দিতে হইবে। প্রেমে এই বোধ হওয়া চাই—"সবুহী মূরত বীচ অমূরত"—সমস্ত মূর্ত্তির মাঝেই সেই অমূর্ত্ত—তোমার ভেট তাঁহার কাছেই পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

যদি এর জন্য ক্ষুদ্রের মমতা ত্যাগ করিতে হয়, সংসারের স্বার্থে আঘাত পড়ে—তবুও এই পথেই চলিতে হইবে। অন্যের দিক চাহিও না—মমতায় হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ করিও না। এমন ধন যদি তোমার মাঝে থাকে, যাহা জগৎকে দিতে পারিবে, তবে তাহাই আনিয়া সবার সমুখে মেলিয়া ধরিও—একের জন্য বা একার জন্য কিছু সঞ্চয় করিও না। তোমার মাঝে অনুরাগের সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত হউক—যে পথিক আসিয়া তোমার দুয়ারে দাঁড়াইবে, সেই তৃপ্ত হইয়া যাইবে—জাতের বাছাই, রুচির বিচার যেন সেখানে না থাকে। এর জন্য দুঃখ পাইবে অনেক; কিন্তু দুঃখ পাওয়াও ভাল, তবুও হৃদয়ে কলঙ্ক রাখিতে নাই।

সংসারের মাঝে কত ছোট ছোট সম্বন্ধের জাল পাতিয়াছ—এইগুলিকে তোমার গুটাইয়া লইতে হইবে। কথাটা শুনিতে ভয়ানক—যে এমন উপদেশ দিতে যায়, তাহার ভাগ্যে গালি খাওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু তবুও যাহা সত্য, তাহা তো কাহারও অনুরোধে উপরোধে টলে না। এই যে ছোট ছোট মমতার বস্তু, ছোট ছোট স্নেহের বন্ধন—এই কি মানবাত্মার চরম সার্থকতা? দিতে তো কেহ মানা করে না—সংসারকে তুমি সবই ঢালিয়া দাও না—কিন্তু তাই বলিয়া এ কিসের বেসাতী করিতে বসিয়াছ তুমি? ওই যে "মূরত বীচ অমূরত"—তাঁহাকে তুমি অর্ঘ্য দিতেছ কামনার বাসি ফুল দিয়া? এ কি অনুরাগ না আত্মপ্রবঞ্চনা? সংসারকে ভালবাস—কি দিয়া ভালবাস? যাহা দিলে তোমারও অভাব মিটিত, সংসারেরও অভাব মিটিত, তাহা না দিয়া এ কি ছাই ভস্ম দিয়া ভালবাসার অপমান করিতেছ?

কিন্তু এ অপমান তো বুঝিবে না, যদি নিজের দিকে না তাকাও। রস কি [illegible], তাহা বুঝিবে তখন, যখন শক্তিকে [illegible] করিতে পারিবে। আবার শক্তি তোমার ক[illegible] হইবে, যখন ক্ষুদ্রের উপাসনা ত্যাগ করিতে পারিবে। বৈরাগ্য না হইলে কিছু হয় না, দুঃখ তাহাতে আছে মানি—কেননা সংস্কার সহজে যায় না। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া অনুরাগ কোথায়? অনুরাগ দিয়া যে তুমি ভালবাসার পাত্রকে বেড়িয়া ধরিবে, কি তোমার সম্বল?—এই দেহের লালসা, এই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, এই চিত্তের প্রমত্ততা? আত্মশক্তি তোমার জাগিল কোথায়? ভালবাসা তো দেহ মন প্রাণের দান নয়—সে যে আত্মার রস-বিলাস। আত্মপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন অনুরাগ অসম্ভব, মিলন মিথ্যা।

এই জন্যই বলি, আগে রসের অনুসন্ধান কর—আপনার মাঝে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া আগে রসের উৎসটী আবিষ্কার কর—নিবারণের পালা পরে। এই যে দেহ মনে তোমার যৌবনের উন্মেষ—এর সার্থকতা এখনও নয়, বিধাতার আনন্দযজ্ঞে এই তো তোমার নিমন্ত্রণ লিপি। ইহাকে পরম আদরে মাথায় বাঁধিয়া আগে খুঁজিয়া দেখ, উৎসবের সাজ সজ্জা তোমার কিছু আছে কি না।

তপস্যা তো যৌবনই করিবে। এত বড় যোগ্যতা বিধাতা আর কাহাকে দিয়াছেন? দুঃখ দৈন্যের মাঝেও মুখে হাসি দিয়াছেন—নৈরাশ্যের মাঝেও উৎসাহের বাঁধা আনিয়া দিয়াছেন আত্মপসারণের বিপুল সামর্থ্য দিয়াছেন—এই যৌবনকেই। সে যদি আজ তার মহিমা না বুঝিতে পারে, সংস্কারের দাস হইয়া ধূলিমাটীর খেলনা লইয়া যদি সে ভুলিয়া থাকে, তবে এমন করিয়া প্রকৃতি তাহাকে সাজাইয়া দিলেন কেন?

তুমি তরুণ—তুমি সুন্দর—চিরসুন্দরের মানসকাননের প্রস্ফুটিত ফুলটী তুমি—তুমি কেন শক্তি থাকিতে ভূমাকে ছাড়িয়া অল্পের প্রতি লোভ করিবে? জগৎকে বুকে তুলিয়া লইবার মত অনুরাগের স্পর্দ্ধা তোমার মাঝে জাগিবে না কেন? আর সে তো স্পর্দ্ধা নয় শুধু—সেই যে তোমার স্বভাব—তোমার বিধিদত্ত অধিকার। ক্ষুদ্রের জন্য তুমি সৃষ্টও নাই—প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে চক্ষু বুজিয়া জাবর কাটিবার জন্য তোমার জন্ম নয়। হে তরুণ, হে বীর, উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত; তোমার জীবন উদার হউক—তোমার প্রেম মহান্ হউক, তোমার সমর্পণ মধুর হউক। [ক্রমশঃ]

যোগসূত্রবৃত্তি

—❀—

সমাধিপাদ

ইতিপূর্ব্বে যোগের স্বরূপ, ভেদ ও সংক্ষেপে উপায়ের কথাও বলা হইয়াছে। এখন যোগাভ্যাসের প্রণালী ও বিস্তৃতভাবে উপায়ের কথা বলা হইবে।

বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদিগের যে সমাধি, তাহাকে **ভবপ্রত্যয়** বলা যায়। ভব অর্থে সংসার বা সূক্ষ্ম অবিদ্যামূলক সংস্কার; প্রত্যয় অর্থ কারণ। সুতরাং ভবপ্রত্যয় সমাধি অর্থে, যে সমাধির কারণ সূক্ষ্ম অবিদ্যামূলক সংস্কার। যাহাদের ভবপ্রত্যয় সমাধি হইয়া থাকে, তাঁহারা সংসারবীজকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদের পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারও হয় না। এইজন্য তাঁহাদের সমাধিকে যোগ না বলিয়া যোগাভাস বলাই সঙ্গত। যিনি মুক্তিকামী, তিনি পরতত্ত্বজ্ঞানে ও তাহার ভাবনাতেই যত্নশীল হইবেন—সূত্রকার এখানে এই ইঙ্গিতই করিতেছেন। (১৯)

বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীন ছাড়া অন্য যোগীদের যে সমাধি, তাহাকে বলে **উপায়প্রত্যয়** অর্থাৎ উপায়ই হইল এই সমাধির

প্রত্যয় বা কারণ। এই উপায়গুলি কি কি? —শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও একাগ্রতা। এই শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপায়গুলি ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লইয়া আসে। যোগীর প্রথমতঃ যোগের প্রতি **শ্রদ্ধা** জন্মে অর্থাৎ চিত্ত প্রসন্ন ও অনুকূল হয়। শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির বীর্য্য উৎপন্ন হয়। **বীর্য্য** যোগে উৎসাহ। এই বীর্য্য বা উৎসাহ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। স্মৃতি অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষ—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১১শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। যোগে উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তির যোগভূমিতে অনুভূত বিষয়সমূহ সংস্কাররূপে স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। স্মৃতি হইতে চিত্তের **সমাধি** বা একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। সমাহিতচিত্ত যোগী যাহার ভাবনা করেন, তাহাকেই সম্যকরূপে জানিতে পারেন—ইহাকেই বলে **প্রজ্ঞা**। এই গুলি হইল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপায়। পুনঃ পুনঃ ইহার অভ্যাসে পরবৈরাগ্যের ফলে ইহা হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। (২০)

এই সমস্ত উপায়ের ভেদ অনুযায়ী আবার যোগীদের ভেদ হয়। যে সমস্ত যোগী তীব্র সংবেগশালী, তাঁহাদের সমাধি ও সমাধিফল আসন্ন। ক্রিয়ার হেতুভূত চিত্তের দৃঢ়তর সংস্কারকে **সংবেগ** বলে। তীব্র সংবেগ হইলে সমাধি শীঘ্র শীঘ্র হয়। (২১)

আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে উপায়ও তিন প্রকার। তাহা ছাড়া ইহাদের প্রত্যেককে সংবেগের মৃদু, মধ্য ও তীব্র ভেদ অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। সুতরাং উপায় ও সংবেগের ভাবভেদে যোগী নয় প্রকার। মৃদূপায় অথচ মৃদুসংবেগ, মধ্য সংবেগ বা তীব্রসংবেগ—এই তিনপ্রকার যোগী। আবার মধ্যোপায় যোগীরও এমনি তিন বিভাগ, অধিমাত্রোপায়েরও তিন বিভাগ। ইহার মধ্যে অধিমাত্রোপায় অথচ তীব্র সংবেগ সম্পন্ন যোগীর সমাধিলাভই আসন্নতম। (২২)

পূর্ব্বে যে সমাধির উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও সুগম উপায় আছে। তাহার মধ্যে **ঈশ্বরপ্রণিধান** সমাধি লাভের একটী সুন্দর উপায়। বিশেষ ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের বিশিষ্ট উপাসনা ও সমস্ত ক্রিয়া তাঁহাতে অর্পণ করা—ইহাই হইল **প্রণিধান**। বিষয়সুখরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সমস্ত ক্রিয়া সেই পরমগুরুতে অর্পণ করা সমাধি ও সমাধি ফললাভের প্রকৃষ্ট উপায়। (২৩)

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইল, ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধি হয়। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ, তাঁহার প্রভাব, বাচক, উপাসনার ক্রম ও তাহার উপাসনার ফল ইত্যাদি বলা হয় নাই। এখন ক্রমে ক্রমে সূত্রকার এই সমস্ত কথা বুঝাইতেছেন।

ঈশ্বরের স্বরূপ এই—তিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ। অবিদ্যা প্রভৃতি **ক্লেশ** পদবাচ্য—ইহাদের কথা পরে বিশেষ করিয়া বলা হইবে। **কর্ম্ম** নানাবিধ—কোনও কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, কোনটা নিষিদ্ধ, কোনটা বা মিশ্ররূপ। জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ কর্ম্মফলকে বলে **বিপাক**। ফলের পরিণামকাল হইতে চিত্তভূমিতে যাহা শয়ান থাকে, সেই বাসনারূপ সংস্কারকে বলে **আশয়**। ত্রিকালের কোনও কালেই ঈশ্বরকে ইহারা স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বর অন্যান্য পুরুষের মত নহেন, এই জন্যই তাঁহাকে **পুরুষবিশেষ**

বলা হইয়াছে। তাঁহাকে ঈশ্বর বলি কেন? কেননা তাঁহার ঈশিত্ব বা প্রভুত্ব রহিয়াছে—তিনি ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিতে পারেন।

ঈশ্বরের ঈশিত্বই তাঁহার বিশেষত্ব নহে। যদিও ক্লেশাদি কোনও আত্মাকেই স্পর্শ করে না, তথাপি তাহারা চিত্তে থাকিয়া আত্মাতে অন্ততঃ উপচরিতও হয়—যেমন সেনার হার-জিৎ সেনানীতে বর্ত্তায়; কিন্তু ঈশ্বরকে উপচারক্রমেও কখনও ক্লেশাদি স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্যই ঈশ্বর সাধারণ পুরুষ হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক।

অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষহেতু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। সত্ত্বোৎকর্ষের হেতু তাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য একটী আর একটীকে আশ্রয় করিয়া জন্মে না—তাহারা পরস্পরের নিরপেক্ষ। ঈশ্বর সত্ত্বে তাহারা অনাদিরূপে বর্ত্তমান। ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়ভূত এই সত্ত্বেরও অনাদি সম্বন্ধ—কেননা, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-বিয়োগ ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। অন্যান্য প্রাণীর চিত্ত সুখ, দুঃখ ও মোহে পরিণত হয়, অথবা নির্ম্মল সত্ত্বে অবস্থিত হইয়া সমাধির উপযোগী হয় এবং চিচ্ছায়ার সংক্রমণহেতু জ্ঞানের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের এ রকম হয় না। তাঁহার মাঝে কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক পরিণামই রহিয়াছে এবং তাহা অনাদি ভোগাভাবে তাঁহাতে সম্বদ্ধ ও ব্যবস্থিত। সুতরাং ঈশ্বর অন্য পুরুষ হইতে বিলক্ষণ বটে।

মুক্তাত্মাদিগের ক্লেশের সহিত সংস্পর্শ ছিল, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত উপায়ে তাহা দূর হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বদাই ক্লেশাদি সংস্পর্শশূন্য, সুতরাং তিনি মুক্তাত্মার মতও নহেন। অতএব তিনি পুরুষ বিশেষ।

ঈশ্বর অনেক, এমন কথাও বলা যায় না। কেননা অনেক হইলে তাঁহারা সকলেই তুল্যপ্রভাব হইবেন; তখন যদি তাঁহাদের কোনও কারণে অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে কোনও কার্য্যেরই উৎপত্তি সম্ভব হইবে না। সামান্যতঃ ঈশিত্ববিশিষ্ট পুরুষদিগের মধ্যে যদি উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিচার আসে, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যাঁহার ঐশ্বর্য্য চরমে উঠিয়াছে, ঈশিত্ববিশিষ্টদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর। (২৪)

ঈশ্বরের স্বরূপ বলা হইল। এখন চাই তাঁর প্রমাণ। সূত্রকার বলিতেছেন, ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞ-বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহাই তাঁহার প্রমাণ। সর্ব্বজ্ঞ-বীজ কাহাকে বলে? সর্ব্বজ্ঞ একজন আছেন, তাহার অনুমান যে প্রত্যয় হইতে হয়, তাহাই সর্ব্বজ্ঞ বীজ। তাহা কিরূপ? অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয় এ জগতের সকলেই জানে না। যাহারা কিছু জানে, তাহারাও কেহ অল্প জানে, কেহ বা বেশী জানে। এই যে বিষয়জ্ঞানের অল্পত্ব ও আধিক্য, ইহা দেখিয়াই অনুমান করিতে পারি, নিশ্চয়ই এই জ্ঞান এক জায়গায় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং বিষয়জ্ঞানের অল্পত্ব ও আধিক্যই সর্ব্বজ্ঞের অনুমাপক। ইহাই সর্ব্বজ্ঞবীজ। অল্পত্ব ও মহত্ত্বরূপ ধর্ম্ম সাতিশয় অর্থাৎ তাহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ নিশ্চয়ই আছে এবং এমনি করিয়া এক জায়গায় তাহারা চরমে ঠেকিবেই। যেমন [illegible] বিষয়ে অল্পত্বের চরম পরমাণু, মহত্ত্বের চরম আকাশ। এইরূপ জ্ঞান প্রভৃতি চিত্তধর্ম্মেরও তারতম্য আমরা দেখিতে পাই, সুতরাং তাহার নিরতিশয়ত্ব বা

পরাকাষ্ঠা আছে বলিয়াও অনুমান করিতে পারি। জ্ঞানধর্ম্ম যাঁহাতে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর।

অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে এই অনুমান তাঁহার সামান্যজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়—ইহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র বা আপ্ত প্রমাণের শরণ লইতে হইবে।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ-বিয়োগ তিনি ঘটাইতে যাইবেন কেন, উহাতে তো তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই—এমন আশঙ্কা কাহারও হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর কারুণিক, জীবের প্রতি অনুগ্রহই তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনরূপে পর্য্যাপ্ত। "কল্প-প্রলয়ে মহা-প্রলয়ে নিঃশেষে সমস্ত সংসারীদিগকে উদ্ধার করিব"—এইরূপ সংকল্প তাঁহার আছে। যাহা যাঁহার পক্ষে ইষ্ট বা অভিলষিত, তাহাই চেষ্টার প্রয়োজক বলা যাইতে পারে। (২৫)

ঈশ্বরের প্রমাণ বলিয়া তাঁহার প্রভাবের কথায় সূত্রকার বলিতেছেন—ঈশ্বর আদিস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রভৃতিরও গুরু, কেননা তিনি অনাদি অতএব কালদ্বারা অনবচ্ছিন্ন নহেন। কিন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতি কালদ্বারা অনবচ্ছিন্ন অতএব তাঁহাদের আদি আছে। সুতরাং উপদেশ ভিন্ন তাঁহারা স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। ঈশ্বরই তাঁহাদের উপদেষ্টা। (২৬)

ঈশ্বরের উপাসনা কি করিয়া করিব? তাঁহার বাচক কি? প্রণবই ঈশ্বরের বাচক বা অভিধায়ক। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রণবের যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, তাহা নিত্য, তাহা প্রণবরূপ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হইল মাত্র—এই সম্বন্ধ কাহারও কৃত নয়। যেমন পিতা পুত্রের মাঝে যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য; যদি কেহ বলে "এই ব্যক্তি ইহাঁর পিতা এবং এ উহার পুত্র"—তবে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় মাত্র। ঈশ্বরের সহিত প্রণবের বাচ্য বাচক সম্বন্ধও তেমনি সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হইল মাত্র। (২৭)

ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে তদ্বাচক প্রণব জপ করিতে হইবে এবং তাহার বাচ্য ঈশ্বরের ভাবনা করিতে হইবে। সমাধি-সিদ্ধির জন্য যোগীরা যথারীতি প্রণব উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ পুনঃ পুনঃ চিত্তে বিনিবেশিত করিবেন—ইহাই একাগ্রতার উপায়। (২৮)

এই প্রকার জপ ও অর্থভাবনারূপ উপাসনার ফলে যোগীর প্রত্যক্-চেতনার সাক্ষাৎকার হয়, এবং তাঁহার সমস্ত অন্তরায়ের অভাব হয় অর্থাৎ তাহাদের শক্তি কুণ্ঠিত হইয়া যায়। যে চেতনা বা দৃক্‌শক্তি বিষয়ের প্রতিকূলে আমাদের অন্তঃকরণের দিকে অভিমুখী রহিয়াছে, তাহাই **প্রত্যক্-চেতনা**। অন্তরায়গুলি কি, তাহা সূত্রকার পর সূত্রেই বলিতেছেন। (২৯)

রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্যে চিত্তে যে সমস্ত বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহারাই **অন্তরায়**। সংখ্যায় ইহারা নয়টী—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব। ধাতুর বৈষম্য হেতু যে শারীরিক উৎপাত, তাহাই **ব্যাধি**। **স্ত্যান** চিত্তের অকর্ম্মণ্য ভাব। উভয়কোটিক জ্ঞানকে বলে **সংশয়** অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত দুইটী ভাবকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তমান যে জ্ঞান, তাহাই সংশয়—যেমন "যোগ কি সাধ্য, না সাধ্য নয়?" চিত্ত যে কিছুতেই উঠিতে চায় না, সমাধি সাধনে

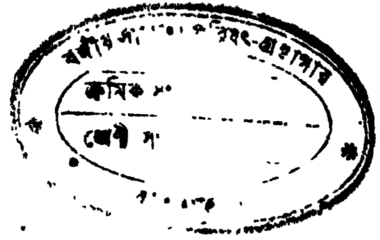
তাহার যে ঔদাসীন্য, তাহাই **প্রমাদ**। শরীর ও চিত্তের যে গুরুত্ব হেতু যোগবিষয়ে প্রবৃত্তির অভাব ঘটে, তাহাই **আলস্য**। বিষয় ভোগের প্রতি চিত্তের যে লালসা তাহা **অবিরতি**। শুক্তিতে রজত জ্ঞানের মত বিপর্য্যয় জ্ঞানই **ভ্রান্তিদর্শন**। কোনও নিমিত্তবশতঃ সমাধি-ভূমির প্রাপ্তি না ঘটিলে, তাহাই **অলব্ধভূমিকত্ব**। উচ্চ অবস্থা লাভ হইলেও সমাধিভূমিতে যদি চিত্ত প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহাকে বলে **অনবস্থিতত্ব**। ইহারা একাগ্রতার প্রতিকূল বলিয়া সমাধির বিঘ্নস্বরূপ। (৩০)

চিত্তবিক্ষেপের সংজাত আরও অন্তরায় যথা দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস-প্রশ্বাস। **দুঃখ** চিত্তের রাজসিক পরিণাম, চিত্ত তাহাতে বাধিত বা পঙ্গু হইয়া যায়। এই বাধাকে দূর করিবার জন্য প্রাণিদগের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহাই সংসার-ব্যবহারের মূল। বাহিরে কিম্বা ভিতরে কোনও কারণবশতঃ মন যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহাকে বলে **দৌর্ম্মনস্য**। সমস্ত শরীরের যে কম্পন তাহাই **অঙ্গমেজয়ত্ব**। ইহা আসনের পক্ষে যেমন বাধা, মনঃস্থৈর্য্যের পক্ষেও তেমনি। প্রাণ যে বাহিরের বায়ুকে গ্রহণ করে তাহাই **শ্বাস**, এবং ভিতরের যে বায়ুকে ত্যাগ করে তাহাই **প্রশ্বাস**। লোকে যে অনিচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে শ্বাস প্রশ্বাস করে, তাহাও সমাধির অন্তরায়।" এই সমস্ত অন্তরায় চিত্তবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিবে। যথাক্রমে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহাদিগকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। (৩১)

এই সমস্ত বিক্ষেপ ও তাহার উপদ্রব দূর করিবার একটী সুন্দর উপায় আছে। এক-তত্ত্বাভ্যাস করিলে অর্থাৎ নিজের রুচির অনুকূল কোনও একটী তত্ত্বে চিত্তকে পুনঃ পুনঃ নিবিষ্ট করিলে ক্রমে একাগ্রতা উৎপন্ন হইয়া এই সমস্ত বিক্ষেপ প্রশান্ত হইয়া যায়। (৩২)

আর একটী সুন্দর উপায়ে চিত্ত প্রসন্ন হয়। সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও অপুণ্যের বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্তপ্রসাদ হয়। ইহারা **পরিকর্ম্ম** বলিয়া কথিত হয়—চিত্তকে ইহারা সংস্কৃত করিয়া থাকে। মৈত্রী সুহৃদের ভাব; করুণা কৃপা; মুদিতা হর্ষ; উপেক্ষা ঔদাসীন্য। যথাক্রমে সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান ও অপুণ্যবান ইহাদের সর্ব্বদা ভাবনা করিতে হইবে। যেমন, কাহাকেও সুখী হইতে দেখিলে "আহা এ যে সুখী হইয়াছে, ভালই হইয়াছে"—এইরূপ ভাবনাই করিবে, তাহার প্রতি ঈর্ষা করিবে না; কাহাকেও দুঃখী দেখিলে "কি করিয়া ইহার দুঃখ দূর হইবে" একপ ভাবনাই করিবে—উদাসীন হইয়া থাকিবে না। আবার পুণ্যবানের পুণ্য কার্য্যের অনুমোদনই করিবে, "এ তো ভারী পুণ্যবান!"—এই ভাবিয়া বিদ্বেষ করিবে না। আবার কাহাকেও অপুণ্যবান দেখিলে তাহার অনুমোদন করিবে না, দ্বেষও করিবে না। এই প্রকার মৈত্র্যাদি পরিকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে সহজেই সমাধির আবির্ভাব হয়।

অবশ্য এই পরিকর্ম্ম বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র। গণিতে যেমন মিশ্র অঙ্ক করিতে হইলে আগে সাধারণ যোগবিয়োগ শিখিতে হয় এবং পরে আমাদের গণিতের সহায়তাতেই মিশ্রগণিত নিষ্পন্ন করা যায়, তেমনি রাগদ্বেষ প্রভৃতির বিপরীত মৈত্রী, করুণা ইত্যাদির ভাবনা দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে, তাহা সম্প্রজ্ঞাত প্রভৃতি সমাধির যোগ্য হইয়া থাকে। রাগদ্বেষই মুখ্যতঃ চিত্তবিক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে যদি সমূলে উৎপাটিত করা যায়, তবে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া আপনিই একাগ্রতা আসিবে। (৩৩)



ত্রিবেণী

—*—

তোমরা আমারই আত্মার প্রতিরূপ, আমার আমিত্বের প্রতিচ্ছায়া তোমরা—তোমাদের নমস্কার।

ধর্ম্মের লক্ষ্য কি, আর হিন্দুরা কি করে তার সাধনা করে থাকেন—সে বিষয়ে ধারা-বাহিক ভাবে আলোচনা করবার আছে। আজ রাতের 'কথা তার ভূমিকা মাত্র।

হিন্দুরা বলেন সকলই ব্রহ্ম। যা কিছু সম্পদ, যা কিছু কল্যাণ, যা কিছু আনন্দ, সবা-রই মূল নিজের মাঝে—নিজের মাঝেই সবার সাগর-সেঁচা মাণিক রয়েছে। সবাই ব্রহ্ম—প্রত্যেকের মাঝেই সব রয়েছে। যদি তাই হয়, তবে লোকে কষ্ট পায় কেন? কষ্ট পায় এজন্য নয় যে, মানুষ প্রতীকারের কোনও পথ জানে না বা বাস্তবিক অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডারী সে নয় বা অমূল্য সম্পদ তার মাঝেই লুকানো নাই। কষ্ট পায় এই বলে যে, তারা তো জানে না—আনন্দের গ্রন্থিটী কি করে মোচন করতে হবে, যে কৌটায় মাণিক লুকানো আছে, কি করে তা খুলতে হবে। মানুষ জানে না, কি করে নিজের মাঝে প্রবেশ করে আত্মাকে জানতে হয়। সমস্ত ধর্ম্মই চায় মানুষের আবরণ দূর করে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে। যে বস্তু আমাদের মাঝে রয়েছে, আপন হাতে তাকে আমরা আবরণ করেছি; আপন ইচ্ছায়, আপন চেষ্টায় আমরা দুঃখের মাঝে দৈন্যের মাঝে তলিয়ে যাচ্ছি। ইমার্সনের (Emerson) ভাষায় বলতে গেলে, "প্রত্যেক মানুষের মাঝেই ভগবান যেন বোকা সেজে রয়েছেন।"

যত ধর্ম্মমত সবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের চোখের সামনে যে পরদা রয়েছে, তাকে ছিঁড়ে ফেলা। কোনও কোনও সম্প্রদায় হয়ত এই আবরণকে অপরের চেয়ে সূক্ষ্মতর করতে পেরেছে। সকল সম্প্রদায়েই এমন কতকগুলি লোক আছে যাদের ভাব শুদ্ধ হয়েছে। ভাবশুদ্ধ হলেই, মোটা হউক আর পাতলাই হউক, পরদাটা একটু সরে যাবেই—সঙ্গে সঙ্গে একবার চকিতের মত সত্যের দেখা পাওয়া যাবে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বোঝান যায়। এই যেমন একটা পরদা রয়েছে (এই বলে স্বামিজী চোখের সামনে একটা রুমাল মেলে ধরলেন)। পরদাটা রয়েছে চোখের সামনে—আমরা সেটাকে সরিয়ে দেখতে পারি বটে, কিন্তু আবার সেটা চোখের সামনে এসে পড়বে। পরদাটাকে আরও পাতলা করা গেল (এই বলে স্বামিজী রুমালের ভাঁজগুলি খুলে ফেল-লেন)—খুব পাতলা হলেও, সেটাকে সরিয়ে দিলে আবার সে চোখের সামনে এসে পড়ে—একেবারে তো চলে যায় না। আমরা ওটাকে আরও পাতলা করলাম। এ অবস্থায় পরদাটা সরালেও আবার তা চোখের উপর এসে পড়বে। কিন্তু ওটাকে যদি খুব বেশী রকম পাতলা করা যায়, তাহলে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে না দিলেও সে আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করে না। আমরা তখন এর ভিতর দিয়ে বেশ দেখতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে আগের মত সরিয়েও দিতে পারি। পরদাটাকে এমনিতর পাতলা করে ফেলতে

পারলে, তাকে আর বাস্তবিক পরদা বলা চলে না। আবরণ থাকা সত্ত্বেও আমরা তখন আনন্দের অধিকার পেতে পারি। আমরা যেন ভগবানের সঙ্গে তখন মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছি—না, আমরা যেন একেবারে তাই হয়ে গিয়েছি। তখন এ জগতের কোনও আঘাতেই আমাদের সুখশান্তি নষ্ট করতে পারে না—কোনও কিছুই আমাদের অন্তরায় হয় না। অন্য ধর্ম্মের চেয়ে বেদান্ত এই হিসাবে উন্নত যে, মায়ার আবরণ অবিদ্যার আবরণ তার কাছে অতি সূক্ষ্ম হয়ে গিয়েছে। তাই বেদান্তজ্ঞানী কর্ম্মজীবনের মাঝেও পরম শান্তির অধিকারী।

সকল সম্প্রদায়ের মানুষই কখন না কখন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা যোগযুক্ত হয়ে থাকবে, ততক্ষণ তাদের চোখের সামনে থেকে অবিদ্যা সরে যাবে। বেদান্তীও তা পাবেন—সমাধির আনন্দে আপনাকে তিনি নিমজ্জিত করতে পারেন। তবে সাধারণ অবস্থাতেও তিনি এই অমৃত অনুভূতি হতে বঞ্চিত নন। কিন্তু যে সম্প্রদায়ের আবরণ স্থূল, সে এই সহজ উপলব্ধি দিতে পারে না

জগতের সমস্ত সম্প্রদায়—এমন কি ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায় ধরেও—মোটামুটী তিনটা ভাগ করা যায়। সংস্কৃতে তাদের বলা চলে—তস্যৈবাহম্, তবৈবাহম্, ত্বমেবাহম্। তস্যৈবাহম্ অর্থ আমি তাঁরই। যে সম্প্রদায়ের এই ভাব, তার আবরণ্ হচ্ছে সব চেয়ে স্থূল। ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, তবৈবাহম্ অর্থাৎ আমি তোমারই। প্রথম ধর্ম্মমতের সঙ্গে দ্বিতীয়টা তুলনা করলে পার্থক্যটা তোমরা স্পষ্টই বুঝতে পারবে। ধর্ম্মে যখন সাধকের প্রথম মতি হয়, তখন সে ভগবানকে নিজ থেকে দূর ভাবে, তাঁকে অলক্ষ্য বলে মনে করে; তাই তিনি যেন সামনে নাই, এই ভাবে নামপুরুষে তাঁর কথা বলে—"আমি তাঁর।" এই হল ধর্ম্মের সুরু। সকল সাধকের পক্ষেই এই হচ্ছে মাতৃস্তন্যের মত। "আমি তাঁর"—এই উপলব্ধিটা যদি পূর্ণভাবে জাগে, তাও কি মধুময় নয়? এই অনুভূতি যে পেয়েছে, সে ভোরের আলোয় চোখ মেলে ভাবে, আমার প্রভুও আমার সঙ্গে জেগেছেন। তারপর তার দিনের কাজে সে যায়,—ভাবে, এ কাজ তো তার সেই মধুময় প্রেমময় প্রভুরই কাজ—এ যে ভগবানেরই অনুজ্ঞা। জগতের দিকে তাকিয়ে সে দেখে, এ তো তাঁরই জগৎ। এই যে তার ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের মেলা—এ তো ভগবানেরই সব—তিনিই না তার হাতে এগুলি সঁপে দিয়েছেন। আহা, এমনি করে ভাবতে শিখলে এ জগৎ কি স্বর্গসুষমায় ভরে ওঠে না—সংসার কি নন্দনকাননে পরিণত হয় না? সরল বিশ্বাসে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে অনুভব কর যে, তোমার যা কিছু, সমস্তই তোমার প্রভুর, সমস্তই ভগবানের—এই দেহও তো তাঁরই! এই অনুভূতিও যদি পূর্ণ হয়ে জাগে, তবে এতেই যে আনন্দ, কোথায় তার সীমা, কোথায় তার ভাষা! এ যে মধুর হতেও সুমধুর। এই ভাবনায় সিদ্ধ হয়ে, এই ভাব নিয়ে চলাও কত মিষ্টি। কিন্তু মত হিসাবে,ধর্ম্মের এখানে সুরু মাত্র।

এর সঙ্গে ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্তরের তুলনা করে দেখ। সেখানকার স্বর—"তবৈবাহম্—আমি তোমারই।" ওগো, তোমায় যে আমি পলে পলে চাই—আমি যে তোমার—শুধু তোমার। প্রথম অবস্থাটী ছিল মধুর, কিন্তু এ যে তার চেয়েও মধুর; প্রথম অব-

স্থাটী ছিল সুন্দর, অনুরাগমাখা। কিন্তু এ অবস্থা যেন আরও সুন্দর আরও অনুরাগে ভরা। একবার পরখ করে দেখ, দুটোয় কি তফাৎ—আবরণ যেন এখানে আরও সূক্ষ্ম হয়ে গিয়েছে। ভগবানকে আর 'তিনি' বলে সম্বোধন নয়—আর তো তিনি চোখের আড়াল নন, যবনিকার ওপারে নন, তিনি যে আমাদের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন! তিনি আমাদের কাছে, আমাদের বুকে—নিকট হতেও নিকটে তিনি। আরও কাছে তিনি এগিয়ে এসেছেন, তাঁকে আরও ভাল করে চিনতে পেরেছি আমরা। ভাবহিসাবে এ বেশী উন্নত বলতে হবে। কিন্তু এমনও হয়, এ সব কথা অনেকে মানে বটে, ভগবানকে খুব আপন বলেও ডাকে, তিনি যে তাদের খুবই কাছে, তাও স্বীকার করে কিন্তু তাদের ভাবের একাগ্রতা থাকে না, জীবন্ত শ্রদ্ধা তাদের মাঝে জাগে না।

অধ্যাত্ম জীবনের প্রথম স্তরে আবরণ স্থূলই থাকে। কিন্তু তখন যদি তার সঙ্গে জীবন্ত শ্রদ্ধার যোগ হয়, তবে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও আবরণ দূর হয়ে যায়। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ধমনীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে মানুষ যখন অনুভব করে যে "আমি তাঁরই"—এ উপলব্ধি যখন তার প্রতি লোমকূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়, তখন এই ঐকান্তিক আকুলতায়, এই প্রাণস্পর্শী উন্মাদনায় মুহূর্ত্তের জন্য মানুষের চোখ হতে সকল আবরণ খসে পড়ে—ভগবৎসত্তায় সে নিমজ্জিত হয়ে যায়—সর্ব্বময়ের চরণে সে লীন হয়ে যায়, ক্ষণেকের জন্য সে ভগবানের সাযুজ্য সারূপ্য পায়।

"আমি তোমারই"—এই উচ্চভাবের উপাসক যারা, ঐকান্তিক শ্রদ্ধার অভাবে অনেক সময় ঈশ্বরসান্নিধ্যের অমৃত-আস্বাদনে তারা বঞ্চিত থাকে। কিন্তু এই দ্বিতীয় স্তরেও তো শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার যোগ ঘটানো সম্ভব হতে পারে।

তৃতীয় ভাব হচ্ছে "ত্বমেবাহম্ আমি তুমিই।" দেখতেই পাচ্ছ, ভগবান্ এতে তোমার কত নিকটে এলেন। প্রথম স্তরে—"আমি তাঁর"—ভগবান তখন বহুদূরে। দ্বিতীয় স্তরে "আমি তোমার"—ভগবান তখন আমাদের কাছে, আমাদের সম্মুখে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের চরম পরিণতিতে দুয়ে এক হয়ে যায়—বঁধু আর পিয়া প্রেমের মাঝে আত্মহারা হয়ে যান তখন। বেদান্তে সত্যের এমনি করে উপলব্ধি হয়। পতঙ্গ ক্রমেই আগুন-শিখার কাছে এগিয়ে এল—তার পর নিজের দেহটী আগুনে আহুতি দিয়ে অগ্নিস্বরূপই হয়ে গেল। বেদান্তের আর এক নাম উপনিষদ্। তার অর্থ হচ্ছে, সেই দিব্য জ্যোতিঃর কাছে (উপ) এমনভাবে নিশ্চিত নিশ্চয়ে (নি) এগিয়ে আসা, যাতে ভেদবুদ্ধিরূপ পতঙ্গের বিনাশ হয় (সদ)। ঠিক ঠিক ভগবানকে যে ভালবাসে, সে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন অজ্ঞাতসারে, আপনা হতেই, অনিচ্ছায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—"সোহহং"—"সোহহং" "সোহহং"—"ত্বমেবাহং"—"ত্বমেবাহং"—"অহং ব্রহ্মাস্মি—নান্যঃ।"

অধ্যাত্ম সাধনার এই হচ্ছে চরম প্রতিষ্ঠা। এই তো ভক্তির চরম। একেই বলে বেদান্ত অর্থাৎ বেদ বা জ্ঞানের শেষ সীমা। সমস্ত জ্ঞান এখানেই এসে থেমেছে—এই হল সাধনার সীমা। এই স্তরে, দেখতেই পাচ্ছ, আবরণ এত সূক্ষ্ম হয়ে গিয়েছে যে, আবরণ থাকা সত্ত্বেও তার ভিতর দিয়ে আমরা সত্যকে সুস্পষ্ট দেখতে পাই; কিন্তু এখানেও এমন

লোক মিলে, যাদের এতটুকু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা নাই, যাতে সমস্ত আবরণ দূর করে অনুভূতির পূর্ণরস আস্বাদন করবে। আবার এমনও অনেক আছেন, যাঁরা বুদ্ধির সাহায্যে এই তত্ত্বটী বুঝে নিয়ে তারপর মর্ম্ম দিয়ে তাকে এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাঁদের সকল আবরণ নিমিষে খসে পড়ে—অনন্ত অমৃতে তারা অবগাহন করেন, তাঁরা অমৃতস্বরূপ হয়ে যান। এঁরাই মুক্ত—এই জীবনেই তাঁরা মুক্তির আস্বাদন পেয়েছেন, তাই তাঁরা জীবন্মুক্ত।

ভাব শুদ্ধ করা বা আবরণকে সূক্ষ্ম করা সাধারণতঃ বুদ্ধির সাহায্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু আবরণ দূর করতে হলে মর্ম্মবেত্তা হওয়া চাই। তিনটী সাধনার কথা বলা হয়েছে—এখন দেখা যাক, এই সমস্ত সাধনমার্গীরা কে কতদূর আবরণ খসাতে পারে। হিন্দুর শাস্ত্র থেকে দুচারটা উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে।

একটী মেয়ে একটী ছেলেকে ভালবাসত। তাদের ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, প্রেমের রসেই তাদের সমস্ত সত্তা নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। একবার মেয়েটীর খুব অসুখ হওয়াতে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার এসে বলল যে, মেয়েটীর শরীর হতে খানিকটা রক্তমোক্ষণ না করলে কিছুতেই তার অসুখ সারবে না। ডাক্তার তার হাতে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিল, কিন্তু হাতে রক্ত বেরুল না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মেয়েটীর হাতে ছুঁচ ফুটাতেই, ছেলেটীর হাত থেকে, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। দেখ দেখি—কি আশ্চর্য্য তাদের একাত্মতা! তুমি বলবে, এ বাজে কথা—গল্পমাত্র; কিন্তু এ তো সত্যও হতে পারে। সাধারণ লোকের মাঝেও যারা ভালবাসে, তাদের ভালবাসা তেমন বিশুদ্ধ না হলেও নিজের জীবনে তারা এমনিতর ঘটনার আভাস পেতে পারে বই কি। ওই মেয়েটী তার আমিত্ব ভুলে গিয়ে বাক্তিত্বের সঙ্গে নিজকে এক করে ফেলেছে—ছেলেটীও তার প্রিয়ার প্রেমে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে।

ভগবানের সঙ্গে এমনিতর যোগই হল ধর্ম্ম। আমার এ দেহ তাঁরই দেহ হোক্—তাঁর স্বরূপ আমার স্বরূপ হোক্।

যোগবাশিষ্ঠ নামে হিন্দুদের এক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে। তার মাঝে লেখা আছে, একটী মেয়েকে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লোকে দেখল, আগুনে তো সে পুড়ল না। তার স্বামীকেও আগুনে ফেলা হল; কিন্তু তারও কিছু হল না। কি করে এমন হল? তার পর দুজনকে নদীতে ফেলল, কিন্তু স্রোতে তারা ভেসে গেল না। পাহাড়ের উপর থেকে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হল, কিন্তু একখানি হাড়ও তাদের ভাঙ্গল না। এ হল কি করে? সে সময় তো তারা এর কোনও উত্তর দিতে পারল না—কেননা তখন তারা ছিল আত্মহারা—এমন জায়গায় তারা ছিল, যেখানে মানুষের প্রশ্ন পৌঁছায় না। পরে তাদের কাছে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তারা উত্তর দিল, তাদের প্রত্যেকের কাছে তার প্রিয়তম ছিল—জগতের সবখানি। তাই আগুন তো তাদের কাছে আগুন নয়। প্রিয়ার কাছে সে আগুন প্রিয়ের মতন, আর প্রিয়ের কাছে তাই প্রিয়ার মতন। জলও সে জল নয়—সে যে প্রিয়তমেরই রূপ। পাষাণ তাদের কাছে পাষাণ নয়—দেহ দেহ নয়—

সবই সেই প্রিয়তম। প্রিয়জন কি করে প্রিয়জনের অনিষ্ট করতে পারে?

হিন্দু পুরাণে আর একটা ছেলের কাহিনী আছে। তার বাপ তাকে ধর্মপথ থেকে ফিরাতে চেয়েছিল। বাপের ইচ্ছা, ছেলে সংসারী হয়ে থাকে তারই মত, কিন্তু বাবার শত আদেশ-উপদেশেও ছেলের মন টললনা। ছেলের মতি ফিরাবার জন্য বাবা তাকে আগুনে ফেলল, কিন্তু আগুন তাকে পোড়াল না। তার পর তাকে জলে ফেলা হল, কিন্তু সে ডুবল না। আগুন, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি তখন তার কেশ স্পর্শও করতে পারে না—কেননা তাদের যা স্বরূপ, তা তো সেই বালকটী জেনেছে। বালকের মোহ টুটে গিয়ে সত্য অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়েছে—সবই তার কাছে তখন ভগবানের প্রেমময় রূপ। শাসন, ভ্রূকুটী, তর্জ্জন, অস্ত্র, আগুন—সবই যে তার কাছে অমৃত! তার অপকার করবে কে?

কিছু দিন আগে হিমালয়ের এক গভীর প্রদেশে গঙ্গাতীরে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী বসেছিলেন। অপর পারে আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী ছিলেন। এপারে যিনি বসেছিলেন, তিনি কেবল বলছেন—"শিবোহহং শিবোহহম্।" এমন সময় একটা বাঘ এসে তাঁর সামনে উপস্থিত। বাঘটা এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু বাঘের মুখে থেকেও তিনি তেমনি গম্ভীরকণ্ঠে নির্ভীকভাবে বলছেন—"শিবোহহং—শিবোহহম্।" বাঘটা তাঁর হাত পাগুলো ছিঁড়ে ফেলল—কিন্তু তবুও তিনি সেই একই সুরে একই মন্ত্র জপ করছেন।

এটা তোমাদের কাছে কেমন ঠেকে? "শিবোহহং—শিবোহহং" বলাটা তোমরা কি মনে কর? একে তোমরা নাস্তিকবাদ বলবে না কি?—ঐ তো মোটেই তা নয় গো! এই হচ্ছে অনুভূতির চরম। যারা ভালবাসে, তারা যখন ভালবাসার চরম শিখরে উত্তীর্ণ হয়, তখন প্রিয়জনের সঙ্গে তারা নিজকে একাত্ম বলে মনে করে না কি? মা কি জানেন না, তাঁর সন্তান তাঁরই অস্থি হতে, মজ্জা হতে, রক্ত হতে? মা কি তাঁর সন্তানকে তাঁরই প্রতিরূপ, তাঁরই আর একটা প্রকাশ বলে মনে করেন না? সন্তানের সমস্ত প্রয়োজন কি মায়ের প্রয়োজনের সঙ্গে এক নয়? হাঁ, এক তো বটেই।

তাঁকে চাও—তাঁকে পাও—তাঁকে বুকে তুলে নাও—এমন ভাবে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাও যে সে তীব্র অনুভূতির কাছে সমস্ত ভেদ-চিহ্ন লোপ হয়ে যাক্। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্"—এ কথার পরেও বল—আনন্দের সঙ্গে বল "আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে।"

আজকাল তোমাদের আমেরিকায় যেমন নাকি বিধিব্যবস্থা, বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এমনটা ছিল না। আমেরিকাতে রাত্রে তোমরা ঘরে ঘরে বিজলী-বাতি জ্বাল। রাম যে সময়ের কথা বলছেন, তখন হিন্দুরা মাটীর প্রদীপ জ্বালত। এক বাড়ীতে আলো জ্বললে পর কাছাকাছি আর সব বাড়ীর লোক সেখান হতেই আলো ধরিয়ে নিত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একটী মেয়ের বড় ভাব ছিল। মেয়েটী এক দিন আলো ধরাবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের বাড়ীতে গিয়েছে। আরও অনেক বাড়ীতে তো আলো জ্বলেছিল, কিন্তু তবুও মেয়েটী শ্রীকৃষ্ণের বাড়ীতেই গেল কেন? সে তো প্রদীপ জ্বালতে যায়নি—শ্রীকৃষ্ণের রূপের আগুনে পতঙ্গের মত পুড়ে মরতে গিয়েছিল সে! সে

কৃষ্ণকেই দেখতে গিয়েছিল—মায়ের কাছে আলো জ্বালবার অছিলা করে।

প্রদীপের শিখায় কোথায় সে তার প্রদীপের সলতেটী ধরিয়ে নেবে, তা না করে সে অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রদীপের দিকে তো তার দৃষ্টি নাই—সে দেখছে শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপমাধুরী। এমন তন্ময় হয়ে মেয়েটী তাঁকে দেখছে যে প্রদীপের শিখায় সলতেটী না ধরে সে তার আঙ্গুলগুলিই ধরে দিয়েছে। আগুন এদিকে পুড়ছে, কিন্তু মেয়েটীর তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন করে কতক্ষণ কেটে গেল মেয়ে ঘরে ফিরছে না। মা তখন মেয়ের আসতে দেরী দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়ল। শ্রীরাধিকার বাড়ীতে গিয়ে মা দেখে—প্রদীপের আগুনে মেয়ের হাত পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়ের তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। এ দিকে আঙ্গুল পুড়ে গিয়েছে—হাড় পর্য্যন্ত আধাপোড়া হয়ে গিয়েছে। দেখে মায়ের তো চক্ষুস্থির—চীৎকার করে মেয়েকে সে ডেকে বলল, "ওমা করছিস কি সর্ব্বনাশ!" মায়ের কথা শুনে তবে তার চেতনা হল।

প্রেমের এই পরমক্ষণে, এই চরম পরিপূর্ণতায়, যুগলে এক হয়ে যায় "আমি সেই আমি তুমি।"

এই হচ্ছে তৃতীয় স্তর। কিন্তু এর পরেও এমন স্তর আছে যেখানে আমন কথাও বলা চলে না। যে গল্পগুলি আগে বলা হল, তাতে তৃতীয় স্তরের ভালবাসার পরিচয় পেলে। এর পরে যা বলা হবে, তাতে "শিবোহম্" এই ভাবের পরিচয় পাবে।

দুটী ছেলে একজন আচার্য্যের কাছে এসেছিল ধর্ম্ম শিক্ষা করতে। আচার্য্য বললেন, পরীক্ষা না করে তিনি তাদের কিছু শিখাবেন না। এই বলে তিনি তাদের দুটী পায়রা দিয়ে বললেন, "এমন জায়গায় গিয়ে এ পায়রা দুটী মারবে, যেখানে কেউ তোমাদের দেখতে না পায়।" একজন তখনই লোকচলাচলের মাঝ দিয়ে চলল। কত লোক যাচ্ছে আসছে—সে তাদের দিকে পেছন ফিরে, একটা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে পায়রাটার মুণ্ড ছিঁড়ে, আচার্য্যের কাছে এসে বলল—"প্রভু, আপনার আদেশ পালন করেছি।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, "পায়রাটা মারবার সময় কেউ তো তোমায় দেখতে পায়নি?" সে বলল, "না।" "আচ্ছা, বেশ, দেখা যাক্, তোমার সঙ্গীটী কি করেছে।"

অপর ছেলেটী এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে যেই পায়রাটার ঘাড় মোচড়াতে যাবে, অমনি দেখে, ওর টুলটুলে চোখ দুটী যে তারই পানে তাকিয়ে রয়েছে। ওই চোখ দুটীর পানে চেয়ে সে পায়রাটার ঘাড় মোচড়াতে গেল, কিন্তু পারল না—তার মনে ভয় এল। হঠাৎ তার মনে হল, আচার্য্য তো তাকে নেহাৎ সোজা কাজটী দেননি। সাক্ষী যে, দ্রষ্টা যে—সে যে এই পায়রাটীর মাঝেও রয়েছে। "আমি তো একা নই এ জায়গা তো এমন নয় যে কেউ আমায় দেখতে পাবে না!—কোথায় যাই—কি করি?" এই ভাবতে ভাবতে সে আর একটা জঙ্গলে গিয়ে সেখানেও যেই পায়রাটা মারতে যাবে, অমনি তার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ল—পায়রাটা যে দেখছে তাকে!—দ্রষ্টা যে পায়রার মাঝেই!

বার বার সে পায়রাটাকে মারবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আচার্য্য তাকে যে ভাবে মারতে বলেছিলেন, সে ভাবে তো সে পারল না। হতাশ হয়ে সে আচার্য্যের কাছে ধীরে

ধীরে ফিরে এল, পায়রাটা তাঁর পায়ের কাছে রেখে কেঁদে বলল—"প্রভু, আপনি যা আদেশ করেছিলেন, তা আমি করতে পারব না। দয়া করে আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন—এমন করে আর পরীক্ষা করবেন না, আমি পরীক্ষার যোগ্য নই। আমায় কৃপা করুন, কৃপা করে আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন—আমি তাই শুধু চাই।" আচার্য্য তখন ছেলেটীকে কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, "বাছা, আজ যেমন যে পাখীটাকে মারতে গিয়েছিলে, তার চোখেও তুমি দ্রষ্টাকে দেখতে পেলে, তেমনি, যেখানেই যাও না কেন, যদি কখনও কোনও প্রলোভন আসে, কোনও অসৎ কাজ করতে যাও, অমনি ভগবান যে তোমার সামনে, সে কথা স্মরণ রেখো। যদি কোনও নারীর দিকে [illegible] মন যায়, তবে তার দেহে তার চোখে সেই দ্রষ্টাকেই দেখতে শিখো—জেনো, তোমার প্রভু তারই চোখ দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রভু তোমায় সব সময় দেখছেন। এমনি ভাব নিয়ে কাজ কর্বে, যেন তুমি প্রভুর চোখের সামনে রয়েছ, মুখোমুখী হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছ—প্রিয়তমের দৃষ্টি তোমাকে এক পলের জন্যও ছেড়ে যায়নি।"

লোকে বলে, নেপলস্ নগরের যাদুঘরের ছাদে এমন সুন্দর একটী মুখ খোদাই রয়েছে যে, যাদুঘরের যেখানেই তুমি যাও না কেন,—ছাদে যাও, নীচে যাও, কোণে যাও—ওই মূর্ত্তিটীর শুভ্র স্নিগ্ধ দৃষ্টি তোমার উপর পড়বেই। যারা অধ্যাত্ম সাধনার দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে, যদি আত্মবঞ্চনা না করে, তাহলে তারা সর্ব্বদাই ভগবানের চোখে চোখে থাকে। তারা অনুভব করে, যেখানেই তারা থাক না কেন—হোক না গৃহের নির্জ্জনতম কক্ষ বা গুহার নিবিড় গর্ভ, সেখানেও ভগবানের দৃষ্টি হতে তারা দূরে যায়নি—তিনি তাদের দেখছেন, তাঁর আলোতে তারা সঞ্জীবিত, তাঁর করুণায় পরিপুষ্ট।

তারপর অধ্যাত্ম সাধনার প্রাথমিক স্তরে আসা যাক্। "আমি তাঁর—আমি তাঁর—আমি ভগবানের"—এ হচ্ছে প্রথম স্তরের কথা। কিন্তু এই স্তরের সাধনাই সাধারণ মানুষের কাছে কত কঠিন। মানুষ যদি সরল বিশ্বাসী হয়, একাগ্রচিত্ত হয়, ভক্তিমান্ হয়, যা বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী যদি আচরণ করে, ধমনীর রক্তস্রোতে যদি ভাবের প্রবাহ বইতে দেখে, প্রতি শোণিত-বিন্দুতে যদি ভাবের উপলব্ধি কর্তে শেখে, ভাবে যদি তন্ময় হয়ে যেতে পারে, তবে এই প্রাথমিক সাধনাতেও সে সংসারে দেবতা হতে পারে।

ভারতবর্ষের একজন লোকমান্য সাধু যুবা বয়সে এক জায়গায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। লোককে ভিক্ষা দেওয়া, খাবার বেঁটে দেওয়া, টাকাপয়সা দেওয়া—এই সমস্ত দাতব্য কাজের ভার তিনি পেয়েছিলেন। একদিন তাঁর প্রভু তাঁর কাছে কতকগুলি লোক পাঠিয়ে দিয়ে হুকুম করেছেন যে, এদের তের সের ময়দা দেবে। সাধু হুকুমমত ময়দা মেপে দিচ্ছেন।—এক সের দিলেন, দু সের দিলেন—তিন সের—চার সের—পাঁচ সের—ছয় সের—এমনি করে শেষে তেরর ঘরে এলেন। ময়দা মাপছেন, আর জোরে জোরে সের গুণছেন। হিন্দীতে তেরকে ঈষৎ আকারান্ত করে উচ্চারণ করা হয়, শুনতে যেন "তেরা"র মত মনে হয়। এশব্দটী কিন্তু ভারী মজার। এর দুটী অর্থ;—এক অর্থ হচ্ছে এক দশ তিন; আর এক অর্থ হচ্ছে, "আমি

তোমার”—“আমি তোমার”—“আমি ভগবানের—আমি তাঁর অংশ আমি তাঁর।”

সাধু নাম পর্যাপ্ত সুখে তের মন্ত্র বসেছেন। তের সের মেপে দিয়ে যখন তিনি “তের” “তেরা” বলে হিসাব রাখছেন, তখন তাঁর মাঝে যেন কত কি ভাব উথলে উঠল—তাঁর দেহমন সব যেন তিনি ভগবানকে সঁপে দিলেন। বাহ্যজগৎ তাঁর কাছে লোপ হয়ে গেল। তিনি তখন আত্মহারা—না, না, তিনি তখন আত্মস্থ। এমনি পরমানন্দময় অবস্থায় তিনি একমনে কেবল জপছেন—“তেরা—তেরা—তেরা—কে বা—।”—আর সেরের পর সের মন্দা মেপে লোককে দিচ্ছেন। অবশেষে “তেরা—তেরা” বলতে বলতে তাঁর সমাধি হয়ে গেল পরমানন্দে তিনি ডুবে গেলেন।

মানব যা বলে, তাই যদি বিশ্বাস করে, যদি একাগ্র হয়, সরল হয়, ভগবানের চোখে ধূলো দিতে না চায় যদি, মুখে ভগবানকে এক কথা দিয়ে কাজে যদি তা না ভাঙ্গে, তাহলে অধ্যাত্মজীবনের প্রথম স্তর থেকেও তার চরম অবস্থা লাভ হতে পারে। দেবস্থানে গিয়ে লোক বলে, “আমি তোমার।” এ কথা উপলব্ধি কর—এই ভাবে জীবন গড়। এ কথার অনুভূতি হলে তবে না সত্যধর্ম লাভ করবে।

জগতের যত ধর্মসম্প্রদায় আছে, সবাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—“আমি তাঁর”, “আমি তোমার”, “আমি তুমি।” বৈজ্ঞানিক বিচার করলে বলা যেতে পারে, “আমি তাঁর” এ কথার চেয়ে “আমি তোমার” বড়, আর “আমি তুমি” এ কথা সব চেয়ে বড়। এর যে কোনও কথার সঙ্গে ভাবের যোগ হলে সত্যধর্ম হল।

হিন্দু বলেন, প্রথম স্তরের সাধনাতেও যারা ভাবের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তারা এ জন্মে না হয় পরজন্মে তার পরের স্তরে উন্নীত হবে। সেই স্তরে আবার ভাবের প্রতিষ্ঠা হলে চরম স্তরে সে উন্নীত হবে—তখন তার জ্ঞান হবে—“সোঽহম্” —“অহমেবাহম্।” এই স্তরে এলে আর জন্ম হয় না—মানুষ তখন মুক্ত—মুক্ত—মুক্ত! জীব তখন শিব! সে চরমে পৌঁছেছে! ওম্

“আজ আনন্দের পেয়ালা আমার আজ পূর্ণ হয়েছে—সকল কামনা আমার পূরেছে আজ। প্রভাতের সমীরণে বয়ে চলেছি আমি প্রস্ফুট কুসুমে চুম্বনের মাদকতা ঢেলে। রামধনুর রঙে সেজেছি আমি—অগ্নির শিখা, বিদ্যুতের দীপ্তি আমারি আদেশ বহন করছে। আমি বঁধু, আমি প্রিয়া—বাসনা'র রক্তরাগ আমি—আমি হৃদয়ের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস।

“গোলাপের হাসি, শিশিরের মুক্তা, প্রভাতী আলোর মধুর সোনার স্বপন, জোছনার রূপালী মায়া, সরসীর বুকের কাঁপন, [illegible] শাখার নৃত্যদোদুল ভঙ্গী, [illegible] বাঁধন, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন—[illegible] প্রকাশ—জীবন [illegible] [illegible] তো আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস।

“শুভে, অশুভে—তিক্ত, মধুরে—আমারি নাড়ীর স্পন্দন। কোথা আমার বন্ধ, কোথায় আমার গতি। সারা আকাশ পূর্ণ করে রয়েছি আমি! সংশয় নাই, বাসনা নাই—আমিই কাল, আমিই অদৃষ্ট, আমিই শক্তি!—দুঃখের স্থান কোথা! আমাতে—কোথায় সংশয়ের আন্দোলন? আমিই প্রকৃতি—আমিই কারণ।

“সকল দেশ আমার প্রস্থান—সকল দেশ আমার প্রত্যাগমন। সকল রহস্যের আবরণ খসে পড়েছে আমার কাছে। স্বার্থ নাই—বন্ধন নাই—শান্তির সুরে বাঁধা এই বিশ্বের প্রাণের তার। শত্রু আর মিত্রের সমষ্টি আমি—বিশ্ব যে আমারি প্রাণান্ত।”

*স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা ৬ই ডিসেম্বর, ১৯০২)

বক্তা ও শ্রোতা

—*—

"আশ্চর্য্যো বক্তা—কুশলোঽস্য লব্ধা"—সত্য যিনি বলেন, তিনি যেমন আশ্চর্য্য, যিনি তাহাকে গ্রহণ করেন, তিনিও তেমনি কুশলী। এই বলার মাঝে আর গ্রহণ করার মাঝে একটু রহস্য আছে। বলার লোকও যেখানে সেখানে মিলে না, শোনার লোকও না। শোনার জন্যও ভাগ্য চাই, সাধনা চাই। উপনিষদই বলিতেছেন, সেই যে পরম রহস্যের কথা—সে যে শুনিবে, এমন সুযোগ কি সবারই ঘটে, না শুনিলেও সবাই তা বুঝিতে পারে?

তবে একটা কথা ঠিক। একদিন সকলকেই শুনিতে হইবে—শোনা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। হিন্দু এ কথা বুঝিয়াছিল, তাই তার সমস্ত প্রমাণের সার শ্রুতি, তার সকল সাধনের গোড়ায় শ্রবণ—শ্রুতিকে মাথায় লইয়া সে সমাজ গড়িয়াছে, সংসার করিয়াছে। কি জানি কেন, আজকাল যেন আমাদের মাঝে একটা আত্মম্ভরিতা জন্মিয়াছে—যোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক নিজের কাছেও নিজেকে আমরা জাহির করিতে কসুর করি না। সবাই আমরা স্বয়ংসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের ঘটে আর বুদ্ধি কতটুকু? জীবনের মাঝে কতবারই, বা সত্যের সন্ধান করিলাম—আর কি-ই বা পাইলাম?

তৃষ্ণায় যার ছাতি ফাটিয়া যায়, সে জানে, ঘরের কোণে হাত্‌পা হইয়া বসিয়া থাকা চলে না। বলি তো আমারই মাঝে সব, কিন্তু পাই তো না কিছুই। সব বলিতে কতটুকু বুঝি? এ কার "সব"?—সত্যের সব না অন্ধবুদ্ধির সব? কে তার মীমাংসা করিবে? ভাঁটির মুখে যার টান পড়িয়াছে, সে দেখে দুই কূলই তো সব নয়। এতদিন এই কূলের বাঁধনের মাঝেই তার অভিমান ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত—কিন্তু আজ এ কাহার পানে সে চলিয়াছে? কেবলই কূলকে ছাড়াইয়া চলা—দূর হইতে কাণে আসে ওই কিসের গর্জ্জন—তারপর চরম আকর্ষণে সব একাকার: এই তো সব। কূলে বসিয়া কি এর অন্ত পাওয়া যায়?

এমন টানের মাঝে যে পড়িয়াছে, সে জানে স্রোত যে বয়, সে কেবল নিজের বেগেই নয়; তার পরেও কিছু আছে। নিজের জোরে যখন চলি, তখন হাত কাটিয়া চলিতে হয়, উঁচু নীচু বাছিয়া যাইতে হয়। কিন্তু পরের টানে চলিতে হয় দিশাহারা হইয়া।

কিন্তু আমি ছাড়াও যে আর কেউ আছে, এ কথা তো সকলের মাঝে জাগে না। চরম তত্ত্বকে আমরা আপন বুদ্ধির মাপে মাপিয়া তুলি। তাতে সত্যের কিছু হয় না—মরণ হয় আমাদেরই। কেননা এ জগতের তো একটা আইন কানুন আছে। তোমার বুদ্ধির দেমাক বেশী বলিয়াই কি স্বচ্ছন্দে আইন লঙ্ঘন করিয়া যাইবে, অথচ তার শাস্তি পাইবে না?

যে পথেই চল, কেবল আত্মনির্ভর করিয়া কূল পাওয়া যায় না। বলিবে, কেন আমি কম কিসে—আমার মাঝেই তো সব। কিন্তু এ তোমার অন্যায় জেদ। অমন কথা আস্পর্দ্ধা করিয়া বলা চলে না। যে অমন বলে সে ঠকে

নিশ্চয়ই। যদি কেউ বলায়, তবেই ও কথা বলা চলে; যে অভিমানটুকু ভিতরে শক্ত হইয়া রহিয়াছে, অনুরাগের আগুনে সেটুকু যদি গলিয়া যায়, তখন নিজকে পরের, মাঝে বড় বলিয়া বোঝাও যায়, বলাও যায়।

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, "আচ্ছা, কেউ পথ না দেখাইয়া দিলে কি চলে না? প্রথম যাঁহারা সত্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁরা নিজের মাঝেই তো সব পাইয়াছিলেন!" শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে এমন সংস্কার অনেকেরই আছে। কিন্তু কথা হইতেছে, প্রথম অবস্থায় যে ভাবেই চলুক না কেন, তাতে তোমার আমার কি? এখন তো চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি—একজন রাস্তা চিনায়, আর একজন চিনিয়া চলে। শুনিতেছি, চিরদিনই নাকি এমন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। অন্যদেশের কথা জানি না—অন্ততঃ এ দেশের তো দেখি, এই ই সনাতন রীতি। শেষ দেখা দেখিয়া এ দেশের মানুষ ফিরিয়া আসিয়া শেষের কথা শোনাইয়াছে—এমন একজন নয়, দুজন নয়, হাজারে হাজার। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা ছাড়িয়া কি আন্দাজীর কথায় বিশ্বাস করিব?

তারপর প্রথমের কথাই বা কি করিয়া বলি? সেখানে তুমিও ছিলে না আমিও ছিলাম না, কাজেই কি করিয়া বলিব, কোন টাই বা প্রথম, কি-ই বা তার ভাব? পিতা মাতা না হইলে তো মানুষের জন্ম হয় না। তার আদিটা খুঁজিয়া পাইবে কোথায়? অথচ শাস্ত্রে স্বয়ম্ভু বলিয়া একটা কথা আছে - তার সঙ্গে এই আজকার মানুষেরও যে একটা সম্বন্ধ আছে—সে কথাও আছে। সে সম্বন্ধও যেমন সত্য, তেমনি পিতা-মাতা হইতে যে সন্তানের জন্ম, সে কথাও তেমনি সত্য। এ দুয়ের মাঝে যে জায়গায় মিল আছে, সে জায়গার খোঁজ এখানে মিলে না। কিন্তু সে তো ব্যবহার জগতের কথা নয়। ব্যবহারে দেখি, পিতা-মাতা ভিন্ন সন্তান হয় না—এই হইল আইন। অবশ্য লৌকিকের কথাই বলিতেছি।

অধ্যাত্ম-জগতের আইনও বলে, পথ দেখাইবার লোক চাই। সে লোকের অভাবও তো হইতেছে না। যারা খোঁজে, তারা জানে পথ দেখাইয়া দিবার জন্য গাইড তৈরী হইয়া বসিয়া আছে পথের মোড়ে। যে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকেই সে পথ দেখাইয়া দিবে—বিনা বিচারে।

তবুও মানুষ বোঝে না, লোক খোঁজে না—অভিমানে অন্ধ হইয়া থাকে। তাই তো উপনিষদ্ বলিতেছেন—"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ"—যাঁর কথা যে শুনিবে এমন ভাগ্যই অনেকের হয় না; আবার "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ"—শুনিয়াও অনেকে তাঁহাকে বোঝে না।

এ তো ছেলেখেলা নয় বা খামখেয়ালী নয়। এর মাঝেও পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা আছে। কুশলী না হইলে শুনিবার অধিকার কাহারও জন্মে না। দুইটী কৌশল চাই—প্রথম চিত্ত-শুদ্ধি, দ্বিতীয় আত্মসমর্পণ। এর মূলেও যে কৃপা রহিয়াছে, তাহার কথা নাই বা তুলিলাম। অপরের কথা না ভাবিয়া আপন জোরে এ দুইটী পর্য্যন্ত উঠা যাইতে পারে। অবশ্য পরোক্ষভাবে যে গুরুশক্তির ক্রিয়া হইতেছে না, তাহা বলি না। মোট কথা, সাধক শুধু আপনাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া চিত্তের এই দুইটী অনুকূল অবস্থা আনিতে পারে। এ হইল আয়োজনমাত্র। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম খুঁজিয়া দেখিলে বুঝিবে, তাহারা বড় জোর এই দুইটী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অপরোক্ষানুভূতি

এরও পরের কথা। নীতি আর তত্ত্বসাক্ষাৎকার এক কথা নয়। চিত্তশুদ্ধিতে নীতির পরাকাষ্ঠা। তার পরেও কিছু আছে; সেখানে যাইতে হইলেই সঙ্গীর প্রয়োজন।

কিন্তু গোড়া হইতেই যদি সঙ্গী জুটিয়া যায়, তাহা হইলে তো আর কথাই নাই। তখন চাই শুধু আপনাকে সঁপিয়া দেওয়া। সমর্পণে চিত্তশুদ্ধি সহজেই হইবে। চিত্তকে মাজিয়া ঘষিয়া তো শুদ্ধ করিতে হইবে। যার বীর্য্য আছে, সেই তা পারে। কিন্তু কেবল আপনাকে লইয়া সব সময় কচ্‌কচি করা চলে না। একটু বিশ্রাম চাই। সে বিশ্রাম মিলে অনুরাগে। অনুরাগ সবার মাঝেই আছে, কেননা সে তো আত্মারই ধর্ম্ম। যত শুষ্ক বিচারই কর না কেন, অনুরাগের রস গোড়ায় না থাকিলে জোর ধরিবে না কিছুতেই। তাই বিচারের মাঝেও এক একবার অনুরাগ দিয়া বিচারকে রসাইয়া লইতে হয়।

এইখানেই সমর্পণের মাধুর্য্য। এই দেহ মন্দির, মনের মন্দির মাজিয়া-ঘষিয়া সাজাইয়া তুলিতেছি—নিজের সুখের জন্য নয়—আর একজনের কথাই মনে করিয়া। দেবতা আসিবেন, তাই না এই সজ্জা। তিনি আসিবেন মানুষ হইয়া—এইখানে তার আরও মাধুর্য্য। দেবতা শুধু দেবতা থাকিলে, নিজকে টানিয়া তাঁহার ভূমিতে তুলিয়া তবে তাঁর যোগ্য আয়োজন করা চলে। কিন্তু ততক্ষণ মানুষকে সঙ্গ দিবে কে? তাই দেবতা আসেন মানুষ হইয়া—মানুষের আঁখি-জলে আঁখিজল মিশাইয়া। মানুষের কাছে মানুষের সমর্পণ—সর্ব্বাবয়ব, সম্পূর্ণ। বৈরূপ্য কিছুই নাই তার মাঝে।

এই কৌশলটুকু যে জানে, উপনিষদ্‌বিদ্যার সেই শ্রোতা। ব্রহ্মবিদ্যার সে কুশলী শ্রোতা। বক্তা আর শ্রোতার মিলন হইয়াছে; কেমন করিয়া? উপনিষদ্ বলিতেছেন, "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা—আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।" কুশলী শ্রোতা যে পরম রহস্য শোনে, তার বক্তাও যেমন আশ্চর্য্য বলিবার ভঙ্গীও তেমনি আশ্চর্য্য। এ জগতের বলা কওয়ার সঙ্গে তো এ আশ্চর্য্য সংবাদের তুলনা হয় না। সে কেমন?—মনস্বী বলিয়াছেন—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

কি অপরূপ কথা। অশ্বত্থের মূলে গুরু আর শিষ্য সমাসীন। গীতার সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা মনে পড়ে কি? শিষ্যরা বৃদ্ধ, কিন্তু গুরু চিরযৌবন। গুরু ব্যাখ্যা করিতেছেন মৌনী থাকিয়া, আর শিষ্যের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। মরমী ছাড়া এ রহস্য বুঝিবে কে?

এমন আশ্চর্য্য বক্তা—আর তেমনি কুশলী শ্রোতা। শুনিতে শুনিতে শ্রোতা যখন জ্ঞাতা হন, তখন তিনিও আশ্চর্য্য হইয়া যান অনুশাসনের এমন কৌশল।

সত্য প্রকাশ করিবে কে? শুধু কথায় তো প্রকাশ নয়। জীবনে উদ্ভাসিত করিলে যে এ প্রকাশ। মৃত্যুর অধিপতি যম একবার নচিকেতার কাছে এই সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে নচিকেতাকে কত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে—তবে তাহার সত্যের অধিকার মিলিয়াছে। যম বলিয়াছিলেন,

"কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।

স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥

—তুমি কামনার তৃপ্তির দিকে তাকাও নাই, জগতের প্রতিষ্ঠা চাও নাই, অনন্ত যজ্ঞফল কামনা কর নাই, সর্বভয়নিবারক, সর্বজনস্তুত মহৎ ও বিস্তীর্ণ পদের আকাঙ্ক্ষা কর নাই। হে নচিকেতা, ধৃতিযোগে নানা ভাবে দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত প্রতিষ্ঠা তুমি ত্যাগ করিয়াছ।”

ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে না পারিলে সত্যের অধিকার মিলে না—বক্তার কথা কেহ বুঝিতে পারে না।

“অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি”—অপরে যদি না বলিয়া দেয়, তবে এখানে কেহ পথ পায় না। বক্তার অভাব হয় নাই কখনো—অভাব দেখি শ্রোতার। শুনিবার আকুলতা চাই বক্তা আপনি আসিয়া দেখা দিবেন। আপন বুদ্ধিকে যদি বড় করিয়া রাখ, তবে শুনিবার জানিবার সুযোগ ঘটিবে না—এবং শোনাই বাহিরে থাকিয়া হইবে শেষ। শুধু চাবিটা শুনিয়া হাতে পাইলে, কিন্তু কেবল কথায় জানিলেও হইবে না—প্রাণে প্রাণে জানা চাই। কিসে যে জানিয়াছি, তার সাক্ষী চাই। আমাদের বুদ্ধি আর কতটুকু সূক্ষ্ম ধারণা করিতে পারে? বুদ্ধির পাণ্ডিত্য থাকুক না কেন, যদি সিদ্ধ অধ্যাত্মদৃষ্টির আলো তাহার উপর আসিয়া না পড়ে, তবে কিছু তত্ত্ব সংস্ফূর্তি হইবে না। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম রহস্যে প্রবেশ বিজ্ঞান হইবে না।

বুদ্ধির দৃষ্টিতে আর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রভেদ অনেক। বুদ্ধির দেখার একটা সীমা আছে, তাই বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়—মনে হয়, যতটুকু জানিলাম, তারপর আর কি থাকিবে। কিন্তু অন্তর তো এত সহজে তৃপ্ত হয় না। অন্তরের দৃষ্টি খুলিলে মানুষ আর আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারে না—স্রোতে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলে—শেষে অকূল পাথারে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। পরশমণির ছোঁয়াচ না লাগিলে এ দৃষ্টি কেহ পায় না। বুদ্ধিকে শুদ্ধ মার্জিত করিতে পার—তাহাতে তৃপ্তিও যথেষ্ট, কিন্তু শক্তি-বিজ্ঞান ভিন্ন কখনও সত্যলাভ হয় না। এইখানেই শক্তিধর পুরুষের প্রেরণা চাই।

কাঠে তাপ আছে, সূর্যকিরণেও তাপ আছে, আগুনেও আছে। কিন্তু রোদে কাঠ ফেলিয়া রাখিলেই তাহাতে আগুন ধরে না। কাঠকে আগুনে ফেলিতে হয়—তাপ যেখানে সংহত, তাহার সংস্পর্শে আনিতে হয়। সত্যের তাপে শুধু নিজকে তপ্ত করা নয়, যদি সত্যের সাধনায় অগ্নিময় হইতে হয়, তাহা হইলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হইবে, দূরে বসিয়া নিজকে তাপিলে চলিবে না।

ব্রহ্মবিদ্ গুরু আপনার মাঝে হোমানল জ্বালাইয়াছেন, সমিৎপাণি হইয়া তাঁহার কাছে উপনীত হইতে হইবে। বাসনা কামনার সমিদ্ভার তাঁহার হোমানলে আহুতি দিতে হইবে। অহঙ্কারকে নত কর, পাণ্ডিত্য বুদ্ধিকে খর্ব কর। যত জ্ঞান মনে কর, তার কিছুই তুমি জান না। এ জানা বাক্যে প্রকাশ হয় না, কিন্তু মর্মে যাহার স্পর্শে রসের সাগর উথলিয়া উঠে—সেই জানার জন্য অসঙ্কোচে হৃদয়টা মেলিয়া ধর—শক্তি পাইবে—ব্রহ্মজ্যোতিতে হৃদয় পূর্ণ হইবে।

“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া”—সত্যের দিকে যে মতি, তর্ক দিয়া তাহা মিলে না। বুদ্ধির যে যুক্তিজাল আছে, তা দিয়া ব্যবহার-জগতের সকল রহস্যের তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লে-

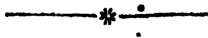
স্পর্শ করিতে পারিবে, কিন্তু পরম রহস্যের সন্ধান তাহাতে পাইবে না। তার জন্য তর্ক-বুদ্ধি দূর করিতে হইবে—কায়-স্থৈর্য্য, বাক্-স্থৈর্য্য, মনঃ স্থৈর্য্য—এ দিয়া নিজকে বাঁধিলে আপনিই মনটী অসীমের রহস্য-সায়রে টুপ করিয়া তলাইয়া যাইবে। তার পর সে অগমপুরীতে গিয়া যাহার দরশ পরশ পাবে, এ জগতের দর্শন স্পর্শনের সঙ্গে যদি তাহা নাই মিলিল, তাহাতেই বা কি? তবে শুদ্ধি চাই, সমর্পণ চাই, অনুরাগ চাই নতুবা স্থৈর্য্য আসিবে না। গুণের বিক্ষোভ তো হইবেই—চিত্ত তো মুকুলি মুকুলি উঠিবেই। সে যে রসের কাঙ্গাল সাচ্চা জহরতের জহুরী সে—মেকী দিয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিবে কি? যতক্ষণ রসের স্পর্শ সে না পাইতেছে ততক্ষণ তার ছটফটী ততক্ষণ সে তোমার শত্রু।

তর্ক কার কেন? অনুরাগ নাই বলিয়া, হৃদয়ের তৃষ্ণার যথার্থ পরিচয়টী জানিতে পার নাই বলিয়া বুদ্ধির বিকার যখন যাহাকে ধরে, তাহাকেই বড় বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপরের বুদ্ধি যদি সেখানে বাদী হইয়া দাঁড়ায়, তবে সে বিরোধ সে মিটাইতে জানে না। এই জন্য শাস্ত্র বলেন, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, শেষ নাই। কিন্তু বুঝার একটী ভঙ্গী আছে। চিত্তের সকল দুয়ার খুলিয়া দাও কোথাও অহংকে পাহারায় বসাইও না। আজ যাহা পাইবে, সংস্কারের পরকলার ভিতর দিয়া তাহাকেই বড় করিয়া দেখিও না। রহস্যের শতদলের একটী পাপড়ি আজ তোমার সামনে মেলিল—আরও কত মেলিবে। এর মাঝে সবাই তোমার আপন। আজ যাহা পাইলে, কাল যদি তার চেয়ে বড় কিছু পাও, তবে পুরাতনের মায়া করিলে চলিবে না। কুঁড়ি হইতে ফুলে, ফুল হইতে ফলে—একই আনন্দের বিলাস। এমনি আনন্দের পরিণতির মাঝ দিয়া দেখিতে শিখাই যথার্থ দৃষ্টির ভঙ্গী।

তবে এমন করিয়া দেখিতে হইলে ভিতরে একটা সুদৃঢ় আশ্রয় চাই উপনিষদের ভাষায়, সংবৃত্তি হওয়া চাই। আসক্তি যদি থাকে, সংবৃত হইতে তো পারিবে না। ইন্দ্রিয় ভোগের প্রতি আসক্তির কথাই বলিতেছি না—মনের অগোচরে আরও কত সূক্ষ্ম আসক্তি রহিয়া গিয়াছে। হয়ত তা শিক্ষার সংস্কার, জন্মান্তরের সংস্কার, আত্মাভিমানের সংস্কার। এগুলি থাকিতে তো হৃদয় উদার হইবে না। "আমার কোনও বাধা নাই—কোন আবরণ নাই—আদি অন্ত সকলই আমার স্বচ্ছ—আলোকের গতি অব্যাহত সেখানে"—এই ভাবনায় নিজকে ভাবিত করিতে হইবে।

এইখানেই তো আপনাকে সঁপিয়া দিতে হয়—শ্রদ্ধায়, অনুরাগে। আপনাকে আঁকড়িয়া রাখিতে চাই না—নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে নিজকে ছাড়িয়া দিতে চাই। অলখের আলো ফুটিয়া উঠিবে, কি রূপে কি রাগে তা তো জানি না। সে যদি বজ্রের মত আসিয়া সকল সাধের সংস্কার আমার গুঁড়াইয়া দিয়া যায়, তাহাতেই বা দুঃখ কিসের? তর্ক করিব না, যুক্তি দেখাইব না—যিনি জানেন, যিনি বলিতে পারেন, কায় মন প্রাণ সমস্ত জাগ্রৎ করিয়া তাঁহারই কথা শুনিব—তাঁহারই বাণীর প্রতীক্ষায় আপনাকে রিক্ত করিয়া রাখিব—এই শুধু আকিঞ্চন। সত্য অপরূপ—তোমার আমার বুদ্ধির ছাঁচে কি তাহার রূপ ধরা পড়ে? সেই বুদ্ধির অনুশাসনকে অহঙ্কারে আঁকড়াইয়া তুলিয়া যে মনে করিব, তাঁহাকে পাইয়াছি—গুরু আমাদের এ মোহ চূর্ণ করিয়া দিন। আমরা যেন শ্রদ্ধায় অনুরাগে এই কথাই বলিতে পারি—"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

আধ্যাত্মিক শিক্ষার পরখ



ভাষার ধোঁয়ায় ভাব অনেক সময় অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর দুটী কারণ আছে। এক হতে পারে, ভাষা দিয়ে যে ভাবকে প্রকাশ করব, তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান গভীর নয়। একটা জিনিষ আভাসে বুঝেছি, অথচ তার রসিক সাধক হতে পারিনি, এমন অবস্থায় ভাবের দৈন্যে ভাষা আবিল হয়ে উঠবে। তা ছাড়া আর একটা কারণ এই হতে পারে, যে-ভাবকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, আদর্শ-হিসাবে বরণীয় হলেও হয়ত তা আমাদের অন্যান্য অবাস্তব স্বার্থ কিম্বা সংস্কারের প্রতিকূল; তাই সত্য কথা বলতে গেলে স্বার্থে আঘাত পড়বে ভেবে আমরা ইচ্ছা করেই সত্য বলতে চাই না। এ অবস্থাতেও ভাবের ঘরে চুরীতে ভাষা আবিল হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সবই নূতন করে গড়ে তুলবার জন্য খুব একটা উত্তেজনা এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি, তারও পুরাদমে আলোচনা চলছে। তার ফলে আবিষ্কার হয়েছে, আমরা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক—সমস্ত জগতের সঙ্গে এইখানেই আমাদের পার্থক্য। অতএব আমরা যাই কিছু করি না কেন, তারই বনিয়াদ আধ্যাত্মিক হওয়া চাই।

এ খুব ভাল কথা নিশ্চয়ই—কারু এতে আপত্তি হতে পারে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা বাস্তবের বেলায় প্রয়োগ করতে গিয়েই আর তাল ঠিক থাকে না। আধ্যাত্মিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক সমাজ, আধ্যাত্মিক সভ্যতা, আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রনীতি—সব শুনতেই ভাল, কিন্তু কথাগুলো বুঝতে গেলেই দেখি একটু গোল ঠেকে। এ বিষয়ে যত আলোচনা হয়, তার মাঝে অধিকাংশই দেখি ভাষার ধোঁয়া। এ কি আমরা বুঝতে পারি না বলেই স্পষ্ট করে কিছু বলি না, না ভাবের ঘরে চুরী আছে বলেই কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে বেরোয় না? উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষার কথায় বলতে পারি, শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করে আমাদের স্থির হয়েছে যে, আমাদের জাতীয় শিক্ষা চাই এবং জাতীয় হতে হলেই সেটা আধ্যাত্মিক হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাটা যে কি হবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে একটা কিছু বলবার সাহস আমাদের হচ্ছে না দেখছি। এর কারণ কি?

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে, কিছুদিন ধরে আমাদের মাঝে একটা নূতন রকম পরিচ্ছেদ-বুদ্ধি দেখা দিয়েছে। আমরা ভাবুক জাতি বলে চিরদিনই একটা অপবাদ বহন করে আসছি বটে, কিন্তু ভাবুকতায় বোধ হয় পাশ্চাত্য জাতি আমাদের উপরেও এক কাঠি। বস্তুজগৎকে আমরা মায়া বলে সংসার-যাত্রাকে অত্যন্ত ঘোলাটে করে তুলেছি—এ অপবাদ না হয় মেনে নিলাম; কিন্তু ভাবজগৎকে ওঁরা যেমন বদ্ধপরিকর হয়ে মায়াময় করে তুলেছেন, তা বাস্তবিকই একটা আতঙ্কের জিনিষ। এঁদেরই উচ্ছিষ্ট মালমশলা নিয়ে দৈবী আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বমানবতা ইত্যাকার ঝুরি ঝুরি শব্দ নির্বিচারে সর্বত্র প্রযুক্ত হয়ে আমাদের ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, তার পরিণাম ভেবে শঙ্কা হয় বই কি। আমা

দের দর্শনশাস্ত্রগুলি নাকি অত্যন্ত জটিল বলে শুনি; কিন্তু তাদের অত্যন্ত এই একটা গুণ পাশ্চাত্য সমালোচকেরাও স্বীকার করেছেন যে, তারা স্পষ্ট কথা বলেছে। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের দর্শন শাস্ত্র নিজের কাছেই দুর্ব্বোধ ঠেকে, কিন্তু এ দেশের দর্শনে স্পষ্টবাদিতার অভাব কখনও হয়নি। স্পষ্ট কথা বলতে এবং স্পষ্ট কাজ করতে পূর্ব্বে এ দেশ কখনো কুণ্ঠা বোধ করেনি। ভাবে ও আচারে এই স্পষ্টবাদিতা ও স্পষ্টকারিতার দরুণ তাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে গালও খেতে হয়েছে কম নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরাও আজ বড় বড় কথার মারপ্যাঁচে ভাবকে অস্পষ্ট করে তুলতে শিখেছি।

এই পাশ্চাত্য ভাবের কুহেলিকা আমাদের আধ্যাত্মিক জগৎকেও ছেয়ে ফেলেছে দেখ্ছি—তাই এতগুলি কথা বলা। জাতীয় ভাবটা কি, তা স্পষ্ট করে না বুঝলেও আধ্যাত্মিক ভাবটাকে স্পষ্ট করে ধরবার লোকের অভাব এখনো আমাদের মাঝে হয় নি—কেননা ওটার মূলে আছে সাধনলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সাধনসম্পন্ন লোক এখনও মিলে, আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেন না। কিন্তু সাধন রাজ্যের সুস্পষ্টতা থেকে আধ্যাত্মিকতা যখন আধুনিক সভাদের মস্তিষ্কোদ্ভূত ভাবরাজ্যে এসে ঢুকল, তখন থেকেই ভাব বহুরূপী খেলা সুরু হল। তাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক সমাজ ইত্যাদি কথাগুলি আমরা শুন্‌ছি বটে, কিন্তু স্পষ্টতঃ তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারছি না।

শিক্ষার কথাই ধরা যাক। শিক্ষা যদি আধ্যাত্মিক হয়, তবে তার রূপটা কি দাঁড়াবে? আধ্যাত্মিক যা, তার সঙ্গে আত্মার যোগ আছে, ভগবানের যোগ আছে—এ কথা খুবই স্পষ্ট। সুতরাং আধ্যাত্মিক শিক্ষায়ও ভগবানের সঙ্গে যোগ থাকবে নিশ্চয়ই। শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা মানে ভগবানের সঙ্গে তার পূর্ণযোগ। এই পর্য্যন্ত মেনে নিয়ে তারপর যদি তাকে জাতীয় বলি, কিম্বা তার উপায়ের আলোচনা করি, তাতে গোল হবার কোনও কথাই নাই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ভগবানকে লাভ করবার জন্য শিক্ষার পত্তন, এ কথাটাই যে আজকাল ভয়ানক। কেননা শিক্ষিতের মাঝে কোনও কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, শুধু ভগবান ভগবান করা একটা বাতিক বিশেষ। এই করে করেই এ দেশটা অধঃপাতে গিয়েছে। সুতরাং ওসব চর্চ্চাকে অবান্তর করে জাতীয়তার পরিপোষক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। শুধু ভগবান ভগবান করাটাই আধ্যাত্মিকতা নয়।

এমন কথা শুনলে বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়। দেখছি, এঁদের মতে ভগবান নিয়ে মাতামাতিটা ভাল নয়, অথচ আধ্যাত্মিক নামটীর মমতা ছাড়লেও চলবে না। এই মনোবৃত্তি থেকে যোগে-ভোগে, সংসারে-বৈরাগ্যে, বন্ধনে-মুক্তিতে খিঁচুড়ী পাকিয়ে আমাদের দেশে সমন্বয়ের একটা ধুম পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এর ফল যে কি হবে, তা ভগবানই জানেন।

এই সমস্ত ভাবের ঘোর না কাটালে আমাদের কল্যাণ নাই। যা সাধনার বিষয়, তা নিয়ে শুধু "Comparative study" করলে চলবে না—নিজের জীবনে পরখ করে তবে সত্য প্রচার করতে হবে। যোগে-ভোগে সমন্বয়টা খুব ভাল আদর্শ, এ কথা বললেই

হবে না, নিজের জীবনে ও দুটোকে একসাথে জুটিয়ে নিয়ে দেখতে হবে কত ধানে কত চাল। সাধনায় যদি সিদ্ধি মিলে, তবেই সে সত্য অপরের জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রয়োগ করবার অধিকার জন্মাবে—নলে শুধু বাগ্‌জালে অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ জন্মানোটা কখনও উচিত নয়।

আধ্যাত্মিকতার প্রত্যক্ষ পরখ চাই। দু'-চারটা থিয়োরীর সংমিশ্রণে ও জিনিষটা উৎপন্ন করবার যো নাই। ভগবানকে লাভ করা যদি সত্য আদর্শ হয়, তবে জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সে লাভের যোগ্য করতে হবে। শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা এই প্রসঙ্গেই ওঠে। ভগবান আমাদের সব—এই কথা যদি এ দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য হয়, তার জাতীয় ভাবের এই যদি বনিয়াদ হয়, তবে এ সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ সকলকেই দিতে হবে—কালাকালের বিচার করা চলবে না, কিম্বা অপর কোনও স্বার্থের খাতিরে এ সত্যকে চেপে রাখলে চলবে না।

এ করতে হলেই সুরু করতে হয় মানুষের জীবনের গোড়া হতে। তারই নাম শিক্ষা। আদর্শকে নিরঙ্কুশ ভাবে পালন করা সবার পক্ষে সহজ হয় না—সমাজের, সঙ্গতির, অবস্থার প্রতিকূলতায় লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করবার জন্যই তো সাধনা। একটা আদর্শ বাস্তবে পরিণত করতে গিয়ে কোন জায়গায় আমরা ঠেকি, কি করেই বা তার প্রতীকার করতে পারি, এ সমস্ত জানতে হলে, জীবন পণ করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় দূরে বসে আন্দাজীতে কেবল থিয়োরী গড়লে চলে না।

যদি আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনকে সার্ব্বভৌম ভিত্তি করতে চাই, তবে এমনি করে সাধনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাতে হবে। আধ্যাত্মিকতা বলতে শুধু ভগবানকেই বুঝতে হবে, সেই বোঝার অনুকূলেই সাধনসম্পদ্ সঞ্চয় করতে হবে—পাঁচমিশালী ভাব সেখানে চলবে না। জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত ওই এক ভাবের পরখ করে দেখতে হবে—সাধনার স্বরূপটা কি, কাল-ভেদ ও নিমিত্ত-ভেদে তার কি কি ভেদ হয়। এমনি করে একটা সমগ্র জীবনের ভগবদনুশীলনের উপরেই শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করবে। এ যদি না করতে পারি, তবে রুচি অনুযায়ী, সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য রকম শিক্ষাপ্রণালীর পত্তন করতে পারি, আপত্তি নাই—কিন্তু তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বদ্‌নামটা জুড়ে দিলে চলবে না।

এমন শিক্ষার আদর্শের বিরুদ্ধে তর্ক আছে অনেক, কিন্তু একে অসম্ভব বলে জানি না। কিম্বা এই শিক্ষা-দীক্ষায় যে মানুষ হয়েছে, সে যে জগতের সকল কাজের বাইরে, এমন কথাও মানি না।

বরং আমাদের দেশে এই আদর্শেরই বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। শিক্ষার অভিমানে দু'চার জন আমরা যতই বিপথে দাঁড়িয়ে চীৎকার করি না কেন, সে দিকে সকলের কান দিলে চলবে না। আমাদের নিয়তি আর এক রকম।

যদি শিক্ষাকে বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে তার উপায় কি? উপায় খুব স্পষ্ট। যাঁরা অধ্যাত্ম-রাজ্যের রাজা, সামাজিক শিক্ষার তরণীতে তাঁদের কর্ণধার করতে হবে। প্রাচীন যুগের স্মৃতি এখনো আমাদের লোপ পায়নি - প্রাচীন গুরুগৃহবাসের পদ্ধতি এখনো আবার ফিরিয়ে

আনা চলে। গুরু আমাদের ছেড়ে যান্‌নি—আমরা তাঁকে চাইনি বলেই অভিমানে তিনি আড়াল হয়ে রয়েছেন। যদি নিজের কল্যাণ কিসে হবে, তা বুঝ্‌তে পারি, সমাজকে যদি তুলতে চাই, সন্তানকে যদি মানুষ কর্‌তে চাই, তবে কায়মনোবাক্যে আবার সেই ব্রহ্মবিদ্‌ গুরুকে আবাহন কর্‌তে হবে। এ দেশের লোক চিরদিন তাঁকে ডেকে এসেছে—আবার ডাকলে তিনি আসবেন, ভুলে থাকবার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু ভিন্ন শিক্ষার আধ্যাত্মিকতা বাজে কথা। ইহলোকের পরলোকের সকল শিক্ষাই তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে জানেন, যদি তাঁকে আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি।

বেদান্ত-সার

—*—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—কর্ম্মবিচার]

উপাসনার প্রয়োজন

নিত্যাদি কর্ম্মের প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট আর একটীর কথা এখনও বলা হয় নাই। সেটী উপাসনা। উপাসনার অধিকার সহজে জন্মায় না। তাহার পূর্ব্বে শাস্ত্রবিহিত নিত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয়পূর্ব্বক চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। তারপর সেই বিশুদ্ধ চিত্তকে শাস্ত্রপ্রকাশিত ধ্যেয় এবং জ্ঞেয় বিষয়ে একাগ্র বা নিশ্চল করিতে হইবে। ইহাই উপাসনার ফলিতার্থ।

চিত্তশুদ্ধি হইলে বিষয়ের সূক্ষ্ম অবধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির যে কত প্রয়োজন, তাহা আমরা আজকাল বুঝি না। সূক্ষ্ম তত্ত্ব—"ন সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ"—ইহাই শ্রুতির অনুশাসন। কেবল মাথা খাটাইয়া তাহা বোঝা যায় না। তাহাতে অক্ষরার্থ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসমঞ্জস তত্ত্বজ্ঞান হইবে না। শুধু বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া আমরা সহস্র মতবাদ সৃষ্টি করিয়া ফেলি—একই বস্তু সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হই, কিন্তু তাহাদের মীমাংসার কোনও পথ দেখি না।

তত্ত্ব বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। যে কোনও বিষয় সম্পর্কে বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যতটুকু জানিতে পারি, তাহাতে সংসারের ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের স্বারসিকতা তাহাতে উদ্বুদ্ধ হয় না। বহিরিন্দ্রিয় এক দিক দিয়া যেমন সামান্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, অপর দিক দিয়া তেমনি প্রাচীরের মত বিশেষজ্ঞানকেও স্থগিত করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সাঙ্কর্য্য তাহার হেতু। এই দোষ চিত্তেও উপসংক্রান্ত হইয়া তাহার প্রসার রুদ্ধ করিয়া রাখে। ফলে মোহগ্রস্ত চিত্ত ইন্দ্রিয়-শাসনের অধীন হইয়া তাহাদের অনুকূল প্রবৃত্তিতেই সমস্ত শক্তি ব্যয়িত করিয়া থাকে। এই জন্ম

অশুদ্ধ ও অসংযত চিত্ত দ্বারা সমস্ত বিষয়েরই স্থূল জ্ঞান মাত্র সম্ভব। বুদ্ধিকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা সহস্রবার শাণিত করিলেও ইন্দ্রিয়রচিত জ্ঞানের এই স্থূল আবরণকে সে ভেদ করিতে পারে না। ফলে মানুষ কেবল তার্কিকই হয়, জ্ঞানী হইতে পারে না।

এই জন্য জ্ঞানের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য তত প্রয়োজন নহে, যত প্রয়োজন তাহার শুদ্ধি। এই শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। চিত্ত শুদ্ধ হইলে শাস্ত্র-প্রকাশিত বিষয়ে তাহাকে একাগ্র করিতে হইবে—তবেই সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ধারণার সামর্থ্য জন্মিবে। এখানে দেখিতেছি, আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মও যেমন শাস্ত্র-বিহিত, অনুধ্যেয় বিষয়ও তেমনি শাস্ত্র প্রকাশিত। উভয়ত্র শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য। শাস্ত্র সত্যসিদ্ধ পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাধনার ইতিহাস, এই কথা স্মরণ করিলে হিন্দুর শাস্ত্রবশ্যতার কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উপাসনার শ্রুতিপ্রামাণ্য

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে যে জ্ঞান হয়, তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ আছে। শ্রুতি বলিতেছেন, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন, দানেন, তপসানাশকেন—এই সেই আত্মাকে ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা, দান দ্বারা, কামভোগ-নিবর্ত্তক তপস্যা দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করিবে।" ("তপসানাশকেন" এই অংশটুকু মূল গ্রন্থে ছিল না—টীকাকার এইটুকু জুড়িয়া দিয়াছেন।)

এখানে একটী বিচার উঠিয়াছে। মূলে আছে, "বিবিদিষন্তি"—জানিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইতেছে—"জানিতে ইচ্ছা করিবে।" অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য হইতে বিধি না পাওয়া গেলেও ব্যাখ্যায় বিধি কল্পনা করা হইতেছে। এরূপ ব্যাখ্যা বিপর্য্যয়ের কারণ কি? সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বিবিদিষা বা জানিবার ইচ্ছার সঙ্গে যে যজ্ঞাদির যোগ, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব জানিতে হইলে যে যজ্ঞাদির প্রয়োজন আছে, এই কথাটী অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে এই কথাটী প্রকৃত শ্রুতিবাক্যে কোথাও পাওয়া যায় নাই। কোনও বিষয়ের পূর্ব্বে প্রসঙ্গ থাকিলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই সেই কথাটী অনুবাদবাক্য হয়। সাধারণতঃ লৌকিক ব্যবহারে আমরা যে সমস্ত বাক্য-দ্বারা কোনও অর্থ মাত্র প্রকাশ করি, তাহা অনুবাদবাক্য অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, ইহা তাহারই উল্লেখ মাত্র।

কিন্তু বেদ আমাদিগকে অলৌকিক বিষয়েরই উপদেশ দিয়া থাকেন। যেমন যজ্ঞের সঙ্গে যে স্বর্গের সম্পর্ক আছে, তাহা লৌকিক কোনও উপায়ে জানা সম্ভবপর নয়। বেদ এই কথাই আমাদের জানাইয়া দিতেছেন। সুতরাং বেদের বাণী মুখ্যতঃ অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে আমরা তাহা কোনও উপায়ে জানিতে পারি নাই। এই অপূর্ব্ব বাক্যের সাহায্যে বেদ আমাদিগকে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন—এই জন্য বেদের অপূর্ব্ব বাক্য মাত্রই বিধি কিম্বা নিষেধে পর্য্যবসিত। এই সমস্ত বিধি নিষেধের ফলাফল লৌকিক উপায়ে আমরা জানিতে পারি না—বেদই কৃপা করিয়া এই অপূর্ব্ব বিষয় জানাইয়া আমাদিগকে সর্ব্বত্র প্রচোদিত করিতেছেন।

বেদ বাক্য অপূর্ব্ব, অতএব তাহা প্রধানতঃ বিধি ও নিষেধে পর্য্যবসিত। কিন্তু অপূর্ব্ব বিষয়ের প্রশংসা বা নিন্দাসূচক কোনও বাক্য

যদি বেদে থাকে, তাহা হইলে তাহার কোনও স্বতঃ প্রামাণ্য থাকে না। পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি নিষেধের তাহা পরিপোষক মাত্র, অতএব উহা বিধি নিষেধেরই অনুবাদ। ইহার পারিভাষিক নাম অর্থবাদ। অর্থবাদের মত কোনও বিধি-নিষেধের পুনরুল্লেখও অনুবাদ মাত্র, কেননা পুনরুল্লেখকে "অপূর্ব্ব" বলা যায় না।

এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, বিবিদিষার সঙ্গে যজ্ঞের সংযোগ এই শ্রুতিপ্রকরণে আমরা পূর্ব্বে আর কোথাও পাই নাই। সুতরাং অপূর্ব্ব বলিয়া, উহা লৌকিক অনুবাদবাক্যের আকারে থাকিলেও বিধি। এই জন্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উহাকে বলিতে হইবে—"জানিতে ইচ্ছা করিবে।"

বেদব্যাখ্যার পদ্ধতি

অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে বেদব্যাখ্যার প্রাচীন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করিতে চাই। আধুনিক যুগে বেদের কথা লইয়া এতটা টানাহেঁচড়া আমাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে। আমরা সব সময়ে উহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বুঝিতে পারি না—কেননা পূর্ব্বাচার্য্যের কি মনোবৃত্তি লইয়া বেদের আলোচনা করিতেন, তাহা আমরা তলাইয়া দেখি না।

বেদ শুধু একটা জাতির সামাজিক ইতিহাস নয়, ইহা তাহার সাধনার ইতিহাস। আর সাধনার কথাও শুধু ফাঁকা বুলি নয়। সাধনা করিয়া ফল পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন, এমন কবিতকর্ম্মা লোকের অভাব এখনও হয় নাই। বেদের সঙ্গে যে সাধনার যোগ আছে, এই কথাটা আমরা মানি না বা বুঝি না, কেননা সাধন করিয়া একটা বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার বুদ্ধি আমাদের দিন দিন লোপ পাইতেছে। তাই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মাঝে আমরা দেখি শুধু প্রাচীন আচারানুষ্ঠানের মিথ্যা আড়ম্বর—আর জ্ঞানকাণ্ডের মাঝে দেখি নানা অপূর্ণ দার্শনিক মতবাদের বিতণ্ডা! বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার এখন নাই। কিন্তু এখনও এ দেশে তন্ত্রের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। তান্ত্রিক সাধনা নিয়া যাহারা নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সাধনায় এমন সমস্ত সূক্ষ্ম শক্তির পরিচয় মিলে, যাহার মর্ম্ম পঞ্চেন্দ্রিয়-সম্বল আধুনিক জড়বিজ্ঞান কিছুতেই ভেদ করিতে পারিবে না। এই রহস্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

কর্ম্মকাণ্ডের কথা না হয় থাক্, জ্ঞানকাণ্ডেরই বা কয়টা তত্ত্বের সাধনা আমরা করি? যাঁহারা বেদকে বিশ্লেষণ করিয়া অসভ্য জাতির মনস্তত্ত্বের স্তরভেদ আবিষ্কার করেন, তাঁহারা বেদব্যাখ্যার অন্তঃপ্রাণ নৈষ্ঠা - নৈতিক উৎকর্ষসাধনের ফল—তাহাতেও কি পা দিয়াছেন? সাধনা করিয়া নিজে সাক্ষাৎ অনুভূতির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে তখন বোঝা যায়, বেদের সত্য কেবল ঐতিহাসিকের কালের মাপকাঠিতে মাপা যায় না। অমুকটা অর্ব্বাচীন, অমুকটা প্রাচীন, এইখানে গ্রীসের প্রভাব, ওইখানে মিশরের প্রভাব—এ সমস্ত কথা সত্যানুভূতির নিকট প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা বিচার করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা একটু সাধনসম্পন্ন হইতে অনুরোধ করি—শুধু শব্দের ব্যুৎপত্তি, আর কোন শব্দটা কোথায় কতবার বসিয়াছে, তাহার তালিকা লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন না।

সাধনায় যাঁহারা একটু লব্ধ প্রবেশ হইয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় অবহিত না হইয়া পারেন না। শাস্ত্র অজ্ঞাত জ্ঞাপক। তাহার জ্ঞাপন করিবার ধারাটী ধরিয়া, অজ্ঞাতকে যিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই দেখেন, বিদ্রূপ করিয়া শাস্ত্রকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আবর্জ্জনা ভাবিয়া যাহাকে ফেলিয়া দিব, আমার অন্ধতায় কোন্ মাণিক তাহাতে আমার হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে, তাহা তো জানি না।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা বেদকে সাধনশাস্ত্র রূপেই দেখিতেন। তাঁহারা নিজে সাধক, তাই অনুভূতিলব্ধ সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া সাধনশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহাদের বিচার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল।

বেদকে তাঁহারা বলিতেন অলৌকিক জ্ঞানের উপায়। কথাটা আমরা তত খেয়ালে আনি না—কেননা অলৌকিক বলিতে যে কি বুঝিতে হইবে, তাহার ধারণা আমাদের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়। লৌকিকটা আমরা বেশ বুঝি, তাহার জন্য হাজার গণ্ডা বিজ্ঞানেরও সৃষ্টি করিয়াছি—কিন্তু অলৌকিককে একবারও বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। তাহার ধারা স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ স্বতন্ত্র—আমরা তাহার সন্ধান করি না।

আমাদের প্রমাণ লৌকিক বিষয়ই জানাইয়া দেয়—এ জানিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। যদি বেদের মাঝে এমন একটা কথা পাইলাম, যাহা সমস্ত লৌকিক সংস্কারের বিরোধী, গাঁজাখুরী বলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দেওয়াটাই কি বৈজ্ঞানিক হইবে? বেদ একটা তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন; তাহার সত্য মিথ্যার যাচাই তো আমরাও করিতে পারি। বেদেই তাহার পথ রহিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া কেহ যদি বেদের রহস্যের মাঝে প্রবেশ করিয়া সত্য বস্তুটী দেখিয়া আসেন, তবে তিনিও ফিরিয়া আসিয়া ওই কথাই বলিবেন। তুমি আমি যদি তাহাকে প্রমাণ বলিয়া না মানি, তবে নিজে গিয়া দেখিয়া আসা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নাই। যাওয়ার পথও খোলা—রাস্তার বিবরণও দেওয়া রহিয়াছে।

এমনি করিয়া বার বার যাতায়াতে যে রাস্তাটা পড়িয়া যায়, তাহাতেই সম্প্রদায় পরম্পরার সৃষ্টি হয়। ইহার আদি খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই আমরা বলি বেদ অনাদি। লৌকিক প্রমাণের সঙ্গে মিলে না বলিয়াই বলি, বেদ স্বতঃপ্রমাণ। বেদের সমস্তগুলি পথের পরীক্ষা হইয়াছে কিনা, তাহা আজ আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তার কতগুলি পথে তো এখনও সাধকদের চলাচল হইতেছে। ইহাদের মাঝে কেহ এ পর্য্যন্ত ঠকে নাই। অথচ তাহা প্রমাণ করিবারও অন্য কোনও উপায় নাই। এ অবস্থায় কোনও শ্রদ্ধাযুক্ত প্রবর্ত্ত সাধক যদি আপ্তবচনকে প্রমাণ মানিয়া লয়, তবে তাহা কি অপরাধ হইবে?

অলৌকিকের পথে বার বার চলাফেরা করিয়া, নিজে সাধিয়া বুঝিয়া ক্রমে এ জাতির মনে বেদ সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার সংস্কার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে—শিশু যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভরে মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে আপনাকে সঁপিয়া দেয়, তেমনি করিয়া এ জাতি বেদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাই বেদের মাঝে সে দেখিয়াছে, অলৌকিকের আভাস, অসীম রহস্যের ইঙ্গিত। এইজন্যই বেদবাণী তাহার পক্ষে শুধু শোনা কথা নয়—অসীমের পার হইতে সত্যের

অন্যথা নির্দ্দেশ। বেদ বলিলেন—এই করিলে এই হয়। শ্রদ্ধাবনত হিন্দু বুঝিল, এ তো শুধু সত্য খ্যাপন নয়—সত্যের পথে চলিবার জন্য এ আমার প্রতি আদেশ। এই জন্যই হিন্দু কেবল বিধি নিষেধরূপেই কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছে—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের সত্য উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে। বেদের বাণী তাহার কাছে শাসন বাণী, শ্রদ্ধা ভিন্ন তাহার মর্ম্ম বোঝা যায় না।

যজ্ঞ ও বিবিদিষা

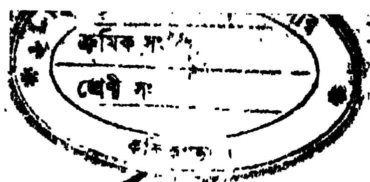
এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরিয়া আসা যাক। উপরি উক্ত শ্রুতি বচন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিবিদিষার সঙ্গে যজ্ঞাদির সংযোগ ঘটিয়াছে। এইখানে একটী সন্দেহ উপস্থিত হয়। শ্রুতিতে এ কথাও আছে, "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত।" ইহাতে দেখিতে পাইতেছি, যজ্ঞাদি যাবজ্জীবন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার নিত্যবিধান হইয়াছে। এখন আবার বিবিদিষার জন্য যদি যজ্ঞাদির বিধান পাই, তবে একই যজ্ঞের যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য বলিয়া নিত্য সংযোগ ও বিবিদিষার্থে কর্ত্তব্য বলিয়া অনিত্য সংযোগ ঘটিতেছে না কি ? এ অবস্থায় শ্রুতির অর্থ আমরা কিরূপে অবধারণ করিব ? তাহা হইলে কি যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহারা দুই বার করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন ? (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব এখনও পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা—"৩নং গোপ কুটীর, পুরী।"

গ্রন্থ পরিচয়—পরকাল-তত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত ও কাশীধাম ব্রাহ্মণ রক্ষা সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০। এই গ্রন্থে কালের দার্শনিক তত্ত্ব, আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে নানা ধর্ম্মের অভিমত ও দার্শনিক যুক্তি অতি নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। রাজা বাহাদুর বহু শাস্ত্র হইতে যথাযোগ্য প্রমাণাদি আহরণ করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য বিষয় সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। পুস্তকখানি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ ; অল্পের মাঝে অথচ সুশৃঙ্খলায় এত তত্ত্বের সমাবেশ মনীষা ও ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক।

সত্যযুগ—শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস বি. এ., ই. এ. সি. প্রণীত ও গোলাঘাট (আসাম) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—॥০ এই গ্রন্থে সত্যযুগের স্বরূপ ও আদর্শ আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকটী সুচিন্তিত ও সুলিখিত। বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিকাশবাদ জড়-পরিণামের একটী বিশিষ্ট ক্ষণ হইতে মাত্র আংশিকভাবে জগৎরহস্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে—পূর্ব্বাপর বিবর্ত্তনের কোনও ইতিহাস ইহাতে নাই। অথচ এই সঙ্কীর্ণ মতবাদ দ্বারা শাসিত আধুনিক সভ্যতা মানুষকে দিন দিন বহির্ম্মুখ করিয়া তুলিতেছে। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রতিবাদকল্পে গ্রন্থকার যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি। পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ; আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না। কিন্তু ধীর ভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্তে গ্রন্থকারের বক্তব্য বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, তাঁহারা অনেক ভাবিবার কথা ইহাতে পাইবেন আশা করা যায়।



ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা

অমর্ত্ত্যোঃ মর্ত্ত্যঃ

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২২।৮]

অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবম্
এজদ্ ধ্রুবং মধ্য আপস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভি-
রমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ॥

পৃচ্ছামি ত্বাং পরমন্তং পৃথিব্যাঃ
পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ
পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম॥

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ
অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো
ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম॥

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতঃ
অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষুচীনা বিয়ন্তা
ন্যন্যং চিক্যুর্ন নিচিক্যুরন্যম্॥

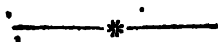
শ্বসি' ফিরে মত্ততায় নিত্যকাজে স্পন্দিত এ প্রাণ,
ধ্রুবরূপে হেরি তবু গৃহমাঝে রয়েছে শয়ান;—
মরণের পারে জীব ফিরে স্বধা করি আহরণ,
এক্-ই ডোরে মরতের সাথে বাঁধা আছে অমরণ।

শুধাই তোমারে বল, কোথা শেষ সীমা এ ধরার—
শুধাই তোমারে বল, এই বিশ্ব—কোথা নাভি তার?
বর্ষক্ষম অশ্ববীর্য্য, বল মোরে খ্যাত কোন নামে,
কারে ধরি রহে বাক্, বল মোরে পর ব্যোমধামে?

যজ্ঞভূমে এই বেদি—তারে জানি পৃথিবীর সীমা—
আরো জানি, ভুবনেরে বেড়িয়াছে যজ্ঞের মহিমা।
বর্ষক্ষম অশ্ববীর্য্য—সে তো জানি এই পূত সোম—
এই ব্রহ্মা—বাক্‌রূপে রয়েছেন আপূরিয়া ব্যোম।

স্বধার বাঁধনে বাঁধা ঊর্দ্ধে-অধে করে বিচরণ—
এক্-ই ডোরে মরতের সাথে বাঁধা আছে অমরণ।
এক সাথে থাকে তারা—এক সাথে চলে-ফিরে-যায়—
একটীরে চিনে সবে—অপরেরে কে জানে হেথায়?

মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব



এই বক্তৃতা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে তোমরা সমস্ত চিত্তকে একাগ্র করে অনুধ্যান কর - মানবজাতি সংহত, সব মানুষই এক, মানুষ মানুষের ভাই। এই ভাবটী খুব গভীরভাবে উপলব্ধি কর খুব গভীরভাবে।—ওঁ।

আজকার কথা যদি কেবল বাদানুবাদই হত, তাহলে তা শোনবার জন্য ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করা তোমাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত হত না। কিন্তু চাই কাজের কথা—যাতে তোমরা বাস্তবিক অধ্যাত্মসুখের অধিকারী হতে পার। আহা যখন অনুভব করি, এ জগতে সবাই আমারি আত্মস্বরূপ—তখন কি আনন্দ আমাদের! ওই যে গানের সুরটী শুনলাম—ও তো আমারই সুর। যখন ভাবি, এ জগতে যারা মহাসমৃদ্ধ, ধনে মানে যারা বরেণ্য তারা আমিই—তারা আমিই—তখন যে কি আনন্দ। সে আনন্দ কি ভাষায় ফোটে? একবার এই ভাবটী অনুভব করতে চেষ্টা করলেই স্বভাবতঃ তোমার বাস্তবজীবনে তার মাধুর্য্য ফুটে উঠবে। যেমন নাকি অনুভব করছ, এই শরীরটা তোমার, তেমনি অনুভব কর যে—সকল দেহই তোমার দেহ। যখন এ অনুভূতি তোমাতে জাগবে, তখন দেখতে পাবে, যে দেহটাকে তোমার বলছ, সে যেমন তোমার শাসন মেনে চলে,—যেমন তোমার ইচ্ছামত পা কে চলতে বললে চলে, হাতকে নড়তে হুকুম দিলে নড়ে; যেমন নাকি তোমার নিজের দেহে এ সব দেখতে পাও—তেমনি জগতের সকল দেহকেই দেখবে তোমার ইসারাতেই তারা চলছে, নড়ছে। এ কথা একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, এর সাক্ষাৎ অনুভূতি মিলে—এ কথার পরখ হয়ে গিয়েছে। ঐকের সত্যে চিত্তকে সমাহিত কর—সমস্ত শক্তি এক ভাবে নিয়োজিত কর—তা হলে এ ব্যাপার দেখতে পাবে। এ শুধু তর্কের কথা নয়: তোমার এই দেহকে দেহ বলে মানাটা যেমন সত্য—এ ও তেমনি সত্য। এ হাতে-কলমের ব্যাপার—একে বিশ্বাস কর—নিজে পরখ করে তার সত্যাসত্য নিরূপণ কর।

যদিও একথা নিছক সত্য, তবুও তর্কের খাতিরে মানলাম, এ আমাদের অসাধ্য। কিন্তু মানবের একত্বানুভূতির ফলে তুমি সত্য সত্য একটা আনন্দের নিশানা পাবেই। কেমন করে শোন। মানুষ ধনদৌলতের জন্য এত দুঃখ পায় কেন—এত ব্যাকুল হয় কেন? তারা ক্ষেত-খামারকে আমার বলে জড়িয়ে ধরতে চায়—তারা বাগানবাড়ী করতে চায়। আহা বেচারীদের কি দুঃখ। আচ্ছা, এখানে বড়লোকদের যে সমস্ত বাগানবাড়ী রয়েছে—কি সর্ব্বসাধারণের জন্য যে সমস্ত বাগান রয়েছে, সেগুলিতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমরা কাটিয়ে দিয়ে আসতে পার না কি? ওই সব বাগানের মালিকেরা যেমন করে বাগানটা ভোগ করত, তোমরাও কি ঠিক তেমনি ভাবে ভোগ করতে পার না? যার বাগান, সে কি বাগানের ফলফুলগুলি চার চোখ দিয়ে দেখবে? যে এই বাগানে ফল ফুল-পাতার বাহার—তোমারও যেমন দু'চোখ দিয়ে এগুলির ভোগ হবে, তারও তাই হবে না কি?

বাগানে যে পাখীর গান, তাও সে তোমার প্রত্যেক দুটো কাণ দিয়েই তো শুনবে! তবে আর ও বাগানবাড়ীটা পাবার জন্য বোকার মত তোমার অমন ছটফট কেন? তাই রাম তোমাদের বলছেন, জগতের সকল বাগান বাড়ীই আপন বলে মনে কর না কেন - সকল দেহই তোমার দেহ বলে ভাব না কেন? প্রতিভার খেলা, বুদ্ধির খেলা যত জগতে - সবই তোমার বলে জান।

এ ভাবকে অস্বাভাবিক বা স্বকপোল কল্পিত বলে মনে করো না। উচ্চ আদর্শে পৌঁছাতে হলে তোমাকে নানা গুণ অর্জন করতে হয় না কি? ওসব তোমার পক্ষে দরকারী বলে জানি—কিন্তু সকল সত্যের সার সত্য যা —তার উপলব্ধি তোমার চিত্তকে একাগ্র করা, তোমার শক্তি সংহত করা—এই হচ্ছে সব চেয়ে দরকারী। এই সত্য লাভ করতে হবে যে, সবাই এক—সব দেহই তোমার দেহ। এই সত্যে তোমার চিত্তকে একাগ্র কর - তোমার শক্তিকে সংহত কর—কেবল ভাবনা কর—ভাব -ভাব—ভাব যে সবই তোমারি দেহ। রাস্তা দিয়ে একজন গুণী মানী লোক যাচ্ছে—হোক সে রুশীয়ার জার বা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি - তাকে দেখে তোমার মনে ঈর্ষা না জাগে, ভয় যেন না হয়। ওই যে বাজো খাঁ'র গলাভরা ঠাউনি—তাকে তোমার জন্যেই ভোগ কর - ভাব, "আমি সে আর কিছু নয়।" এমনি ভাবে যদি ভাবতে পার, তা হলে তোমার আপন পরগন্ড তোমার বলে জেনে যে, সবাই এক—এই সত্য; সবাই তোমার চক্ষু, কর্ণ, পদ, তোমার দেহ। নিখিল মানবের ভ্রাতৃভাব!—যুক্তিতে তা ধরা পড়ুক আর না পড়ুক, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করুক আর না করুক, দর্শন চাহে সায় দিক্ আর না দিক্—কিন্তু তবুও জানবে, এ সত্য পরখ্‌করা নিছক্ সত্য।

ওঁ—মানবজাতির ভ্রাতৃত্বরূপ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রাম এখন কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে চেষ্টা করবে—রাম বলে যাবেন, আর তোমরা মনপ্রাণ দিয়ে সেগুলি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে।

খবরের কাগজে এই বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়াতে গিয়ে যাঁরা এর নাম দিলেন "মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব।" কিন্তু পরে রামের লজ্জা হল, এ নাম তো ঠিক খাটে না। "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব" এ নামও খাটে না—এতেও ঠিক অর্থটা প্রকাশ হয় না। ভাই বললেও একটা পার্থক্য বোঝায়। ভাইয়ে ভাইয়েও তো দেখি লড়াই করে মরে—কিন্তু আমরা যে ভাবের কথা বলছি, সেখানে তো বিরোধের লেশমাত্রও নাই। কাজেই এ ভাব ভ্রাতৃত্বের চেয়েও বড়। "মানবজাতির একত্ব ও সংহতি"—এই নাম দিলেও কতকটা খাটে। তোমরা হয়ত বলে বসবে, "তোমার আত্মা-টাত্মা নিয়ে খেলা বকো না তুমি। সব সময়ই তুমি কেবল আত্মার কথাই বল ওসব কথা আমরা ধরতে পারি না।" সে তো বেশ কথা। আত্মার কথাই যদি তোমরা শুনতে চাইতে, তাহলে তো বলবার কিছুই ছিল না—কেননা সেখানে কে কি বলবে? সবারি যে শেষ সেখানে। অন্ততঃ সেখানে আমরা সবাই এক। সেখানে মানুষের কথা যায় না— ভাষায় তো সে অবস্থার বর্ণনা হয় না।

আত্মা তো ভাষার অতীত। তাঁর কথা তোমরা নাই বা শুনলে। রাম একেবারে গোড়া থেকে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

ধর না স্থূল দেহ হতেই আলোচনা সুরু হোক। দেহ তো খুবই স্থূল বিষয়। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যদি আমরা কোনও প্রশ্ন না তুলি বা আত্মার কথা, সত্যস্বরূপের কথা যদি আলোচনা না-ও করি, তা'ও তোমাদের এই জড় দেহই প্রমাণ করবে যে তোমরা সবাই এক। মন প্রমাণ করছে যে তোমরা এক। অনুভূতির বাজ্যেও বিজ্ঞান প্রমাণ করবে যে তোমরা এক। স্থূল জগতে, মনোজগতে, সূক্ষ্ম জগতে, সর্ব্বত্রই তোমরা এক। এ যদি অনুভব না কর, বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন আবর্ত্তনে ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনটুকু যদি স্বীকার না কর, তাহলে সব চেয়ে বড় সত্যের অবমাননা করবে তোমরা। জান তো, রাজার আইন যে লঙ্ঘন করতে যায়, সে এড়িয়ে যেতে পারে না—তাকে দণ্ড নিতেই হয়। তেমনি এই ভ্রাতৃত্বকে যারা অনুভব করে না, প্রাত্যহিক জীবনে একে যারা স্বীকার করে না, তাদেরও দণ্ড আছে। মানবের ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব বলি কেন—মানবের একত্বরূপ যে এই মহাসত্য, মহাবিধান—এই যে সকল আইনের চেয়ে বড় আইন—একে লঙ্ঘন করার ফলেই না জগতে যত দুঃখ, যত গ্লানি, যত দীর্ঘশ্বাস!

আমাদের সকলের এই স্থূল দেহটাও এক। কিন্তু ভাই, এ কি করে হবে? একটা দেহ এখানে, আর একটা ওখানে—কি করে তারা এক হবে? সমুদ্রে আমরা দেখি, এখানে একটা ঢেউ, ওখানে একটা ঢেউ। তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করে রয়েছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন আকার। কিন্তু বাস্তবিক তারা সবাই এক, কেননা একই জল হতে তাদের উৎপত্তি—একই সমুদ্রে এই বিভিন্ন তরঙ্গ। যে জলে এই ঢেউটা গড়েছে, সেই জলেই আর একটু পরে ওই ঢেউটা গড়বে। যেমন নাকি ঢেউ এর বেলায়, তেমনি তোমাদের এই স্থূল দেহের বেলাতেও। যে জড় উপাদানে এই দেহটা তৈরী, সেই উপাদানই একটু পরে আর একটা দেহ তৈরী করবে। যে দেহটাকে তোমরা বলছ রামের দেহ তার উপাদানে যে সব ভৌতিক পরমাণু রয়েছে, রামের জীবদ্দশাতেই দেখছি, তারা অন্য দেহ তৈরী করছে। শ্বাস প্রশ্বাস থেকে এ কথাটা ধরা পড়ে। তুমি অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ কর, আবার তাকে কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাসে রূপান্তরিত করে ত্যাগ কর। গাছ পালা আবার সেই কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাস নিয়ে অক্সিজেন ত্যাগ করছে। সেই অক্সিজেন আবার তুমি নাও ছাড় কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাস—আবার গাছ-পালা তাই গ্রহণ করে। এ থেকে দেখছি গাছ-পালার সঙ্গে তুমি ভ্রাতৃত্বের ডোরে বাঁধা। তোমার প্রশ্বাস তাদের মাঝে যাচ্ছে, আবার তাদের প্রশ্বাস তোমার মাঝে আসছে, তুমি তাদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার করছ, আবার তারাও তোমার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করছে। কাজেই, গাছ-পালার সঙ্গেও তুমি এক

আর একদিক থেকে এটা আমরা দেখতে পারি। যে অক্সিজেনকে প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে কার্ব্বনডায়ক্সাইডে তুমি রূপান্তরিত করলে, সেটা এসেছিল গাছ পালার কাছ থেকে। আবার এই অক্সিজেন তোমার ভাইয়ের ফুসফুসে গিয়ে ঢুকল—যা তোমার দেহে ছিল, তা আবার তার দেহে গেল। তোমরা সবাই একই বায়ু হতে শ্বাস নিচ্ছ। একবার অনুভব কর তো—তোমরা একই বায়ুর শ্বাস নিচ্ছ—অন্ততঃ শ্বাসের দিক দিয়ে

দেখতে গেলে তোমাদের সবারি এক দেহ। যেমন নাকি তোমরা একই পৃথিবীতে, একই চন্দ্র সূর্য্যের নীচে রয়েছ, তেমনি একই বায়ুমণ্ডল তোমাদের সকলকে ঘিরে রয়েছে।

তোমরা ফলমূল, তরীতরকারী, মাছমাংস কত কিছুই খাও। তাই খেয়ে তোমাদের শরীরের পুষ্টি হয়—আবার তার অসার অংশ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। যা বেরিয়ে গেল, তা আবার উদ্ভিদরূপে রূপান্তরিত হবে—আবার তা ফলমূলের রূপ ধরবে। যে উপাদান তোমার শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছিল, তাই যখন আবার ফলমূলের আকারে দেখা দিল, তোমার ভাইয়েরা তখন তা গ্রহণ করল—অপরের শরীরে তা প্রবেশ করল। এমনি করে দেখতে পাচ্ছি, যে উপাদান তোমার দেহগত ছিল, তাই আবার অপরের দেহগত হল।

যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমাদের গায়ের চামড়া পরীক্ষা করি, তবে দেখি, কত ছোট ছোট জান্তব পদার্থ আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে। কেবল যে আসছে, তা নয়, অমন কত জীবাণু আবার শরীরে প্রবেশও করছে। এমনি করে প্রতি দেহে জীবাণু আসছে যাচ্ছে। জগতে এমন বিনিময় অহরহই চলছে। তোমার শরীর থেকে যে জীবাণু বেরিয়ে এল, তারা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ল; যা নাকি তোমার ছিল, চোখের পলকে তা অপরের হল।

বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে তোমাদের স্থূল দেহ সব এক। কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না হয়ত। আমার শরীর থেকে আণুবীক্ষণিক বীজাণু সব বেরিয়ে আমার বন্ধুর শরীরে ঢুকছে, আবার আমার বন্ধুর শরীর থেকে বেরিয়ে আমার শরীরে আসছে—এ কথা কি করে সম্ভব হয়? এ কি হয় কখনো? আচ্ছা, দেখা যাক। বল দেখি গন্ধ কি করে হয়? জান তো, কোনও বস্তু থেকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু বেরিয়ে এলে তাই থেকে আমরা গন্ধ পাই। ফুলের গন্ধ আছে, কেননা তা থেকে ওই রকম অণু সব বেরিয়ে আসে। এ সত্য বিজ্ঞানই প্রমাণ করেছে। আমরা এখানে সকলেই দেহ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই দেহের কি গন্ধ নাই? গন্ধ আছে, কিন্তু সে গন্ধ ধারণ করবার মত ঘ্রাণশক্তি আমাদের তীক্ষ্ণ নয়—কিম্বা সে শক্তি এ গন্ধকে গ্রহণ করবার অনুকূল নয়। কিন্তু তোমাদের দেহের যে গন্ধ আছে, এ কথা নিশ্চয়। কখনও তোমরা নিজেও গন্ধ পাও, কুকুরে তোমাদের গন্ধ পায়। তোমাদের দেহে যদি গন্ধ নাই থাকবে, তবে কুকুর তা শুঁকে ধরতে পারে কি করে? কাজেই তোমাদের শরীর থেকে যে গন্ধ বেরুচ্ছে, তা থেকে এই প্রমাণ হচ্ছে যে তোমার শরীর থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজাণু সর্ব্বদাই বেরিয়ে আসছে। এই সব অণুই তোমার শরীর থেকে বেরিয়ে অপরের শরীরে ঢুকছে। কাজেই এইখানে তো তোমরা সবাই এক।

তাই বলি, আমাদের সকলেরই এক দেহ। এই গন্ধের অনুভূতি পেলে, ঘ্রাণতত্ত্ব জানলে বুঝতে পারবে, এই দিক দিয়ে আমাদের জড় দেহ এক। একজনের অসুখ হয়েছে; তুমি তার ঘরে গেলে; দেখবে ঘরটা শুদ্ধই তার অসুখের গন্ধ। কলেরা, বসন্ত, কি প্লেগ—এই রকম একটা সংক্রামক পীড়াতে কেউ আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এই পীড়া আবার অপরে সংক্রামিত হয় কি করে? তার এক-

মাত্র কারণই হচ্ছে, রোগীর দেহ থেকে যে সমস্ত বীজাণু বেরিয়ে এসেছে, তারা অপরের শরীরেও ঢুকছে। এ হতে কি প্রমাণ হয় না যে, রোগীর দেহগত উপাদান আমাদেরও দেহগত হতে পারে? এমন করেই তো আমরা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হই। একজনের সর্দ্দি হয়েছে। তার সঙ্গে যে থাকবে, তার যদি খুব নরম ধাত হয়, তবে তারও সর্দ্দি হবে। একজনের ক্ষয়কাস হয়েছে—তা থেকে অপরেরও হল। যদি অপরের দেহ হতে অনুপরমাণু বেরিয়ে এসে আমাদের দেহেরই উপাদান রচনা না করবে, তবে এ সকল কি করে সম্ভব হতে পারে? এই থেকেই প্রমাণ হয় যে, দেহে তোমরা সবাই এক। আত্মায় যে তোমরা এক, সে কথা না হয় এখন থাক্ দেহেও তোমরা সব এক।

এই কথা থেকে রাম আশ্চর্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কারু যদি অসুখ হয়, তাহলে তার অসুখের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? এর মাঝে তার দায়িত্ব কতটুকু? যার অসুখ হয়েছে, সে যে কত কষ্ট পাচ্ছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে কেন? না সে জানে না বলে; সে যে আমাদেরও অসুখের কারণ, তা সে জানে না। সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে বটে, কিন্তু সমস্ত জগতের অসুখের জন্যও তো সে-ই দায়ী। সে নিজে অসুখ হয়ে তারই রুগ্ন দেহ হতে অজ্ঞাতসারে রোগের বীজাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু আমি কষ্ট পাব বলেই যে আমার রোগী হবার অধিকার নাই, তা নয়। আমার শরীরের রোগের জন্য জগতের কাছে আমি দায়ী। তোমার অসুখের জন্য সমস্ত জগতের কাছে তুমি অপরাধী, তোমার রুগ্নশরীর যে সমস্ত জগৎকেই রোগের আগার করে তুলছে—রোগের বীজাণু যে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই রোগী হবারও অধিকার নাই তোমার। সকলকেই এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে। রোগ যে কেবল শরীরের অস্বাস্থ্য তা নয়, এ নৈতিক অস্বাস্থ্যও বটে। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখবার জন্য তোমাকে হুঁসিয়ার হতে হবে। যখন খাও দাও, তখন খুব সাবধানে থেকো - তোমার নিজের শারীরিক স্বচ্ছন্দতার জন্য নয় সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্যই। বেশী খেয়ো না—খুব হুঁসিয়ার থেকো।

আচ্ছা, যারা সুস্থ, রোগীর প্রতি তাদের কর্ত্তব্য কি? সুস্থেরা রোগীদের পরিচর্য্যা করে থাকে। ওতে শুধু রোগীর প্রতি দরদ দেখানো হল না বা তার উপকার করা হল না—সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্যই তা করতে হল। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য সত্যের খাতিরে, মনুষ্যত্বের খাতিরে, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের খাতিরে, তোমার নিজের কল্যাণের খাতিরে তোমাকে রোগীর শুশ্রূষা করতে হবে। এ শুধু রোগীকে দয়া দেখানো নয়—এ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তোমার কর্ত্তব্য। তার জন্যই রোগীর সেবা করছ, তাকে রোগযন্ত্রণা হতে আরাম করতে চাচ্ছ।

তবেই দেখতে পাচ্ছ, আমাদের স্থূল দেহগুলো এত বিভিন্ন হলেও তারা পরস্পরের দুঃখের ভাগ নেয়। স্থূলের রাজ্যেও আমরা পরস্পর ভাই, একই রক্তমাংসের পবিত্র বন্ধনে বাঁধা। চিকিৎসকেরা প্রমাণ করেছেন যে প্রত্যেক সাত বৎসর অন্তর মানুষের সমস্ত শরীরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। তখন শরীরের প্রত্যেকটী অণুর স্থান নূতন অণুতে এসে অধিকার করে। এতেও এই কথাই প্রমাণ হচ্ছে যে এই যে অণুপরমাণুর অহরহঃ পরিবর্ত্তন, এই যে সমস্তটা শরীর জুড়ে একটা

ওলট পালট—এগুলোকে আমার বা তোমার বলে গণ্ডী টেনে রাখা যায় কি? এই শরীর টাকে আমার বলব, আর ও-টাকে তোমার বলব এমন কি অধিকার আছে আমাদের? প্রতিমুহূর্ত্তে শরীরের পরিবর্ত্তন হচ্ছে, এই মুহূর্ত্তে যাকে আমি আমার বলছি, তা আর পরমুহূর্ত্তে আমার থাকছে না। আমার বলে আমি বলছি কাকে? আজ যেটা রামের শরীর, সাত বছর আগে সেটা আর কারু ছিল হয়ত। চৌদ্দ বৎসর আগে যেটা রামের দেহ ছিল, সেটা আজ কার? আজ হয়ত কতজন তাকে ভাগ করে নিয়েছে। কাজেই যে দেহটা তুমি বলছ তোমার, সেটাও তোমার একার নয় সে সকলের। এইটুকু একবার তলিয়ে দেখবে কি? তাহলে দেখবে জড় জগতেও তোমরা সবাই এক!

তারপর এলাম মনোজগতে। তোমার চুল বাড়ছে, ধমনীতে রক্ত বইছে—কেমন? কিন্তু তোমার চুল বাড়াচ্ছে কিসে? তোমার পাশের ওই মানুষটার চুল যে শক্তিতে বাড়ছে, সেই শক্তিতেই তোমারটাও বাড়ছে না কি? এ দুয়ের মাঝে কোথাও তফাৎ দেখতে পাচ্ছ কি তুমি? তোমার ধমনীতে রক্ত বহায় কে? সবার শিরাতে যে বহায়, তোমার শিরাতেও সেই বহায় না কি? তোমার পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক করায় কে? সবার পাকস্থলীতে যে করায়, তোমার পাকস্থলীতেও সেই করায় না কি? সব জায়গাতেই একই শক্তির খেলা নয় কি? এই সত্যটা একবার মনের সামনে ধর দেখি—একবার এটা অনুভব কর দেখি!

এ কি অপরূপ—আমি তবে কি? যে শক্তিতে কেশের বৃদ্ধি, খাদ্যের পরিপাক, শোণিতের সঞ্চালন, আমি কি সেই শক্তিই নয়? সেই শক্তিই যদি আমি, তবে আমি এক—অখণ্ড—সর্ব্বঘটে বিরাজমান! আমি অবিভাজ্য—অসংখ্যের অবিনাশ্য—সমস্ত দেহের শাসন ও পরিচালন করছি আমি! এইটা একবার অনুভব কর।

এই হচ্ছে মনোজগতের সত্য। তোমরা সবাই এক। তোমরা একই—কোন ভেদ নাই তোমাদের মাঝে।—এইটা একবার অনুভব কর। যে দেহটাকে তোমার বলছ, সেটা যখন অনাহারে শুকিয়ে যায়, তখন কষ্ট কর কেন? আহারের প্রাচুর্য্যে পরিপুষ্ট সকল দেহই তো তোমার। তোমার বলে বিশেষ করে মার্কা দেওয়া এই দেহটা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন দুঃখ কিসের? স্বাস্থ্যপূর্ণ সমস্ত দেহই না তোমার দেহ? অনুভব কর এই সত্য—অনুভব কর একবার!

অপরের প্রতি তোমার কি কর্ত্তব্য? যদি অপর কারু অসুখ হয়, তাকে বুকে টেনে নাও; তোমার নিজের পীড়া হলে যেমন করে তার প্রতীকার করতে, তেমনি করে অপরের পীড়াতেও সেবা কর। অপরকে তুমি তুলে ধরবে, তার জন্য ভাববে, তার দরদ বুঝবে—এই তোমার অপরের প্রতি কর্ত্তব্য। আর তোমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য এই যে, সকল অবস্থাতেই তুমি সুখী থাকবে, আনন্দে থাকবে। সব রকম বিরক্তি আর হা হুতাশ একদম ছেড়ে দেবে। (আগামীবারে সমাপ্য)

যোগসূত্রবৃত্তি

—*—

সমাধিপাদ

প্রাণবায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়। অভ্যন্তরীণ বায়ুকে বিশেষ প্রযত্ন সহকারে মাত্রানুসারে বাহির করিয়া দেওয়াকে বলে **প্রচ্ছর্দ্দন**। আবার তেমনি মাত্রানুযায়ী প্রাণের যে আয়াম বা গতিরোধ, তাহাকেই বলে **বিধারণ**। কাহারও মতে বিধারণ দুই প্রকারে হইতে পারে—বাহিরের বায়ুকে ভিতরে আপূরিত করিয়া কিম্বা আপূরিত বায়ুকে ভিতরে নিরোধ করিয়া। ইহাতে **রেচক**, **পূরক**, ও **কুম্ভক** ভেদে তিনপ্রকার **প্রাণায়াম** পাওয়া গেল। প্রাণায়াম চিত্তের স্থিতি ও একাগ্রতা সম্পাদন করে। পূর্ব্বে প্রাণে প্রবৃত্তি জাগরিত হইলে তবে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। আবার প্রাণ ও মন স্ব স্ব ব্যাপারে পরস্পরের সাহিত এক যোগে কাজ করিয়া থাকে। যদি প্রাণকে নির্জ্জিত করা যায়, তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে এবং তাহা হইতে চিত্ত একাগ্র হইবে। শাস্ত্রে আছে, এই প্রাণায়ামে সমস্ত দোষ ক্ষয় হইয়া যায়। দোষের জন্যই তো চিত্তে বিক্ষেপ বৃত্তি সমূহ জাগরিত হয়। কাজেই প্রাণায়ামে দোষ দূর হয় বলিয়া সহজে একাগ্রতাও জন্মিয়া থাকে। (৩৪)

চিত্ত স্থৈর্য্যের আর একটি উপায় আছে· তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ব্বাঙ্গ বলা যাইতে পারে। বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও তাহা মনের স্থিতিনিবন্ধনী হইয়া থাকে। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ— ইহারাই **বিষয়**। প্রবৃত্তি অর্থ প্রকৃষ্ট বৃত্তি বা সূক্ষ্ম-বৃত্তি। শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় যে-সূক্ষ্মবৃত্তির ফল, তাহাই বিষয়বতী প্রবৃত্তি। শরীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে ধারণার ফলে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কথাটা এই—নাসাগ্রে চিত্তকে ধারণা করিলে দিব্যগন্ধের সংবিৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেমনি জিহ্বাগ্রে দিব্য রস সংবিৎ, তালুর অগ্রে রূপসংবিৎ, জিহ্বা-মধ্যে স্পর্শসংবিৎ, আর জিহ্বামূলে দিব্যশব্দের সংবিৎ উৎপন্ন হয়। এইরূপে এক একটী ইন্দ্রিয় ধরিয়া এক একটী দিব্য-বিষয়ের সংবিৎ উৎপন্ন হইলে, তাহা চিত্তের একাগ্রতার হেতুভূত হইয়া থাকে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ হইতে যোগের যে নিশ্চিত ফল আছে, এই কথা ভাবিয়া যোগী আশ্বস্ত হন—কাজেই যোগে তাঁহার উৎসাহ বাড়ে। তা ছাড়া দিব্য বিষয়ের সম্বিৎ উৎপন্ন হওয়ায় লৌকিক শব্দ স্পর্শাদি বিষয়েও যোগীর বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। ইহাও চিত্তস্থৈর্য্যের মূল। (৩৫)

বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিও চিত্তের স্থিতিনিবন্ধনী। **জ্যোতিঃ** শব্দদ্বারা এখানে সাত্ত্বিক প্রকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে প্রবৃত্তিতে এই সাত্ত্বিক প্রকাশ ভূয়িষ্ঠরূপে অনুভূত হয়, তাহাই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। শোক রজোগুণের পরিণাম। সুখময়সত্ত্বাভ্যাস-বশতঃ শোক দূর হইয়া যায় বলিয়া এই প্রবৃত্তি **বিশোকা**। এই প্রবৃত্তি হইতেও চিত্ত-স্থৈর্য্য হয়। সাধনার ক্রমটী এই—হৃৎপদ্মপুটে প্রশান্ত-কল্লোল ক্ষীরোদ সমুদ্রের মত চিত্ত

সত্বের ভাবনা করিতে হইবে। তাহাতে প্রজ্ঞালোক বিকশিত হইয়া চিত্তের রজোমূলা প্রবৃত্তি পরিক্ষীণ হওয়াতে চিত্তের স্থৈর্য্য উৎপন্ন হইবে। (৩৬)

আর একটী উপায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয়। বীতরাগ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তিত করিলেও চিত্ত স্থির হয়। যে চিত্তে বিষয়াভিলাষ নাই, যে চিত্তের সমস্ত ক্লেশ দূর হইয়া গিয়াছে, তাহাই বীতরাগ চিত্ত। সিদ্ধ মহাপুরুষের এই প্রকার চিত্তকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তিত করিলে যোগীর চিত্তও একাগ্র হয়। (৩৭)

চিত্তস্থৈর্য্যের আর একটী উপায় স্বপ্নজ্ঞান বা নিদ্রাজ্ঞানকে আলম্বন করিয়া ভাবনা করা। যখন বাহিরের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অস্তমিত হইয়া গেলে আত্মা কেবল মাত্র মনদ্বারা বিষয় ভোগ করেন, সেই অবস্থাকে বলে স্বপ্ন। নিদ্রার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, (১০ম সূত্র দ্রষ্টব্য)। এই স্বপ্ন কিম্বা নিদ্রাকে আলম্বন করিয়া যে জ্ঞান মানুষের স্বাভাবিক উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানকে পুনরায় স্বেচ্ছায় আলম্বন করিয়া যদি কেহ তাহাতে ভাবনা প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, তবে তাহার চিত্ত স্থির হইবে। (৩৮)

সর্ব্বশেষে চিত্তস্থৈর্য্যের একটী সার্ব্বভৌম উপায় বলা হইতেছে।— নানাজনের নানা রুচি —ইহার মধ্যে যাহার যে বিষয়ে রুচি বা শ্রদ্ধা, সে যদি সেই বিষয়ের ধ্যান করে, তাহাতেও তাহার ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। এই ধ্যানে বাহ্য কিম্বা আভ্যন্তর উভয় প্রকার বস্তুকেই আলম্বন করা যাইতে পারে—যেমন বাহিরে চন্দ্রাদির ধ্যান, অন্তরে নাড়ীচক্রাদির ধ্যান। এইরূপ অভিমত বস্তুর ধ্যানে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যাস করিয়া তারপর তত্ত্বাদির ভাবনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। (৩৯)

যোগের উপায়ের কথা বলা হইল। এখন সূত্রকার ফলের কথা বলিবেন। পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়া যে যোগী চিত্তস্থৈর্য্যের ভাবনা করিবেন, সূক্ষ্ম বিষয়ের ভাবনা দ্বারা পরমাণু পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্তের বশীকার হয় অর্থাৎ পরমাণুর মত সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণাতেও তাঁহার চিত্ত প্রতিহত হয় না। তেমন মহত্ত্বের দিক দিয়া, আকাশাদি পরম মহৎ বিষয়ের ভাবনাতেও তাঁহার চিত্ত প্রতিহত হয় না। যে কোনও বিষয়ের ভাবনাতে তখন তাঁহার স্বাতন্ত্র্য জন্মিয়া থাকে। (৪০)

এই প্রকারে উপায় দ্বারা সংস্কৃত চিত্তের পরিণাম কি? সমস্ত বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া গেলে গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্যে চিত্তের তৎস্থত্ব ও তদঞ্জনতারূপ সমাপত্তি হয়। অস্মিতা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়—ইহারাই যথাক্রমে গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য নামে অভিহিত হয়। তৎস্থত্ব অর্থাৎ তাহাতে একাগ্রতা। তদঞ্জনতা অর্থে তন্ময়ত্ব। চিত্তের বৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইলে যে বিষয়ের ভাবনা করা যায়, তাহারই উৎকর্ষহেতু সেই প্রকারই সমাপত্তি বা পরিণাম উপস্থিত হয়। সূত্রকার অভিজাত মণির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অভিজাত মণি অর্থে নির্ম্মল স্ফটিক। স্ফটিকের কাছে যে রূপই স্থাপিত করা যায়, উহাতে সেই রূপই ধরিয়া যায়। তেমনি, চিত্ত নির্ম্মল হইলে যে প্রকার ভাব্য বস্তু উহাতে উপরক্ত হইবে, উহা সেই রূপাপন্নই হইবে। সূত্রে বলা হইয়াছে—গ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য, এই ক্রমানুযায়ী। কিন্তু ভূমিকার ক্রমানুসারে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতৃ এই পর্য্যায়ই ধরিতে হইবে

কেননা সমাধি প্রথমতঃ গ্রাহ্যনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ, তারপর গ্রহণনিষ্ঠ এবং পরিশেষে অস্মিতারূপ গ্রহীতৃনিষ্ঠ। এখানে গ্রহীতৃ বলিতে অস্মিতাকেই ধরিতে হইবে। কেননা কেবল গ্রহীতা যে পুরুষ, তিনি কখনও ভাব্য হইতে পারেন না। স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ে উপরক্ত চিত্ত উহাতেই সমাপন্ন হইয়া থাকে; ইহাই গ্রাহ্যসমাপত্তি। এইপ্রকার গ্রহণসমাপত্তি ও গ্রহীতৃসমাপত্তিকেও বুঝিতে হইবে। (৪১)

এই সমাপত্তি আবার চারি প্রকার। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ যে সমাপত্তি, তাহা **সবিতর্কা**। যাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহাও যেমন শব্দ, তেমনি যাহা স্ফোটরূপে বর্তমান তাহাও **শব্দ**। **অর্থ** বলিতে জাতি প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিবৃত্তিই **জ্ঞান**। বিকল্প কি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৯ম সূত্র দ্রষ্টব্য)। যে সমাপত্তিতে এই শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান পরস্পর অধ্যস্ত হইয়া প্রতিভাসিত হয়, তাহাকে বলে সবিতর্ক। যেমন গো বিষয়া সমাপত্তিতে যদি গো এই শব্দ, তাহার অর্থ ও তাহার জ্ঞান বিকল্পিত হইয়া প্রতিভাসিত হয়, তবে তাহাকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলিতে হইবে। (৪২)

নির্বিতর্ক ইহার বিপরীত। শব্দ এবং অর্থের স্মৃতি যখন বিলীন হইয়া যায়, গ্রাহ্যের আকার নিরবচ্ছিন্ন ও স্পষ্ট হওয়ায় জ্ঞানসত্ত্বও যখন অপ্রধান হইয়া যায়, তখন স্বরূপশূন্যের মত যে সমাপত্তি, তাহাই **নির্বিতর্কা**। (৪৩)

এই সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা সমাপত্তি হইতেই সবিচারা ও নির্বিচারা সমাপত্তির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেমন করিয়া? সবিচারা ও নির্বিচারা সমাপত্তির বিষয়মাত্র ভিন্ন। তন্মাত্র ও অন্তঃকরণরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বই তাহাদের বিষয়। ইহাতে বুঝা গেল, পূর্বের দুই সমাপত্তির, তাহার বিষয় স্থূল মহাভূত।

যে সমাপত্তিতে সূক্ষ্ম ভাব্য বস্তু শব্দ ও অর্থের স্থির হইয়া শব্দার্থবিকল্প সহকারে দেশ কাল ও ধর্ম্মাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া প্রতিভাত হয়, তাহা **সবিচারা**। আর যাহাতে ভাব্য বস্তু দেশকালধর্ম্মাদি রহিত হইয়া কেবলমাত্র ধর্ম্মিরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা **নির্বিচারা**। (৪৪)

শেষোক্ত সমাপত্তি সূক্ষ্মবিষয়া; কিন্তু এই সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা কতদূর? সবিচার ও নির্বিচার সমাপত্তির সূক্ষ্মবিষয়ত্ব অলিঙ্গ পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত। কোথায়ও লীন হয় না, কিম্বা কোনও কিছুর লিঙ্গ বা বোধক নহে বলিয়া প্রকৃতিকে বলে **অলিঙ্গ**। এই প্রকৃতি পর্য্যন্ত উক্ত সমাপত্তির বিষয়। গুণের পরিণামের চারিটী পর্ব্ব আছে—বিশিষ্টলিঙ্গ, অবিশিষ্টলিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ। ভূতসমূহ **বিশিষ্টলিঙ্গ**; ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র **অবিশিষ্টলিঙ্গ**, বুদ্ধি **লিঙ্গমাত্র**, প্রকৃতি অলিঙ্গ। এর পর আর সূক্ষ্ম কিছুই নাই। (৪৫)

এই সমস্ত সমাপত্তিকে **সবীজ** সমাধি বলা হয়। **বীজ** অর্থ আলম্বন। উক্তরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সর্ব্বত্রই একটী না একটী আলম্বন রহিয়াছে। (৪৬)

সমস্ত সমাপত্তিই ভূমিকার ক্রমানুসারে নির্ব্বিচারা সমাপত্তিতে পর্য্যবসিত হয়। এই নির্ব্বিচারের বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ জন্মিয়া থাকে। বৈশারদ্য অর্থে নির্ম্মলতা। স্থূলবিষয়া সবিতর্কা সমাপত্তি হইতে নির্বিতর্কা শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতে সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও নির্বিকল্পরূপা নির্বিচারা শ্রেষ্ঠ। নির্বিচারা সমাপত্তি প্রকৃষ্টরূপে অভ্যস্ত হইয়া

নির্ম্মল হইলে চিত্ত ক্লেশ বাসনাশূন্য হইয়া স্থিতি প্রবাহের যোগ্য হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে **অধ্যাত্মপ্রসাদ**। চিত্তের স্থিতিতে যে দৃঢ়তা, তাহাই তাহার বৈশারদ্য। (৪৭)

এই অবস্থাতে যে প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়, তাহার নাম ঋতম্ভরা। ঋত অর্থাৎ সত্যকে ভরণ করে—বিপর্য্যয় দ্বারা তাহ আচ্ছন্ন হইতে দেয় না বলিয়া ইহাকে বলে **ঋতম্ভরা**। এই প্রজ্ঞার আলোকে যোগী সমস্ত বিষয়ই যথাবৎ দর্শন করিয়া প্রকৃষ্ট যোগ প্রাপ্ত হন। (৪৮)

অন্য প্রজ্ঞা হইতে এই প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সূত্রকার বলিতেছেন, অর্থের বিশেষত্ব আছে বলিয়া শ্রুতপ্রজ্ঞা ও অনুমানপ্রজ্ঞা হইতে ইহা ভিন্নবিষয়া। আগম কিম্বা অনুমান হইতে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা সামান্যজ্ঞান মাত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ের মত বিশেষ কিছু বুঝাইবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। কিন্তু নির্বিচারা সমাপত্তির বৈশারদ্য হইতে সমুৎপন্ন এই প্রজ্ঞাতে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত কিম্বা বিপ্রকৃষ্ট বস্তুরও স্ফুটরূপে বিশেষজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব এই প্রজ্ঞালাভের জন্যই যোগীর বিশেষ প্রযত্ন করা উচিত। (৪৯)

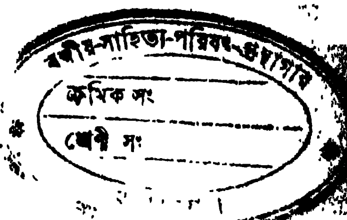
এই প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যুত্থানজনিত ও ইতরসমাধিজনিত সংস্কারসমূহের প্রতিবন্ধী হইয়া থা... তাহাদিগকে স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম করে। এই প্রজ্ঞা তত্ত্বরূপা; অন্যান্য প্রজ্ঞা তাহা নহে। সুতরাং এই প্রজ্ঞাই বলবতী হইয়া অন্য প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারসমূহের বাধা জন্মাইয়া থাকে। এইজন্য যোগীর এই প্রজ্ঞা অভ্যাস করাই উচিত। (৫০)

এই পর্য্যন্ত গেল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তার পর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা। নিরোধ দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারেরও বিলয় সাধন করিলে সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিজের কারণে লয় হইয়া যায়। তাহার পরেও সংস্কারমাত্র হইতে যে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকেও "নেতি নেতি" করিয়া ফিরাইয়া দিলে **নির্ব্বীজ** সমাধি হয়। এই সমাধিতে পুরুষ শুদ্ধ ও স্বরূপনিষ্ঠ হন। (৫১)

বস্তু সংক্ষেপ

যোগসূত্রের অধিকৃত বিষয় যোগ। চিত্তবৃত্তিনিরোধ তাহার লক্ষণ। লক্ষণের উল্লেখ করিয়া সূত্রকার তাহার পদব্যাখ্যা করিলেন। নিরোধের উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। সূত্রকার যথাক্রমে তাহাদের লক্ষণ, স্বরূপ ও ভেদ বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতরূপে যোগকে মুখ্যতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তারপর যোগাভ্যাসের উপায় দেখাইতে গিয়া অন্যান্য উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধানরূপ উপায় বিশেষরূপে সুগম বলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ, প্রভাব, বাচক, উপাসনা ও তাহার ফল যথাক্রমে নিরূপণ করিলেন। তারপর চিত্তবিক্ষেপ ও তাহার সহজাত দুঃখাদির লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বলিয়া তাহাদের প্রতিষেধের জন্য একতত্ত্বাভ্যাস, মৈত্র্যাদি পরিকর্ম্ম, প্রাণায়াম, বিষয়বতী প্রবৃত্তি প্রভৃতির উপদেশ করিলেন। উপসংহারে সমাপত্তির লক্ষণ, ফল ও বিষয়ের কথা বলিয়া সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপসংহাররূপে সবীজ ও নির্ব্বীজ সমাধির কথা বলিলেন। এইরূপে সমাধিপাদ ব্যাখ্যাত হইল।

ইতি পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তিতে
সমাধিপাদ।



পথের সঙ্কেত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রূপ আর রস, এই নিয়াই তো জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুইটীর স্বরূপ যদি চিনিতে পার, তবে আপনাকে বিস্তার করা সহজ হইয়া যায়। তাই রূপের পরিচয় দিতে অভিমানের কথা তুলিয়াছিলাম আর রসের স্বরূপ দেখাইতে বলিয়াছিলাম মমতার কথা। এই দুয়ের মাঝে আত্মার যে সত্য গভীর ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য তোমাকে চেষ্টিত হইতে হইবে। চেষ্টার জন্য দূর দূরান্তরে যাইতে হইবে না আপনার মাঝে খুঁজিলেই সব পাইবে। আত্মানুসন্ধান আত্মালোচনা চাই—যাহা কিছু প্রকৃতির বশে সংস্কারের বশে হইতেছে, তাহাতেই চোখ বুজিয়া সায় দিয়া গেলে চলিবে না।

তবে তোমার মাঝে কতটুকু সোণা আর কতটুকু খাদ, তাহা জানিবার জন্য একটা কষ্টিপাথর তো চাই! সে পাথর পাইবে কোথায়? তাহাও পাইবে তোমার নিজের ভিতরেই—তার জন্যও বাহিরে খুঁজিতে হইবে না। আদর্শের মাঝে যে সৌন্দর্য্য-বোধ, সে তো তোমার আত্মার মাঝেই রহিয়াছে তাঁর আলো যে তোমার সকল আবরণ ভেদ করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। ভিতরে সেই আলোর মাণিক নিশিদিন জ্বলিতেছে বলিয়াই না বাহিরে সকল আজ উজ্জল দেখিতেছ!

এটুকু বুঝিবার পক্ষে বাধা আছে অনেক, তা জানি। কিন্তু বাধা আছে বলিয়া বসিয়া থাকিলে কিম্বা কেবল হা হুতাশ করিলেই তো আপনা হইতে বাধা সরিয়া যাইবে না। তা ছাড়া, বাধাকে তুমি যত দুর্লঙ্ঘ্য মনে কর, মোটেই তত নয় যদি তোমার চিত্ত জাগ্রৎ থাকে, অর্থাৎ হিতকথা বলিলে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিবার শক্তি যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাকে বুঝিবার জানিবার জন্য যদি ব্যাকুলতা জাগিয়া থাকে তবেই দেখিবে, বাধা হটাইবার শক্তির উৎসমুখ আপনা হইতেই খুলিয়া গিয়াছে। যে প্রাণে প্রাণে চায়, সে ঠিক বস্তুটা পায়—এ কথা একেবারে সত্য। তাই আপনাকে পাইবার পক্ষে যে সমস্ত বাধা, সেগুলি যদি তোমার উপর মোহ বিস্তার না করিয়া থাকে, সেগুলিকে যদি আত্মার অপমানকর বলিয়া জানিয়া থাক, তবে দেখিবে, কত সহজে অনায়াসে সকল বাধা দূর হইয়া যাইতেছে। যতটুকু মন্দ তোমার মাঝে, তার শতগুণ ভাল যে তোমাতে রহিয়াছে। সৃষ্টির তাৎপর্য্যই এখানে। ভগবান্ সৃষ্টিকে আনন্দের দিকে, কল্যাণের দিকেই লইয়া যাইতেছেন। তাই যদি কায়মনোবাক্যে কল্যাণের কামনা কর, তাহা হইলে দেখিবে, তাঁহাকে পাওয়ার পথটাই সোজা, অশিবের পথটাই বাঁকা। যত সহজে মানুষ ভাল হইতে পারে, তত সহজে বোধ হয় মন্দ হইতে পারে না। অবশ্য তার জন্য তোমার মর্ম্মস্থানটীকে স্পর্শ করা চাই।

আত্মানুশীলনের পক্ষে যে আদর্শের প্রয়োজন, তাহা কি করিয়া পাইবে? প্রথমতঃ, তোমার মাঝে সামান্যতঃ সে আদর্শ আছেই—অতিমন্দ

লোকেও তাহাকে ভাল বলিয়াই জানে। এখন তোমার পক্ষে প্রয়োজন, সেই আদর্শকে আরও বিশেষ করিয়া বোঝা। এর জন্য দুই দিকে তোমার সংস্কারের প্রয়োজন। যেমন ভিতরের কাজ চাই, তেমনি বাহিরের কাজও চাই। ভিতরে চাই ব্যাকুলতা, চাই অধ্যবসায় আপনাকে জানিব এই সংকল্প নিয়া মনটাকে চেতাইয়া তুলিতে হইবে। একটু জোর ধরিয়া চলা চাই। বাধা বিপত্তি যাই আসুক না কেন, তবু স্রোতে গাত দিয়াছ, সেটাকে উদ্ধার করিবার জন্য লাগিয়া পড়িয়া থাকিতেই হইবে। ভিতরে এই অধ্যবসায়টুকু চাই।

আবার বাহিরে চাই শৌচ। অবশ্য শৌচ অন্তরেরও জিনিষ। কিন্তু বাহির শুচি না হইলে অন্তর শুচি হয় না তাই শৌচকে আগে বাহ্য সাধনা বলিয়াই ধরিয়া নিলাম। দেহের অশুচিতায় মানুষের যে কি ক্ষতি করে, তাহা বলিবার নয়। দেহের সঙ্গে মনের বড় শক্ত বাঁধন। সাধনার পথেও যেমন তোমার পরম শত্রু, তেমনি ওর আইন মানিয়া ওকে চালাইতে পারিলে ওই আবার তোমার পরম মিত্র।

শৌচকে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। যে প্রকৃতির নিয়মে দেহ চলে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও অশুচিতা। সুতরাং কেবল দেহ মার্জ্জনই শৌচ নয়—তোমার একটুকু অনাচারে দেহে যে তিলমাত্র অস্বস্তি জন্মিবে, তাহার মূলেই তোমার অশুচিতা। সুতরাং শুচি হইতে হইলে আচার পালন করা চাই। আচার হইল চলিবার নিয়ম। সে নিয়ম প্রকৃতির অনুকূলে—আবার আত্মারও অনুকূলে। আচারকে অটুট রাখিয়া চলিতে পারিলেই শৌচ সাধন হইবে। আচারে নিষ্ঠা না জন্মিলে তাহা অনাচারেরই সামিল; কাজেই শুচি হইতে হইলে তোমাকে সদাচারী ও নিষ্ঠাপরায়ণ হইতে হইবে।

বাহিরের শুচিতা ক্রমশঃ অন্তরকেও শুচিতায়, আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। আগে বাহিরে কতগুলি নিয়ম বাঁধিয়া সেগুলি মানিয়া চল, দেখিবে, অন্তরেও ক্রমে নববলের সঞ্চার হইতেছে—আঁধার কাটিয়া গিয়া প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইতেছে এর সঙ্গে যদি অধ্যবসায় থাকে তাহা হইলে ক্রমিক অভ্যাসে তোমার আদর্শটী আপনা হইতেই দিন দিন ফুটিয়া উঠিবে।

একটা আদর্শকে জানিয়া তাহারই অনুকূলে জীবনকে পরিচালিত করা সেই কাজ তোমার আত্মার বীর্য্যবত্তার পরিচয়, এই বীর্য্যের সঙ্গে ভাবের যোগ ঘটাইতে পারিলেই উজ্জ্বলে মধুরে মিশিবে। তার সঙ্কেতটুকুও তোমাকে জানিতে হইবে কেননা জীবন সর্ব্বাবয়ব ও সম্পূর্ণ না হইলে তাহা কল্যাণে আনন্দে চিরসার্থক হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভাব হইতেছে তোমার অন্তরের রস। এই রসের বন্ধনে সংসারের সকলের সঙ্গে তুমি বাঁধা রহিয়াছ। সংসারটা কি কেবল একটা যুদ্ধক্ষেত্রই মাত্র? অহরহঃ এখানে কেবল শক্তির পরিচালনাতেই সকলে ব্যস্ত? আত্মার বিশ্রামভূমি কি কোথায়ও মিলে না? মিলে নিশ্চয়ই। বিশ্রাম ছাড়া আনন্দ ফুটে না। যেখানে দেখিতেছ, কেবল অবিরাম দ্বন্দ্বের অভিঘাত, সেখানেই একটা নির্ব্বিরোধ বিশ্রামের ঠাঁই আছে—নতুবা দ্বন্দ্বের ভূমিই তো মিলিত না। তোমার জীবনে যে এত দ্বন্দ্ব কোলাহল—এগুলি তুমি সহিয়া যাইতেছ—কিসের আশায়? বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তির এত প্রচণ্ড আকর্ষণে তোমার সমস্তটা

জীবন ছিন্নভিন্ন হইয়া ধূলায় মিশিয়া যাইতেছে না কেন? এই বিরোধের ঝঞ্ঝা-গর্জ্জনের মাঝে সামঞ্জস্যের শান্ত রাগিণীটী আবার কে বাজাইয়া তুলিতেছে?

এই যে বিক্ষোভের মাঝেও প্রশান্তি, বিরোধের মাঝেও সামঞ্জস্য, এই হইল ভাবের মূল। আত্মা একটা ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাহারই রসে নিষিক্ত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়াই বিরোধেও তাঁহার মাধুর্য্য টুটিয়া যায় নাই। ভাব সকলের মাঝেই আছে। ভাবের প্রেরণাতেই মানুষ কাজ করিতেছে। ভাল মন্দ কত কিছুই তো একজনের জীবনে ঘটিতেছে; ইহার মূলে যদি এক বলিয়া কিছু না থাকিবে, তবে একই জীবনের মাঝে অমন বিভিন্ন প্রকৃতির সংস্থান হয় কি করিয়া? আজ যে একটা মন্দ কাজ করিল আবার কাল যে একটা ভাল করিল, বাহির হইতে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা ইহাকে স্বতোবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করি, কিন্তু ভালমন্দের মাঝে দিবারাত্র ঘুরপাক খাইয়া যে মরিতেছে, সে তো তাহার মাঝে কোনও বিরোধ দেখিতে পাইতেছে না—কেননা তার স্বভাবের মূলে সে একটি কিছু ভাবকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সেই ভাবের দিকে চাহিয়া তাহারই প্রেরণায় সে কাজ করিয়া যাইতেছে—ভালমন্দের বিরোধের পীড়া কোথাও অনুভব করিতেছে না। এই ভাব আদর্শ কি না হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিচার এখন নয়।

কিন্তু এ তো গেল শুধু বিরোধ। যদি কুকর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া সুকর্ম্ম লইয়াই থাক, তবুও তোমার বিরোধের ল্যাঠা তো ঘুচিবে না। তখনও কাম্য কারণের বশে বিচিত্র কর্ম্মের চাপ আসিয়া তোমার উপর পড়িবে—ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? একমাত্র উপায় হইতেছে—ভাবের প্রতিষ্ঠা। একটী ভাবে চিত্তকে রসাইতে হইবে, মজাইতে হইবে; রসের মাঝে অবগাহন করিয়া সেখান হইতে সে যাহা বলিবে, দ্বিধা না করিয়া তাহা করিয়া যাও, দেখিবে, কর্ম্মের বৈচিত্র্য তোমাকে কোথাও পীড়ন করিতেছে না—ফুলের পাপড়ির মত সমস্ত কর্ম্মই একটী বোঁটায় আসিয়া মিলিতেছে।

কর্ম্মের কথা বার বার করিয়া বলিলাম এই জন্য যে, কর্ম্ম ছাড়া জীবন পঙ্গু। কর্ম্ম ত্যাগ বাঞ্ছনীয় নহে—সম্ভবও নহে। সংসারীই হও আর বিরাগীই হও—কর্ম্ম তোমায় করিতেই হইবে। জন্মজন্মান্তর হইতে যাহা পুঁজি করিয়া আসিয়াছ, তাহার সকলটুকু নিঃশেষ করিতে পারিলে তবে না তোমার ছুটি? তখনই না অভয় বৈরাগ্যের অধিকার মিলিবে? নইলে ঘর ছাড়িলেই কি কর্ম্মের বন্ধন কাটিয়া যায়—মানুষ বৈরাগী হয়?

ভাবের বনিয়াদের উপর কর্ম্মের মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে—এই হইল সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা। এই দুয়েরই যোগ্যতা লাভের জন্য তোমার যে চেষ্টা, তাই হইল তোমার শিক্ষা। শিক্ষার কালে তোমাকে কর্ম্মের তত্ত্বও বুঝিয়া লইতে হইবে, ভাবের তত্ত্বও বুঝিতে হইবে। তারপর যখন সংসারে নামিলে, তখন তোমার পরীক্ষা সুরু হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মৃত্যুর দুয়ার উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতলোকে প্রবেশের অধিকারও পাইবে।

কর্ম্ম তোমার জীবনের বহির্ভাগ; আর ভাব হইল তাহার অন্তঃপুর। প্রকৃতির বশে কর্ম্ম হইবেই; এখন তাহাকে পরিচালনা করার মাঝেই যা কিছু কৌশল। সেই জন্যই ভাবের সন্ধান। এই ভাবটুকু পাইবার

জন্যই এমন করিয়া সাত রাজ্য হাতড়াইয়া বেড়ান। যত আদেশ-উপদেশ, আচার বিচার —সকলই তোমার ওই মর্ম্মরহস্যটী তোমাকে বুঝাইবার জন্য। কোন রসের ভূমিতে তোমার প্রাণের মূল অবগাহন করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্যই তো এমন করিয়া তোমার চিত্তকে চিরিয়া চিরিয়া বিশ্লেষণ করা। সেইটুকু যখন জানিবে, তখন আর সতর্ক বিচারের প্রয়োজন হইবে—কেবল প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত।

আত্মার রসসান্দ্র পূর্ণতাই ভাবের স্বরূপ—সকল দ্বৈতকে পরিতৃপ্ত করিয়া যে অদ্বৈতের প্রকাশ সেখানেই ভাবের প্রতিষ্ঠা। এই মর্ত্ত্যের জীবের জন্য তাহা মধুর হইয়া জগতে নামিয়া আসে। কেননা এক দিক দিয়া আমরা যেমন দ্বৈতের মধ্যে বাঁধা, আর এক দিক দিয়া তেমনি ভাবের প্রেরণা না পাইলে আমাদের কর্ম্ম পঙ্গু হইয়া রহিবে—জীবনের সার্থকতা কোথাও মিলিবে না। আমরা এই ভাবকে জানি একটি সম্বন্ধের মধ্য দিয়া। বহুকে আমরা স্বীকার করি, তাহার মাঝেই আপনার নিঃসঙ্গ একত্বের আকুলতাকে পরিতৃপ্ত করিতে চাই, তাই বহুর সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্রে নিজকে বাঁধিয়া আমরা আপনার মাঝে ভাবের প্রতিষ্ঠা করি।

কিন্তু এই বহুকে বুঝিবারও ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে। যদি ইহাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে খণ্ডে খণ্ডে দেখ, তবে আমার আমিটাকে বৃহৎ করিয়া তাহার দ্বারা বহুকে আমাদের বেড়িয়া নিতে হয়, নতুবা ভাবের আশ্রয় মিলে না। ইহারই নাম সংসার। অহং এখানে রাজা, মমতার ডুরি দিয়া সকলকে সে আমার বলিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। আমার বেষ্টনীর মাঝে যাহাদের বাঁধিয়াছে, তাহাদের জন্যই আমার কর্ম্ম—তাহাদের প্রতি মমত্ব-বোধই আমার কর্ম্মের প্রেরণা জুটাইতেছে—ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কিছুই বিচার করিবার অবসর দিতেছে না। ইহাতে একদিক দিয়া কর্ম্মের বিরোধের মীমাংসা হইলেও অপর দিক দিয়া হইতেছে না। অহংকে হাজার বড় করিলেও তাহার একটা সীমা আছে—সুতরাং যেখানেই সে নিজের বলিয়া গণ্ডী টানিবে, সেখানেই গণ্ডীর বাহিরে যারা, তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই সঙ্গে তাহার বিরোধ বাধিবেই। এই জন্যই অহংবুদ্ধি থাকিতে কর্ম্মের বিরোধ মিটে না। কিন্তু তবুও সংসারে এক রকম করিয়া কর্ম্ম তো চলিতেছেই; তাই তার মূলে সত্য না থাক, সত্যের আভাসটুকু রহিয়াছে। সেটুকুকে ভাব না বলি, ভাবেরই বিকার বলিব।

ইহাকে আমরা চাই না। আমরা চাই এর চেয়েও বড় একটা জিনিষ। এইবার বহুকে বুঝিবার আর একটী রীতি ধর। তোমার অহংকে ছোট করিয়া ফেল; আবার সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত বহুর মায়া—ইহাকে সমষ্টিভাবে ধারণ করিবার চেষ্টা কর। এবার তোমার স্পর্দ্ধিত অহং যেন আর বহুকে গ্রাস করিবার ব্যর্থ প্রয়াস না করে—বিরাট্ বহুর সর্ব্বগ্রাসী মমতার মাঝে তোমার অহংটাকেই তুমি বিসর্জ্জন দাও। তোমার অহং যদি ছোট হইয়া যায়, তবে দেখিবে, আপাততঃ বিচ্ছিন্ন বহুর মাঝেও একের বিরাট্ মহিমা ফুটিয়া আছে; ক্ষুদ্র অহং পূর্ব্বে যাহাকে বহু মনে করিয়াছিল, তাহা একেরই বশে ধৃত, সঞ্জীবিত। বহুর মাঝে যে এক—সেই তখন তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে। সেই একের মহাসাগরে তুমি একটী

বিন্দু মাত্র। অহং-এর দিক দিয়া তুমি খাটো হইলে বটে, কেননা এক সিন্ধু আর তুমি বিন্দু, কিন্তু স্বরূপের দিক দিয়া, রসের দিক দিয়া তোমার মর্য্যাদা অনন্তগুণ বাড়িয়া গেল। কেননা বিন্দু হইলেও তুমি তো সেই সিন্ধুরই বিন্দু সিন্ধুর স্বরূপই তো তোমার স্বরূপ। আবার সেই সিন্ধুর মাঝেই অগণিত বিন্দুর সঙ্গে একই রসে তুমি যে বাঁধা পড়িয়াছ।

এই যে মহতের সঙ্গে তোমার প্রাণের ঐকান্তিক সম্বন্ধ—ইহাই হইল তোমার প্রাণের মেরুদণ্ড। সমস্ত কর্ম্মে, সমস্ত মননে ইহাকেই তোমার স্মরণে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তুমি ছন্নছাড়া কিছু নও—সকল হইতে আলাদা কিছু নও—সকলের সঙ্গেই তোমার নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। মাটী হইতে যে গাছটা জন্মিয়াছে, সে কি মাটী ছাড়িয়া যাইতে পারে? শাখাপ্রশাখা দিয়া সে আকাশকে আলিঙ্গন করিতে চায় বটে, কিন্তু তাহার প্রাণের সকল শিকড় যে মাটীর বুকের স্তন্য পিপাসায় আকুল হইয়া ফিরিতেছে। তাই আকাশের সত্য, আলোর সত্য, মাটীর সত্য—সকলের সত্য মিলাইয়াই গাছের সত্য। তোমার জীবনটাকেও ঠিক এমনি করিয়া মহতের সঙ্গে জড়াইয়া নিয়া বুঝিতে হইবে। তাঁর পরিপূর্ণ সত্য তোমার জীবনেরও সত্য—সে সত্য রূপেরও সত্য, অরূপেরও সত্য। একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে ধরিতে যাইও না, কেননা তুমি তো জান না—কার শক্তি কতটুকু। আজ একজনকে অবহেলা করিয়া ছাড়িয়া গেলে, কিন্তু কাল যদি সে তোমার বাদী হইয়া দাঁড়ায়, তখন কি করিয়া তাহাকে ঠেকাইবে? তাই, নিজের খেয়ালমত কিছু করিবার কল্পনা করিও না। আপনাকে নিঃশেষে সেই দেবতার মাঝে সঁপিয়া দাও। তোমার বলিবার যেটুকু রহিয়াছে, তার সবটুকুই সেই তাঁরই দান। তাঁর বস্তুতে তিনি যে লীলা যে রস ফুটাইয়া তুলিবেন, তাহাতেই তো তোমার আনন্দ।

কেবল ভাব—মহতের সঙ্গে তোমার প্রাণের যোগ। অভিমান নাই তোমার মাঝে যে সে আজ আপনার খুসীমত একটা কিছু গড়িতে চাহিবে। আছে শুধু প্রণতি, আছে শুধু মধুর আত্মসমর্পণ—শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যুৎ-ভরা পুলক শিহরণ। প্রভাতের আলোতে জ্বলিয়া উঠিল একটী শিশিরবিন্দু যেমন পূর্ণ, যেমন উজ্জ্বল, যেমন স্নিগ্ধ—তেমনি তুমি। তাঁর আলোতে দেহ মন তোমার জ্বলিয়া উঠিয়াছে—প্রতি শ্বাসে শ্বাসে তাঁহারই পরিপূর্ণ প্রাণের তরঙ্গ তোমার নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চালিত হইতেছে—তাঁহারি প্রেমে মুগ্ধ আত্মহারা তুমি, তাঁহারি রসের সাগরে অবগাহিত, নিমজ্জিত!

এই তো রূপ—এই তো রস—ইহাতেই তোমার ভাবের প্রতিষ্ঠা। ইহার জন্যই এত কাল ধরিয়া এত আয়োজন। (ক্রমশঃ)

———✻———

শ্রীশ্রীরূপসনাতন

(শ্রীমন্মহাপ্রভুসূত্রিত অভিধেয়সাধনভক্তিতত্ত্ব)

সাধ্যাসাধ্যবিচার

শ্রীমন্মহাপ্রভুসূত্রিত ভক্তির পরিকরসমূহ ব্যাখ্যাত হইল। ইহার পর সাধনভক্তির কথা।

গুণের সংস্পর্শবশতঃ পুষ্টির তারতম্য হেতু ভক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শ্রবণাদি অঙ্গের সাধনা করিয়া যে ভক্তি লাভ হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি।

এখানে একটী কথা বিচার করিতে হইবে। সাধনার ফলে যদি ভক্তির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তো ভক্তি অনিত্য হইয়া পড়ে। যাহা অনিত্য, তাহা পুরুষার্থ হইবে কি করিয়া? এই সংশয়ের উত্তরে মহাজনেরা বলিতেছেন—বাস্তবিকপক্ষে ভক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু—জীবের ইহা স্বভাবজ ধর্ম্ম। অবিদ্যাকলুষিত হৃদয়ে সাধনাদ্বারা তাহাকে প্রকট করিতে হয় বলিয়াই তাহাকে সাধনভক্তি বলা হইতেছে। কথাটার একটু বিস্তার আবশ্যক।

সংসারের নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই, এখানে অনুভূতির গাঢ়তার তারতম্য আছে। যে কোনও বস্তুকে সবাই এক ভাবে জানে না বা বোঝে না। কোনও বস্তু সম্বন্ধে কাহারও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিমাণ দিয়া সেই বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেননা আজ তুমি যতটুকু বুঝিতেছ, আর একজন হয়ত সেই বস্তুটাই তোমার চেয়ে বেশী বুঝিতেছে, কিম্বা তুমিই হয়ত কাল আজকার চেয়ে বেশী বুঝিবে। আমাদের অনুভূতির রাজ্যে যদি এই ভাবে সঙ্কোচ প্রসার ঘটিতে থাকে, তবে কোনও অবস্থাতেই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে নিরপেক্ষ সত্য বলা চলে না। অনুভূতির চরম সঙ্কোচে আমরা দেখিতেছি জড়ত্বের উদ্ভব। কিন্তু তাহার চরম প্রসারে যে কি, তাহা আমরা সাক্ষাৎভাবে বলিতে পারি না। অথচ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝি, ব্যবহারিক অনুভূতি সীমাবদ্ধ হইলেও সেই সীমা চিরন্তন নহে—তাহারও প্রসার আছে।

প্রসার যে আছে, ইহা আমরা অনুভবও করি। তাহা ছাড়া অন্তরে যাঁহারা একটু গূঢ়-প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসারের দিকে যে এই অনুভূতির আকর্ষণ, তাহার পরিচয় বিশেষ করিয়াই পান। ফল কথা, লোকসিদ্ধ অনুভূতির পরেও যদি কিছু থাকে, তাহা শুদ্ধ চিত্তেরই অনুভবসিদ্ধ। এখন কথা এই যে, তাহার স্বরূপ কি?

লৌকিক অনুভূতি দেশ, কাল ও গুণপরিণাম দ্বারা বিশিষ্ট। উহা যে সীমাবদ্ধ, তাহার কারণই এই দেশ, কাল ও গুণের বেষ্টনী। কিন্তু কোনও বস্তুর মূলে দেশকালাদির অতিরিক্ত আর একটী সত্তা রহিয়াছে—যাহা

একরস হইয়াও সর্ব্ববৈচিত্র্যের বীজ। এই একরস ভাব ও তাহার সহচারী শক্তির প্রেরণাতেই লৌকিক বৈচিত্র্যের উদ্ভব। যে কোনও বস্তুর সঙ্গে অনুভববৃত্তির যে সংঘাত, তাহার অনুধাবন করিলেই এই তত্ত্বটী বোঝা যায়।

অনুভূতির প্রসাদে আমরা শক্তির কেন্দ্রীভূত এই রসবস্তুরই পরিচয় পাই। ইহাতে অবগাহন করিলে দেশ, কাল ও গুণের বন্ধন খসিয়া যায়। তখন বুঝা যায়, লৌকিক অনুভূতিতে জগৎকে দেখা সত্যের বিপর্য্যয়। অনিত্যের পারে দাঁড়াইয়া নিত্যের অনুভূতি হইতে পারে না। অনিত্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া নিত্যভূমিতে উপনীত হইলে বুঝা যায়, এইবার সম্পূর্ণ বস্তুটীর সাক্ষাৎ মিলিয়াছে— অনিত্যেরও যাহা রহস্য, তাহাও নিত্যের কুক্ষিগত হইয়াই দেখা দিয়াছে। কিন্তু অনিত্যের মাঝে দাঁড়াইয়া তো নিত্যকে এমন সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উপলব্ধি করা যাইবে না। সেই জন্য নিত্যের কথা বলিতে গেলেই অনিত্য ধর্ম্মের সঙ্গে তাহাকে না জড়াইয়া কিছু বলিবার উপায় থাকে না। তার ফলে নিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় যে স্বতোবিরোধ উপস্থিত হয়, অপ্রবুদ্ধ তর্কজালে তাহার মীমাংসার কোনও উপায় থাকে না।

অনিত্যের রঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া যদি বলি, নিত্যসিদ্ধ ভাবকে প্রকট করিবার জন্যই সাধনা, নতুবা ভাব সাধ্য বস্তু নয়, তাহা হইলে শুনিতেই কথাটা কানে ঠেকে। যাহা নিত্যসিদ্ধ, তাহার তো কোনও কালেই ব্যভিচার নাই—তবে আবার তাহাকে প্রকট করিবার জন্য সাধ্য-সাধনা কেন? আবার সাধনা দ্বারাই যদি তাহাকে প্রকট করিতে হয়, তবে তাহা নিত্য হইল কি করিয়া? কি জ্ঞান-বিচারে, কি ভাব-বিচারে, উভয়ত্রই সংশয়ীর মনে এই তর্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। আবরণক্ষয়বাদ ও প্রাকট্যবাদ দিয়া ইহার যে মীমাংসার প্রয়াস করা হইয়াছে, বুদ্ধি-শুদ্ধি ব্যতিরিক্ত তাহার সারবত্তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই জন্য শেষ পর্য্যন্ত ইহার কোনও যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা হয় না।

কিন্তু সাধকের মনে ইহার অনুভবসিদ্ধ মীমাংসা মিলে। সমস্ত গণ্ডগোলের মূল হইতেছে, এই বিচারে যে জ্ঞানকে আমরা প্রামাণ্য ভাবিয়া বিচারকের আসনে বসাইয়াছি, সেই। এখানকার জ্ঞান বলিতেছে, নিত্যকে যদি প্রকট করিতে হইল, তবে অপ্রকট অবস্থায় তাহার অনুভূতি না থাকায় তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় কি করিয়া? কিন্তু অপ্রকট অবস্থায় নিত্যের যে অনুভূতি মিলিল না, ইহার জন্য দায়ী কে? কাহার নিকট এই অনুভূতি ধরা পড়িল না? এই লৌকিক জ্ঞানের কাছেই। কিন্তু কথা হইতেছে নিত্যত্বাসিদ্ধির তর্কে বস্তুর তত্ত্বাবধারণে লৌকিক জ্ঞানের ক্ষমতা কতটুকু? সে কি শুধু তর্কের প্রণালীটী মাত্র ধরাইয়া দিয়াছে, না তাহার সঙ্গে সঙ্গে তর্কের বিষয়ীভূত বস্তুর সম্যকজ্ঞানও তাহার হইয়াছে? অর্থাৎ যে "নিত্য" লইয়া তাহার তর্ক, সেই নিত্যের অপরোক্ষানুভূতি তাহার আছে কি? নিশ্চয়ই নাই; নিত্যসম্বন্ধে আমাদের যে লৌকিক জ্ঞান, তাহা বিকল্পজ্ঞান মাত্র। বিকল্পরূপ মিথ্যাজ্ঞান লইয়া যে তর্কের প্রতিষ্ঠা, তাহা দ্বারা কখনও সত্য নির্ণয় হইতে পারে না।

আবার রহস্য এই, নিত্যের সাথে বিকল্প জ্ঞানকে দূরীভূত করিয়া যদি প্রামাণ্য তর্ক সূচনা করিতে যাই, তবে তর্কের অবসরই মিলিবে না অর্থাৎ নিত্যত্বের সম্যক্ জ্ঞান হই-

সেই তর্কদ্বারা যাহা সাধ্য ছিল, তাহা অনায়াসেই অপরোক্ষানুভূতিতে সিদ্ধ হইবে। এইজন্য নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রাকট্য কি করিয়া তর্কের অবিরোধে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা সাধনা দ্বারাই বুঝিতে হইবে—লৌকিক জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া তর্ক দ্বারা তাহার বিনিশ্চয় হইবে না। এক কথা নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রতি চিত্তের লোলুপতা চাই, তাহার প্রতি যে আমাদের সহজ আকর্ষণ রহিয়াছে, শুদ্ধচিত্ত দ্বারা তাহা অনুভব করা চাই।

বৈধীভক্তি

শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণগুণ শ্রবণাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই সাধনভক্তি। ইহাই সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। আবার এই সাধনভক্তিই পরিপক্ব হইয়া পরম্পরাক্রমে নিত্যসিদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ে প্রকট করিয়া থাকে—ইহাই হইল তাহার তটস্থ লক্ষণ। সাধন ভক্তি আবার দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা।

এখনও হৃদয়ে ভগবদনুরাগ সম্যক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই, কিন্তু শাস্ত্রের আদেশ মানিয়া জীব ভক্তির অঙ্গসমূহের যাজনা করিতেছে—ইহাই হইল বৈধী ভক্তি। শাস্ত্রে ভজনার বহু বিধি আছে, যথা—

তস্মাৎ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥

—হে ভারত, এই জন্যই বলি, যে সংসারভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়, সে ভগবান হরির গুণ শ্রবণ করিবে, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিবে এবং সমস্ত কর্ম্মের অবসরে তাঁহারই কথা স্মরণ করিবে—কেননা তাঁহারই বশে এ জগৎ সকলের আত্মারূপে ছাইয়া রহিয়াছেন তিনিই। (শ্রীমদ্ভাগবত ২, ১, ৫,)

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণে রাখিবে—কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। শাস্ত্রের যত বিধিনিষেধ সমস্তই এই দুইটী ভাবের দাস মাত্র। (পদ্মপুরাণ)

এই সমস্ত শাস্ত্রবিধিদ্বারা অনুশাসিত যে ভক্তিপথ, তাহাই বৈধীভক্তি। সাধন ভক্তির সাধনাঙ্গ অনেক। সংক্ষেপে তাহার কিছু আলোচনা করা যাউক।

শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় ভক্তির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। শ্রীগুরুর শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুসেবা করিতে হয়। সেবা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে কিছুই স্ফুরিত হয় না। শুদ্ধ চিত্তে মন্ত্রার্থের স্বরূপ আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে, এবং তত্ত্বধারণার যোগ্যতা জন্মায় বলিয়া গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগে। তখন পূর্ব্ব মহাজনগণ কোন পথে গিয়া ভগবানকে পাইয়াছিলেন, ভক্ত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন এবং তাঁহারও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে আগ্রহ জন্মে।

ভক্তসাধককে ভোগে নিঃস্পৃহ হইতে হইবে, কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত—সেবা তাঁহার সহায়। সেবার মাঝে নিজের ভোগবাঞ্ছা থাকিলে কি সেবা হয়? যেখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য প্রকট, কৃষ্ণভক্তগণ যেখানে নিশিদিন আনন্দের তরঙ্গ তুলিতেছেন, ভক্ত সাধক এমন স্থানেই বাস করিবেন। কোনও কিছু অর্জ্জন বা সঞ্চয় করিবেন না। যদৃচ্ছাক্রমে যাহা মিলে, তাহাই গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করিবেন—জীবনধারণের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার

অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করিবেন না। একাদশীর উপবাস, ধাত্রী ও অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা, গোব্রাহ্মণের সেবা, বিষ্ণুভক্তের সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ হইবে।

ভগবানের সেবার সময় ভক্তিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সেবাপরাধ ও নাম করিবার সময় নামাপরাধ সমূহ বর্জ্জন করিয়া চলিবেন। যাহারা ভগবদ্ভক্ত নহে, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিবেন। বহু শিষ্য গ্রহণ, বহু শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠ, বহু কলাবিদ্যার অভ্যাস, কিম্বা অপরের নিকট নিজের পাণ্ডিত্যব্যাখ্যাদি বর্জ্জন করিবেন। নতুবা এই সমস্তেই চিত্ত অহঙ্কৃত ও বহির্ম্মুখী হইয়া উঠিবে।

ভক্ত লাভক্ষতিতে নির্বিকার থাকিবেন, অনিত্য বস্তুর জন্য কখনও শোক করিবেন না। নিজের ইষ্ট দেবতায় যেমন নিষ্ঠা ও প্রীতি রহিয়াছে, অপরেরও সেইরূপ থাকিতে পারে এবং সকলই ভগবানেরই প্রকাশ, এই জানিয়া অন্য দেবতা কিম্বা অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করিবেন না। কেননা ইহাতে চিত্ত কলুষিত ও বহির্ম্মুখী হওয়া ছাড়া নিজের কোনও উপকার হয় না। ভগবানের নিন্দা কিম্বা ভক্তের নিন্দা কখনও শ্রবণ করিবেন না। যেখানে বাজে কথার আলোচনা হয়, সেখানে থাকিবেন না। সমস্তই ভগবানের বিভূতি, সুতরাং সকলেই আমার পরম আত্মীয়, এই মনে করিয়া কোনও প্রাণীর অনিষ্ট চিন্তাও করিবেন না, কিম্বা মুখের কথা দিয়াও কাহারও চিত্তে উদ্বেগ জন্মাইবেন না।

ভক্ত সাধক ভগবানের গুণাবলী শ্রবণ করিবেন, স্বয়ং কীর্ত্তন করিবেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার ভাব স্মরণে রাখিবেন। ভগবান্ সর্ব্বদাই আমার সম্মুখে, এই মস্তক দৈন্যভরে তাঁহারই চরণে লুটাইয়া রহিয়াছে—এইরূপ বন্দনার ভাবটী সর্ব্বদা চিত্তে পোষণ করিবেন। নিয়মিতরূপে নিষ্ঠা সহকারে তাঁহার পূজা করিবেন এবং সমস্ত কার্য্য তাঁহারই পরিচর্য্যা করিতেছি এই ভাবে অনুশীলন করিবেন। আমি ভগবানের দাস কিম্বা আমি তাঁহার সখা—এইরূপ ভাবিয়া ভক্ত আত্মনিবেদন করিবেন। ভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য, গীত, প্রার্থনা, দণ্ডবৎ প্রণাম, স্তবপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ধূপ, মালা ও গন্ধাদির উপহার, বিগ্রহের প্রদক্ষিণ, অবতরণ ও মহোৎসব দর্শন ইত্যাদি ভক্তের অবশ্য করণীয়।

নিজের কাছে যে বস্তুটী ভাল লাগে, ভগবানের প্রীত্যর্থে ভক্ত তাহা দান করিবেন। তুলসীসেবা, বৈষ্ণবসেবা, মথুরাসেবা ও ভাগবতসেবা—এই চারি প্রকার সেবাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত। ভক্ত মনে করিবেন, তাঁহার যে কিছু কর্ম্ম সমস্তই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সর্ব্বত্রই তাঁহার কৃপারসে তিনি অভিসিক্ত। পর্ব্বোপলক্ষে অন্যান্য ভক্তদিগকে লইয়া মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিবেন। ভক্ত সর্ব্বদা ভগবানের শরণাগত হইয়া থাকিবেন। মোটামুটী সাধন ভক্তির এই চতুঃষষ্টি অঙ্গ।

ইহার মধ্যে আবার সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তির সেবা—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

——*——

গীতার ভূমিকা *

—*—

সমগ্র মহাভারত হইতে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পর্ব্বটীকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। গীতার প্রতি আমাদের আত্যন্তিক শ্রদ্ধাবশতঃই এরূপ হইয়াছে। মহাভারতের সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ধূমোদ্গারের মাঝে গীতা-পর্ব্বটী যেন একটী স্থিরোজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত আপন সত্যের মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে। একটা সমগ্র জাতির জীবন মন্থন করিয়া যে সত্যটুকু মিলিয়াছে, গীতা তাহারই ইতিহাস। এই-জন্যই গীতা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদরূপে একটা ব্যক্তিগত ঘটনা হইয়া রহে নাই—প্রদীপের মত একস্থানে থাকিয়াও দূর দুরান্তরে যুগ যুগান্তরে তাহার আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

একটা সমগ্রজাতির হৃদয় হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই গীতার ধর্ম্মে বিরোধ নাই কোথাও সাম্প্রদায়িক মত হিসাবে তাহার মাঝে কোনও খণ্ডতা নাই—তাহা যেমন ব্যাপক, তেমন সর্ব্বসমঞ্জস। গীতার এই সর্ব্বসমঞ্জসী ব্যাপকতার দিকে চাহিয়া মনে হয়, শান্ত তপোবনের অন্তরালে যে গীতার জন্ম নহে, রণভেরীর কর্কশ তাড়ন যে তাহার জন্ম ঘোষণা করিয়াছে, ইহার মাঝে একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে। কুরুক্ষেত্র সমস্ত জাতির মিলন ক্ষেত্র। সে মিলনের উপলক্ষ্য শুভ হউক, অশুভ হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এমনি করিয়া জীবন মরণের সন্ধিস্থলে একটা জাতি আসিয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছে, সেখানে তাহার অন্তরের দুঃসহ বেদনা হইতে গীতার অমৃতধারা ক্ষরিয়া পড়িয়াছে। মরণের মাঝে আত্মাহুতি দিয়া আর্য্যবীর্য্য তাহার চরম পরিণতিকে সার্থক করিয়াছে—আপনাকে দগ্ধ করিয়া চিরযুগের উপর আলো ঢালিয়াছে।

এই সুমহান্ আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া যখন দেখি, তখন গীতাকে একটা অখণ্ড নিত্য সত্তা বলিয়া মনে হয়। একটা জাতির মরণ পীড়ন হইতে তাহার জন্ম হইলেও, তাহাকে আর সেই জাতির বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া মনে হয় না—মনে হয়, তাহা সমস্ত দেশ কাল পাত্রের বন্ধনী অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতিরই চিরন্তন ধর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা বস্তু জাতির আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাহাকে জাতীয় সংজ্ঞা দেওয়া চলে, অর্থাৎ জাতীয়তা সংকীর্ণ ধর্ম্ম। কিন্তু বিরোধকে অতিক্রম করিয়া সেই বস্তুটী যখন প্রশান্তির মহিমায় উত্তীর্ণ হয়, তখন বিশিষ্ট কোনও জাতির দাবী আর তাহার উপর খাটে না তখন তাহা বিশ্বের সম্পদ। কুরুক্ষেত্রযজ্ঞে আর্য্যজাতির আত্মাহুতিতে গীতার ধর্ম্ম এইরূপ বিশ্বজনীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গীতাকে এই ভাবে সমস্ত ঐতিহাসিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমরা ব্যবহার করিতেছি। গীতার সত্যই আমাদের কাছে স্ফুট, তাহার ব্যক্তি আমাদের কাছে ব্যক্তিত্বশূন্য—নির্বিশেষ। কি পরম্পরা ধরিয়া কাহাকে

আশ্রয় করিয়া কাহার উদ্দেশ্যে এই গীতার প্রথম প্রবর্ত্তনা, সে কথা আজ আমাদের কাছে অবান্তর। গীতার মাঝে পার্থের বেদনা ব্যাকুলতাকে আমরা আর তেমন করিয়া অনুভব করি না—পার্থের সহিত পার্থসারথির সম্পর্ককেও আর তেমন মানবসম্পর্কোচিত মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া অনুভব করিতে পারি না। গীতার লীলা অংশটুকু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার বিরাটত্বই আজ আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইতিহাসকে এমন করিয়া বাদ দিলে তো চলে না। তাহাতে যেমন সত্যের পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়, তেমনি আমাদের অন্তরের রসবোধও পীড়িত হয়। সত্য চিরন্তন ও ব্যাপক হইলেও ব্যক্তির ভিতর দিয়াই তাহার পূর্ণাবয়ব প্রকাশ। সত্যের শুধু বিস্তার দেখিলেই চলিবে না, তাহার গভীরতাও অনুভব করা চাই। এই গভীরতার অনুভূতি রসানুভূতি—তাহাই লীলারস রূপে তুচ্ছ অতুচ্ছ সকল বস্তুর ভিতর দিয়া রাসয়া উঠিয়া সত্যের ব্যাপকতাকে নিবিড় করিয়াছে।

ইতিহাসে আমরা সেই লীলার পরিচয় পাই—তাহা একাধারে সত্য এবং সুন্দর। অবশ্য ইতিহাস সংজ্ঞাটী প্রাচ্যের প্রাচীন অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। এই যে গীতার সত্যের ব্যক্তিরূপ ভূমিকা—পাশ্চাত্য ইতিহাস তাহাকে মানিতে পারে, না মানিতেও পারে—কেননা পাশ্চাত্য ইতিহাস ব্যক্তিসর্ব্বস্ব, রস-সর্ব্বস্ব নহে। একজন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া যদি একটা অখণ্ড রস ফুটিয়া উঠে, তবে তাহার মাঝে সে ব্যক্তিটাকেই বড় করিয়া দেখিবে—ব্যক্তিত্বকে নহে, রসকে নহে। সে ব্যক্তি জড়দেহে ছিল কি না ছিল, তাহাই সে নিরূপণ করিতে ব্যস্ত; কিন্তু তাহার আশ্রয়ে যে রস অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহার আস্বাদনের জন্য সে ব্যগ্র নহে।

কিন্তু আমাদের বিচার অন্যরূপ। আমরা বলি, রসই প্রধান। সেই রসকে ফুটাইবার জন্যই ব্যক্তির ভূমিকা; রসাশ্রয়ী ব্যক্তির কাহিনীই আমাদের ইতিহাস। রসের অনুভূতি দিয়া ব্যক্তিকে যেখানে আমরা চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি, সেখানে সে শাশ্বত অমর। কোনও কালে কৃষ্ণার্জ্জুন কাহারও জড়দৃষ্টির বিষয়ীভূত ছিলেন কি না, তাহা প্রমাণ হইলেই বা আমাদের কি, না হইলেই বা কি? আমাদের রসানুবিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে যে তাঁহারা আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষ। আমাদের ইতিহাসে তাঁহাদের সত্তা রসাশ্রিত—সুতরাং তাহা নিত্য। চিজ্জগতে যাহা পাইয়াছি, জড় জগতের প্রলাপোক্তিতে কি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি?

এই হইল গীতার ঐতিহাসিকতা অর্থাৎ তাহা রস ও ব্যক্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ—রসিকের হৃদয়ে ব্যক্তির আশ্রয়ে তাহার সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসের অনুকরণে গীতার ব্যক্তিকে জড়ের ভূমিতে নামাইয়া তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে যেমন আমাদের চলিবে না, তেমনি গীতার সত্যকে একান্তভাবে তত্ত্বরূপে দেখিলেও চলিবে না। এই দুইটী রীতির একটী মিথ্যা, অপরটী অসম্পূর্ণ। পার্থ ও পার্থসারথির যে বেদনা ও ব্যাকুলতা, তাহাই গীতার ভূমিকা। গীতার সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে রসিক সাধককে এই ব্যক্তিত্বের রহস্যের মাঝে অবগাহন করিতে হইবে—সেই বিরাট কি করিয়া মানুষের সুখদুঃখের মাঝে ধরা দিলেন, তাহা বুঝিতে হইবে।

গীতার পরিপ্রেক্ষাভূমি স্থির করিতে হইলে

তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ গীতার শ্রোতা যিনি, সেই পার্থের জীবনের তাৎপর্য্য, দ্বিতীয়তঃ যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার অভিব্যক্তি, সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তাৎপর্য্য এবং তৃতীয়তঃ পার্থ ও পার্থসারথির মাঝে যে সম্পর্ক তাহার তাৎপর্য্য। এই তিনটী বিষয়কে একত্র গাঁথিয়া একটী অখণ্ড বস্তুরূপে দর্শন করিতে পারিলেই গীতার ঐতিহাসিকতা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথমে আমরা অর্জ্জুনের জীবনের কথাই আলোচনা করিব। বিস্তীর্ণ আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই; তাঁহার জীবন হইতে দুই চারিটী ঘটনা পাইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোড়াতেই প্রশ্ন উঠে, বিশেষ করিয়া অর্জ্জুনকে কেন গীতার শ্রোতা নির্ব্বাচিত করা হইল? সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহা হইতে অর্জ্জুনের চরিত্রগত কোনও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়া অনেকে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের চরিত্রে যে বিশেষত্ব রহিয়াছে এবং সেই বিশেষত্বের দরুণই যে তিনি গীতার শ্রোতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ব্যাপারটাকে আমরা এ ভাবে না দেখিলেও পারি। অর্জ্জুনের বিশেষত্ব আগে, নির্ব্বাচন পরে, এই কথা না বলিয়া আমরা বলি, তাঁহার নির্ব্বাচন আগে এবং সেই নির্ব্বাচনের দরুণই তাঁহার বিশেষত্ব। অর্থাৎ অর্জ্জুনকে উপযুক্ত দেখিয়াই গীতার সত্য তাঁহাতে ন্যস্ত হইয়াছে, এমন নহে; গীতার সত্য ধারণ করিবার যোগ্যতা দিয়াই তাঁহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"—সব্যসাচীর প্রতি এ আদেশ কেবল তাঁহার যুদ্ধ বৈরাগ্য দূর করিবার জন্য নয়—একটা মহাসত্য প্রকাশের নিমিত্ত করিয়া, সমগ্র জাতির সাধনার প্রতীক করিয়াই তাঁহার সৃষ্টি। গীতার যে তিনি ধারক, এ কথা পূর্ব্বাবধারিত—পার্থ পার্থসারথির চিহ্নিত জন। সমগ্র জাতির জীবনে একটা মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে মহাবিপ্লবের ভিতর দিয়া একটা নূতন সৃষ্টি হইবে; তার জন্যই ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন—সঙ্কটমোচনের জন্য, অভিনবের জন্মের জন্য। এখানে এই যে প্রবর্ত্তন-লীলার সূত্রধার ভগবান, নানা বিশেষত্বের আরোপ করিয়া কি তাঁহাকে আমাদের ভগবান বানাইয়া লইতে হইবে? তা তো নয়। তাঁহার সত্তা, তাঁহার লীলা স্বতঃসিদ্ধ—আমরা শুধু শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তাহার স্ফুরণ দেখিয়া যাইব। লীলার সহচর যিনি, তাঁহার সত্তাকেও এমনি ভাবে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ভাবের একটা নিত্যলোক রহিয়াছে—যুগসন্ধিতে তাহারই প্রতিবিম্ব একবার জগতের বুকে ঝলকিয়া উঠিল। তাহাতে তাহার নিত্যত্ব ব্যাহত হইল না, কার্য্য কারণের শৃঙ্খলায় তাহার অখণ্ডতার ব্যত্যয় হইল না। পার্থের জীবনেও এই সত্যের প্রকাশ। যেমন পার্থসারথির নিত্যত্বে ও পূর্ণত্বে সন্দেহ করি না, তেমনি পার্থের জীবনেও কোন সাধ্য সাধনার অবকাশ দেখি না। এক কথায় তিনিও সহজ ও পূর্ণ।

এমনি ভাবে লোকোত্তর একটা মহাভাবের আধার হইয়াছে যাঁহাদের জন্ম, সাধ্য-সাধনার জৈব প্রয়াস যাঁহাদের মাঝে নাই, তাঁহাদের জীবনে দেখি—একটা আত্মভোলা নিরাসক্ত ভাব। এ সংসারের মাঝে থাকিয়াও যেন তাঁহারা এখানে নাই। তাঁহাদের সমস্তটা জীবন যেন কাহার প্রতীক্ষা করে—কোন এক পরম ক্ষণের বিশিষ্ট সার্থকতার জন্য। এই

আত্মপরাৎপর নিরাসক্ত ভাবটীই আমরা অর্জ্জুনের জীবনে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করি। মহাভারতের মাঝে অর্জ্জুনের কীর্ত্তি যতটা স্থান জুড়িয়া আছে, এমন আর কাহারও নয়। অথচ সমগ্র মহাভারতের মাঝে সেই অর্জ্জুনের কয়টী কথা আমরা শুনিতে পাই? কত বড় বড় বিপদ, কত বড় বড় কর্ত্তব্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে সকলে হটিয়া গিয়াছে, সেখানে তিনিই আসিয়া মানরক্ষা করিয়াছেন, অথচ তাহা এত নিঃশব্দে, এত অনায়াসে। ভীমের আস্ফালনে মহাভারত মুখর, অর্জ্জুনের নিস্তব্ধতায় তাহা গম্ভীর। অথচ অর্জ্জুনের শৌর্য্যবীর্য্যের তুলনা নাই। সমগ্র গীতার মাঝে অর্জ্জুনের প্রশ্নগুলি কত সংক্ষিপ্ত অথচ কত মর্ম্মস্পর্শী। কেবল যুদ্ধের প্রারম্ভে আর বিশ্বরূপ দর্শনের পর দেখিয়াছি তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। এইগুলি কথা বোধ হয় অর্জ্জুন আর কোথাও বলেন নাই— আর এই দুইটাই তাঁর জীবনের মহাসাক্ষিস্থল।

মহাভারতের জাতিবিরোধের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মাঝে যখন দেখি, নিকটস্থ ও অপ্রধানও চরিত্রে পার্থ আপনার পথে চলিতেছেন, চারিদিকের ঈর্ষ্যা ও লোভের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাঝে কোথাও তিনি একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছেন না—তখন এই নিস্তব্ধ একাকিত্বের মাঝেই যেন আমরা তাঁহার জীবনের লোকাতীত সার্থকতার একটা আভাস পাই। পার্থের জীবনে অভিমানের সংস্পর্শ নাই, তাই বিষণ্ণতার কোনও কলুষ চিহ্ন দেখি না। তিনি একান্তভাবে আঁকড়িয়া ধরিতে পারেন না। তাহার ভিতর যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তের মাঝে তিনি নিমিত্ত মাত্র। দেবতা তাঁহাকে প্রবাহ দিয়া কোথায় [illegible] চালাইয়া [illegible] সুস্পষ্ট না দেখিয়াও

স্বভাবগুণেই তিনি আপনাকে যেন স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। তাহার চারিদিকে বাহিরের স্বার্থের যে আবর্ত্ত তাহার ধ্যানময় চিত্তকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। এ সমস্ত জাতিবিরোধের কলহের মাঝে তিনি নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতেছেন না—তাঁহার জীবন যেন এই বিরোধের সঙ্কীর্ণতার মাঝে আবদ্ধ নহে, সে যেন কত দূরদূরান্তরে কোন্ অজানার পানে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে।

সমস্ত মানব ঘটনা পরম্পরার মাঝে তাঁহার জীবনের চরম সার্থকতা নাই বলিয়াই যেন দৈবও তাঁহাকে এই সমস্ত জঞ্জাল হইতে দূরে দূরে সরাইয়াছে। বনবাসের দুঃখ পাণ্ডবদের সকলেরই জীবন কাটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মাঝেও অর্জ্জুনকেই আবার অন্য অপেক্ষা অধিক নিঃসঙ্গ হইয়া চলিতে হইয়াছে। পাণ্ডবদের ভাগ্যে রাজ্যনাশ যখন ঘটিয়াছে তখনও দেখি, ব্রহ্মচারী অর্জ্জুন সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তীর্থে তীর্থে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তার পর বনবাস দুঃখের মাঝে পরস্পরের সঙ্গলাভের সান্ত্বনাটুকুও যখন পাণ্ডবদের ছিল, তখনও দেখি, তপস্বী অর্জ্জুন আপনার ব্রত উদ্যাপনের জন্য সকলকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুনের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, তাঁহার নিঃসঙ্গ ব্রহ্মচার, তাঁহার বিরাট একাকিত্বেরই সূচনা করিতেছে। তাঁহার শৌর্য্যে আমরা বিস্মিত ও উৎফুল্ল হই বটে, কিন্তু যখন এই ধ্যান-গম্ভীর নিরাসক্ত জটিল তপস্বীর দিব্য [illegible] মূর্ত্তিখানি আমাদের মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠে, তখন আমাদের চিত্ত যেন কোন্ এক মহা প্রতিষ্ঠা [illegible] হইতে থাকে

—রাজার ঐশ্বর্য্য, বীরের শৌর্য্য, সমস্তই যেন তাঁহার বৈরাগ্যের কাছে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

এক দিকে অর্জ্জুনের এই নিঃসঙ্গ বৈরাগ্য আর একদিকে তাঁর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তাঁহার বীর্য্যবত্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু গীতা শুনিবার পূর্ব্বেই এই যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের অসীম নির্ভরপরায়ণতা দেখিতে পাই। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত এমনি নিঃসংশয় যে, ইহার ফলাফল যেন তাঁহার বিগত জীবনের একটা ঘটনার মত সুস্পষ্ট—তাঁহার সমগ্র অন্তরের প্রেরণা যেন তাঁহাকে এইদিকে আকর্ষণ করিতেছে—তাই এখানে তাঁহার আর কোনও দ্বিধাই নাই। যে অর্জ্জুন বিষাদ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে সে বিষাদ একবার যুধিষ্ঠিরকেও আক্রমণ করিয়াছিল। অর্জ্জুনই তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন,—"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে যুদ্ধসম্বন্ধে আমাদিগকে নিঃসংশয় করিয়াছেন, তাহার ভাল মন্দ নিয়া আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না।" তার পর যুদ্ধ যখন আসন্ন, তখন যুধিষ্ঠিরের চিত্তে আবার জয়পরাজয়ের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। অর্জ্জুন আবার বুঝাইলেন, "আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কারণ 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—শুধু তাই না বলি কেন, 'যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।' আমাদের চিন্তার প্রয়োজন কি?" শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে এমনি প্রমাদশূন্য সুদৃঢ় প্রত্যয় তাঁর। ইহা কি প্রবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তিতের নিগূঢ় অন্তর্যোগের সূচনা করিতেছে না?

পার্থের জীবনের পরম সার্থকতা গীতায়। গীতার উপলক্ষ্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ। সুতরাং এই যুদ্ধের সঙ্গে অর্জ্জুনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার একটা নিদর্শন এই যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সফলতার জন্য ব্যাসদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে অর্জ্জুনকেই তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুনের এই তপস্যা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। ভবিষ্যতে যে মহাযজ্ঞের তিনি হোতা হইবেন, ভগবান যেন এই তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে তাহারই যোগ্য করিয়া লইলেন। এই তপস্যার মাঝেও দেখি, অর্জ্জুনের সেই যন্ত্রচালিতবৎ আত্মহারা ভাব। তপস্যার আদিতে কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কথা তাঁহার মুখে আমরা শুনি নাই—বরপ্রার্থনার সময়ও কোনও আসক্তি-পঙ্কিল ভাব দেখি নাই—তারপর ভাইদের সঙ্গে আবার মিলিবার কালেও এই ব্যাপার নিয়া বিন্দুমাত্র উচ্ছাস-আবেগের পরিচয় পাই না। এ যেন যাহা পূর্ব্বাবধারিত, তাহাই ঘটিল মাত্র—এর মাঝে ব্যক্তিগত অভিমানের কোনও স্থান নাই-সব্যসাচী শুধু নিমিত্তমাত্র—প্রেরয়িতা তাঁর অন্তর্যামী।

এই প্রসঙ্গে উর্ব্বশী-প্রত্যাখ্যানের কথাটী ভুলিলে চলিবে না। অর্জ্জুনের ইহাই বোধ হয় কঠিনতম পরীক্ষা। পার্থের এ বীরত্বের আর তুলনা নাই। অথচ সমস্তটা ব্যাপারের মাঝে তাঁর সেই ব্রহ্মচারীর আত্মস্থ ভাব—সেই অনায়াস মহিমা। উর্ব্বশীর কথার প্রত্যুত্তরগুলি কত দৃঢ় অথচ সংক্ষিপ্ত। অর্জ্জুনের স্বভাবসিদ্ধ নিঃস্তব্ধতার কাছে উর্ব্বশীর সমস্ত উচ্ছাস ব্যর্থ হইয়া গেল। তাঁহার ক্ষুব্ধ অভিশাপবাণীর উত্তরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পড়িল না। শাপের ফলাফল সম্বন্ধে চিত্ররথকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই অর্জ্জুন

নিশ্চিন্ত। তাহার জীবনে আর সমস্তই অবাস্তব—সত্য কেবল তাঁহার অন্তর্য্যামীর প্রেরণা। অর্জনে তাঁহার আগ্রহ নাই, বর্জনে তাঁহার ক্ষোভ নাই—তাহার সম্পদ সিদ্ধ সম্পদ। জগতে তাহার অভিব্যক্তির জন্যই যেন তাঁর জীবনভরা দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্জ্জুন এই মহাযজ্ঞের হোতা—যজ্ঞাধীশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কেবল একটা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না—ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার যোগ আছে। ভগবান অবতীর্ণ হন সাধুর পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য। ধর্ম্মসংস্থাপনই মূল কথা—অভিনব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার ভূমিকা প্রস্তুত করিতেই ভগবানকে বিপ্লব ঘটাইতে হয়। প্রকৃতির পরিণামে, যাহা এক দিন জীবন্ত আদর্শ ছিল, তাহা অভ্যস্ত আচারে ও মৃত অনাচারে প্রাণহীন ও পঙ্কিল হইয়া পড়ে। অথচ এই নির্জ্জীবতার অন্তরালেই আবার নূতন জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায়। সে স্পন্দন এত সঙ্গোপন যে সকলের চোখে তাহা ধরা পড়ে না। সংস্কারান্ধতায় মানুষ যখন প্রাচীন ধর্ম্মের বিকৃতি ঘটাইতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই কোন কোন ভাগ্যবানের মাঝে নূতন আদর্শের মূর্ত্তি বিদ্যুতের মত ঝলকিয়া উঠে—সমাজকে পিছনে ফেলিয়া অভিনব বিবর্ত্তনকে বরণ করিয়া লইতে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যান। এই সময়েই বিপ্লবের প্রয়োজন হয়—যুগসন্ধিতে ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃত বিবর্ত্তনের গতিরোধকারী দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিয়া প্রাচীনে নূতনে সুর মিলাইয়া সমগ্র দেশের অধ্যাত্মসাধনাকে বর্ত্তনের পথে আর এক পদ অগ্রসর করিয়া দেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও এইরূপ একটা বিপ্লব। এই রুদ্রলীলার ভিতর দিয়া সমস্ত আর্য্যজাতিকে আত্মশুদ্ধি করিয়া নূতন ধর্ম্মের দীক্ষা লইতে হইয়াছে। আত্মশুদ্ধির জন্য যে আত্মাহুতির প্রয়োজন, অর্জ্জুন তাহার প্রধান নিমিত্ত। কুরুক্ষেত্রের বিপ্লব ঘটাইতেই হইবে, সমাজের মাঝে যাহারা প্রাচীনপন্থী অন্ধ সংস্কারে মূঢ়, তাহাদিগকে দূর না করিতে পারিলে অভিনবের স্ফুরণ হইবে না। ভারতবর্ষের সাধনায় বহু আদর্শের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, বহু আদর্শ সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া প্রাকৃতিক অধঃস্রোতের নিয়মানুযায়ী প্রাণহীন আচারে কিম্বা অনাচারে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইবার বিবর্ত্তনের পরের ধাপে তাহাকে উঠিতে হইবে, অভিনবকে জন্ম দিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের একটা বোঝা পড়া করিয়া নূতন পথে জাতিকে চালিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিপ্লব—এই বোঝাপড়া হইয়া গেল। যুদ্ধে বিপ্লব—প্রাচীন সমাজের ধ্বংস; আর গীতায় প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে বোঝা-পড়া। অভিনব ধর্ম্ম তবে কোথায়? বঙ্গভূমিতে সে এখনও উপস্থিত হয় নাই। সে আছে, পিছনেই আছে, পূর্ণ রূপেই সে আপনাকে বিকশিত করিয়াছে—কিন্তু এখনও জাতির সাধনা তাহাকে গ্রহণ করে নাই, কারণ এখনও জাতির আত্মশুদ্ধি হয় নাই। তাহার কথা পরে বলিব, আগে গীতার কথাই বলি।

একটী রহস্য এই, গীতাতে ভগবান্ নূতন কোনও কথা বলেন নাই—অথচ সেই

প্রাচীন আদর্শের মাঝেই একটা নূতন ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আর্য্যসাধনায় নূতন পন্থা নহে—ভগবান্ নিজেই তাহা বলিয়াছেন। আর্য্য সাধনা পর পর এই তিনটী বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির অধঃস্রোতে আদর্শের মাঝে বিকার উপস্থিত হয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে আজকাল অনেকে গীতা প্রতিপাদ্য অভিনব ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন, তাহাও অভিনব নহে। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, এই যোগ "পুরা প্রোক্ত" তবে কালের বশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তিনি আজ তাহারই উদ্ধার করিলেন মাত্র।

সুতরাং গীতোক্ত আদর্শ অভিনব নহে অভিনব হইতেছে গীতোক্ত আদর্শ সমন্বয়, গীতোক্ত ব্যঞ্জনা। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—তখনকার আর্য্য সমাজ এই তিনটী আদর্শের চরম পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছে। এখন তাহাকে দিতে হইলে নূতন কিছু দিতে হইবে। কিন্তু নূতন কিছু দিতে হইলে তার আধারটীকে শুদ্ধ করা চাই, এ পর্য্যন্ত সে কি পাইয়াছে, তাহার একটা সুস্পষ্ট হিসাব লওয়া চাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির মাঝে এতদিন যেন একটা প্রাচীর মত ছিল। প্রাচীন বৈদিকযুগে কর্ম্মসাধনার পর যখন জ্ঞানের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন এই জ্ঞানকে প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় করিতে হইয়াছিল—উপনিষদ্‌ও তাহার নিদর্শন বহিয়াছে। তারপর আর্য্যজাতি ভক্তির আস্বাদন পাইল। ভক্তির সাধনায় যখন সিদ্ধিলাভ করিল, তখন তাহার কর্ম্মজ্ঞানভক্তির সমন্বয় প্রয়োজন হইল। গীতায় আমরা এই সমন্বয় ধর্ম্মই দেখিতে পাই। ভগবান্ নিজকে কেন্দ্রে রাখিয়া দেখাইতেছেন, এতদিনে আর্য্যজাতি কতটুকু পাইল। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—এ তিনটী যে একই অধ্যাত্মসূত্রে গাঁথা—এ যে একটা বস্তুরই ত্রিধা বিবর্ত্তন—গীতায় ভগবান তাহাই দেখাইতেছেন।

এইটুকু বুঝিতে পারিলে তবে ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করা চলে। তাই নূতন কিছু দিবার পূর্ব্বে, ইহার আগে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা গুছাইয়া, তাহার মর্ম্মসত্যটী আবিষ্কার করিয়া তাহার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথিয়া, সমস্ত বস্তুটীকে একটা অখণ্ড সত্যরূপে দেখাইতে হয়। গীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাই দেখাইলেন। অর্জ্জুনের জীবনের একটা উদ্দেশ্য সফল হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্জ্জুন সমগ্র জাতির সাধনার প্রতীক মাত্র। অর্জ্জুনের কর্ম্মে, অর্জ্জুনের জ্ঞানে, অর্জ্জুনের ভক্তিতে, আর্য্যজাতির সাধনা এতদিনে কোন স্তর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, ভগবান্ গীতাতে তাহাই দেখাইলেন—আরও দেখাইলেন এই তিনটী সাধনার মাঝে তিনিই সূত্রবৎ অনুস্যূত। অর্জ্জুনের জীবনের একটা কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল তাঁহার জীবনে আর্য্যজাতিও বুঝিল—কি পাইয়াছে। এখন ইহার পর কি পাইবে, তাহারই আশা।

কিন্তু পাইতে হইলে মরণের ভিতর দিয়া যে তাহাকে নবজন্ম লইতে হইবে। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মরণ-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দেয়া কি মিলিবে? যজ্ঞেশ্বর বলিয়াছেন—ইহাতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। যুধিষ্ঠিরের একচ্ছত্রাধিপত্যই ধর্ম্মরাজ্য নয়। এতগুলি প্রাণের বিনিময়ে যদি একটা

লৌকিক রাজ্য মাত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না।

পার্থসারথি যে ধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম প্রেম। এই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভারতের ক্ষাত্রবীর্য্য চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, ইহাই ভারতের নিয়তি। বস্তু সম্পদের দিক দিয়া এর পর আর ভারতবর্ষের শ্রী ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না। কিন্তু তাহার অন্তরের সাধনা তো রুদ্ধগতি হয় নাই। কুরুক্ষেত্রের পর হইতে একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া তাহার সাধনা এক নূতন দিকে চলিয়াছে।

কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে বৃন্দাবনলীলা। কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে আর্য্যজাতির ক্ষাত্রবীর্য্য যখন স্বার্থের তাড়নায়, রাজ্যবিস্তারের লোলুপতায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও কেহ জানে না যে তাহার এমন শোচনীয় অপঘাত মৃত্যু হইবে। বৃন্দাবনে যে বাঁশীর সুরে ভগবান্ সনাতন ভারতের আত্মাকে ডাক দিয়াছেন, বহির্বাসনাক্ত ক্ষাত্রগণ তো তাহা শুনে নাই। কিন্তু এই বাসনা, এই মদান্ধতা দূর না হইলে তো প্রেম ফুটিবে না। তাই কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্রশক্তির ধ্বংসের প্রয়োজন হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া ভগবান ক্ষত্রিয়বীর্য্য নির্ম্মূল করিলেন; যে দুই একটী স্ফুলিঙ্গ অবশিষ্ট ছিল, মৌষল লীলায় স্বয়ং তাহা নির্ব্বাপিত করিলেন।

সমস্ত অনাচার, সমস্ত উদ্ধত আস্ফালন দূর হইয়া গেল। ইহার বিনিময়ে ভারত পাইল কি? বৃন্দাবনের অকৈতব প্রেমসুধার আস্বাদন। কিন্তু এখানেও শুধু পাইবার সূচনা মাত্র। ভারতের সিদ্ধিলাভ এখনও হয় নাই। কিন্তু আদর্শ যাহা, তাহা সে বুকের মাঝে আঁকিয়া লইয়াছে। বৃন্দাবনে যে লীলা, তাহাতে ভগবান্ আপনাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, রাখিয়া ঢাকিয়া কিছু করেন নাই তাই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম এই চতুর্ব্যূহে তিনি পূর্ণ—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" কিন্তু লীলার যে শৈলী, এখানেও দেখি তাই। নিত্যসিদ্ধ সম্পদকে ভগবান নিত্যশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলেন, তাই দেখিয়া জগৎ একটা আদর্শ পায়, তার মাঝেও যে সেই পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহার আভাস পাইয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়ে—সেই ব্যাকুলতা হইতে তাহার সাধনা আরম্ভ হয়।

এই ব্যাকুলতার পথে ভারত চলিয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর হইতে বারবার সেই পার্থসারথির ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে প্রেমের ডোরে সকলকে একত্র বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহার পর ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। প্রথম তাই তাহার সফল হয় নাই। অশোক সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন কিন্তু শ্রীবুদ্ধের প্রেমের বাণী তাঁহার সে সঙ্কল্প ভাসাইয়া লইয়া গেল, ক্ষুদ্র ভৌগোলিক রাজ্যের স্থানে তিনি এশিয়াজোড়া ধর্ম্মরাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। এই একটী ব্যাপার হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, ভারতবর্ষের নিয়তি কোন দিকে। আচার্য্য শঙ্কর ভারতের চতুঃসীমায় তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিলেন, একেবারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বাঁধিতে চাহিলেন—তাহার মূলেও এই ধর্ম্মরাজ্যের কল্পনা। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে খ্রীষ্টপ্রচারিত Kingdom of God সে-ও তো এই কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিধ্বনিমাত্র। এই সেদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় লাভালাভের কথা ভুলিয়া

প্রেমের মন্ত্রে সমস্ত ভারতবর্ষ সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। ইহাতেই বুঝি এ দেশের প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই বৃন্দাবনের সুর লীলায়িত হইয়া ফিরিতেছে।

এই প্রেমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অর্জ্জুনের সম্পর্ক কতটুকু, তাহাই এখন দেখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষাত্র শক্তিকে নির্জ্জিত করিয়া কুরুক্ষেত্র প্রেমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছে। সুতরাং অভিনব ধর্ম্মসংস্থাপনের পক্ষে অর্জ্জুন ভগবানের প্রধান লীলা সহচর। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান প্রাচীন আদর্শের সমন্বয় ঘটাইয়াছেন এবং অভিনব ধর্ম্মের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুন জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধের পরিসমাপ্তি। তারপর দেখি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। পৌত্র পরীক্ষিতের মাঝে অর্জ্জুনের জীবনের অপরার্দ্ধের অনুবৃত্তি। গীতা যে ধর্ম্মের ভূমিকা মাত্র, ভাগবত তাহার বিকাশ। সেই ভাগবতের শ্রোতা যে পরীক্ষিৎ, তিনি অর্জ্জুনেরই পৌত্র—কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রারই পৌত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালানল হইতে শ্রীকৃষ্ণই অলৌকিক উপায়ে এই পৌত্রটীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এতগুলি ঘটনায় যোগাযোগ শুধু আকস্মিক নহে—ইহার মাঝে একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা দেখি সেই নব-নারায়ণেরই লীলা। কুরুক্ষেত্রেই সে লীলার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই—মহারাজ পরীক্ষিতের জীবন পর্য্যন্ত তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছে। বৃন্দাবনে যে লীলার পূর্ণবিকাশ — পার্থ পৌত্র পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ্য করিয়াই জগতে তাহার প্রথম প্রচার।

এই সূত্র ধরিয়া বৃন্দাবন লীলা হইতে পরীক্ষিতের ভাগবত শ্রবণ পর্য্যন্ত সমস্তটা ব্যাপারকে অখণ্ডভাবে দেখিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আমরা একটা অভিনব তাৎপর্য্য দেখিতে পাই। এই উপলক্ষ্যে অর্জ্জুনের জীবনটাও আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। ভারতের আত্মা অর্জ্জুনের মাঝেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে। অর্জ্জুনের নিঃসঙ্গ বৈরাগ্য, তাঁহার তপস্যা, তাঁহার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস—এমন কি তাঁহার দ্বিধা দ্বন্দ্ব টুকুও দেশাত্মারই প্রতিচ্ছবি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের যে বিষাদ, তাহার মাঝে আমরা কি দেখিতে পাই? একটা সুমহান আত্মত্যাগের মাঝে দেখা দেয় একটা অভিনব বস্তুর জন্ম যে আসন্ন, ভারতের আত্মা তাহা বুঝিতে পারিয়াছে তাই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সে স্পন্দমান। কুলধর্ম্ম আর জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য অর্জ্জুনের যে আকুলতা, নূতনের জোয়ার হইতে প্রাচীনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এ যেন দেশাত্মারই আর্ত্তনাদ। সে বুঝিয়াছে, এইবার যে প্লাবন আসিবে, তাহা তাহার জাতিকুল ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—তাই শঙ্কাবিধুর হৃদয়ে সে তাহাদিগকে আগুলিয়া রাখিতে চায়। শুনিয়া পার্থসারথি একটু হাসিলেন মাত্র, বলিলেন "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ বটে।"

এই তো গেল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তাৎপর্য্য। আমরা দেখিলাম, গীতার সমন্বয় ধর্ম্ম প্রলয়ের মুখে নূতন সৃষ্টির বৈদ্যুতী লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন পার্থ ও পার্থসারথির কোন্ নিগূঢ় সম্বন্ধের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা, তাহাও দেখিতে হইবে। বারান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

গত বর্ষে আসাম শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রম এবং শাখা আশ্রমগুলিতে মোট ৮৩০৬৸/১৭॥ ব্যয় হইয়াছে। জনসাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৩৮১৬॥৴১৫ এবং আশ্রমগুলির আয় ৫৪৩॥১০ বাদ বাকী ৩৯৪৬৸১২। মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। গারোহিল আশ্রম এবং কাশীর গম্ভীরার সেবকগণের আহার্য্য স্থানীয় লোক প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে বার্ষিক আয়ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আয়

সাধারণ হইতে প্রাপ্ত—	৩৮১৬॥৴১৫
আশ্রম সমূহের আয়—	৫৪৩॥/১০
মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত	৩৯৪৬৸১-॥০
মোট আয়—	৮৩০৬৸/১৭॥

ব্যয়

আসাম—শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম	২৭৪৭।১০
খোরাকী	১৪৩৪৸/১০
বস্ত্রাদি	২৪৫৸/১৫
শিক্ষা	১৩৮৸৵০
সেবা	১৫৫/১০
গৃহসংস্কার	১০৬৸/১৫
সেবকগণের যাতায়াত	৩১।৶১৫
উৎসবাদিতে	১০২৸০
তৈজসপত্রাদি	১৫৯৸৵১০
ডাকটিকেট	৩০॥/৫
জামজমা	২০৪৸৵০
বাজে	১৩৬/১০
বগুড়া আশ্রম	৩১৫৪৷০
ঢাকা আশ্রম	১৪৬৬॥৲১৫
ময়নামতী আশ্রম	২২০৶১৭॥
কাশী গম্ভীরা	৫৫৸০
কাশী মাতৃমন্দির	৬৬১৶১৫
গারোহিল যোগাশ্রম	×
মোট ব্যয়	৮৩০৬৸/১৭॥০

—*—

নিখিল ভারত অনাথ-আশ্রম

বিগত মাসে আমরা নিখিল ভারত অনাথ-আশ্রমের একখানি নিবেদন পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার পর উহা আমাদের হস্তগত হওয়ায় যথা সময়ে পত্রস্থ করিতে পারি নাই। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রকাশিত হইল।

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বনামধন্য ইন্দুভূষণ সেন, সুপরিচিত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, প্রভৃতি মহাশয়গণের নেতৃত্বে ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত-অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। সেই সময় থেকে গড়ে প্রায় ২০০ অনাথ আতুর রোগী এই আশ্রমে সাহায্য পেয়ে এসেছে। গত ১৯২১ সালে মোট ২৮,৬০০ টাকা অর্থাৎ গড়ে ২,৪০০ টাকা মাসিক ব্যয় হয়েছে, ইহার ভিতর বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট হতে গড়ে মাসে

মাত্র ৪০০ টাকা পাওয়া গেছে, বাকী বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা বিদেশী অর্থাৎ মাড়োয়ারী গুজরাটী ভাটীয়া বোম্বাওয়ালা মুসলমান প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে পাওয়া যাচ্ছিল।

১৯২১ সালের শেষভাগে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় ও Exchange পড়ে তবে গোলমাল চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের কারাবরোধ এবং পরে উক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের দেশযাত্রার (যেন প্রশ্রমটীর একটী সংগ্রাম শুরু হইল) পর চারিদিকে সাধারণের অজ্ঞান খারাপ দেখিয়া শাস্ত্রে লোকচালান হওয়া ও অন্যান্য নানা অসুবিধা দিগের বাধানায় বন্ধ পড়া, এই এক দিকে আগেকার মত দৃষ্টি না দেওয়ায় ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন উঠিয়া যেত, কেবলমাত্র শুকদেব বাবু অধ্যক্ষ মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এই দীপটার ক্ষীণ শিখা কোনও রকমে জ্বালিয়ে রেখেছেন। প্রায় ১২০০০৲ টাকা ঋণ পড়ে তার মধ্যে শুকদেব বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোনও রকমে ৫০০০৲ টাকা শোধ করেছেন, বাকী এখনও ৭০০০৲ টাকা।

মধ্যে কিছু কিছু টাকাকড়ি পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু উত্তরবঙ্গের বন্যার পর হইতে টাকাকড়ি ও সেবকের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় আরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

৭ই ডিসেম্বরে কোনও কিছু জুটে নাই, একেবারে অনাহার, তৎপর দিবস খালি ভাত ও প্রায় ডিসেম্বর মাসের ১৫ দিন ১ বেলা খাওয়া হয়েছে।

হিসাবপত্র পরীক্ষা করা হয়ে আছে ও হচ্ছে, যে কেউ ইচ্ছা করলে এসে দেখতে পারেন।

যদি কাহারও মনের মত না হয় বা পরিচালনায় দোষ আছে এরূপ আশা করেন বা দেখেন, সকলকে শুকদেব বাবু সাদরে আমন্ত্রণ কচ্ছেন, তাঁরা এসে আশ্রমের সুবন্দোবস্ত করুন, শুকদেব বাবু যে কোনও রূপ মত ও যুক্তিতে আশ্রম চালাতে রাজী আছেন।

মিশনারীরা "Industrial Home" নাম দিয়ে চালাতে রাজী রয়েছেন তাঁরা সমুদয় ধার শোধ দেবেন। আজ যদি কালকাতার মত জায়গায়, সহরের বুকের উপর এতগুলি ছেলেমেয়ের এরূপ অবস্থা হয়, বাঙ্গালীর বিশেষতঃ হিন্দু প্রতিষ্ঠান নিয়ে সেই জায়গায় চালায়, তাহলে হিন্দুদের, হিন্দুর মনুষ্যত্বের কি গৌরব বৃদ্ধি হবে? আশা করি, দেশের জনসাধারণ ধনীমানী মহানুভব ব্যক্তিরা ভেবে দেখবেন।

যদি দয়া করে কিছু দিয়ে প্রতিষ্ঠানটীকে বাঁচাতে চান, তাহলে নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় টাকাকড়ি পাঠালেই চলবে। দান যতই সামান্য হউক না কেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হবে।

১। কলিকাতার উত্তর বিভাগে শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র ৪, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

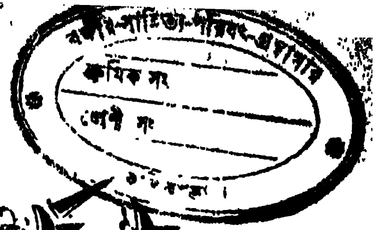
২। কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার, ১০, মুলেন ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

৩। কলিকাতার মধ্যে শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র সহকারী সভাপতি, ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। আশ্রমের আফিস—৩১নং কালীঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।"

ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

৫শ বর্ষ } চৈত্র { ১২শ সংখ্যা

বাগ্-রহস্যম্

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২।১৮]

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইৎ তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষ-
ত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী
সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বিক্ষরন্তি
তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং
তদ্বিশ্বমুপজীবতি॥

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥

ঋকের অক্ষর যাহা—পরব্যোমে তারি নিকেতন,
বিশ্বদেব তারি মাঝে আপনার রচেছে আসন;
তত্ত্ব তার নাহি জানি' ঋকে শুধু কিবা হবে ফল?
জেনেছে এ রহস্য যে, লভেছে সে স্থিতি অচঞ্চল।

কারণ সলিল সৃজে গৌরী, তাহে ধ্বনিত গগন;—
একপদী—দ্বিপদী সে—ক্রমে তার চারিটী চরণ—
অষ্টাপদী, নবপদীরূপে কভু করে অবস্থান—
সহস্র অক্ষরে তার পরব্যোমে হেরি অবিষ্ঠান।

মেঘ গলি স্নেহ তার পড়িছে ক্ষরিয়া,
তারি প্রাণ চারিদিকে পড়িছে ঝরিয়া;—
তারে ধরি অক্ষরের হয়েছে ক্ষরণ—
সেই উৎস হতে বিশ্ব পেয়েছে জীবন।

রহস্যনিলীনা বাক্—চারি পদে তার পরিমাণ—
মনিষী ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি তার জানেন সন্ধান।
গুহাহিত আছে তার তিন পদ—নহে পরকাশ;—
মানবের কণ্ঠমাঝে তুরীয়ের ফুটিয়াছে ভাষ।

যোগসূত্রবৃত্তি

—*—

সাধনপাদ

সমাধিপাদে সমাহিত চিত্তের যোগোপায় কথিত হইয়াছে। এখন ব্যুত্থিত চিত্তের পক্ষেও উপায় অভ্যাস দ্বারা যোগ কিরূপে সাধ্য হইতে পারে, তাহাই বলা হইবে।

ক্রিয়াযোগই এই সাধনার পন্থা। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান—ইহাদিগকে **ক্রিয়াযোগ** বলা হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিকে **তপস্যা** বলে—ইহার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ বা মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন হইল **স্বাধ্যায়**। আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সেই পরমগুরুতে সমস্ত ক্রিয়ার সমর্পণই **ঈশ্বরপ্রণিধান**। (১)

সমাধিভাবনার জন্য ও চিত্তের ক্লেশসমূহের কার্যরোধ করিবার জন্য ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ফলতাৎপর্য এই—তপস্যা প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা চিত্তস্থ অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহ শিথিল হইয়া যায় এবং চিত্তের সেই অবস্থা সমাধির অনুকূল হইয়া থাকে। এই জন্য যোগীর প্রথমে ক্রিয়াযোগপরায়ণ হওয়া উচিত। (২)

পূর্বসূত্রে ক্লেশের কথা বলা হইয়াছে—এই ক্লেশগুলি কি কি? অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটীকে **ক্লেশ** বলে। ইহারা চিত্তে যে পরিতাপ জন্মায়, তাহা যোগের বাধাস্বরূপ। তাহা ছাড়া, এই ক্লেশসমূহের ক্রিয়া চলিতে থাকিলে যে গুণপরিণাম ঘটে, তাহাতে সংসারবন্ধন আরও দৃঢ় হয়। (৩)

যদিও সমস্ত ক্লেশই সাধনার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ, তথাপি অবিদ্যাকে তাহাদের মূলীভূত বলা যাইতে পারে। অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ মোহকেই **অবিদ্যা** বলে। অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশসমূহের প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারিটী পর্ব আছে। সমস্ত পর্বেরই অবিদ্যা হইল ক্লেশের ক্ষেত্র বা উৎপত্তিস্থান। মিথ্যাজ্ঞানরূপা অবিদ্যা শিথিল হইলে পরে আর কোনও রূপ ক্লেশের উদ্ভব দেখা যায় না।

যে সমস্ত ক্লেশ চিত্তভূমিতে থাকিয়াও উদ্বোধকের অভাবে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, তাহাদিগকে **প্রসুপ্ত** বলে। যেমন ছোট ছেলের মাঝে বাসনারূপে ক্লেশসমূহ থাকা সত্ত্বেও সহকারী উদ্বোধকের অভাবে ব্যক্ত হয় না। আবার যখন এই সমস্ত ক্লেশ প্রতিকূল ভাবনা দ্বারা শিথিল হইয়া যায়, কার্য্যকরী হইবার আর তাহাদের কোনও সামর্থ্য থাকে না, তখন তাহাদিগকে **তনু** বলা যায়। তখন তাহারা বাসনার অবশেষরূপে চিত্তে অবস্থিতি করে, উদ্বোধকের প্রাচুর্য্য ভিন্ন তাহারা আর কার্য্যকরী হইতে পারে না। অভ্যাসপরায়ণ যোগীর ক্লেশসমূহ এইরূপ তনু অবস্থায় থাকে।

একটী ক্লেশ যখন বলবত্তর আর একটী ক্লেশদ্বারা অভিভূত থাকে, তখন তাহাদিগকে **বিচ্ছিন্ন** বলা যায়। যেমন ধর, রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ:—যখন দ্বেষ আছে, তখন রাগ থাকিতে পারে না। ইহারা পরস্পর

বিরুদ্ধ, সুতরাং ইহাদের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নয়। এ স্থলে রাগ ও দ্বেষকে যথাক্রমে বিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে। আর ক্লেশ যখন সহকারী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া চিত্তে নিজ নিজ ক্রিয়া বিস্তার করে, তখন তাহাকে **উদার** বলে। যেমন ব্যুত্থানদশায় সর্ব্বদাই ক্লেশসমূহ উদারভাবে অবস্থিত বলিয়া যোগে বিঘ্ন ঘটাইতেছে।

এই চারি পর্ব্বে বিভক্ত ক্লেশসমূহের মূল হইতেছে অবিদ্যা। অবিদ্যা ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্বিত। অবিদ্যারূপ বিপর্য্যয়বৃত্তির অন্বয় ছাড়া কোনও ক্লেশেরই স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু অবিদ্যা মিথ্যা। সম্যকজ্ঞান দ্বারা এই মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে ক্লেশসমূহ দগ্ধবীজের ন্যায় সামর্থহীন হইয়া যায়, তখন আর তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অবিদ্যাই ক্লেশের নিমিত্ত। সুতরাং এক অবস্থার কথা বলিলেই ইহাদেরও কথা বুঝিতে হইবে। সমস্ত ক্লেশই চিত্তে বিক্ষেপ জন্মায়, সুতরাং যোগী প্রথমে ইহাদিগের উচ্ছেদ করিতে যত্নশীল হইবে। (৪)

যাহা মূলে যাহা নয়, তাহাকে তাই মনে করা—এই হইল অবিদ্যার সামান্য লক্ষণ। এই কথাটাই বিস্তার করিয়া বলিলে বলা যায়, যাহা অনিত্য, অশুচি, দুঃখকর ও অনাত্মবস্তু, তাহাকেই নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মবস্তু বলিয়া জ্ঞান করাই **অবিদ্যা**। যেমন ভোগোপকরণ যা বিষয়মাত্রেই অনিত্য—অথচ তাহাদিগকে আমরা নিত্য জ্ঞান করি। তেমনি অশুচি দেহকে শুচি বলিয়া মনে করি, দুঃখময় বিষয়-ভোগকে সুখময় ভাবি, আত্ম-ব্যতিরিক্ত এই দেহে আত্মাভিমানের আরোপ করি। এইরূপ পাপে পুণ্য বোধ, অনর্থে অর্থ-বোধ ইত্যাদিও অবিদ্যা। (৫)

দৃক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই হইল **অস্মিতা**। পুরুষই **দৃক্‌শক্তি**। আর অন্তঃকরণরূপ যে সাত্ত্বিক পরিণাম রজঃ ও তমোদ্বারা অভিভূত নয়, তাহাই হইল **দর্শনশক্তি**। এই দুইটার মাঝে দৃক্‌শক্তি ভোক্তা ও অজড়, আর দর্শনশক্তি ভোগ্য ও জড়, সুতরাং ইহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাদিগকে এক বলিয়া যে অভিমান তাহাই অস্মিতা। প্রকৃতির বস্তুতঃ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব না থাকিলেও "আমি কর্ত্তা—আমি ভোক্তা", এইরূপ অভিমান জন্মিয়া থাকে। এই অভিমানরূপ বিপর্য্যাসবৃত্তিই অস্মিতা ক্লেশ। (৬)

পূর্ব্বে যে সুখ অনুভব করিয়াছে, তাহার সেই সুখের স্মৃতি থাকায় সুখসাধনের প্রতি যে তৃষ্ণা তাহাই **রাগ**। আবার পূর্ব্বে যে দুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহার সেই দুঃখস্মৃতি লইয়া দুঃখসাধনের প্রতি যে অনভিরুচি, তাহাই **দ্বেষ**। (৭, ৮)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে জীব মরণদুঃখ অনুভব করিয়াছে। সেই অনুভবের প্রতিকূল বাসনা তাহার মাঝে আছে। এই বাসনা হইতে জাত মরণত্রাস বা চিত্তে মৃত্যুভয়ের সঞ্চার হয়। "এই শরীর হইতেই বা বিষয় হইতে আমি যেন কখনও বিযুক্ত না হই"—এই ভাব সর্ব্বদাই সকলের মধ্যে [illegible]। কোনও নিমিত্ত ছাড়া, ক্ষুদ্র কৃমি হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রাণিমাত্রে যে [illegible], তাহারই নাম **অভিনিবেশ**। (৯)

ব্যুত্থানদশা এই সমস্ত ক্লেশদ্বারা কণ্টকিত। একাগ্রতা অভ্যাসদ্বারা প্রথমেই ইহাদিগকে দূর করিতে হয়। কিন্তু ইহাদের

স্বরূপ না বুঝিলে তো ইহাদিগকে দূর করা যায় না, তাই এ পর্য্যন্ত সূত্রকার ক্লেশসমূহের নাম নিমিত্ত, বিভাগ ও লক্ষণ ব্যাখ্যা করিলেন। এখন স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে কিরূপে তাহাদের নিরূপণ করা যায়, তাহাই বলা হইবে।

যে সমস্ত ক্লেশ বাসনারূপেই থাকে, বৃত্তিরূপে অভিব্যক্ত হয় না, তাহারা সূক্ষ্ম। প্রতিপ্রসব বা চিত্তের প্রতিলোম পরিণাম দ্বারা তাহাদিগকে নিবারিত করিতে হইবে। প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেলে চিত্ত যখন বাসনা সহিত স্বকারণ অস্মিতায় প্রবিষ্ট হয়, তখন ক্লেশ সমূহও নির্ম্মূল হইয়া যায় —আর তাহাদের উদ্ভব হয় না। (১০)

কিন্তু যে সমস্ত ক্লেশ স্থূল বা কার্য্যকরী, তাহাদিগের সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক বৃত্তির উদ্ভব হয়। চিত্তৈকাগ্রতারূপ ধ্যান দ্বারা সেই ক্লেশ দূর করিতে হইবে। ইহারা স্থূল বলিয়া কেবলমাত্র চিত্ত পরিকর্ম্মের অভ্যাসেই ইহাদের নিবৃত্তি হইতে পারে। যেমন বস্ত্রাদিতে যে স্থূল মল, তাহা প্রক্ষালনেই দূর হইয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম মল দূর করিতে হইলে তাপ প্রভৃতি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। (১১)

সমস্ত কর্ম্মেরই কিছু না কিছু সংস্কার থাকিয়া যায়—তাহার নাম **কর্ম্মাশয়।** ক্লেশই কর্ম্মাশয়ের মূল, কেননা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মেরই মূলে ক্লেশ রহিয়াছে। কর্ম্মাশয়ের ফল দুই প্রকার—দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে ফল এই জীবনেই অনুভব করা যায়, তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং যে ফল জন্মান্তরে অনুভবনীয়, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। কর্ম্মাশয় দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। দেবারাধনা প্রভৃতি কোনও পুণ্যকর্ম্ম তীব্রসংবেগ সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে ইহজন্মেই বিশিষ্ট জাতি, আয়ু ও ভোগের নিমিত্ত হইয়া থাকে। যেমন নন্দীশ্বর মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া ইহজন্মেই বিশিষ্ট জাতি, আয়ু ও ভোগের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রেরও তপঃপ্রভাবে বিশিষ্ট জাতি ও আয়ুর উদ্ভব হইয়াছিল। কাহারও বা কর্ম্মাশয়দ্বারা বিশিষ্ট জাতিরই উদ্ভব হয়। যেমন দুষ্টকর্ম্মকারী নহুষের তীব্রসংবেগবশতঃ সর্পজাতিতে পরিণাম হইয়াছিল — কার্ত্তিকেয় বনে উর্ব্বশীর লতারূপে পরিণাম ঘটিয়াছিল। এইরূপ কর্ম্মানুসারে জাতি, আয়ু ও ভোগের মধ্যে কাহারও দুই বা সকলগুলিরই পরিণাম হয়, কাহারও বা কোনও একটি মাত্র পরিণাম ঘটে। (১২)

কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মসংস্কারের মূল কারণ ক্লেশ। চিত্তে যদি ক্লেশ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে, ভালমন্দ সকল কাজের ফলে জীবের জাতি আয়ু ভোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রভৃতি নানা যোনিতে জন্ম — জাতি; নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যাপিয়া দেহ সম্বন্ধ — আয়ু, ভোগের অর্থ যথাক্রমে বর্ম্ম, কিন্তু ভোগ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করিলে তাহার অর্থ দাঁড়ায় বিষয় (যাহা ভোগ করা যায়), ইন্দ্রিয় (যাহা দ্বারা ভোগ করা যায়) ও সুখদুঃখ সংবিৎ (যাহা ভোগস্বরূপ)। ভোগ অর্থে এই তিনটীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই অনাদি কাল হইতে চিত্তভূমিতে কর্ম্মবাসনা সমূহ সঞ্চিত রহিয়াছে; বাসনার পরিপাক অনুযায়ী তাহারা বলবৎ কিম্বা দুর্ব্বল হইয়া জাতি, আয়ু, ভোগরূপ স্ব স্ব কার্য্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। (১৩)

জাতি, আয়ু ও ভোগ কর্ম্মের ফল। সুতরাং তাহাদের কার্য্য স্বকারণ কর্ম্মের অনুসারেই হইবে। তাই পুণ্যকর্ম্মহেতু যে জাতি, আয়ু ও ভোগ নিরূপিত হয়, তাহাদের ফল সুখ;

আর অপুণ্য কর্ম্ম হইতে যাহাদের উদ্ভব, তাহাদের ফল দুঃখ। (১৪)

এই যে সুখ ও দুঃখরূপ দুইটী ফলের কথা বলা হইল, ইহা সকল জীবের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু যোগীর কাছে পরিদৃশ্যমান সমস্ত ভোগসাধনই বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় দুঃখকর -কেননা তিনি ক্লেশের স্বরূপ জানিয়াছেন এবং তাহার স্পর্শ হইতে নিজকে মুক্ত রাখিবার সঙ্কল্পও বুঝিতে পারিয়াছেন। যে যোগীর সাধনসঞ্চয় যত অধিক, দুঃখ হইতে তাঁহার তত উদ্বেগ। যেমন চোখের মাঝে একটী মাকড়সার সূতা স্পর্শ করাইলেও পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু অন্য অঙ্গে তাহা হয় না, তেমনি বিবেকী ব্যক্তি স্বল্পমাত্র দুঃখের সংস্পর্শেই পীড়া অনুভব করেন।

যোগীর দুঃখানুভবের হেতু এই। যোগী দেখেন, সমস্ত বিষয়েই পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ সংস্কারদুঃখ ও গুণবৃত্তির বিরোধ বর্ত্তমান। বিষয় ভোগের সময় বিষয়ের প্রতি লালসা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সেই সঙ্গে অভিমত বিষয় না পাওয়ার দুঃখও অপরিহার্য্যরূপে উপস্থিত হয়। আবার অভিমত বিষয় লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইলেও দুঃখ ভিন্ন তাহা মিলে না। এই অপ্রাপ্তির দুঃখ আর প্রাপ্তি সাধক দুঃখকেই বলে **পরিণাম দুঃখ**।

আবার সুখকর বিষয় উপভোগের সময়ও চিত্তে তদ্বিপরীত দুঃখকর বিষয়ের প্রতি দ্বেষ থাকিবেই; সুতরাং সুখানুভবকালেও দুঃখানুভব অপরিহার্য্য। ইহাকেই বলে **তাপ দুঃখ**।

নিজের অভিমত বিষয় নিকটে থাকিলে সুখসংবিৎ উৎপন্ন হয়; আবার অনভিমত বিষয় হইতে দুঃখসংবিৎ জন্মে। কিন্তু এই সুখ-দুঃখের সংবিৎ হইতে চিত্তক্ষেত্রে আবার সেইরূপ সংস্কারের উদ্ভব হয়। সংস্কার হইতে আবার সুখদুঃখের সংবিৎ জন্মে: এইরূপে সংস্কারোৎপত্তির আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। সর্ব্বত্র সংস্কারের এই অনুবৃত্তিই **সংস্কার দুঃখ**।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ বৃত্তি গড়িয়াছে। কিন্তু ইহারা সর্ব্বদাই চিত্তক্ষেত্রে একটী আর একটীকে অভিভূত করিয়া জন্মায় বলিয়া পরস্পরের মাঝে বিরোধ বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এই বিরোধরূপ দুঃখ দ্বারা চিত্ত সর্ব্বদাই অনুবিদ্ধ থাকে। ইহাই **গুণবৃত্তিবিরোধরূপ দুঃখ**।

বিবেকী ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাই উক্ত চারিটী কারণে সমস্ত বিষয়ই তাঁহার কাছে দুঃখময় বলিয়া মনে হয়। তিনি দেখেন, সমস্ত কর্ম্মের বিপাকেই দুঃখ। (১৫)

এই যে ক্লেশ, কর্ম্মাশয় ও কর্ম্মবিপাকের কথা বলা হইল, ইহাদের মূল হইল অবিদ্যা। অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞানরূপ, সুতরাং সম্যক্ জ্ঞানে তাহার বিচ্ছেদ হইবে। সম্যক্‌জ্ঞানের স্বরূপ জানিতে হইলে, তাহার সাধনই বা কি এবং সেই সাধনের অনুকূলে কি ত্যাগ করিতে হইবে এবং কি কি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও অবধারণ করিতে হইবে।

প্রথমে হেয় বা ত্যাজ্য কি তাহাই নিরূপণ করা হইতেছে। যে সংসার দুঃখ এখনও আসিয়া জুটে নাই, তাহাই **হেয়**। কেননা যে দুঃখ অতীত, তাহা তো চলিয়াই গিয়াছে; আর যে দুঃখ বর্ত্তমানে অনুভবের বিষয়, তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার সাধ্য কাহারও নাই। সুতরাং অনাগত দুঃখই হেয় অর্থাৎ দুঃখ যাহাতে আর না হয়, তাহার জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। (১৬)

মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব

তারপর আমরা এলাম অন্তর্জগতে—বেদনার ভূমিতে। অন্তর্জগতেও তোমরা সবাই এক। এ কথা একেবারে নিছক সত্য—এ ও তোমাদের অনুভবের সামিল। ধর একটা বীণা রয়েছে—তার তারগুলি বেশ ঘাটমত বাঁধা; আবার তার কাছেই আর একটা বীণা রয়েছে; তারও তারগুলি ওই একই ঘাটে বাঁধা। এখন তুমি যদি একটা যন্ত্রে আঘাত কর, তাহলে এটা হতে যেমন সুর বেরুবে, ওটা হতেও তেমনি সুর বেরুবে। বাজাতে গেলে এটাতেও যে তারগুলি ঝঙ্কার দেবে, ওটাতেও ঠিক সেই তারগুলিই ঝঙ্কার দেবে। এমন হয় কেন?

এর কারণ হচ্ছে এই, যে স্পন্দনে একটা বীণাতে সুর উঠেছে, সেই স্পন্দন আর একটা বীণাতেও রয়েছে। তোমার অন্তরে হয়ত একটা কিছু ভাব জাগল—অমনি যে তোমার কাছে বসেছে, তার মাঝেও তার ঢেউ উঠল। নাটক অভিনয় করতে গিয়ে অভিনেতারা কত রকম ভাবের আরোপ করে থাকে। তাদের ভাব তো ঐকান্তিক নয়—একদিকে তারা কাঁদে, আর একদিকে আবার হাসে। কিন্তু ছলনা হলেও দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনয়ের কায়দা এমনি সুন্দর যে, তারা যদি কাঁদে, তবে সকল দর্শকই চোখের জলে ভেসে যায়। এ কেমন করে হয়?

একটা বীণার তারে আঘাত দিলে—অমনি তোমাদেরও মনোবীণার তারে ঝঙ্কার উঠল। তোমাদের সবারই মন যদি এক না হত, ভাবজগতে যদি তোমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাইয়ের মত সম্পর্কিত না হতে—একাত্ম না হতে, তবে এমনটা কখনো হত না। একটা ঢেউএর সঙ্গে আর একটা ঢেউএর যে যোগ, তোমাদের অন্তরে-অন্তরে যদি তেমন যোগ না থাকত, সবারই মন যদি একই চিত্তসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ না হত—তবে এই সব বেদনা কিছুতেই জন্মাত না। বিজ্ঞান বলে, একটা বস্তু যদি আর একটা বস্তুর মাঝে বেগ সঞ্চার করে, তবে উভয়ের মাঝে নিশ্চয়ই সংযোগের অনুবৃত্তি রয়েছে—এই অনুবৃত্তির আইন ডিঙিয়ে কোনও শক্তিরই ক্রিয়া হতে পারে না।

এই যে সামনে কঠিন নিরেট টেবিলটা রয়েছে, এর একটা অংশ নড়লেই সবটা নড়ে ওঠে—কেন? কারণ এই অংশটার সঙ্গে বাকী সকল অংশটাই যে নিরেট হয়ে গাঁথা। শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে অনুবৃত্তির ক্রিয়া—আশ্রয়ের অনুবৃত্তি না থাকলে শক্তির সঞ্চালন সম্ভব হয় না। ধর একটা মানুষের হৃদয়ভাব আর একটা মানুষে সংক্রামিত হয়েছে। যে কোনও মাধ্যমিকের সংযোগে হৃদয়ে হৃদয়ে যদি অনুবৃত্তি না থাকত, তাহলে এ কি কখনও সম্ভব হত? তোমাদের সকলের হৃদয় যদি এক সূত্রে গাঁথা না থাকবে, তবে একের মনোভাব অপরের মাঝে পৌঁছাবে কি করে?

এ একেবারে খাঁটি কথা। হৃদয় হতে হৃদয়ে যে ভাব চলাচল হয়, তা দেখে তোমায় এ সিদ্ধান্ত করতেই হবে যে, তোমাদের সকলের হৃদয়ই পরস্পরের সঙ্গে এমনি নিবিড় ভাবে যুক্ত যে তাদের এক বলা ছাড়া আর

উপায় নাই। ভাবের সংহতি আছে—চিন্তার সংহতি আছে মানুষের মাঝে! স্বামী অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখেছেন যে বক্তৃতার সময় তিনি যদি হাসলেন, তবে সকলে হেসে উঠল। এও দেখা, একজন যদি কাঁদল, তবে আশে পাশে যারা বসেছে, তাদেরও মন গলে গেল। একজন গান গাইছে, আর তার সুরের তরঙ্গ সবার মনের মাঝে দোলা দিচ্ছে। স্বামী এমনও দেখেছেন, একজন যদি গান গাইল, তবে তা শুনে আর দশজনকেও গানে পেয়ে বসল। এ সংহতির সত্য! তোমাদের সবারই মন যদি এক না হবে, তবে এ হয় কেমন করে?

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর। আমরা শিখি কি করে? লোকের কাছ থেকে, বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে তো আমরা নানা বিষয় শিখি? কিন্তু শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের যদি যোগই না থাকবে, একই মনোভূমিতে যদি তারা না দাঁড়াবে, তবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শেখাবে কি করে? এই তো দেখছ, দুটো মনের মাঝে অতি স্পষ্ট যোগ! একজনের জ্ঞান আর একজনের আয়ত্ত হচ্ছে! দুয়ে যদি সাক্ষাৎ যোগ না থাকবে, তবে এ হবে কি করে? আবার নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাতে এও তো তোমরা দেখেছ যে, তোমার বন্ধুর ব্যথা যদি তুমি ভাব প্রীতি, সমবেদনা, শুভানুধ্যান প্রভৃতি যে কোনও বৃত্তিই তুমি তার সম্বন্ধে পোষণ কর না কেন—সে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও ঠিক একই ভাবে তার বুকখানা কেঁপে উঠবে। স্বামী এ কথার সত্যতা কতবার প্রত্যক্ষ করেছেন, আজও প্রত্যক্ষ করছেন হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানেও কিছু আসে যায় না। এতে কি এই প্রমাণ হয় না যে সকলের চিত্ত একই ভূমিতে—একই নিগূঢ় যোগে যুক্ত? তাহলে তো ভাবের জগতেও তোমরা পরস্পরের ভাই!

মানুষ এ জগতে অপরাধ করে, পাপ করে কি করে, তা জান না। মনে কর, একটা লোক এসে তোমার প্রাণে আঘাত দিল, কিন্তু তার শক্তি যেন তোমার চেয়ে ঢের বেশী। তার বিরুদ্ধে তোমার চিত্তটা ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল, কিন্তু এদিকে তোমার এমন ক্ষমতা নাই যে সে মনোভাবটাকে তুমি কার্য্যে পরিণত কর। আবার সেই জবরদস্ত লোকটা আর একজনকে আঘাত করল—সে লোকটাও নিতান্ত ঠাণ্ডাগোছের—সেও মনে মনে তার প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু তার কুভাবনাকে সে কার্য্যে পরিণত করতে পারল না। আবার সেই লোকটাই তৃতীয় একজনের অনিষ্ট করল সেও যেন নেহাৎ একটা গোবেচারা—প্রত্যক্ষভাবে অপরাধীকে শাস্তি দেবার সাধ্য তার নাই। এমনি করে অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলল—ক্রমে বিশ জন, পঁচিশ জন, একশ জন লোক হয়ত সেই লোকটারই খপ্পরে পড়ে নাস্তানাবুদ হল। শেষে একবার একটা খুব মস্তিমান লোকের সঙ্গে তার বেধে গেল—একেবারে সমানে সমানে।

সামান্য একটু খোঁচা খেয়েই এই লোকটা এমনি তেতে উঠল যে খোঁচাটা তার একটু লেগেছে কি না লেগেছে, তার দিকে সে ভ্রূক্ষেপই করল না। অপমানের মাত্রা ঠিক করবার জন্য সে একটুও ভাবনাচিন্তা করল না—একেবারে মারমুখী হয়ে বন্দুক নিয়ে তেড়ে এসে সেই লোকটাকে গুলি করে বসল। পুরোণ পাপী তো গুলি খেয়ে মরল, তারপর পুলিস এসে এই লোকটাকে খুনী বলে ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কাছে চালান দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন

করে দেখলেন—এ কি কাণ্ড!—যতটুকু অপমান ওর হয়েছে, তার তুলনায় এ কি চণ্ডালী রাগ লোকটার! অপমান তো বলতে গেলে কিছুই না—কিন্তু তার তুলনায় দেখ দিকিনি লোকটার কি ভয়ানক রাগের বহর! ম্যাজিষ্ট্রেট অবাক্ হয়ে রইলেন—পত্রিকাওয়ালারাও খবরটা লুফে নিল—চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "বাপ রে কি ভয়ানক লোক—পান থেকে চুণটুকু খসতেই একেবারে রেগে মেগে কুরুক্ষেত্র। কিছু হয়েছে না হয়েছে আর অমনি একটা মানুষ খুন করে বসেছে।"

এমন কত কিছু রোজ হচ্ছে না কি? কিন্তু ম্যাজিষ্টরও জানেন না, খবরের কাগজওয়ালারাও জানে না, এইটুকু অপমানে এতটা রাগ লোকটার হল কিসে? বেদান্ত তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন। বেদান্ত বলেন, এখানে একই মনোজগতের একটা যৌথ কারবার গড়ে উঠেছিল। তোমরা তো জান, যৌথ কারবারে অনেক অংশীদার থাকে, তাদের মাঝে একজন থাকে ম্যানেজার বা পাণ্ডা। লোকটা প্রথম যখন তোমার অপমান করেছিল, তখন তুমি তার বিরুদ্ধে একটা দুষমনের ভাব তো পোষণ করেছিলে? রাগের কারবারে এইটুকু হল তোমার বখরা—মানুষটার বিরুদ্ধে ওই রাগটুকু পুঁজির তহবিলে তুমি দিলে। তারপর দ্বিতীয় লোকটাকে অপমান করতে সে ও তার হিস্সে মত কিছু দিল, তৃতীয় লোকটাকে অপমান করতে সে ও কিছু পুঁজি বাড়াল। এমনিভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আদি করে সবাই কিছু কিছু তহবিল বাড়াল। শেষে তহবিল এত ফেঁপে উঠল যে কারবার সুরু করবার সময় এল।

মেলা ভাগিদার এসে যখন জুটল, তখন এল ওই জবরদস্ত ম্যানেজারটা। তাকে চটাতেই মানসিক আকর্ষণের আইনের বলে, এর আগে দুশো লোক যে ওই লোকটার সঙ্গে মনে মনে দুষমনী করেছে, সেই সবার রাগের পুঁজি এসে ম্যানেজারের হাতে পড়ল—সে একা সকলের রাগ জমিয়ে নিয়ে একেবারে শেষ ঘা বসিয়ে দিল - লোকটাকে গুলি তো করলই, নিজেও বাজার আইনে অপরাধী হয়ে দাঁড়াল। গবর্মেণ্ট তো কেবল ম্যানেজারকেই সাজা দিল, কিন্তু ভগবানের চক্ষে, সত্যের বিচারে, তোমরা সবাই দোষী—সবাই অংশীদার—সবাই খুনী। হাঁ, তোমরাও খুন করেছ বই কি? যে লোকটা খুন করেছে, তার যতটুকু অপরাধ, তোমরা যারা শুধু চিন্তায়, তারে দুষমণী করেছ, তোমাদেরও ঠিক ততখানিই অপরাধ।

তাই খৃষ্ট বলেছিলেন, কেবল খুন না করলেই বেঁচে গেলে না—কারু অনিষ্টচিন্তা পর্য্যন্ত তুমি করতে পাবে না। যে মানুষ মারে, সে ও যেমন খুনী, তেমান মানুষকে ঘৃণা করে যে, সে ও খুনী। এই থেকেই বুঝতে পারবে, যারা খুন খারাপী করে, তারা যতটুকু অপমান পেয়েছে, তার শতগুণ চটে ওঠে কেন। অপমান হল এক তিল—কিন্তু ঝাঁঝটা হল এক তাল; কেন? কারণ, ও তো তোমার ব্যক্তিগত রাগ নয়; তোমার ভাই বেরাদরের রাগই যে এসে তোমার ঘাড়ে চেপেছে—তারা যে তোমায় পাগল করে তুলেছে। এতটুকু অপরাধ পেয়েও তুমি সবারই মনের ঝাল মিটাতে যাও কি না—তাই কাণ্ডটা এত বড় হয়ে যায়।

মানুষকে ভূতে পায়, দানোতে পায়, তা তো শুনেছ? তেমনি তোমাদের রাগেও পায়। আর রাগে পেলেই তোমরা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পাগল হয়ে একেবারে মরণ,

মায় মেরে বস। আর আমরা অবাক হয়ে ভাবি—তাই তো এ হল কি?—এইটুকু ব্যাপারে অত বড় কাণ্ড?

মানুষ গড়ে এমনি করে। ইতিহাস পড়েছ তো? তার মাঝে দেখবে, দেশের মাঝে যখন যে একটা বিপ্লব হয়ে যায়, তখন সবাই এমন একটা লোক চায়—বজ্রের মত যার শাসন, অশান্ত প্রজার যে টুঁটি চেপে ধরতে পারে। প্রজাকে শান্ত রাখতে সবাই চায়, কিন্তু কারু হয়ত ক্ষমতায় কুলায় না। তখন সবারই ইচ্ছা মিলে এমন একটা লোক তৈরী হয়, যে নাকি বিদ্রোহী প্রজাকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারে।—সেই হচ্ছে তখন নেপোলিয়ান। যে যুগে নেপোলিয়ানের দরকার, সেই যুগেই তার আবির্ভাব হয়—তাই তার মাঝে হাজার লোকের, লক্ষ লোকের শক্তি সংহত হয়ে থাকে। বীরের মাঝে লক্ষ লোকের শক্তি থাকে কেন? একটা সৈন্যদল এসেছে নেপোলিয়ানকে ধরতে—আর তিনি একা তাঁদের গিয়ে বললেন, "থাম্ তোরা"—আর অমনি সব থ'বনে গেল। এই তো দেখি একটা লোক হাজার লোককে ভেড়া বানিয়ে দিচ্ছে। লোকে সে কথা শুনে অবাক হয়; কিন্তু বেদান্ত তার ব্যাখ্যা জানেন।

বেদান্ত বলেন, এখানে বাস্তবিকপক্ষে হাজার লোকের চিন্তা, হাজার লোকের শক্তি এসে একজনের মাঝে সংহত হয়েছে—হাজার জনের ভাবনায় একটা লোক গড়ে উঠেছে। কাজেই কোনও বীরের বা কোনও নেপোলিয়ানের অধিকার নেই যে আপনাকে সে হামবড়া বলে ভাববে। বীর তুমি?—লক্ষ লোকের শক্তি যদি তোমার মাঝে থাকে—তবে লক্ষ লোকই যে তুমি—তুমি একা নও যে! লক্ষ লোকের ভাবনা তোমার দেহের উপর ক্রিয়া করছে। তুমি যে ভগবানের একটা আজব সৃষ্টি, এমন গুমোর তোমার থ'কে কোথায়? তোমার মাঝে লক্ষ লোকের যে ক্রিয়া হচ্ছে।

তারপর ধর সেক্সপীয়র—কত বড় নাট্যকার তিনি। আজকাল আর সেক্সপীয়রের প্রয়োজন হয় না। তখনকার লোক সেক্সপীয়রকে চেয়েছিল, তাই তিনি এসেছিলেন। তখন ছিল নাটকে দিন—নাটক দেখতে যাওয়া ছিল সবার একটা বাতিক। তখনকার লোকে চাইত নাট্যকার, চাইত নাটক। লোকে যা চাইত—সেই মনের গতি হতে, সেই ভাবনা হতে সেক্সপীয়রের আবির্ভাব হল। আবার দেখ মজা, সেক্সপীয়র-ধরণের লোক কখনও একা আসে না। সেক্সপীয়রের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি একেবারে এক ঝাঁক নামজাদা তুখোড় ভাবুক—মার্লো, বুমন্ট, ফ্লেচার ইত্যাদিতে দেশ ছেয়ে গেছে তখন—সবাই মিলে ওই এক রকমের সাহিত্য গড়ে তুলছে।

এইখানে দেখি, পারিপার্শ্বিক ঘটনা হতে যুগপ্রভাবে সব মানুষের মনের গতি একমুখী হয়েছে—রাসায়নিক আকর্ষণের ফলে সবার চিন্তা এসে যেন এক জায়গায় জমেছে—আর তা হতে তোমার সেক্সপীয়রের আবির্ভাব হয়েছে। তা হলেই দেখ, লক্ষ লক্ষ লোকের ভাবনা বা চিন্তা যদি একজনের মাঝে সংহত না হয়, তবে কি অমন মিষ্টি মুখ নিয়ে সেক্সপীয়রের জন্ম হয়?—হাজার লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে, অমন বক্তার উদয় হয়?—লক্ষ লোককে চালনা করতে পারে, অমন নেতার সৃষ্টি হয়?—লক্ষ লোকের শির নোয়াতে পারে, অমন সেনাপতি জন্মায়?—লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে শক্তি আনে, এমন প্রতিভার উদ্ভব হয়?

কাজেই দেখছ, সেক্সপীয়ার বল আর নেপোলিয়ান বল, সবই তোমাদের আপন হাতের সৃষ্টি। তোমাদের আবেগ দিয়ে, তোমাদের চিন্তা দিয়ে তাদের হৃদয়, তাদের প্রতিভা গড়ে উঠেছে। এ সব ইতিহাসের সত্য—প্রতিদিনই আমরা চারদিকে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। কাজেই বলতে হয়—মনোজগতেও তোমরা সবাই এক।

খ্রীষ্টানদের জেরুজিলাম উদ্ধারের জন্য ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ কি করে হয়েছিল? জেরুজিলামের অবস্থা দেখে কারু প্রাণে হয়ত খুব আঘাত লেগেছে। সে ব্যক্তি ইউরোপে এসে দেশের লোকের কাছে জেরুজিলামের দুর্দ্দশার কাহিনী প্রচার করতে লাগল। তীর্থের দুর্গতির কথা বলতে বলতে লোকটা একেবারে কেঁদেই ফেল্‌ল। একজনের প্রাণে যে ব্যাকুলতা জাগল, সেই ব্যাকুলতাই আবার সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। তখন সকলে মিলে তুর্ক মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। এমনি করে ক্রুসেড অভিযানের উৎপত্তি হল।

তোমাদের আমেরিকাতে স্বাধীনতার সংগ্রাম কি করে সুরু হল?—ঠিক এই ভাবেই। একটী মাত্র লোক—সে আর কেউ নয়, তোমাদের জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি—লোকের সঙ্গে মত না মিললেও তিনি উত্তেজিত হয়ে খাপ হতে তলোয়ার খুলে বলে উঠলেন—"যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই।" অমনি সবাই সেই এক ধূয়া ধরল। সভায় যে সমস্ত বিরোধী লোক ছিল, সভাপতির সঙ্গে যাদের মতের মিল ছিল না তাদের পর্য্যন্ত তখন তাঁর মতেই মত দিতে হল। কিন্তু এইখানেই বোঝ সবার হৃদয়-মন যদি এক না হবে, তবে এমন সব অঘটন ঘটে কি করে? আমরা সবাই এক—এই একত্বের অনুভূতি চাই!

তারপর আর এক ভূমিতে এলাম। দেখ, সুষুপ্তিতেও তোমরা সবাই এক। ঘুমের মত এমন আর কেউ সবাইকে এক করতে পারে না। সুষুপ্তিতে কারু সঙ্গে কারু ভেদ থাকে না। রাজা যে মকমলের গদীতে রাজ-আস্তরণে গা ঢেকে ঘুমুচ্ছেন আর একজন কাঙ্গাল যে রাস্তার ধারে পড়ে ঘুমুচ্ছে—এ দুজনেরই তো একই অবস্থা। দুজনেরই সুষুপ্তির অবস্থাটী ভেবে দেখ দেখি। ভেদ কোথায়? দুইই যে তখন এক!

তবেই দেখছ, তোমরা সুষুপ্তিতে সবাই এক। মনোজগতে, স্বপ্নজগতে তোমরা এক। আবার সবার জাগ্রৎ অবস্থাতেও দেখেছি, তোমাদের সবারই দেহ এক। এর পর আমরা আত্মার কথা বলব। হাঁ, আত্মাই তো মূল, আত্মাই সত্য—এই আত্মাই এক। আত্মার বেলায় দ্বৈতের ভাষা প্রয়োগ করবার কোনও উপায় নেই। তরঙ্গ অথবা ঢেউ—এমন কথাও তোমার সেখানে চলবে না—সেখানে সবাই এক। তুমি হয়ত বলবে, বাঃ, এ কি করে হবে?—আমার ছেলে আমারই—কিন্তু এই লোকটা তো আমার নয়। তা যদি তুমি ভেবে থাক; তবে ওটা তোমার মহাভ্রম—ও হতেই পারে না। কখনও যাদের তুমি তোমা হতে পৃথক বলে জানছ, তারাও তোমার ছেলের মতই তোমার আপনার। ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে, মেয়ে হয়ে, বাবা হয়ে, কতবার কত জন্মে যে তাদের সঙ্গে বাঁধা পড়েছ, সে খবর কি রাখ! আজ যাকে তোমার শত্রু বলে মনে করছ, আর এক জন্মে সেই হয়ত তোমার বাপ কিম্বা ভাই ছিল। আজ যে তোমার পিতা, পরজন্মেও সে তোমার পিতা

থাকতে পারে—হয়ত অন্য পিতামাতা হতে তখন তোমার জন্ম হবে।

যেমন তোমার মনোভাব বা হৃদয়বৃত্তিগুলি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে, তেমনি তোমার ভাই-বোন আত্মীয়স্বজনদেরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে এমন ঘটনা কি দেখনা যে, একই বাড়ীতে যে সমস্ত ছেলে মেয়ে জন্মেছিল, সারা জীবনটা হয়ত এত দূরে দূরে কাটাল যে কেউ কারু মুখ পর্য্যন্ত দেখল না, আবার এমন হল যে এই দেশে একজন জন্মে সারাটা জীবন আর এক দেশে গিয়ে কাটিয়ে দিল? এর মানে কথাটা হচ্ছে এই যে এ দেশে তার জন্ম হলেও অন্য দেশের লোকের সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। কাজেই দেখছ, যাদের আপন ভাই-বন্ধু বা স্বামী স্ত্রী বলে মনে করছ, শুধু তাদের মাঝেই তোমার আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ রাখলে চলে না। এ জগতের সবাই তোমার আপন, তোমার আত্মস্বরূপ—এইটী বিশেষ করে অনুভব কর। বিজ্ঞান এর প্রমাণ দিয়েছে।

রাম এখন সমস্ত সিদ্ধান্তের সংক্ষেপ করবেন। বিজ্ঞান দেখিয়েছে, যে বিশেষ দেহটাকে তুমি 'আমি' বলে মনে করছ—সেটা এক। তোমার পায়ের আঙ্গুলগুলির গোড়া-লীর সঙ্গে যোগ রয়েছে—সে আবার শরীরের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত;—এমনি করে সমস্তটা শরীরের মধ্যে তার প্রতি অণু-পরমাণুর পর্য্যন্ত যোগাযোগ রয়েছে—তোমার সমস্তটা দেহ এক, অখণ্ড। এই জন্যই একমাত্র আত্মাই তার আনখাগ্রকেশ পর্য্যন্ত পরিপূরিত করে রয়েছেন। স্পষ্টই দেখছ একই আত্মা; একই অনুভূতি তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত।

আবার বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, এই জগতের সমস্ত বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে এমনি নিগূঢ় ভাবে যুক্ত যে, যদি একটী নিতান্ত অপরিণত জীবকোষের পাশে তার চেয়েও পরিণত আর একটী কোষ রাখ, তারপরে আবার আর একটী রাখ, তা হলে এমনি করে সাজিয়ে গেলে দেখতে পাবে, জগতের সব বস্তুরই মাঝে একটা আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা রয়েছে—সবার মাঝেই সূত্রবৎ একটা অনুবৃত্তি চলছে।

সমস্ত জগতের মাঝেই এই সূত্রবৎ অনুস্যূতি—একে ছাড়িয়ে যাবার আর কোনও পথ নাই। তাই যদি হয় তাহলে সমস্তটা বিশ্বই তো একটা অখণ্ড সত্তা। যেমন নাকি তোমার এই ক্ষুদ্র দেহপিণ্ডের বেলায় বুঝেছিলে, একই অনুভূতি আত্মারূপে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাপে রয়েছে; তেমনি জগৎ যদি একটা অখণ্ড পিণ্ড হয়, তাহলে তার মাঝেও একই আত্মা সর্ব্বব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন—ক্ষুদ্রতম পরমাণু হতে মহত্তম ব্রহ্মা পর্য্যন্ত তিনি অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মাতে যে আত্মার বিকাশ, একটী তুচ্ছ কীটাণুকীটেও সেই আত্মারই বিকাশ—আত্মার দিক দিয়ে সেখানে সবাই এক।

মানবজাতির একত্ব প্রমাণ করতে যে সব যুক্তি-তর্ক রয়েছে, তা কতকটা তোমাদের বলা হল। এখন বাস্তবে এই সত্য প্রয়োগের উপর রাম বিশেষ জোর দিচ্ছেন। বুদ্ধি দিয়ে এই সত্য তুমি গ্রহণ না করতে পার, কিন্তু নীতির আইনে এ তোমাকে মেনে নিতেই হবে। বাস্তব-জীবনে এ সত্য তোমাকে প্রয়োগ করতেই হবে—নইলে তুমি যে মরবে। আর তো কোনও পথ নাই তোমার।

এই যেমন হাতখানা রয়েছে। এ যদি স্বার্থপর হয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করতে চায়,

যদি এমন তর্ক করে যে, "বাঃ রে, আমি সারা দিন খেটে মরি আর আমার সমস্ত কাজের ফল ভোগ করে ওই পেট—আমি তো কিছুই পাই না! কিন্তু আমি আর ওকে একলা একলা সকল সুবিধা ভোগ করতে দিচ্ছি না—আমার সব আমি আমার কাছে রাখব।" মনে মনে এমনি তর্ক করে হাত তখন তার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করতে চাইল। দুধ-ঘি, মাছ-মাংস, শাক-সব্জি প্রভৃতি যত কিছু খাবার নিত্য জোটে, তা সে এখন নিজে খাবে—সবটুকু মজা সেই লুটবে। এই ভেবে হাত করল কি, একটা সূঁচ নিয়ে নিজের গায়ে একটা ছ্যাঁদা করে দুধ ঘি সব তার মাঝে পিচকারী দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে লাগল—যাতে দাঁত, মুখ, পেট ওরা তার ভাগ না পায়। এমনি করে হাতটা জখম হয়ে গেল—লাভ হল না কিছুই।

আর একবার এক ফন্দী মাথায় গজাল। পুষ্ট হবার জন্য হাত মনে করল মধু খাবে। মধু পাবে কোথায়? মৌমাছির কাছ থেকে। তাই একটা মৌমাছি ধরে সে তাই দিয়ে নিজের গায়ে হুল ফুটিয়ে নিল। খুব মধুই সে পেল বটে, একেবারে মৌমাছির প্রাণটা পর্য্যন্ত তার মাঝে ঢুকে গেল—কারণ হুল ফুটিয়েই মৌমাছিরা সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। সবটুকু মধু দখল করে হাত খুব মোটা হল বটে কিন্তু এদিকে যে ক্রমেই অসহ্য ব্যথা আর টাটানি সুরু হল।

এমনি করে ভুগে ভুগে অবশেষে হাতের চৈতন্য হল। তখন সে বুঝল, "যা কিছু আমি রোজগার করি, সবই একলা ভোগ করতে গেলে তো চলবে না। যা আমি জমাব, তা দিতে হবে পেটকে; সেখান থেকে রক্তে তা টেনে নেবে—সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তার ভাগ পাবে। এমনি করে তবে না আমার পুষ্টি হবে। এ ছাড়া আর তো কোনও পথ দেখি না।"

এমনি করে ঘা খেয়ে খেয়ে তবে হাত বুঝতে পারল যে তার আমিত্ব শুধু তার সীমার মাঝেই আবদ্ধ নয়—সমস্তটা দেহের যখন পুষ্টি হবে, তখনি হাতেরও পুষ্টি হবে। চোখের গরজ যখন মিটবে হাতের গরজও তখনি মিটবে। চোখ, কান, নাক, মুখ সমস্ত শরীরের যে স্বার্থ, হাতেরও সেই স্বার্থ।

তুমিও যদি হাতের মত স্বার্থপর হতে যাও, তবে সে বেচারী যেমন স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে ঠকেছিল, তুমিও তেমন ঠকে যাবে—স্বার্থবুদ্ধির ফল হাতে হাতে পাবে। ভগবানের আইন এই—আপন জাত হতে তুমি আলাদা হতে পার না। তোমার জাতভাইদের নিকট হতে নিজকে যখন আলাদা মনে কর, তখন সত্যের মহা অপলাপ কর তুমি। যে দোকানী বা বেণিয়া খরিদদারের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের সঙ্গে এক করে দেখে না—তার সর্ব্বনাশ হয়, কেউ তার কাছে যায় না। আপন জীবনে এই সত্য তোমাদের প্রত্যক্ষ করতে হবে, তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে।

হাতকে বলি, ভাই, তোমার স্বার্থ জগতেরই স্বার্থ—চোখ, কাণ, শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বার্থ। এইটী ভাল করে বোঝ—এইটী অনুভব করতে চেষ্টা কর। যদি দুঃখ হতে পরিত্রাণ চাও, সুখী হতে চাও, তবে সবার সঙ্গে যে তুমি এক, এইটী বিশেষ করে উপলব্ধি কর। কোনও যায়গায় দরদ হলে হাতটা যেমন আপনি এসে সে যায়-গায় পড়ে, তেমনি তুমি যদি সকলের সঙ্গে

আপনাকে এক বলে ভাবতে পার—এই ভাবনাতে যদি তন্ময় হতে পার—তবে সবাই এসে তোমার সহায় হবে। এ তুমি একেবারে হাতেকলমে দেখতে পাবে। গায়ের এক জায়গায় চুলকানি হলে হাতটা আপনি সেখানে ওঠে। তুমিও যদি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে পার, সবার আত্মার সঙ্গে তোমার একাত্মভাব অনুভব করতে পার, তবে তোমার বিপদে সবাই তোমার সহায় হবে। এ সত্য পরীক্ষিত—অতি বাস্তব। ওঁ ওঁ *

*স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০৩)

উত্তর বঙ্গে বন্যা

আমাদের সেবকগণ বন্যার্ত্ত সেবা শেষ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা আজ তাহার কথাই বলিব। বিগত বন্যার ভীষণ কবলে পড়িয়া রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা জেলার যে সকল লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বন্যার সময়ে লোকগুলি যে কি কষ্টে দিন কাটাইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে অতি নিষ্ঠুরের প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হয়। যে সকল স্থানে বন্যা হইয়াছিল তাহাতে ছোট ছোট গ্রামগুলি ২।৩ মাইল এমন কি ৫।৬ মাইল ব্যবধান। এই গ্রামমধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এই ধানই গ্রামবাসীর জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র পন্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত বন্যার আগে যখন এই সকল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র-সমূহ স্ফুটনোন্মুখ শীর্ষগর্ভ নিবিড় শ্যামল ধানের গাছে শোভা পাইতেছিল, তখন কৃষকের প্রাণে যে কি আশার সঞ্চার হইতেছিল, তাহা বলা যায় না। এই ভাবীসম্পদের আশায় উৎফুল্ল কৃষকের প্রাণে হঠাৎ এই করাল বন্যা নিরাশার আগুণ জ্বালাইয়া দিল। এই বন্যা কৃষকের খাদ্য হরণ করিয়াও ক্ষান্ত হইল না, তাহাদের ধন, প্রাণ, গৃহ, পশু, যথাসর্ব্বস্ব সকলই কবলিত করিতে প্রয়াস পাইল। তাহাদের এই দুর্দ্দিনে একজনের বর্ণনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

—"পাঁচ সাত দিন ধরিয়া অনবরত মুষল ধারে বৃষ্টির পর কোথা হইতে জলের স্রোত আসিয়া ঘাট বাট সকল প্লাবিত করিয়া দিল। ক্রমশঃ জল বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের উচ্চস্থানেও জল উঠিল। গ্রামের ভিতর ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল—গৃহভিত্তিতে জল লাগিয়া দেওয়ালগুলি পড়িতে লাগিল। এইরূপে কেবল গৃহাদির পতন শব্দ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। গ্রামবাসীরা বিপদ গণিয়া গ্রামের ভিতর বা প্রান্তবর্ত্তী উচ্চ স্থানে বা পুকুরাদির পাড়ে আশ্রয় লইতে লাগিল—কেহ বা মাচা করিয়া, কেহ বা নিরুপায় হইয়া পতিত গৃহের [illegible] লইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। গৃহজাত দ্রব্যাদি এমন কি গবাদি পশুগুলি কতক ভাসিয়া গেল, কতক বা দেওয়াল চাপা পড়িয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। অনেকের শয্যা-বস্ত্রাদিও

এইরূপে নষ্ট হইল। ধান্যাদি খাদ্যসামগ্রী যাহা সঞ্চিত ছিল, কতক ভাসিয়া গেল, কতক পচিয়া নষ্ট হইল। খাদ্যাভাবে বস্ত্রাভাবে স্থানাভাবে শিশুসন্তানাদি লইয়া বৃষ্টির ভিতর উন্মুক্ত স্থানে সকলে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে লাগিল, তাহা অবর্ণনীয়। কেহ যে দূর দূরান্তরে বা অন্যগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইবে, তাহার উপায় নাই। একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামের ভিতর অতল জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে—যেন সমুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহাতে আবার ভীষণ স্রোত, আবর্ত্ত ও উত্তাল তরঙ্গ! এ দৃশ্য যে কিরূপ তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। আমরা এই অবস্থার প্রতি মুহূর্ত্তে কেবল মৃত্যুর কবলিত হইবার আশঙ্কা করিতেছিলাম। এই সময় সেবকেরা আসিয়া আমাদের জন্য মুড়ি চিড়া চাউল ডাল ইত্যাদি ও শিশুদের জন্য দুগ্ধ দিয়া যাইত। ৫।৭ দিন এইরূপে কাটাইবার পর ক্রমশঃ জল কমিতে লাগিল, আমাদেরও প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।”

এই বন্যার মধ্যে অনেকের প্রাণহানিও হইয়াছে। বন্যান্তে মনুষ্য, পশু ইত্যাদির মৃত দেহের ও পচনশীল খাদ্যসামগ্রীর দুর্গন্ধে গ্রামবাসীকে আতঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। সেবকগণ এই সকল দূর করিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। কূপাদিতে ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া তাহার জলকে বিশুদ্ধ করিবার জন্যও চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শী সেবকগণ প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। বন্যাপ্লাবিত স্থানে বহুস্থানে কোনরূপ ব্যাধির প্রকোপ না থাকা কেবল তাঁহাদেরই চেষ্টা ও যত্নের ফল। এই জন্য ঐ সকল কর্ম্মিগণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অন্যান্য সাহায্যসম্প্রদায় সাময়িক নানা সাহায্য করিলেও বঙ্গীয় রিলিফ কমিটী পূর্ব্বাপর অতীব সুশৃঙ্খলার সহিত সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা অনেক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সুদূর পল্লীতে পল্লীতে যেরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার বিষয়। কর্ম্মশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে প্রধান কেন্দ্রে আফিসের কার্য্যাদি ও হিসাবপত্রের ব্যবস্থা এবং জিনিষপত্র সরবরাহ করিবার জন্য এমন সুশৃঙ্খলাপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যিনি তাহা দেখিয়াছেন, তিনিই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। দেশের প্রকৃত নেতা অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই বিরাট্ যজ্ঞের হোতা ও বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রীযুক্ত সতীশবাবু তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি ও সঙ্ঘ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারাই দেশমাতৃকার অমোঘ আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া এই দুঃস্থ নিরন্ন ভ্রাতাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে দায়িত্ব তাঁহারা সুন্দর রূপেই বহন করিয়াছেন।

যাঁহারা ঐসকল বন্যাপীড়িত দুঃস্থ লোকের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের অবস্থা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, মানুষ অভাবে পড়িয়া কিরূপ ভীষণ প্রকৃতির হয়। এই সকল লোক কিরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া আছে! এমন সব গ্রাম আছে, যাহার একটা লোকও প্রাইমারী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভর করে। প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই সকল লোক শিক্ষা ও চরিত্রের অভাবে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। প্রায় সকলেই দেনার দায়ে মহাজন ও জমিদারের কবলগত। কিরূপ দুর্গতিতে যে তাহারা জীবন যাপন করে, তাহা সহজেই অনুমেয়; তার উপর

বন্যায় তাহারা বস্ত্রহীন, গৃহহীন, অন্নহীন! কৃষির উপযুক্ত বলদের অভাবে আবার অনেক স্থলে সদ্যপ্রসূতা গাভী দিয়া হলকর্ষণ করে। এই সকল অশিক্ষিত দেশবাসী দেশের এক কোণে পড়িয়া দেশের মঙ্গল ও উন্নতির কিরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, তাহা সম্ভবতঃ সেবকগণের অনেকের চক্ষেই ঠেকিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিবিধানের কি উপায় হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে আকুল হইতে হয়।

এ সকল স্থানে অনেক জমীদার আছেন, যাঁহারা একটু চেষ্টা করিলে প্রজার সমূহ হিত সাধন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই সহরবাসী হওয়ায় ও তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের অন্যরূপ উপায় থাকায় প্রজার হিতাহিতে তাঁহারা অমনোযোগী। এই সকল জমীদার স্বগ্রামে বাস না করায় রাস্তা ঘাট, স্কুল, পুষ্করিণী ইত্যাদি সংস্কারের কোনই ব্যবস্থা নাই। জমীদার স্বগ্রামে বা স্ব-জমীদারীতে বাস করিলে অন্ততঃ নিজের সুখ সুবিধার জন্যও এই সকল সংস্কার করিতে বাধ্য হন। প্রজারা প্রকারান্তরে তাহাতে উপকৃত হয়। তারপর জমীদার কর ইত্যাদিতে প্রজার নিকট যে ধন শোষণ করেন তাহাই আবার উৎসবাদি পালাপার্ব্বণে নানা রূপে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু আজকালকার জমিদার সহরবাসী ও বিলাস-পরায়ণ হওয়ায় প্রজার নিকট হইতে যাহা শোষণ করেন, তাহা সহরে ও বিদেশে তাঁহাদের বিলাসব্যসনের উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। এই অর্থের বিনিময়ে প্রজারা কিছুই লাভ করে না অধিকন্তু দিন দিন নিঃস্ব হইতে থাকে। এই বন্যার দুর্দ্দিনেও নাকি কোন কোন জমীদার তাঁহার প্রজার নিকট জোর করিয়া খাজনাও আদায় করিতেছেন। কোনও জমীদার নাকি তাঁর প্রজারা শিক্ষিত হইলে আমলাদের মানিবে না বলিয়া ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জমীদারী হইতে উচ্চ ইংরাজী স্কুলটী উঠাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ জমীদার দেশের কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহা আর বলিয়া বুঝাই বার প্রয়োজন নাই।

দুঃখ ও দৈন্য—সুখ ও সৌভাগ্য লইয়া আইসে। তাই এই দুর্দ্দিনে একদিকে যেমন হাহাকার, অন্যদিকে তেমনি আশার সঞ্চার। যে দৃশ্য এতগুলি সেবক ও কর্ম্মীকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়বান করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অমঙ্গল হইলেও দেশে প্রভূত কল্যাণ আনয়ন করিয়াছে। সেবকগণ যেমন অক্লান্ত পরিশ্রমে বন্যাপ্লাবিত স্থানে কার্য্য করিয়াছেন ও কার্য্যে নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালী যুবককে আর অবহেলার চক্ষে দেখা যায় না। তাঁহারা অধিকাংশই হিন্দু হইয়াও মুসলমান দুঃস্থ জনগণের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনে যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে দিন দেশের প্রকৃত বন্ধু ভারতগতপ্রাণ মিঃ এণ্ড্রুজ তাঁহার এক প্রবন্ধে (Can Famine be Prevented?) সেবকগণের প্রশংসা করিতে করিতে আমাদের সেবকগণ সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার আলোচনার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত হইল—

"আমি যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই একটা ব্যাপার আমার চোখে ঠেকিয়াছে। গ্রামবাসীরা মুসলমান; যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক আমার সঙ্গে আছেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু—

ইহাদের মাঝে অন্য জাতির একটীও নাই। কিন্তু তথাপি গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ আপন বলিয়া ভাবে ও ভালবাসে। এই মানবসেবা কর্ম্মে ধর্ম্মের পার্থক্যসূচক কোনও ভাবের লেশমাত্রও আমি এখানে দেখিতে পাইলাম না। মাঝে মাঝে এই মুসলমান গ্রামবাসীদিগের মনোভাব দেখিয়া আমার মনে হইত, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত হিন্দু সংস্কারের স্মৃতি যেন আজ আবার তাহাদের মাঝে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আসামের যে স্বামিজী আমাদের দলের নেতা, তাঁহার পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত হিন্দুর ব্রহ্মচারীদের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, এই মুসলমানেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে এবং তিনিও তাহাদের শ্রদ্ধার যোগ্য। স্বেচ্ছাসেবকেরা মমতা ও সমবেদনায় সকলের হৃদয় জয় করিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে গিয়া, স্থানীয় লোকের সঙ্গে তাহাদের যে সুন্দরভাব হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতে বাস্তবিকই বড় আনন্দ হয়। প্রীতি ও সমবেদনার এই মধুর যোগ অবিনশ্বর। ইহার ফলে এই স্বেচ্ছাসেবকেরা নূতন হৃদয় লইয়া জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া জগতের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

"মুসলমানদিগের মনোভাবের একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি এখানে দিলাম। কিন্তু উপসংহারে একটা কথা বিশেষ করিয়া না বলিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই বিপদের সময় বঙ্গীয় রিলিফ কমিটীর কর্ম্মিগণ যে কতখানি আনুকূল্য করিয়াছেন, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। যখন কোনও দিক দিয়াই আশা-ভরসার কিছু ছিলনা, তখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন বলিয়াই লোকের মনে সাহস জন্মিয়াছে, আশা জাগিয়াছে। ভগবানের বিধানে আত্মসমর্পণের উপরই সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই বিপদের সময় ইসলামধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শক্তি গ্রামবাসীদিগের মনে এ ভাব নিশ্চয়ই বিশেষ করিয়াই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদিগের সেবা ও সহানুভূতি তাহাদিগের চিত্তে এই ভগবনির্ভরের ভাবকে আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সেবকেরা গ্রামবাসীদিগকে বৈষয়িক ব্যাপারে যতটুকু আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহার চেয়ে তাহাদিগের মনে ভগবানের প্রতি নির্ভরকে দৃঢ় করিয়া দিয়া তাঁহারা যে আধ্যাত্মিক সহায়তা করিয়াছেন, তাহার মূল্য অনেক বেশী। আবার এই সহায়তা যে প্রধানতঃ হিন্দুর নিকট হইতেই তাহারা পাইয়াছে, ইহাতে ইহার মূল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অন্তরের অন্তস্তলে তাহারা বুঝিয়াছে যে ভগবান তাহাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই এবং এই বিশ্বাসেই তাহারা সহিষ্ণুতার বীর্য্য লাভ করিয়াছে।"

কিন্তু সেবকগণের প্রশংসা করিলেও উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্রের অভাবে তাঁহাদের যেরূপ ত্রুটী আশঙ্কা করা যায়, তাহা অবশ্যই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সেবকগণের মধ্যে অসংযমের ভাব আমাদের সেবকগণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেকেই চরিত্রে, খাদ্যাখাদ্য বিচারে ও কর্ম্মীরূপে নিজশক্তি প্রয়োগে ব্যভিচার করিয়াছেন। অনেক হিন্দু কর্ম্মী সমদর্শিতার ছলে মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত এক পংক্তিতে হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছেন। এইরূপ হিন্দুমুসলমান প্রীতির অর্থ যে কুক্কুটমাংসাদ ভোজন, তাহাও স্থল-

বিশেষে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মিগণ এইরূপ অবৈধ মেলামেশার দরুণ অনেকস্থলে চরিত্রগত দোষই অর্জ্জন করিয়াছে।

সব ভাল যার শেষ ভাল। অধিকাংশ সেবক অতীব প্রশংসার সহিত কার্য্য করিলেও বিদায়কালে কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে প্রসন্ন অন্তঃকরণ লইয়া গৃহে ফিরিতে পারেন নাই—ইহা আমাদের সেবকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই ৪।৫ মাস যাবৎ সেবা করার পর সেবকগণের প্রসন্নতা ও আত্মপ্রসাদ লইয়া গৃহে ফিরা উচিত ছিল। তাহা ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ উৎসাহিত ও কর্ম্মপর করিয়া তুলিত। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ অপ্রসন্ন ভাবে গৃহে ফিরিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রাণে যেন শেলবিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রিলিফ-কমিটীর পূর্ব্ব প্রকার সেবাকার্য্য অন্তে যখন অল্পদিন হইল নবপর্য্যায়ে কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন অধিকাংশ সেবক এই নূতন প্রকার কার্য্যে সেবকভাবের কতকগুলি বিরুদ্ধ ব্যবস্থা দেখিয়া প্রতিবাদ করেন ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন করেন। কিন্তু ঊর্দ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তৃগণের রূঢ় ব্যবহারে তাঁহারা বিকলমনোরথ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এক সময় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে যদি তিনি অন্ততঃ ২৮টা ছেলে পান, যাহারা বলিতে পারে যে ভগবান ছাড়া আর কিছুই চাই না—তবে তিনি পৃথিবীর ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আজ শত শত এইরূপ যুবক পাওয়া সত্ত্বেও এক বিবেকানন্দ অর্থাৎ নেতার অভাবে তাহারা দেশের বিশেষ কোন হিতে লাগিতেছে না।

পরিশেষে আমরা বন্যার কারণ ও প্রতিকারের উপায় বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। স্থানীয় ব্যক্তিগণ, প্রত্যক্ষদর্শী ও আমাদের সেবকগণ সকলেই রেলের বাঁধকেই একবাক্যে বন্যার অন্যতম কারণ মনে করেন। কারণ রেলরাস্তা হওয়ার পর এতদ্দেশে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে দুইবার প্রবল বন্যা হইয়া প্রজার শস্যহানি ও প্রভূত অপকার সাধন করিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা রেলরাস্তা হইবার পূর্ব্বে কখনই এরূপ বিপদগ্রস্ত হয় নাই ও এরূপে প্রায় সম্পূর্ণ শস্যহানি দেখে নাই। রেলের রাস্তা বাঁধস্বরূপ হওয়ায় নিম্নমুখী জলের অবরোধস্বরূপ হইয়াছে। এই জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষের উচিত—প্রচুর culvert নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া জলনিকাশের সুবিধা করিয়া দেওয়া। অধিকন্তু এই সকল লোক বিলের পার্শ্ববর্ত্তী নিম্নভূমিতে বাস করে, সামান্য কারণেই প্লাবনের আশঙ্কা আছে। সুতরাং তাহাদের বাসস্থান আরও উচ্চ করিবার প্রয়োজন। কিন্তু বন্যাই তাহাদিগের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ নহে। শিক্ষা, নীতি, জীবিকার উপায় ইত্যাদি সকলই এ বিষয়ে অল্পবিস্তর দায়ী। জীবিকার জন্য একমাত্র ধান্যের উপর নির্ভর না করিয়া নানারূপ গৃহশিল্পের চর্চ্চা হওয়া উচিত। অধিকাংশ লোকই মুসলমান—তাহারা শিক্ষা-দীক্ষার ধার ধারে না; দেশে উচ্চ বিদ্যালয় বা শিল্পশিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় কৃষি ছাড়া অন্য কোন জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা অবলম্বন করে না। যাহাতে এই সকল লোকের উচ্চশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হয় এরূপ করা প্রয়োজন। জমীদারগণ এ বিষয়ে প্রজাকে সমূহ সাহায্য করিতে পারেন। তজ্জন্য দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে জমীদারেরও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। কংগ্রেস কর্ম্মিগণ

যদি এদিকে একটু দৃষ্টি দেন, তবে প্রকৃত দেশের কাজ করা হয়। আমাদের বিশ্বাস, যদি এক এক জন শিক্ষিত যুবক এক বা ততোধিক গ্রামের শিক্ষার ভার লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন ও দেশবাসীকে তাহাদের অবস্থাদি বুঝাইয়া তাহাদের মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারেন ও তাহাদিগের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, তবে সব চেয়ে বেশী কাজ করা হয়।

এই সকল স্থানের লোকেরা যেরূপ মহাজন ও জমীদারের নিকট ঋণী দেখা যায়, তাহাতে তাহারা যে অমিতব্যয়ী তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। একটী সাধারণ প্রজা ৫০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ঋণী। আমাদের সেবকগণ রাজসাহী জেলার বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহে সেবা কার্য্য করিবার সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে এইরূপে ঋণগ্রস্ত নহে, এরূপ লোক কদাচিৎ দেখা যায়। সুতরাং এই বন্যাই যে এই সকল প্রজার সমূহ বিপদের একমাত্র কারণ তাহা নহে। এই বন্যা তাহাদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র। তাহাদের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষার অভাবই দেশের প্রকৃত রোগ। এই রোগ সারাইলে তাহারা আপন আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। এইরূপ লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোক যে আমাদের দেশের উন্নতিতে কত বাধা, তাহা দেশবাসী এই বন্যাব্যাপারে বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন —এইটুকুই বন্যার চরম ফল ও মহাশিক্ষা।

পরিশেষে দাতাগণ—যাঁহাদের বিরাট দানে এই বিরাট যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, তাঁহারা সমূহ ধন্যবাদার্হ। এই ত্যাগীর দেশে ত্যাগ মাহাত্ম্যেরই জয়জয়কার! ত্যাগেই শ্রেয়ঃ লাভ হয়। কাজেই যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়াছেন, তাঁহারা দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন! এই ত্যাগ যে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রকাশ।

ধাতুপ্রসাদ

একদিকে বিষয়, আর একদিকে আত্মা। তার মাঝে একটীর সঙ্গে নিত্য পরিচয়, আর একটীকে চিনি কি না, কোনও দিন দেখিয়াছি কি না বলিতে পারি না। একটু নড়িতে চড়িতেই বিষয়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি—তাহাকে না ছুঁইয়া নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত ফাঁক যায় না—মনের মাঝে এতটুকু তরঙ্গ পর্য্যন্ত উঠে না। অথচ আত্মজ্ঞানের পিপাসাও যে জাগে না, তা-ও তো বলিতে পারি না। কি রকম পিপাসা যে জাগে, তাহা বুঝাইয়া বলিতে আমরা পারিব না—হয়ত তার অনেকখানিই সংস্কারমাত্র—সংস্কারকেই সত্য বলিয়া লইয়া খুসী রহিয়াছি—কিন্তু তবুও এইদিক হইতে ওই দিকে প্রাণে মনটী এক আধবার ছুটিয়া যায় বই কি। দৃশ্যের ওপারে যে অদৃশ্য আছে, তাহাকে দেখিতে হইবে—অন্ততঃ এ কর্ত্তব্যবোধটুকুও মাঝে মাঝে আমাদের জাগে।

বুদ্ধি যদি মার্জ্জিত হয়, সুকৃতির সংস্কার

যদি প্রবল হয় তবে এইখানেই দর্শনের উপায়ের কথাটা মনে ওঠে। কি করিয়া দেখিব, কি করিয়া পাইব—এই প্রশ্নই হইল ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরও মিলে অধিকার অনুযায়ী। যেমন করিয়া বিষয়কে পাওয়া যায়, তেমনি করিয়া আত্মাকেও পাওয়া যাইবে অর্থাৎ বিষয় লাভ করিতে হইলে যেমন নানারকম আয়োজনের প্রয়োজন হয়, এখানেও তেমনি নানা আয়োজন করিতে হইবে—এই হইল সাধন সংস্কারের স্থূল অবস্থা। এর মূলে আছে বিষয়ভোগের পীড়ন। সে ভোগটা যেমন স্থূল, তাহার ত্যাগের উপায়টাও তেমনি স্থূল। তাই মানুষ প্রথমে আত্মলাভের পক্ষে অনুষ্ঠানটাকেই বড় বলিয়া মনে করে।

প্রাথমিক অবস্থায় এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। শাস্ত্র কর্ম্ম বলিতে ইহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এমনি করিয়া একটা কিছু করিতে করিতে বুদ্ধি যখন শুদ্ধ হয়, তখন রহস্যের আর একটা দিক চোখে পড়ে। তখন দেখি, পাওয়ার পথ তো বাহিরে নয়—সে তো ভিতরেই। যাকে ধর্ম্ম বল, অধর্ম্ম বল, কার্য্য বল, কারণ বল—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মাঝে কালের চক্রে যাহা ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে—তাহার মাঝেই তো পাওয়ার পথ নয়। এগুলি হইল দ্বৈতস্পৃষ্ট সত্তা। এর এক পিঠ ধরিলে আর একটা পিঠ আপনি উঠিয়া আসে—গাছের পাতার মত। কিন্তু এই সব দুই-পিঠ-ওয়ালা বস্তু লইয়া তো তৃপ্তি হয় না কোনও দিন। দুঃখের সঙ্গে যেমন সুখ, সুখের সঙ্গেও তেমনি দুঃখ। প্রবৃত্তির বশে আজ সুখটাও বাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি এমন সময়ও আসে, যখন সুখেও যেন চিত্তে জ্বালা ধরিয়া যায়।

তখন যদি পথ খোঁজ, বাইরে আর পথ পাইবে না—বাইরের দিকেই আর যাইতে ইচ্ছা হইবে না। এই হইল আদিপর্ব্ব। যে কোনও দ্বন্দ্বাভিঘাত যাঁর পক্ষে অসহন, তিনিই উপনিষদুক্ত ধীর সাধক। এই ঐটুকু না পাওয়া পর্য্যন্তই ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন, বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। ধৈর্য্যলাভ হইলে আর বাহিরের দিকে ভ্রূক্ষেপ থাকিবে না। তখন চিত্তের কয়েকটা বিশেষ লক্ষণও দেখা দিবে।

প্রথমতঃ কর্ম্মনিবৃত্তি হইবে; উপনিষদের ভাষায় সাধক তখন অক্রতু হইবেন। কর্ম্মনিবৃত্তি স্থূল অর্থে বলিতেছি না—সে হইল তমোগুণের ক্রিয়া—জড়ত্বের সামিল। কর্ম্মনিবৃত্তি মানে অভিমানযুক্ত সঙ্কল্পের বিনাশ। চালক যে পিছনেই রহিয়াছে, এই বোধটা যখন চিত্তে সুস্পষ্ট হয়, তখনই কর্ম্মনিবৃত্তি হইতে পারে। সংসারের হিসাবে ঘোর কর্ম্মী হইয়াও সাধক তখন কর্ম্মী নন। কর্ম্ম তখন ভারমুক্ত, অনায়াস, লঘু—তাহাই কর্ম্মের সাত্ত্বিক প্রকাশ।

তার পর কর্ম্ম যখন দূর হইবে, তখন তার আনুষঙ্গিক হর্ষ-শোকও দূর হইবে। সুখ-দুঃখ—এর উপজীব্য বাইরে, ভিতরে নয়। যে বিভু, সেই অভিমানের গণ্ডীতে, সঙ্কল্পের কাঁচিতে কাটা পড়িয়া ছোট হইয়া গেল। ছোট হইলেই বাহির আর ভিতর বলিয়া একটা ভেদের সৃষ্টি হয়; তখন নড়িবার চড়িবার জায়গা মিলে—সব জিনিষের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। এই নড়াচড়াটাই তো কর্ম্ম; আর সংঘর্ষের উঠা-পড়াটাই হইল সঙ্কল্প। সংঘর্ষের ফলে জয় পরাজয় আছে, সঙ্কল্পের সফলতা-বিফলতা আছে। তাই নিয়াই সুখ-দুঃখ। কিন্তু কর্ম্মে যদি কর্তৃত্ব না থাকে, অথচ

অধ্যাত্মযোগের আনন্দ থাকে—তাহা হইলে হর্ষশোকের বালাই আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়; তখন সুখও একটা খেলা, দুঃখও একটা খেলা। পূর্ণিমার জোৎস্নায় প্লাবিত জগতের মত চিত্ত তখন স্থির, শান্ত, স্নিগ্ধ—মাধুর্য্য আছে তাহাতে, কিন্তু উচ্ছাস নাই।

জ্যোৎস্নার পরিপ্লাবনের মত তখন জাগে ধাতুর প্রসন্নতা। এই প্রসন্নতা প্রকৃতির চরম দান—সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এ দেহের প্রসাদ, ইন্দ্রিয়ের প্রসাদ, মনের প্রসাদ, বুদ্ধির প্রসাদ। তখন "দশদিক হেরি নির্দ্বন্দ্ব।" প্রাকৃত বুদ্ধিতে আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, এই প্রসাদ তাহার চেয়েও উঁচু দরের জিনিষ। প্রথমেই দেখি, সুখে বিক্ষোভ আছে, চিত্তের বিলোড়ন আছে—কিন্তু প্রসাদে তা নাই। সুখ একদেশাশ্রয়ী, তার এক দিকে নজর পড়িলে আর এক দিকে পড়ে না—ফলে একদিকের পাল্লা ভারি হইয়া আর একদিকে বৈষম্যের পীড়া উৎপন্ন করে। কিন্তু প্রসাদের মাঝে রহিয়াছে সবদিকের একটা সামঞ্জস্য।

আসল কথা হইতেছে কি, প্রকৃতির মাঝেও আনন্দের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা আছে—তার সবটুকুই সুন্দর সুডৌল। সহজের মাঝে সমাহিত হইলে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি তো আমাদিগকে সহজ হইতে দেয় না। প্রকৃতির যদি একটা সোজা আইন থাকে, বুদ্ধি তার মাঝে হাজারটা মারপ্যাচের সৃষ্টি করিবে। বুদ্ধির কূটজালের মাঝে পড়িয়াই আমরা কোথাও প্রকৃতির সহজ আনন্দ পাইতেছি না—স্বস্তি আমাদের না দেহে, না ইন্দ্রিয়ে, না চিত্তে। বুদ্ধির পরামর্শে এর একটার তর্পণ করিতে গিয়া আর একটার উদ্বেগ জন্মাই—কাজেই মোটের উপর স্বস্তি পাই না কোথাও। দেহ, ইন্দ্রিয়, আর চিত্ত এর কোনও একটার দিকে বিশেষ ভাবে না চাহিয়া, এর তিনটারই মূলে যে এক শক্তি তার মাঝে অবগাহন করিতে পারিলে, তবে এই তিন সুর বাঁধা চলে। তিনটীতে সুর বাঁধিতে পারিলেই প্রকৃতির আনন্দ নিকেতনের সাঙ্কেতিক পাওয়া যাইবে। তখন আত্মাকে পাই সহজ পথে দিনের পর দিন নব নব উৎসবের আনন্দের ভিতর দিয়া।—দেহে, ইন্দ্রিয়ে, মনে যে সুর, বাজিয়া উঠিবে, তা সেই সাগর-সঙ্গীত-লীলাময়েরই সুর।

উপনিষদ বলিতেছেন, ধাতু প্রসন্ন হইলেই আত্মার মহিমা জ্ঞান হইবে। কেন হইবে, তার কারণ আছে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, এই তিনটীই তো ধাতু জৈবসত্তার ইহারাই হইল স্তম্ভ স্বরূপ। পরা সত্তার দিকে আমরা যখন যাইতে চাই, তখন এই তিনটীকে মনে করি বাধা। ইহারা যেন বেষ্টনীর মাঝে আমাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে এ বেষ্টনী হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আত্মার উদার লোকের সন্ধান পাইব। দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি এই যে একটা প্রতিকূল সংস্কার—এটা খুবই একটা খাঁটী জিনিষ। কিন্তু এর মাঝেও একটা কথা আছে।

কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া আজ যাহাদিগকে একমাত্র বাধা মনে করিতেছি, তাহারা স্বরূপতঃ এত বড় বাধা না'ও হইতে পারে। ধরা যাক দেহের কথা। দেহ বাধা তাহা মানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেহকে বাধা বলিয়া জ্ঞান হয় কখন?—দেহ সুস্থ রহিলে, না রুগ্ন হইলে? দেহ যদি সুস্থ থাকে বা উপনিষদের ভাষায় দেহ-রূপ ধাতু যখন প্রসন্ন থাকে, তখন দেহ আছে বলিয়াই যে জ্ঞান থাকে না। আবার সেই

দেহের মাঝেই প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে যদি কোথাও একটু ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, তখন দেহের সামান্য পীড়াটুকুও জানাইয়া দেয়, দেহ একটা কত বড় বোঝা।

ইন্দ্রিয়ের বেলাতেও তাই—মনের বেলাতেও তাই। দেহ, ইন্দ্রিয় আর মন বাধা বটে; কিন্তু স্বভাবতঃ তাহারা যতটুকু বাধা না হইত, আমাদের বুদ্ধির দোষে তাহারা তার শতগুণ বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সহজ পথে চলিতে হইলে, এই তিনকে প্রসন্ন করিতে হইবে—আপ্যায়িত করিতে হইবে। ধাতু প্রসন্ন হইলেই জড়ের বাধা দূর হইয়া যাইবে—তখন এই দেহে, এই ইন্দ্রিয়ে, এই মনেই সেই দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, মনাতীতের মহিমা ফুটিয়া উঠিবে। প্রসন্ন দেহে, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়ে, প্রসন্ন চিত্তে বুঝিতে পারিব—সেই গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ, পুরাণ বস্তুটা কি।

ধাতুপ্রসাদলাভের তিনটী উপায় আছে—উপনিষদ তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনটী ধাতুর জন্য তিনটী সঙ্কেত—স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য। বেদাধ্যয়ন, বেদবাক্যের মনন—এই হইল স্বাধ্যায়; ইহাই চিত্ত প্রসাদের উপায়। তপস্যায় ইন্দ্রিয়ধাতু প্রসন্ন হয়, ব্রহ্মচর্য্যে দেহধাতু প্রসন্ন হয়; গুরুগৃহে এই তিনটীরই সাধনা চলিত। এই জন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে আচার্য্যবান পুরুষেরই অধিগম্য বলা হইত। এই পাওয়া সহজ পাওয়া। যে ধাতুর যতটুকু সামর্থ্য, আনন্দ সঞ্চয়ের যতটুকু যোগ্যতা—তাহাকে তার অনুরূপ আহার দিয়া আপ্যায়িত করিতে হইবে—পরস্পরের অবিরোধে; প্রকৃতি জয়ের এই তো সহজ পন্থা। তোমরা বলিবে—এ তো কৃচ্ছ সাধন—কেননা বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া তোমাদের সহজ সংস্কারটী যে লোপ পাইয়া বসিয়াছে। কুসংস্কারের আবর্জ্জনা দূর হইলে দেখিবে—ধাতুকে শুদ্ধ রাখিতে পারিলে আত্মার মহিমা সহজেই উপলব্ধি হয়। অবিচারে, অনাচারে ধাতুর বিকার ঘটাইয়া তাহার চিকিৎসার জন্য ছুটাছুটী করাই কৃচ্ছ সাধনা।

সহজ পথ সাম্যের পথ। জীবনের গোড়া হইতে যে সে পথের পথিক হইয়াছে, সাধনার মাঝে কৃচ্ছতা কোথায়, তাহা সে দেখিতেই পায় না। সাধনাকে জটিল করিয়াছে আমাদেরই কুসংস্কার। আপনি বাঁকিয়া বাঁকা পথে চলিয়া এখন আমরা পথের দোষ দিতেছি। কিন্তু প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণ ছিল—সহজের পথে। ধাতুকে প্রসন্ন করিয়া আপ্যায়িত করিয়া আত্মার মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ করা—এই দিকেই তো তার নিগূঢ় আকর্ষণ!

কিন্তু এই আকর্ষণের তত্ত্ব জানিতে হইলে একটা কেন্দ্র পাওয়া চাই। তিন দিকের তিনটী শক্তি—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন; এই তিনের ধর্ম্মে সাম্য ঘটাইয়া পথ চলিতে হইলে অশিক্ষিত-পটুত্ব চাই, বুদ্ধির বিচারে পথ মাপিয়া চলার যো নাই। কিন্তু আমাদের যে সকলই শিখিয়া লইতে হয়, কঠোর সাধনা করিয়া পাইতে হয়—এই না আমাদের সংস্কার। তবে অশিক্ষিত-পটুত্ব আমরা পাইব কোথায়?—এইখানেই তো আর এক রহস্য। বুদ্ধি দিয়া যদি পরখ করিতে যাই, তবে এ জগতের কোন ব্যাপারটা না জটিল ঠেকে? অথচ প্রাণ হইতে প্রাণ সঞ্চারিত হইতেছে—একটী প্রদীপের শিখা হইতে আর একটী প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠার মত; এর মত সহজ কথা আর কোথায় আছে?

আমাদেরও এমনি জ্বলিয়া ওঠা চাই—প্রদীপের স্পর্শে। সেই প্রদীপই কেন্দ্র, জীবনের সেই স্থিরজ্জ্বল জ্যোতিঃবিন্দু—দেহ,

ইন্দ্রিয় ও চিত্তের তিনটী রশ্মি তাহারই আশ্রয় হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। প্রাণ এই কেন্দ্র, জ্যোতিঃ এই কেন্দ্র—ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্য এই কেন্দ্র। জীবনে কুসংস্কারের আবিলতা স্পর্শ করিতে না করিতে এই কেন্দ্র জ্যোতিঃর সংস্পর্শ যদি ঘটে, তবে সহজের দুয়ার আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। স্বাধ্যায়াশ্রয়ে মনন হইবে তখন চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তপস্যায় ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বীর্য্যবত্তা ফুটিয়া উঠিবে, ব্রহ্মচর্য্যে দেহের কূলে কূলে যৌবনের আনন্দবান ডাকিয়া যাইবে। এই তো প্রসন্নতার পথ—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পথ। কিন্তু দুইটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ জ্যোতির্ময় অমৃত প্রাণের স্পর্শ চাই আচার্য্যের সঙ্গ হইতে; দ্বিতীয়তঃ জীবনে সংস্কারের আবিলতা স্পর্শ করিতে না করিতে এই জ্যোতির্ময় সঙ্গ পাওয়া চাই।

এর পূর্ব্বে উল্টা পথের কথা বলিয়াছিলাম, আপনার চারিদিকে আবর্ত্তন করিয়া যে বন্ধনের মাঝে আপনাকে জড়াইয়াছিলাম, সেই বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার কথা হইতেছিল। তাই সাধনার প্রসঙ্গে সংঘর্ষের কথাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। পুঁজির ঘরে তখন শূন্য, তাই উপার্জ্জনের তাগিদটাই বড় বলিয়া মনে হইতেছিল। এই উপার্জ্জনের কৃচ্ছ্র সাধনার পথেই শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ চলে। পাথেয়ের জন্য তাই বাহ্য সাধনাও চাই; তারপর বাহ্যবিরতির পর অন্তঃসাধনায় ধৈর্য্য চাই, কর্ম্মবিরতি চাই, হর্ষ শোকের অতীত হওয়া চাই। তারপর আসিবে ধাতুর প্রসন্নতা—আত্মার মহিমা।

কিন্তু এ সমস্ত তো প্যাঁচ জড়াইয়া প্যাঁচ খোলা। এই পথেই সবাই চলিয়াছে বলিয়াই ইহাকে সহজ পথ বলিব না। ধাতু-প্রসাদের যে পুঁজিটুকু ছিল, তাহাকে খোয়াইয়া আবার তাহার অর্জনের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগা—এ তো প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথ। এ পথে মনন, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য সবই কঠিন আচার্য্যও দুর্লভ; স্ফুরণের দিন হইতেই জীবন আড়ষ্ট। এ ব্যাধি সমাজ ছাইয়া ফেলিয়াছে—তাই সব থাকিলেও আমরা কিছুই পাই না, সব চেয়ে নিরাশার কথা, ব্রহ্মবিদ আচার্য্যের আজীবন সঙ্গ ও শিক্ষা পাই না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই—সমাজের শুদ্ধি চাই—আচার্য্যের আসনটী আবার তাহার মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। সেই পথই সনাতন পথ—সত্য পথ; শুধু ব্যক্তির কল্যাণ তাহাতে নয়—তাহাতে জাতির কল্যাণ। প্রশান্ত হও, প্রসন্ন হও, আচার্য্যবান হও; কৃচ্ছ্র সাধনায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার সেই সহজ সাধনার যুগ—স্বাধ্যায়, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যের যুগ ফিরাইয়া আন—নান্যঃ পন্থাঃ।

বেদান্ত-সার

—*—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—কর্ম্মবিচার]

———*———

যজ্ঞ ও বিবিদিষা

এই সংশয় দূর করিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের সাহায্য লইতে হইবে। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে অনুরূপ স্থলে এক প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে। অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট পশু সম্বন্ধে এইরূপ দুইটা বিধি আছে "খাদিরে বধ্নাতি" ও "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ।" এখানে একই দ্রব্যে দুইটা বিধি দেওয়া সংযোগের পৃথকত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ খাদির যূপের সঙ্গে যজ্ঞার্থের নিত্যসংযোগ এবং পুরুষার্থের অনিত্য সংযোগ। সুতরাং সংযোগের পৃথকত্ব থাকা হেতু দুইটা বিধি ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ বিধায় তাহাদের প্রাধান্য হারাইল না—অর্থের বিভিন্নতা হেতু নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয়ত্রই তাহাদের তাৎপর্য্য বলবৎ রহিল।

বিবিদিষার সঙ্গে যজ্ঞের সংযোগ ও যজ্ঞবিধির নিবৃত্তিও এইরূপে মীমাংসিত হইবে। অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে, আমাদের মনের গতি অনুসারে শ্রুতির বিধান আমাদের উপর খাটিবে। পিতৃপিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বিশিষ্ট কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যদি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া যাই, তবে যজ্ঞসম্বন্ধীয় নিত্যবিধি আমাদের উপর প্রযোজ্য হইবে। আবার শ্রুতির নির্দ্দেশানুযায়ী জ্ঞানোদ্দেশে যদি এই যজ্ঞ করি, তবে যজ্ঞের নৈমিত্তিক বিধিই আমাদের পক্ষে বলবান হইবে—নিত্যবিধির সহিত তাহার কোনও বিরোধ থাকিবে না। কাজেই সংসার নিবৃত্তির অভিলাষী যাঁরা, তাঁহাদের পক্ষে দুইবার যজ্ঞ করিবার কোনও কথাই হইতে পারে না।

যজ্ঞের সঙ্গে বিবিদিষার সংযোগ আছে বলিয়া এমন মনে করা চলে না যে, কর্ম্ম কখনও মোক্ষার্থে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অদ্বৈত বেদান্তীর পক্ষে মোক্ষ ও জ্ঞানের অভিন্ন স্বরূপ এবং জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের কিছুতেই সমুচ্চয় হইতে পারে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন, উভয়ের একত্রাবস্থান কি করিয়া সম্ভব হইবে? কর্ম্ম করিতে হইলেই কর্ত্তৃ করণাদির আবশ্যক সুতরাং কর্ম্মের সূত্রপাতেই অজ্ঞানাশ্রয়ে দ্বৈতের উৎপত্তি। কিন্তু জ্ঞানে তো কর্ত্তৃকরণাদির ভেদই থাকিতে পারে না—সুতরাং কর্ম্ম সেখানে থাকিবে কি করিয়া? ভেদই তো অজ্ঞান; কর্ম্ম সেই ভেদকে আশ্রয় করিয়াই সম্ভব। সুতরাং কর্ম্মের মূলেই অজ্ঞান; অতএব জ্ঞানের সহিত তাহার নিত্যবিরোধ।

তাহা ছাড়া জ্ঞানকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ম্মের ফল বলা চলে না। জ্ঞান যদি কর্ম্মের ফল হয়, তাহা হইলে তাহা উৎপন্ন

বস্তু, অতএব অনিত্য। কিন্তু অনিত্য বস্তুর উপর অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা হইবে কি কারণে? জ্ঞানই মোক্ষ, জ্ঞানই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কখনও কর্ম্মসৃষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলেও জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের কখনও সমুচ্চয় হইতে পারে না। এই সমস্ত বিচার করিয়াই ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন, "অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা"—এই জন্য স্বার্থসিদ্ধি পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা অগ্নীন্ধনাদি আশ্রমকর্ম্মের কোনও অপেক্ষা রাখে না।"

কিন্তু বিবিদিষার সহিত যে যজ্ঞ সংযোগ বিহিত হইয়াছে, তাহার কি গতি হইবে? জ্ঞানের সঙ্গে কি তাহার কোনও সংস্রব নাই? কোন সংস্রব যে নাই, বেদান্তী এমন কথা বলিতেছেন না। বেদান্তী বলেন, সম্ভবতঃ সমস্ত বস্তুর সাক্ষাৎ ভাবে নিমিত্ত হইতে পারে না, কেহ সাক্ষাৎ ভাবে ফলের উৎপাদক, কেহ বা পরম্পরাক্রমে ফলের সহায়ক। জ্ঞানের সম্বন্ধে কর্ম্মকে এই শেষোক্তরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই ব্রহ্মসূত্রকার বলিতেছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ।" তাৎপর্য্য এই, যদিও ফলসিদ্ধিপক্ষে বিদ্যা বা জ্ঞান কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না, তথাপি জ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে আশ্রমকর্ম্মের অপেক্ষা আছে। যজ্ঞসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি। যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ অশ্বের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অশ্বের হলকর্ষণে যোগ্যতা নাই, কিন্তু রথবহনে যোগ্যতা আছে। সেইরূপ কর্ম্মেরও বিদ্যার ফলসিদ্ধিতে যোগ্যতা আছে। যদি জিজ্ঞাসা কর, বিদ্যার সাধন কি? উত্তর হইবে শমদমাদি সম্পত্তি। আর যদি জিজ্ঞাসা কর, বিবিদিষার সাধন কি? উত্তর হইবে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম। বিদ্যা আর বিবিদিষার পার্থক্য আছে। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম শমদমাদি অপেক্ষাও বিদ্যার বাহ্যতর সাধন।

কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্পর্ক এইটুকু। কর্ম্ম বিবিদিষা জন্মাইতে পারে, চিত্তের ময়লা-মাটী ধুইয়া তাহাকে জ্ঞানধারণার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে।

কর্ম্মের ফল

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নিত্য প্রভৃতি কর্ম্মের ফল সত্ত্বশুদ্ধি এবং চিত্তের একাগ্রতা। কিন্তু শ্রুতিতে আবার আমরা পাই—"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া দেবলোকঃ—কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় করা যায়", "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি (যাহারা দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা) তাহারা সকলেই পুণ্যলোকের অধিকার পায়।" তবেই দেখা যাইতেছে, নিত্যাদি কর্ম্মের ফল যদি সত্ত্বশুদ্ধি ও চিত্তৈকাগ্র্য বলা যায়, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে তাহাদের লোকপ্রাপ্তিরূপ ফলের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ বাধিয়া যায়। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য?

বেদান্তী বলেন, স্মৃতিতে একটা দৃষ্টান্ত আছে, ফলের জন্যও যদি কেহ আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, তথাপি তাহার ছায়া ও গন্ধ হইতে সে বঞ্চিত হয় না। এখানে ফল মুখ্য, কিন্তু ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক, অতএব অবান্তর। নিত্যাদি কর্ম্মের ফল সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সত্ত্বশুদ্ধি ও চিত্তৈকাগ্র্য হইল তাহাদের মুখ্য ফল আর লোকপ্রাপ্তি হইল আনুষঙ্গিক অবান্তর ফল। বিশেষতঃ উপরিধৃত শ্রুতিবাক্যে শুধু সামান্যতঃ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, গৌণরূপ ফলকে উদ্দিষ্ট করিয়া নিত্যাদির বিধান [illegible] হয় নাই; অথচ উক্ত বিবিদিষা সম্পর্কে

কর্মের বিশিষ্ট বিধান রহিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং বিবিদিষার অনুকূল চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতাকেই আমরা নিত্যাদি কর্মের মুখ্য ফল বলিব; লোকপ্রাপ্তি আনুষঙ্গিক মাত্র।

[টীকাকার রামতীর্থ এই প্রসঙ্গ মূল হইতে প্রায়শ্চিত্ত কর্মকে বাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রায়শ্চিত্তের আর কোনও অবান্তর ফল থাকিতে পারে না—সে কেবল সঞ্চিত পাপের বিনাশ করিয়া থাকে মাত্র। মূলে যে পিতৃলোক ও সত্যলোকের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ও উপাসনার অবান্তর ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।] (১৩)

দেশের ও দশের কথা



কাল অনাদি, অনন্ত; এই জীবনেরও আদি-অন্ত কোথায় তাহা জানি না। কিন্তু যে সুখদুঃখের বিচিত্র লীলায় জীবন তরঙ্গিত, তাহাকে আদি-অন্তহীন বলিয়া ভাবিতে ভরসা পাই না। তাই মহাকালের প্রেরণায় অসীমের পথে চলিতে চলিতেও একবার থমকিয়া দাঁড়াই, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, কতটুকু পথ পার হইয়া আসিলাম, তীব্র আশার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখের যবনিকা ভেদ করিয়া দেখিতে চাই—আর কত পথই বা বাকী। কিন্তু এমন করিয়া কতটুকু রহস্যের সন্ধান পাই? অতীত বা ভবিষ্যতের সীমার মাঝে মহাকালের যে অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছি, তাহাকে যে আমাদেরই জড়দৃষ্টির অবরোধ দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছি। তবে আর তিথি নক্ষত্রের হিসাব দিয়া কালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার আলোচনায় কতটুকু সত্য পাইব? কালের অসীমতা আর আত্মার অনন্ত বিলাস—এ দুয়ের মাঝে মানুষের খণ্ডিত সুখদুঃখের মূল্যই বা কতটুকু?—কিন্তু তবুও ক্ষুদ্রের মমতা তো কাটাইয়া উঠিতে পারি না, চলিতে চলিতে যে তাহারা পদে পদে জড়াইয়া ধরে—তাহাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করিয়া যে নিষ্কৃতি নাই। তাই বৎসরের মাপকাঠি দিয়া কালকে মাপিয়া সেই সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে আপন আপন সুখদুঃখের হিসাবটা একবার খতাইয়া দেখিতে হয়; অদূরদৃষ্টি দুর্ব্বল মানুষ আমরা—হয়ত এই হিসাব নিকাশে পথের দুঃখ কতকটা লাঘব হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের আশাকে কিছু সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে। কিন্তু তবুও এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে বৈরাগ্য আমাদের পিতৃপুরুষার্জ্জিত অক্ষয় ভাণ্ডার। জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তনের মীমাংসা আমরা করিতে শিখিয়াছি—স্পৃহাহীন বৈরাগ্যের আশ্রয়ে মহাকালের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া।



প্রথমেই মনে পড়ে উত্তরবঙ্গের বন্যার কথা। বৎসরের পর বৎসর বিধাতা যেন বাঙ্গালার জন্যই এক একটা কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করিতেছেন—এমন করিয়া আগুনে পোড়াইয়া আঘাতের উপর আঘাত দিয়া

আমাদিগকে তাঁহার মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। আমাদের নিয়তি যে কোন সার্থকতার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া পরস্পরের নাড়ীর টানে যে আমরা দিন দিন সংহত হইতেছি, ইহাই ভগবানের অপার করুণার নিদর্শন। এই সমস্ত বিপ্লব উপলক্ষ্য করিয়া যে মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপনের ভার আমাদের উপর পড়ে, আমরা দিনে দিনে তাহার কতটুকু যোগ্য হইতেছি, তাহাই বিবেচ্য। সেবাধর্ম্ম অকিঞ্চনের ধর্ম্ম; সকল থাকিয়াও যাহার আপন বলিতে কিছু নাই, সেই যথার্থ সেবক। সেবা আর পরোপকার কার্য্যতঃ এক হইলেও উভয়ের পরিপ্রেক্ষাভূমি স্বতন্ত্র। আপনাকে নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল করিয়া পরের জন্য যে বিলাইয়া দিল, "নারায়ণের সেবক আমি" এইটুকু অভিমান তার থাকিলে চলে; কিন্তু "আমি পরোপকারী"—এই ভাব জন্মিলেই সব মাটী। সেবককে পরোপকারী পরেই বলিবে, কিন্তু নিজেকে সে দীনাতিদীন সেবক ভিন্ন আর কিছুই বলিবে না। যেখানে এই ভাবের ব্যতিক্রম, সেখানে সেবা অসম্পূর্ণ এবং অশুচি। ভাবশুদ্ধি না থাকিলে জীবসেবার মত এত বড় একটা যুগধর্ম্মও হুজুগ ও বিলাসিতায় পরিণত হইতে আটক নাই। বড় বড় সেবা-প্রতিষ্ঠানের মূলে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের চেয়ে যে সমস্ত অধীনস্থ সেবক সাক্ষাৎভাবে দুঃস্থের সংস্পর্শে আসেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য আরও কঠোর। দূরদূরান্তরে থাকিয়া আর্ত্তের কাতর ক্রন্দনে করুণায় গলিয়া গিয়া যাঁহারা সেবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন, তাঁহাদের ভাব অনাবিল ও অকৃত্রিম থাকিবারই কথা। কিন্তু সেই করুণার দানকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার ভার যাঁহারা লইবেন, তাঁহাদের স্নেহে যে মায়ের অধিক ভাইয়ের অধিক কঠিন পরীক্ষা রহিয়াছে। আমাদের দেশের সেবা সেনা কি সর্ব্বত্রই এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলে?

—•—

এই প্রসঙ্গে আর একটী সেবা-প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়িল। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার নিখিল ভারত আশ্রমের একটী বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হয়। তাহার বিবরণ পাঠক সম্ভবতঃ অন্যত্র পাঠ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে সেবা-ধর্ম্মের আর একটা দিকের কথা মনে পড়ে। নিখিল ভারত আশ্রমের সঙ্গে দেশের অনেক স্বনামধন্য পুরুষের নাম সংযুক্ত ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আশ্রমটীর এমন শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইল কেন, সে সম্বন্ধে সহসা কিছু অনুমান করিতে সাহস হয় না। তবে একটা কথা মনে হয়, আমাদের নজর বড় উঁচু দিকে। সমগ্র "বিশ্বকে" জড়াইয়া, নিদানপক্ষে সমস্তটা "দেশকে" জড়াইয়া হাওয়ার উপর একটা কিছু ফাঁদিয়া বসিতে আমাদের বেগ পাইতে হয় না, কিন্তু বুকের রক্ত জল করিয়া এই মাটীর উপর একটা সামান্য কিছু গড়িতে গেলেই দেখি, আমাদের সামর্থ্যে কুলায় না। ভাব আমাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু কাজ তত সহজ নয়। এইটেই কি জীবন্ত জাতির লক্ষণ বলিব? বিরাট কল্পনার সৌধকে বড় বলিব, না ক্ষুদ্র বাস্তবের সেবাকে বড় বলিব? সেবাধর্ম্ম কোথায় সার্থক?—বিশ্বের কল্পলোকে না আমাদের ঘরের কোণে নিত্য অবজ্ঞাত দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্যের মাঝে? ছোটর দিকে আমরা নজর দিতে না পারিলে বড়র

দিকেই যে নজর দিতে পারিব, তাহার ভরসা করি কি করিয়া ? মনে পড়ে মহাত্মা গান্ধীর সেবার কথা—আর এই বাঙ্গালা মায়ের স্নেহের দুলাল বিদ্যাসাগরের কথা ;—দেশের সেবা, আর পথের ধারের অচেনা অজানা ভাইয়ের সেবা—এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যজ্ঞান তাঁহাদের ছিল না। আর বাঙ্গালার বাঙ্গালী বাঙ্গালীর সেবাপ্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ বাঙ্গালীর দুয়ার হইতে বিতাড়িত হইয়া খৃষ্টান মিশনারীর হাতে আত্মসমর্পণ করিতে চলিল—বাঙ্গালীর গৌরব তাহাতে বাড়িল কি ? পরে শুনিয়াছি, সমাজের পতিতাদের রুকণায় এই প্রতিষ্ঠানটী কোনও রকমে রক্ষা পাইয়াছে। তবুও কি আমাদের অভিমান চূর্ণ হইবে না ?

—*—

স্বদেশসেবার এক বছরের হিসাব যদি আজ খতাইয়া দেখি, তবে দেখিব, এই এক বছরে আমরা বড় বেশী অগ্রসর হই নাই। গত বৎসর যে আন্দোলন আর উদ্দীপনার ঢেউ সমস্ত দেশটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল, এ বৎসর তাহা শান্ত হইয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে। ভাবের উচ্ছ্বাস জিনিসটা ভাল হইলেও সাধনা শুদ্ধ না হইলে তাহাকে সংযম করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। জন সাধারণ একটী বড় খোকা বলা চলে—অল্পকে সেই সে উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাকে শান্ত করিতে হইলে ভগবদ্দত্ত অনুপাণিত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন। মহাত্মার পর এমন নেতা দেশের মাঝে কেহ নাই। তাই নিরর্থক উত্তেজনায় দেশ যে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই—এটাকে এক হিসাবে ভালই বলিতে হইবে। ইহাতে বন্যার জল সরিয়া গিয়া দেশের বুকে কতটুকু পলি পড়িয়াছে, ধীরে সুস্থে তাহার পরখ করা চলিবে। আর এইটুকুই হইল আমাদের নগদ মুনাফা ; শুধু হাওলাত করিয়া তহবিল ফাঁপাইয়া লাভ কি ?

—*—

দেশের লোক তাহাদের যথাবুদ্ধি কর্তব্য সাধন করিয়াছে। স্বদেশের হিতের দিকে চাহিয়া তাহারা যে খুব বেশী একটা কিছু করিয়াছে, তাহা না হউক ; স্বরাজ-সাধনার প্রত্যেক টী পাঁতি তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পরিপালন করে নাই, তাহা মানি। কিন্তু তাহারা দেশেরই হিত করিবে বলিয়া তো কোমর বাঁধিতে লাগে নাই। যতটুকু রাগ তাহাদের হৃদয়ে লাগিয়াছে, ততটুকুই তাহারা করিয়াছে। ইহার পর যদি আর কিছু না হয় [illegible], তবে সে নেতাদেরই পরিচালনার [illegible]। তাঁহারাই তো দেশের লোকের [illegible] দিবেন—তার না তাহারা দিশা পাইবে ! কিন্তু জগচ্চন্দ্র পূর্ণ্যারজর আমল হইতেই এ দেশে বার রাজপুতের তের হাঁড়ী। এক একজন নেতা এক একটা মত ফাঁদিয়া বসিয়া আছেন যত্নকভাঙ্গা পণ, যতদিন না সকলকে আপন মতের কোটে আনিতে পারিবেন, ততদিন আর তাঁহারা অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। এদিকে যে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। তুচ্ছ একটা রাজনৈতিক চোবড়া লইয়া নিজেদের মাঝে কামড়াকামড়ি না করিয়া দেশহিতের প্রকৃত শাঁসটুকু যদি তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিতেন, তবে তাঁহাদের নেতৃত্ব সার্থক হইত। বিলাতী ধরণে কেবল সভা করিয়া রেজলিউশন পাশ করা আর বক্তৃতার খই ফুটানো এ আর ভাল লাগে না। দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সব উৎসন্ন যাউক, কেবল সভাসমিতির চোটেই দেশ উদ্ধার হইয়া যাইবে !

পল্লী লক্ষীর তুলসীতলায় একটী মাটীর প্রদীপের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না—আর সহরে সভ্যতার বিলাসী বিবিকে রাজনীতির মজলিসে নাচাইয়া বাহবা লইতেছি—এই বুঝি দেশহিতৈষণার নমুনা?

—*—

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার মুখে আমরা জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গড়িয়াছিলাম। মূল উদ্দেশ্য মহৎ থাকিলেও একটা বাজনৈতিক রেষারেষির উপর তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সাময়িক উত্তেজনার সাধারণতঃ যে ফল হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিক্ষার নাম দিয়াছি জাতীয় বটে, কিন্তু আদর্শ হিসাবে বিচার করিলে সেটা প্রাচ্য জাতীয় কিম্বা পাশ্চাত্য জাতীয়, সে সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ থাকে। তবুও দেশীয় লোকের আনুকূল্য লালিত পালিত এই প্রতিষ্ঠানটীকে আমরা স্নেহের চক্ষে না দেখিয়া পারি না। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইহার প্রতি যে নির্ম্মম ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহার পার ক্ষমা নাই। আজ দেখিয়া সুখী হইলাম, বাঙ্গালীর পৌরুষ ও আত্মমর্য্যাদার একমাত্র নিদর্শন এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটীর কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা জাতীয় শিক্ষা সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে, এমন নয়; তথাপি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ যদি অধম শূদ্রবৃত্তি হইতে দেশকে বৈশ্যবৃত্তিতেও কতক পরিমাণে উন্নীত করিতে পারেন, তাহাও মন্দের ভাল। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় এখনও আমরা প্রতীচ্য আদর্শের মোহেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। প্রতীচ্যের আদর্শই যে আমাদের জাতীয় আদর্শ, তাহা বলা চলে কি? অবশ্য এস্থলে একটা সঙ্কট এই, জাতি বলিতে আমাদের হিন্দু ও মুসলমান দুইই বুঝিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মকেই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মেরুদণ্ড বলিতে অনেকে সঙ্কোচ অনুভব করেন; তাই হিন্দু মুসলমানকে এক শিক্ষার মন্দিরে মিলাইতে গিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শূদ্রের কিম্বা বৈশ্যত্বের আদর্শে গড়া ভিন্ন আর কোনও উপায় দেখেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ ব্রাহ্মণের আদর্শ। এই আদর্শের মূল যে, চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, তাহার মাঝে তো জাতিভেদ বা ধর্ম্মভেদের কোনও বালাই নাই—সে তো জগতের যে কোনও মানবের পক্ষে সত্য ও সনাতন আদর্শ। জাতীয় শিক্ষা যদি আমরা এই আদর্শের অনুরূপ গড়িয়া তুলিতে পারি, তবেই তাহা সার্থকনামা হইবে। শুনিয়াছি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদমন্ত্র উচ্চারণে নূতন শিক্ষাভবনের ভিত্তি স্থাপনা করা হইয়াছে। বিধাতা এই প্রতিষ্ঠানকে বৈদিক আদর্শে সঞ্জীবিত করিয়া ইহার কল্যাণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

—*—

বিলাতী উচ্ছ্বাসে দেশের গুটীকতক লোক মাতিতে পারে, কিন্তু একটা গোটা দেশই যে একদিন বাপদাদার বুলি ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ বিলাতী বুলি কপচাইতে সুরু করিয়া দিবে, একথা কি করিয়া বিশ্বাস করি? যে রোগে আমাদের এই দুর্দ্দশা, বিলাতী চসমা চোখে দিলেই তার নিদান নির্ণয় হইবে না। এ দেশেরই জলবায়ুর দোষে যে রোগ জন্মিয়াছে, এদেশের ভেষজই তাহার প্রতিষেধ হইবে। বিলাতী দাওয়াই মুহূর্ত্তেজক হইতে পারে, কিন্তু এ গঙ্গাজলের ধাতে তাহা সহিবে কেন? শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ,

রাজনীতি—সব জায়গাতেই দেখি ওই বিষম এক বিলাতী হাওয়া—ও দেশের আদর্শের সঙ্গে খাপ না খাইলে আমাদের দেশের আদর্শ একেবারেই অকেজো, ভুয়া! হাজার হাজার বছর ধরিয়া পিতৃপুরুষেরা কেবলই ভুল করিয়া আসিয়াছেন, আর এই সবেমাত্র দেড় শ' কি পৌনে দু'শ বৎসরের বিলাতী সংস্পর্শে সে ভুল ধরা পড়িয়া গিয়াছে—এবার উজানে ফিরিতেই হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মনুষ্যত্বের পরিমাণ হাজার বছর আগে আমাদের বেশী ছিল, না আজই বেশী হইয়াছে? হিন্দু ডুবিল কেন—সমাজতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ঘাঁটিয়া তাহার নিদান বাহির করি, কিন্তু নিজের ঘরের কোণের খবর, নিজের বুকের ভিতরের খবরটা লইয়া দেখি কি, কোন পাপে, কোন্ অনাচারে, হিন্দু দিন দিন ডুবিতে বসিয়াছে? বিলাতী সভ্যতার রং মাখিয়া দিন দিন মাকাল সাজিতেছি, কিন্তু অন্তরের গলিতকুষ্ঠ কি কেবল রঙের পোঁচেই ঢাকা পড়ে? আত্মশুদ্ধি, সমাজশুদ্ধি না হইলে কিসের উপর স্বদেশীর বনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে? ধর্ম্মে, নীতিতে ব্যভিচার করিয়াও পাশ্চাত্য সমাজ ধনকনকচর্চ্চায় আপাতসিদ্ধি লাভ করিতে পারে বটে; কিন্তু আমাদের দেশ কি আর তাহাদের চর্চ্চাটা বেমালুম হজম করিতে পারিবে? দেশের সমস্যা কি কেবল রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সমস্যা মাত্র? সমাজ কি কেবল আত্মসুখ সাধনের সহায়ক মাত্র? অথচ এই আদর্শেই আমরা সব জিনিষকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চেষ্টা করিতেছি! গুটীকতক শিক্ষিতাভিমানীর কথায় কি এ দেশ তাহার চিরক্ষুণ্ণ পথ ছাড়িয়া বিপথে আত্মহত্যা করিতে যাইবে?

:—•—

হিন্দুমুসলমানের মিলনচেষ্টায় যে সমস্ত খেয়াল-খেয়ালী কাণ্ড আমরা ঘটাইতেছি, তাহাও এই বিলাতী বাতিকেরই ফল। বিলাতী সমাজশাস্ত্র মতে একত্র খানা পিনা না হইলে সাম্য মৈত্রী প্রকাশ পায় না। অতএব আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে—মুসলমান ভাইদের সঙ্গে আহারাদি করিলেই হিন্দুমুসলমানের সকল ভেদ ঘুচিয়া যাইবে। এ সমস্ত নাকি "নৈতিক সাহসের" লক্ষণ! কি কুক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ ছুঁৎমার্গ কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন—সেই হইতে দেখিতেছি, বাঁশের চেয়ে কঞ্চিই দিন দিন দড় হইতেছে। বিবেকানন্দ দেশকে, ধর্ম্মকে কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহার খোঁজ করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহার তপশ্চর্য্যার সাকরেদী করিবার লোক মিলিবে না—কিন্তু ওই ছুঁৎমার্গ পরিহারের বেলায় আদর্শ দেখাইবার লোকের অভাব হয় না। প্রকৃত হিন্দু জানেন, ভাতের হাঁড়িকে উপলক্ষ্য করিয়া বিরোধটা যেমন সত্য নয়, মিলনটাও তেমনি মিথ্যা। শিক্ষায় দীক্ষায় সাম্য না আসিলে কি ভাতের দস্তীর সাম্যনীতি কোনও দিন টিকে, না তাহার ফল ভাল হয়? সুবিধাবাদটা হিন্দুর দেশের জিনিষ নয়—ওটা সাগরপারের আমদানী। পোলিটিক্যাল সুবিধার জন্য সমাজের বেড়া ভাঙ্গিয়া সকলে মিলিয়া তাল পাকাইলে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না; অজ্ঞের তাহাতে বুদ্ধিভেদ জন্মিবে এবং নিজেরাও তখন শেষ পর্য্যন্ত তাল সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন না। হিন্দু আচারের উপর এত জোর দেয়, কেননা এই আচার দিয়া সে একটা সত্যকার নিরেট বস্তুকে পাইতে চায়। তাহার আচার শুধু কোন্ এক বিস্মৃত অতীত যুগের সংস্কারের কঙ্কাল মাত্র নয়—তাহারও

একটা বস্তুতান্ত্রিক মর্য্যাদা আছে। আচার পালন করিয়া তাহার মর্ম্মসত্যটী বুঝিয়া কেহ যদি তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চান, তবে তিনি হইবেন নূতন যুগের সংস্কার-কার; ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথে তিনি জাতিকে পরিচালিত করিবার অধিকারী। কিন্তু চির অনাচারে অভ্যস্ত, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল মানুষ—নিজের সত্বটুকু বজায় রাখিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত যাহার নাই, সে সমাজ ভাঙ্গিতে যায় কোন সাহসে? ঐ কোথ সূত্রধার তো আমরা নই; অলক্ষ্যে বসিয়া যিনি এ দেশের নিয়তিকে গড়িয়া তুলিতেছেন; তিনিই জানেন, মিলনের সেতু কোথায়। স্ব স্ব অধিকারে অপ্রমত্ত থাকিয়া আত্মসমাধান অভ্যাস করিলে আমরাও তাঁহার মঙ্গলময় নির্দ্দেশের সঙ্কেতটী চিনিতে পারিব। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহাকে বুঝিয়া তারপর ভাঙ্গাগড়ার কাজ। মূল কথা, আগে "চাপরাস পাওয়া চাই।"

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

আগামী বৈশাখ মাসের ৬ই তারিখ অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে অত্র সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি আশ্রমের ১৬শ বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে; তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের আবাহন ও অর্চনা, ৭ই তারিখ শাস্ত্রব্যাখ্যা ও আলোচনা এবং ৮ই তারিখ পঞ্চমী তিথিতে জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে সারস্বত মঠে তদীয় আসনে তাঁহার পূজা, আরাত্রিক, হোম ও বেদপাঠাদি হইবে। সমস্ত দিন ব্রহ্মনাম যজ্ঞ এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবাপূজা হইবে। এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ এবং আমাদের "আর্য্য দর্পণের" গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছি।

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎপরমহংসদেব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া মঠের বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বেই মঠে পদার্পণ করিবেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

ঠাকুর হরিদাস—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও বগুড়া—মালতীনগর হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।০ মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বনে শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের মধুর চরিত্র মধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তমাত্রেই পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

কাশীধামের ব্রাহ্মণরক্ষা সভা হইতে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে "তত্ত্বপ্রকাশ গ্রন্থাবলী" ও "মাহাত্ম্য প্রকাশ গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া ব্রাহ্মণরক্ষা সভা যে দুইটী পুস্তকমালা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। আজকাল চারিদিকে জাতীয়তার ধূয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাই হিন্দুর প্রকৃত জাতীয় গৌরব ও বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক ব্রাহ্মণ-সভার এই সাধু চেষ্টাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। "ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত এই সমস্ত পুস্তকের কাপিরাইট হিন্দু জনসাধারণে, সমর্পিত। এ জন্য যে কোন হিন্দুধর্ম্মের সভাসমিতি বা যে কোন হিন্দু ইহা নিজব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন।" এই

ঔদার্য্য ও ধর্ম্মপ্রাণতা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণ সন্তানের উপযুক্ত।

স্থানাভাব বশতঃ আমরা পুস্তিকাসমূহের বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারিলাম না। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। আশা করি, স্বদেশভক্ত হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার এই উদ্যমের সহায়তা করিবেন।

ত্রিসন্ধ্যাতত্ত্ব—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় লিখিত। পৃঃ ৬৯, ছবিখানি ছাব আছে, মূল্য চারি আনা মাত্র। আধুনিক বিকৃত শিক্ষার প্রতিষেধক যুক্তিতর্ক সমন্বিত অতি সরল ও সরস আলোচনা। প্রত্যেক ব্রাহ্মণসন্তানেরই পড়িয়া দেখা উচিত।

শিবার্চ্চনতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কাব্য-তীর্থ লিখিত ও শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। পৃঃ ১৪+৮০, মূল্য ছয় আনা মাত্র। বহুশাস্ত্র হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সমস্ত কথাই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা তর্জ্জমার সঙ্গে মূল প্রমাণবাক্যসমূহও উদ্ধৃত হইয়াছে।

রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য, তুলসীমাহাত্ম্য ও গঙ্গোদকমাহাত্ম্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত। মূল্য যথাক্রমে ৵০, ৵০ ও ৶০ আনা মাত্র। বহুশাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণবাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। পাদটীকায় সংস্কৃত মূলও উদ্ধৃত হইয়াছে। বেশ সুন্দর সংগ্রহ।

বেদসভা

আগামী ১৩৩০ সালের ৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হাওড়া সহরে বেদসভার বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। ঐ উপলক্ষে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের সম্মিলনে বেদ-বিষয়ক বক্তৃতার ও বিবিধ প্রবন্ধ পঠিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বেদবিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলানুসারে ছাত্রের পুরস্কারের ও অধ্যাপকের বৃত্তির ব্যবস্থা করা যাইবে। বিশেষ সংবাদ জানিতে হইলে বেদসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল বেদরত্ন মহাশয়ের নিকট হাওড়া—পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়ে আবেদন করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্ত্তমান চৈত্রমাসে আর্য্য-দর্পণের পঞ্চদশ বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখ হইতে আর্য্য-দর্পণ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। যাঁহারা আগামীবর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনি-অর্ডার যোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ১৫ই বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য কিম্বা নিষেধ-সূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন; গ্রাহক-দিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে, তাঁহাদিগের কোনও ক্ষতিই হয় না। কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ডাকখরচ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরত আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা আছে, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।